# গল্প-পঞ্চাশৎ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

**মিত্র ও ঘোষ**
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত—

করকমলে

## ॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

বাংলা-সাহিত্যের সমৃদ্ধ ছোটগল্পের জগৎকে যাঁরা সমৃদ্ধতর করেছেন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর গল্পে "একটি প্রারম্ভ থাকে, একটি মধ্যাংশ থাকে, একটি উপসংহার থাকে।" অর্থাৎ তাঁর গল্পে 'গল্প' থাকে। সেইজন্যই পাঠক-সমাজে তাঁর ছোটগল্পের এত সমাদর।

বর্তমান খণ্ডে তাঁর 'স্বর্ণমুকুর' 'চতুর্দোলা' 'নবযৌবন' ও 'নূতন উষা' গ্রন্থের সব গল্প ছাড়াও কয়েকটি গল্প আছে। এই বইগুলি দীর্ঘকাল ছাপা নেই। অতঃপর আর ছাপাও হবে না। ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি—এমন কয়েকটি গল্পও এর মধ্যে সন্নিবেশিত হল। 'নবযৌবন'-এর অধিকাংশ গল্পই লেখকের কিশোর বয়সের রচনা, সার্থক শিল্প-স্রষ্টার প্রাথমিক প্রচেষ্টার নমুনা হিসেবে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে ব'লেই সে গল্পগুলিকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল।

প্রকাশক

# সূচী

## গল্পের কাঠামো

কী গল্প লিখব ব'সে ব'সে ভাবছি—এমন সময় ছোট শালী এলেন প্রায় লাফাতে লাফাতে ; অভিনবত্বের আনন্দ ও উত্তেজনায় তাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত, —'জামাইবাবু শুনেছেন ? আমাদের পাড়ায় এই মাত্র একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে !'

চিন্তায় ছেদ পড়ল। তবু বিরক্তিটা প্রাণপণে চেপে বললুম, 'না শুনি নি। কিন্তু এ আর এমন কি একটা অসাধারণ খবর ? হামেশাই তো কত মেয়ে গলায় দড়ি দিচ্ছে, বিষ খাচ্ছে ! তা ব্যাপারটা কি ? হতাশ প্রণয় ?'

'না গো মশাই !' বিজয় গর্বে মুখ ঘুরিয়ে বলেন তিনি; 'অত সোজা নয়। তিন ছেলের মা, বড় ছেলেটির বয়স কম ক'রেও আঠারো—থার্ড ইয়ারে পড়ে। বড় মেয়েটা এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে। ছোটটিও মেয়ে—ইস্কুলে পড়ছে। বয়স চল্লিশের কম হবে না—স্বামী বড় চাকরি করে, আমাদের পাড়ায় নতুন বাড়ি ক'রে উঠে এসেছে। গাড়ির দরখাস্ত ক'রে রেখেছে—পাওয়া গেলেই গাড়িও কিনবে—সব ঠিকঠাক। বামুন চাকর আছে—স্বচ্ছল অবস্থা। শখ সৌখীনতা খুব, এ পাড়ায় এসে পর্যন্ত দেখি প্রায়ই স্বামী-স্ত্রী লেকে বেড়াতে যেত। হঠাৎ কী যে হ'ল—বড় দু'জন কলেজে গেছে, ছোটটার ছুটি—চাকরের সঙ্গে তাকে পাঠিয়েছে পয়সা দিয়ে চকোলেট কিনতে। চাকরকে ব'লে দিয়েছে সেই সাদার্ন মার্কেট থেকে কিনে আনতে—সেখানকার জিনিসগুলো নাকি ভালো। মানে যতটা সময় পাওয়া যায় আর কি ! ঠাকুর কোনদিনই দুপুরে বাড়ি থাকে না—কোথায় ওদের দেশওয়ালী লোকের আড্ডা আছে, সেইখানে যায়। ফাঁকা বাড়ি—শোবার ঘরে ঢুকে দোর দিয়ে এই কাণ্ড। মেয়ে আর চাকর ফিরে দেখে সদর দোর খোলা—কেউ কোথাও নেই। খুঁজতে খুঁজতে ওপরে গিয়ে দেখে, মার ঘরের দোর বন্ধ। ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পায় না—তখন চিৎকার ক'রে পাড়ার লোক ডেকেছে। তা তিনটে-চারটের সময় আমাদের পাড়ায় আর ক'টা লোক থাকে বলুন, ঘুম ভেঙ্গে দু-একজন মহিলা এসেছেন অনেক পরে—কী ভাগ্যি, তাঁদেরই মধ্যে কে একজন বুদ্ধি ক'রে পাশের বাড়ি থেকে পুলিশে ফোন করেছেন। পুলিশ আর বড়ছেলে একসঙ্গেই বাড়ি ঢুকেছে প্রায়—ওরা

দোর ভেঙে দেখে এই কাণ্ড! চিঠিপত্র কিছু নেই—কী কারণ কিছু জানা যায় নি।'

এক নিশ্বাসে এতটা ব'লে, সম্ভবত দম নেবার জন্যই, একবার থামলেন তিনি। কিন্তু দেখা গেল উত্তেজনার বাষ্প তখনও যথেষ্ট কমে নি, আরও কিছু বার হওয়া দরকার। বললেন, 'গুজব কিন্তু এখনই বেশ চালু হয়ে গেছে। এই তো ঘণ্টা-তিনেকের ব্যাপার—এর মধ্যেই কত রকম শুনছি। আসল কথা ঐ পুরুষটাই বদমাইস।'

'তা তো বটেই!' সবিনয়ে স্বীকার করলুম, 'মেয়েরা যা কিছু ভালো কাজ করেন সব তাঁদের গুণ—খারাপ কাজের দোষটা নির্ঘাৎভাবে পুরুষদের।'

ভাগ্যিস আমার এসব বাজে কথায় তাঁর কান দেবার সময় ছিল না—নইলে এই নিয়েই হয়তো আরও খানিক বকুনি চলত (ব'লে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়েছিলুম বৈকি!)! তাঁর ভেতরের বাষ্পই তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলল, কাছাকাছির মধ্যে যতগুলি আত্মীয় আছে, সবাইকে খবরটা দিতে। যেমন দমকা হাওয়ার মত এসেছিলেন, প্রায় তেমনি ভাবেই চ'লে যেতে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। স্ত্রী একটু হেসে বললেন, 'গল্প খুঁজছিলে—এই তো এসে গেল। এখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, বানিয়ে বুনিয়ে একটা খাড়া ক'রে ফেল—আর কি! তোমাদের তো ঐ কাজ!'

স্ত্রী-বাক্য অবশ্যই শিরোধার্য।

কিন্তু মূল প্রশ্নটা যে থেকেই যাচ্ছে—লিখি কি? একটি চল্লিশ বছরের মহিলা আত্মহত্যা করেছেন—এটা অত্যন্ত স্থূল এবং বর্ণহীন তথ্য। বেলুনের চোপ্সানো মূল বস্তুটার মতই আকারহীন সামান্য পদার্থ একটা। যতক্ষণ না এর মধ্যে কল্পনার বাতাস ভ'রে এর একটা আকার দেওয়া যাচ্ছে—ততক্ষণ এর কোনো মূল্যই নেই। গৃহিণী তো ব'লেই খালাস—'ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বানিয়ে বুনিয়ে খাড়া কর'—কী দিয়ে ফোলাব সেইটেই তো ভেবে পাচ্ছি না!

আসলে এটা হ'ল গল্পের পরিণতি। কবিগুরুর মতে এটা নিতান্তই তথ্য—তুচ্ছ! গল্পের সত্য হচ্ছে সেই বস্তু যাকে বাস্তব জীবনে কল্পনা ও মিথ্যা বলা হয়। সেই মিথ্যার ফুঁ দিয়ে ভরাতে না পারলে এটুকু তথ্যের পদার্থ বাজারে চালানো যাবে না যে কিছুতেই।

অর্থাৎ, এই আপাত-অর্থহীন কার্যের একটা জুৎসই লাগসই কারণ ভাবতে

হবে। এই নিদারুণ পরিণতির একটি হৃদয়গ্রাহী পৃষ্ঠপট রচনা করতে হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গৃহিণী নিচে তাঁর ছেলে-মেয়ে, কুকুর-বেড়াল, চাকর প্রভৃতি নিয়ে চেঁচামেচি বকাবকি শুরু করেছেন। ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে, আশ-পাশের বাড়িতেও। সামনের বাড়ির দুষ্টু ছেলেটা বোধ করি আজ বাপের ভয়ে এখনই পড়তে বসেছে। ওপাশের বাড়ি থেকে আহ্লাদী মেয়েটার বেসুরো গলার প্রাণপণ চিৎকার ভেসে আসছে (তার বিশ্বাস সে গানই গাইছে ; তার মায়ের আশা এই সুরের তরণী নিয়েই সে বিবাহসমুদ্রে পাড়ি জমাবে!)। তারই মধ্যে অন্ধকারে ব'সে ব'সে আমি ভাবছি ঐ মহিলাটির কথা।

কেন আত্মহত্যা করলেন তিনি ? কী দুঃখে এত সাধের সাজানো ঘরকন্না ছেড়ে, ছেলে মেয়ে স্বামী—নতুন বাড়ি, ভবিষ্যতের আরও অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসের সম্ভাবনা ছেড়ে নিজের জীবনে এমন অসময়ে অকালে ছেদ টানলেন ?—বরণ ক'রে নিলেন এই বীভৎস মৃত্যু ?

সম্ভাব্য কারণ অনেক হ'তে পারে। অনেক সময় অনেক তুচ্ছ এবং হাস্যকর কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশেষত মেয়েমানুষ। বৈজ্ঞানিকরা সে আত্ম-হত্যার একটিমাত্র কারণ নির্দেশ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন—সাময়িক উন্মত্ততা। কিন্তু তা দিয়ে আমার গল্প জমবে না। সহজ মানুষের সাধারণ আচরণের কারণ আর গল্পের পাত্র-পাত্রীর আচরণের কারণ এক হ'লে চলবে কেন ?

সুতরাং আমাকে অন্য-রকম একটা কিছু ভাবতে হবে। জটিল মনস্তত্ত্বের গহণ অরণ্য থেকে কাঁটার ফুল তুলে এনে গাঁথতে হবে এই কথার মালা।

অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ভাবলাম।

তিন রকমে সাজানো যায় গল্পটা। অন্তত আমার এখন এই তিনটের কথাই মনে পড়ছে।

প্রথমত ধরুন : আমার শালীর কথাই ঠিক। স্বামীটাই পরোক্ষভাবে দায়ী। তা যদি ধরা যায় তা হ'লে ঘটনাটা কী দাঁড়াবে ?

মহিলার নাম মনে করুন—রমা। স্বামীর নাম নরেশ।

এই রমার যখন বিয়ে হয় তখন মনে হয়েছিল নরেশ সবদিক দিয়েই যোগ্য পাত্র। এম-এ পাস, ভাল চাকরিতে ঢুকেছে, পৈতৃক অবস্থাও মন্দ নয়। স্বভাব-চরিত্র যত দূর জানা যায়—খুবই ভালো। সিগারেটটি পর্যন্ত খায় না।…বিয়ের

সময় মনে হয়েছিল বহুজন্মের তপস্যার ফলেই রমার এমন পাত্র মিলেছে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেক অনূঢ়া কন্যার বাপ-মাই রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

আনন্দ রমারও কম হয় নি। বিবাহের পর প্রথম কিছু দিন অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল সে আনন্দ। নবদম্পতির প্রেমগুঞ্জন-মুখর সে স্বপ্ন-কল্পনার দিনগুলি সৌভাগ্যের এক সুখস্বর্গ রচনা করেছিল রমার জীবনে।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে-না যেতেই রমা বুঝল একটা মস্ত বড় ফাঁকির ওপর এই স্বর্গ রচনা করেছে সে। যেটাকে সে প্রস্ফুটিত সৌভাগ্য-পুষ্প ব'লে মনে করেছিল আসলে সেটা কীটদষ্ট। মদ-ভাঙ তো দূরের কথা—নরেশ বিড়ি-সিগারেটও খায় না। কিন্তু এর চেয়ে মদ-ভাঙ খাওয়াও বোধ করি ভালো ছিল। স্বামীর চরিত্রের যে দিকটা নিয়ে সব চেয়ে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ মেয়েদের—সেইখানেই একটা বড় দুর্বলতা আছে নরেশের। ক্রমে রমা আরও বুঝল—এটা তার সহজাত, স্বভাবের অঙ্গীভূত। এর আর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

অর্থাৎ, বহু নারী ছাড়া নরেশের তৃপ্তি হয় না। এবং এ-স্বভাব তার প্রকাশ পেয়েছে বহুকাল—বলতে গেলে কৈশোরকাল থেকেই। রমার পূর্বেও বহু নারী এসেছে তার জীবনে—রমা আসাতে কয়েকটা দিন থেমেছিল মাত্র সে স্রোত,—আবারও আসতে শুরু করেছে।

কিন্তু তবু যদি, এতটুকু ভদ্র আচ্ছাদনও থাকতো ওর এই ক্লেদাক্ত লোলুপতায়।

ক্রমে ক্রমে নরেশের পূর্ব-জীবনের বহু ইতিহাসই কানে যায় রমার। আত্মীয়স্বজনরা নাকি বয়স্কা মেয়ে নিয়ে ওদের বাড়িতে আসতে সাহস করতেন না—নিকট আত্মীয়ের কন্যারাও ওকে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠত।

তবু রমা আশা ছাড়ে নি প্রথমটা। মান-অভিমান, কান্নাকাটি, উপবাস—নারীর তূণে বিধাতা যে ক'টি অস্ত্র দিয়েছেন তার কোনোটারই প্রয়োগে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নি। কিন্তু তবু পেরে ওঠে নি সে স্বামীর সঙ্গে। লোকে কথায় বলে 'পায়ে-পড়ারে ছাড়া ভার'—যে অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয়—যে নিজেও চোখের জল ফেলে, উপবাস করে—তাকে কী ক'রে সংশোধন করতে পারা যায়! অনুতাপ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে—প্রতিজ্ঞা করে আর কখনও এমন করবে না—আবার পরক্ষণেই, প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র, সেই কাজ করে।

এই ভাবেই ওরা কাটিয়ে এসেছে দীর্ঘকাল। ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি অন্যান্য কর্তব্যে কখনও ত্রুটি করে নি নরেশ। অফিসেও খ্যাতি ছিল, বছর বছর পদোন্নতি হয়েছে। ঘরবাড়ি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সবই পেয়েছে সে। রমার মাও ওকে অনেকটা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ; বুঝিয়েছিলেন, 'সেকালে সব বড়মানুষই তো রক্ষিতা রাখত, মনে কর না কেন এ তাই। তোর পিতামহ প্রপিতামহ যে গণ্ডাকতক ক'রে বিয়ে করতেন—তার চেয়ে তো ভাল। সতীনের সঙ্গে অধিকারের ভাগ দিয়ে তো বাস করতে হচ্ছে না। তোর মর্যাদা তো ক্ষুণ্ণ করে নি সে। এদিকে-ওদিকে কি ক'রে বেড়ায় তা নিয়ে আর মাথা ঘামাস্ নি।'

এই যুক্তি তো ছিলই—তা ছাড়াও রমা অনেক ব্যবস্থা করেছিল। সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে দিত না, অফিস থেকে সকাল ক'রে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করেছিল—সন্ধ্যের সময় সঙ্গ ছাড়ত না। লেকেই হোক, সিনেমাতেই হোক, আর খেলার মাঠেই হোক—সর্বদা ছায়ার মত সঙ্গে থাকত। দুর্বল ও লোভীকে সুযোগ দিতে নেই—এটা সে বুঝেছিল ভালোমতেই।

কিন্তু পাহারা দিয়ে চরিত্র বাঁচানো যায় না—স্ত্রী-পুরুষ কারুরই না। আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য সিন্দুকে পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেও একটা মেয়ের চরিত্র সামলাতে পারে নি। ওটা উল্টো হ'লেও ফল বোধ হয় একই হ'ত।

রমা ঝি রাখা বন্ধ করেছে বহুকাল। কিন্তু পরের বাড়ির ঝি কোনোদিন কোনোকালে আসবে না—এমন তো হ'তে পারে না। এখানে আসার পর পাশের বাড়ির মিসেস সেনের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভালো শিল্পী—তাঁর কাছে রমা বোনার নতুন প্যাটার্ন শিখছিল। সেই উপলক্ষ্যেই তাঁর অল্পবয়সী ঝি আসা-যাওয়া করত। গতকাল সন্ধ্যাতেও এমনি একটা প্রয়োজনেই সে এসেছিল। ছেলেমেয়েরা পড়ার ঘরে, রমা বাথরুমে—নরেশ অফিস থেকে এসে চা-খাওয়া শেষ ক'রে ব'সে কাগজ পড়ছিল। সামান্য একটু সময়। রমা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই কিছু অশোভন ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকবে। ঝি বোনার নমুনাটা রমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে গেল, 'আর কখনও তোমাদের বাড়ি আসতে বোল নি বৌদি! ছি ছি, এই তোমাদের ভদ্দরনোকের বাড়ি? এই ব্যাভার নেকাপড়া-জানা বাবুদের? কী ক'রে এমন মানুষের ঘর কর বৌদি?'

এর পর রমা যদি আজ এই কাণ্ড ক'রেই থাকে তো ওকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

এই পর্যন্ত গেল—সেকালের ভাষায়—প্রথম প্রস্তাব।

আবার উল্টো ভাবেও ধরা যায় বৈকি গল্পটা।

রোমান্টিক মেয়ে রমা। জীবনটা সে ছোটবেলা থেকেই রঙিন চশমার মধ্যে দিয়ে দেখতে চেয়েছে। পড়তে শিখে বেছে বেছে শুধু প্রেমের কবিতা পড়ত, কেবল রোমান্টিক ধরনের কাহিনী পাঠেই ছিল তার আনন্দ। ছবি আঁকত, গান গাইত—ফুরফুরে হয়ে ঘুরে বেড়াত শুধু।

তাই নরেশের সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হ'ল তখন সবাই সেটাকে পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলেও, পূর্বজন্মের বহু তপস্যার ফল ব'লে ভাবলেও, রমা তা ভাবতে পারে নি। বরং একটা আশাভঙ্গের বেদনাই অনুভব করেছিল মনে মনে। নরেশ ছিল স্থূল বস্তুবাদী মানুষ। অফিস, কাজ, সংসার—এবং নিতান্তই সহজ, সাধারণ জীবন এ ছাড়া কিছু জানত না। স্বপ্ন-কল্পনার ধার দিয়েও যেত না সে—কোনোপ্রকার কাব্যের ধার ধারত না।

তবু ওদের জীবন একরকম ক'রে কেটেছে। বাইরের কেউ ওকে দেখে কোনো ব্যর্থতা, কোনো ক্ষোভের সন্ধান পায় নি। ছেলেপুলে, ঘর-সংসার, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—এরই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল রমা; মনে করেছিল অন্তরের সে বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত রোমান্টিক সত্তাটা একেবারে শুকিয়ে মরে গিয়েছে।

তার পর—এই এতকাল পরে, কোথা থেকে এল বিমল, ওর ছেলেমেয়ের তরুণ প্রাইভেট টিউটার। এম-এতে ফার্স্ট হয়েও কোনো ভালো চাকরির চেষ্টা করে নি বা করতে পারে নি—সম্ভবত উদ্যমের অভাবেই। একটা বেসরকারী কলেজে প্রফেসারী করে, আর নিতান্ত সাংসারিক কারণে করে এই অতিরিক্ত পাঠনের কাজটুকু—এই টিউশনি। কিন্তু কাজ ওর ভালো লাগে না, ও চায় পড়তে—বিশেষ ক'রে কবিতা পড়তে।

পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, অবিন্যস্ত চুল, বেশভূষা যৎপরোনাস্তি শিথিল ও আলুথালু—চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে ধ'রে ব'সে থাকে একঘণ্টা, খেতে মনে থাকে না। ট্রামে উঠে আবিষ্কার করে মনিব্যাগটা বাড়িতে ফেলে এসেছে। টাকার গোছা বাজে কাগজ মনে ক'রে বাইরে ফেলে বাড়িতে ঢোকে। চোখের দৃষ্টি সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক ও স্বপ্নালু।

ওকে দেখে প্রথম দিন থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল রমা। ওকে যত্ন করবার জন্য, ওর অভিভাবকত্ব করার জন্য সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় দিয়ে ওর অন্তরের কবি-

প্রকৃতিকে সযত্নে লালন করবার জন্য রমার সমস্ত অন্তর লালায়িত হয়ে উঠেছিল। এই তো তার স্বপ্নের পুরুষ, এমনি লোকই তো সে চেয়েছিল সারাজীবন।

বিমলও ওকে দেখে কম চমৎকৃত হয় নি। বস্তুত ছাত্রছাত্রীর মা মধ্যবয়সী এক মহিলার মধ্যে এমন একটি কাব্যরসিক রসবুভুক্ষু মন সে আবিষ্কার করবে তা রমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে স্বপ্নেও ভাবে নি। ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় ফাঁকি দিয়ে কাব্যচর্চা করলে তাদের অভিভাবিকা অসন্তুষ্ট হন না—বরং খুশি হন, এ অভিজ্ঞতা যে একেবারে অভিনব!

বিমল, যথার্থই যাকে বলে, কাব্যপাগলা—তাই। তার হাতের খাবার মুখে তুলতে মনে থাকে না, আগের মুহূর্তে কোনো জিনিস পকেটে পুরে পরের মুহূর্তে সে পকেট ছাড়া সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু কবিতা তার আশ্চর্য মুখস্থ থাকে। রাশি রাশি কবিতা শোনায় সে রমাকে—শুধু বাংলা নয়, ইংরিজিও। সে-সব কবিতার অর্থ বুঝতে পারে না রমা, কিন্তু তার ধ্বনি, বিমলের আশ্চর্য নরম আবেগ-থরো-থরো গলার আবেদন, তাকে অভিভূত করে। তারও মনে প'ড়ে যায় বহু দিনের পড়া কবিতাগুলো—এতকাল পরেও সে ভোলে নি তাদের। এও এক আবিষ্কার তার কাছে। অবাক হয়ে যায় সে নিজে নিজেই। বুঝতে পারে যে, যে-মন তার চিরকালের জন্য মরে গেছে ভেবে সে নিশ্চিত হয়েছিল—আসলে তা সংসারের স্থূল বাস্তবতার চাপে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল মাত্র। সামান্য দক্ষিণা বাতাস পাওয়া মাত্রই তা আবার নতুন ক'রে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

রমার মনে হ'ত—প্রথম কৈশোরের সেই স্বপ্নে ও সঙ্গীতে মেশা দিনগুলিতে যদি এর সঙ্গে দেখা হ'ত!

বিমল প্রকাশ্যেই বলত, 'জীবনপথে যদি আপনার মত কোনো সঙ্গিনী পেতাম বৌদি!'

কোথায় কী কথা বলা অশোভন বা অসঙ্গত—এতটা সাংসারিক জ্ঞান আজও হয় নি বিমলের। আর সেটা আশাও করে না রমা। এ জ্ঞান নেই ব'লেই বিমলকে তার এত ভালো লাগে। সে প্রসন্নকৌতুকহাস্যে মুখ রঞ্জিত ক'রে অভয় দেয়, 'খুঁজুন, পাবেন বৈকি! অনেক মেয়ের মধ্যেই আমার মত মন ঘুমিয়ে আছে, ঠিক মানুষটি ছুঁলেই তা জেগে উঠবে!'

এই ভাবেই চলছিল—হঠাৎ একদিন এসে বিমল বলল, 'বৌদি, আপনার কাছে যদি খুব অসঙ্গত এবং অন্যায় একটা আবদার করি—আপনি কি খুব রাগ করবেন?'

চমকে কেঁপে উঠল রমা। বুকের রক্ত যেন ছলাৎ ক'রে উঠল একবার। রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। অতিকষ্টে শুধু বলল, 'বলেই দেখুন না!'

তবুও অনেক ইতস্তত ক'রে, অনেক মাথা চুলকে, অবশেষে বিমল বলেছিল কথাটা—'যদি শ' পাঁচেক টাকা ধার চাই ?'

আশ্বস্ত হ'ল কি হতাশ হ'ল—রমা তা নিজেও বুঝল না। তবে উত্তর দিতে একটু দেরি হ'ল তার। বলল, 'ও, এই !…তা এর জন্যে এত ভূমিকা কেন, এখনই দিচ্ছি !'

যাকে অনেক, অনেক বেশি দেওয়া যায়, তার হাতে মাত্র পাঁচ শ' টাকা তুলে দেওয়াটা কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হয় নি সেদিন ?

কৌতূহলও হয়েছিল বৈকি, তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি—হঠাৎ এত টাকার কী দরকার হ'ল বিমলের।

অনুচ্চারিত সে-প্রশ্নের জবাব পেলে রমা দিন-তিনেক পরেই। বিমল তার কলেজের একটি ছাত্রীকে বিয়ে করেছে। স্ব-শ্রেণীর মেয়ে নয় ব'লে বাপ-মা তাকে ঘরে তুলতে রাজি হন নি, সেইজন্যে নতুন বাসা ভাড়া ক'রে, সে-বাসা সাজিয়ে সেইখানে এনে তুলতে হয়েছে বৌকে। সলজ্জ হেসে বললে বিমল, 'সেইজন্যেই হঠাৎ অত টাকার দরকার হয়েছিল। আপনার দয়াতেই এ যাত্রা অনেক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম। হয়তো বিয়ে করাই হ'ত না এখন—টাকাটা না পেলে। আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত রইল না।…যদি অনুমতি করেন তো একদিন নিয়ে আসব—আপনাকে দেখিয়ে যাব !'

আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছিল রমা ? প্রতারক ব'লে মনে হয়েছিল বিমলকে ? বিদ্বেষ বা ঘৃণাবোধ হয়েছিল ঐ লোকটা সম্বন্ধে ? ঠিক কী হয়েছিল তা রমা নিজেও বোধ করি জানে না।

তবে দিন-কতক একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ওর মধ্যে, এটা ঠিক। বহুকাল যে স্বামীর সঙ্গে ওর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না, সেই স্বামীকে নিয়েই অকস্মাৎ যেন মেতে উঠল ও। একদণ্ড ছাড়তে চায় না—চায় না একটি মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতে। জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায় লেকে, নিয়ে যায় সিনেমায়, খেলার মাঠে। এক-একদিন শুধুই যে-কোনো ট্রামে বা বাসে চেপে বেরিয়ে পড়ে—পাশাপাশি ব'সে অনির্দেশ্য পথে যাত্রার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে।

কে জানে হয়তো নতুন ক'রে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল সে স্বামীকে—

অথবা চেয়েছিল মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

নরেশের মন্দ লাগে নি ব্যাপারটা। সেও নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল স্ত্রীর এই প্রেমের আতিশয্যের মধ্যে। হয়তো তারও—এত দিনের নীরস, একঘেয়ে বিবর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে এ বর্ণ-বৈচিত্র্যটুকু ভালোই লেগেছিল।

কিন্তু—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রমা সামলাতে পারল না নিজেকে। এই কাণ্ড ক'রে বসল!

এও একরকম হ'তে পারে গল্প। কিন্তু ধরুন, যদি এ দুটোর কোনোটাই না করা যায়?

যদি ধরা যায় যে, নরেশ আর রমা—দু'জনেই সহজ, স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ ছিল?

মনে করা যাক—ওরা সুখীই হয়েছিল পরস্পরকে পেয়ে। দু'জনেই দু'জনকে ভালোবেসে ছিল। বিবাহের আগে যে-জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল রমা, যে সুখ-সৌভাগ্য সে কল্পনা করেছিল তার অনেকখানিই মিলে গিয়েছিল বাস্তবের সঙ্গে। স্বামী পুত্র কন্যা—সবই মনের মত দিয়েছিলেন বিধাতা। যেটুকু সাধ ছিল—ভদ্র পল্লীতে নিজস্ব একটি বাড়ি, তাও পূরণ হয়েছিল, বরং আশার অতীত ভাবেই হয়েছিল। লেকের ধারে তার বাড়ি হবে—এতটা সে কল্পনা বা প্রার্থনাও করে নি কখনও।

হয়তো এতটা সুখ-সৌভাগ্যই কাল হ'ল শেষ পর্যন্ত। এই কথাটাই স্বামী-স্ত্রীর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল ইদানীং। আচ্ছা, মৃত্যুর পরও, পরলোকে গিয়েও তাদের এই জীবন এমনি থাকবে তো? এমনি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধা—এমনি মধুর সুখের জীবন? এপার ওপারে পার্থক্যের মধ্যে যদি শুধু এই দেহটার অভাবই একমাত্র হয় তো আপত্তি নেই ওদের। কিন্তু—কিন্তু যদি এই সাময়িক-বিচ্ছেদই চিরবিচ্ছেদ হয়?

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল হয়তো একদা খুব হাল্‌কাভাবেই, কিন্তু ক্রমশ সেটা ওদের পেয়ে বসল। আবিষ্ট হয়ে উঠল ঐ চিন্তাতে। মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে 'অবসেসান' বলেন তাই হয়ে দাঁড়াল।

শেষে এমন হ'ল—ভোরবেলা ঘুম ভেঙে প্রথম কথা উঠত ঐটেই। তারপর অবশ্য প্রাত্যহিক সংসারের কাজে সেটা মুলতুবী রাখতে হ'ত—কিন্তু নরেশ অফিস থেকে ফেরা মাত্র আবার শুরু হয়ে যেত আলোচনাটা। বাড়িতে তেমন জমত না

ব'লে ইদানীং ওরা সন্ধ্যার পর লেকের ধারে চ'লে যেত, সেখানে পরিচিত পরিবেশের বাইরে নির্জন অন্ধকারে প্রসঙ্গটা জমে উঠত ভালো। এক-একদিন ভাবতে ভাবতে যখন মাথা গরম হয়ে যেত, অজানা রহস্যের বধির অন্ধ সেই কঠিন যবনিকায় মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে ওদের অন্তর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠত, তখন এক-একদিন ওরা বেরিয়ে পড়ত অনির্দেশ যাত্রায়—সামনে যে-কোনো পথের যে-কোনো বাস বা ট্রাম পেত তাতেই উঠে পড়ত এবং যতক্ষণ না একেবারে লাইন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ত ততক্ষণ পর্যন্ত তেমনি পাশাপাশি ব'সে থাকত ওরা স্তব্ধ হয়ে—নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাহচর্য অনুভব করত শুধু।

সমস্ত প্রশ্ন এখন শুধু একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে এসে সংহত হয়েছিল : জীবনের পরেও কোনো জীবন আছে কিনা! কেউ কি বলতে পারে না 'ওপারের' খবর? কেউ কি জানে না? জানা কি সম্ভব নয় কোনো মতেই—মরণের পরে কে কোথায় যায়?

এই বিষয়ে লেখা প্রচুর বিলিতী বই সংগ্রহ করেছিল নরেশ, লাইব্রেরি থেকেও আনত গাদা গাদা। নিজে প'ড়ে তার মর্মার্থ টা বুঝিয়ে দিত রমাকে—কিন্তু ওদের কারুরই তাতে মন ভরত না। ঠিক বিশ্বাস হ'ত না যেন। যে সব বন্ধু-বান্ধবরা প্ল্যানচেট ক্লেয়ারভয়েন্সৃ ইত্যাদির সাহায্যে পরলোকের খবর জানবার চেষ্টা করতেন তাঁদের বৈঠকেও দু'চার বার যোগ দিয়েছে ওরা। কিন্তু সবটাই বিরাট ধাপ্পাবাজি ব'লে মনে হয়েছে। নিজেরাও দু'চারবার চেষ্টা করেছিল—সুবিধা হয় নি। একবার নরেশ ভূতাবিষ্ট হয়ে প্ল্যানচেটে অনেক প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক লিখে ফেলেছিল। কিন্তু সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসিনী রমা তার মাসিমার শ্বশুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে এমন হাস্যকর সব জবাব আসতে লাগল যে, সে হেসে উঠে প্ল্যানচেটের টেবিল ঠেলে ফেলে দিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

অবশেষে একদিন রমা এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসল : সে নিজে মরে খবর সংগ্রহ করবে।

নরেশ শিউরে উঠে ওর দুটো হাত চেপে বলে, 'ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না।'

'না গো। এ অনিশ্চয়তা, এ সংশয় আমার অসহ্য লাগছে। দেহটা থাকতে যদি এ যবনিকার ওপারে পৌঁছনো না যায়—দেহটা ত্যাগ ক'রেই না হয় গেলাম! তবু—জানতেই হবে আমাকে, না জেনে থাকতে পারছি না আর!'

'কী বলছ যা-তা। পাগল হয়ে গেলে নাকি? তুমি গেলে ছেলেমেয়েগুলোর কী অবস্থা হবে বল তো? আমিই বা কি করব?'

'ছাখো, আর কে কী পারে না পারে তা জানি না—কিন্তু আমি তোমাকে জানাবই—এ আমি কথা দিচ্ছি। যদি মৃত্যুর ওপারে কোনোরকম জীবনের অস্তিত্ব থাকে, যদি সত্যিই তোমার আমার কোনো অবিচ্ছেদ্য অনন্ত মিলনের সম্ভাবনা থাকে তো তোমাকে আমি সে খবরটুকু পেঁ ৗছে দেবই—যেমন ক'রে হোক। তখন তুমিও সেই পথে গিয়েই মিলবে আমার সঙ্গে। আর কোনো ভয় কোনো সংশয় থাকবে না—কোনো দিন কোনো মৃত্যু এসে আর আমাদের আলাদা করতে পারবে না। সেই তো ভালো গো!'

'কিন্তু যদি আর কোনো জীবনের অস্তিত্ব না থাকে? যদি নিতান্তই পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়। আত্মা পরলোক যদি সব ভুয়ো, সব বাজে কথা হয়? তখন?'

'তাহ'লে এই জীবনের প্রেম ভালোবাসা আকর্ষণ—এসবেরও তো কোনো মূল্য থাকে না। তাহ'লে বেঁচেই বা লাভ কি? যা এত ক্ষণস্থায়ী, এত অল্পে যার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি—সে-জীবন আঁকড়ে ধ'রে থেকেই বা লাভ কি! এত সাধনা, এত সংগ্রাম কিসের জন্যে তাহ'লে!'

'কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো? তাদের কথা ভাবছ না? তাদের আমরাই এ পৃথিবীতে এনেছি। তারা স্বাধীনভাবে জীবন আরম্ভ না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'ছাখো কত রকমেই তো আমার মৃত্যু হ'তে পারে। যে-কোনো দিন যে-কোনো রোগে—যে-কোনো একটা অ্যাকসিডেন্টে। তখন ওরা কি করবে! সে অবস্থায় যা করত—এখনও না হয় তাই করবে। তোমার পয়সা আছে, ঝি চাকর রেখে চালাতে পারবে। খোকা তো আর এক বছর পরেই বি-এ পাস করবে—ওর জীবন তো শুরুই হয়ে যাবে বলতে গেলে!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নরেশ আবারও যেন শিউরে উঠে সবলে ওকে জড়িয়ে ধরলে, 'না না রমা, এ সব ছেলেমানুষি কোর না। আমাদেরই ভুল হয়ে গিয়েছিল এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামাতে যাওয়া। ভূত ভূত করতে ভূতই ভর ক'রে বসেছে। ছিঃ! পরে যা আছে তা পরেই দেখব। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—।'

রমা তখনকার মত চুপ ক'রে গেল।

এর পর দিনকতক নরেশ ওকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ ক'রে বেড়াল। পর পর সিনেমায় গেল ক'দিন; থিয়েটার, ম্যাজিক—কিছু বাদ দিলে না। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি গেল খুঁজে খুঁজে, তাদের নেমন্তন্ন করলে নিজেদের বাড়ি—অর্থাৎ একটা নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার, একটা নিরন্ধ্র নিরবসরতার ঘূর্ণাবর্তে রমার মনের এই বুকচাপা চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে।

এই পর্ব চলেছিল দিন পনেরো ধ'রে। এই সপ্তাহটাই ক্লান্ত হয়ে থেমেছিল নরেশ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চেয়েছিল—যদিও এসব প্রসঙ্গ যত্ন সহকারে এড়িয়ে যেত।

রমার আচরণ বরাবরই সহজ ও স্বাভাবিক। কাজেই, এই পাগলামির ভূতটা তার ঘাড় থেকে নামল কি না তা বুঝতে পারলে না নরেশ। তবু তার মনে হ'ল যে, অনেকটা প্রকৃতিস্থই হয়েছে নিশ্চয়। এতদিনে যখন ও প্রসঙ্গ একবারও তোলে নি—তখন অন্তত আগের মত আচ্ছন্ন ক'রে নেই নিশ্চয় চিন্তাটা।

সেইখানেই ভুল হয়ে গিয়েছিল। বাইরের প্রশান্তি দেখে অন্তরের আলোড়নটা আন্দাজ করতে পারে নি।

কারণ, তার পরেই তো এই কাণ্ড ঘটল।

এখন হয়তো নরেশের কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। হয়তো নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে এই সর্বনাশের জন্য। আবার রমার কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতেও পারছে না। রমা যে এই কারণেই আর এই উদ্দেশ্যেই স্বেচ্ছায় মরেছে তাতে নরেশের কোনো সন্দেহ নেই। কৌতূহলে ও ঔৎসুক্যে আশু বেড়ে গেছে মৃত্যুর দিকে।

সত্যি কি পারবে রমা কোনো সংবাদ পাঠাতে? পাঠানো কি সম্ভব?

সেই সংশয়, সেই অন্তহীন প্রশ্ন। শুধু তার সঙ্গে যোগ হবে একটা সীমাহীন সমাপ্তিহীন প্রতীক্ষা।...একটা ক্ষীণ আশা উন্মুখ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করবে, ওপারের সামান্য একটু ইঙ্গিতের জন্য।

কিন্তু যদি সত্যিই সে ইঙ্গিত কোনোদিন আসে—নরেশ কি পারবে রমার মত সেই অপার্থিব বিদেহ চিরমিলনের আশায় পার্থিব ভোগসুখ এবং এই দেহটার মায়া কাটাতে? পারবে কি অমনি প্রশান্তমুখে স্বেচ্ছায় ওপারের দিকে পা বাড়াতে?

আর যদি কোনোদিনই না আসে সে ইঙ্গিত, না পৌঁছায় সে সংবাদ?

তখন নিজের মূঢ়তার অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে এই ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবনই

কি টেনে বেড়াবে সে?

কে জানে!

মোটামুটি গল্পের কাঠামোগুলো এই। এর মধ্যে কোনটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং চড়িয়ে খাড়া করতে পারলে পাঠকদের পছন্দ হবে তাই ভাবছি। সেইটে ঠিক করতে পারলেই লিখতে ব'সে যাব।

## আশীর্বাদ

নিরাপদ তার বক্তব্য শেষ ক'রে বসবার পর কিছুক্ষণ—প্রায় মিনিট দুই—অতবড় হলটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল, যেন থমথম করতে লাগল সবটা। কারণ, ওর কথাগুলোর সম্যক্ অর্থ বুঝতেই সময় লাগল খানিকটা। তারপর—একটু একটু ক'রে ব্যাপারটা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃদু ধিক্কার এবং বিদ্রূপের গুঞ্জন শস্যশীর্ষে বাতাস লাগার মতই সেই বিপুল ছাত্রসমাবেশের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

কেউ বললে 'মেলোড্রামা', কেউ বললে 'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স'!

সহপাঠীরা বললে, 'ও চিরদিনই অমনি পাগল। দেখছেন না কী অদ্ভুত বেশভূষা!'

প্রিন্সিপ্যালের মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি অপ্রতিভতা ও বিরক্তি সামলাতে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ডানহাতের করতলটার দিকে চেয়ে রইলেন। আর এই নাটকের যিনি প্রধান নায়ক—প্রবীণ অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাস ক্ষমাসুন্দর হাসিতে মুখটি রঞ্জিত ক'রে প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ছাত্রদের দিকে।

অবশ্য অনুষ্ঠানের আর বেশি দেরিও ছিল না। অধ্যক্ষের বক্তব্য এবং চারুবাবুর প্রত্যভিনন্দন, তারপর সমাপ্তি-সঙ্গীত। সবশেষে সামান্য জলযোগ। অধ্যক্ষ ঠিক সোজাসুজি নিরাপদকে তিরস্কার না করলেও বর্তমান ছাত্রদের প্রসঙ্গে 'ইম্‌পার্টিনেন্স' শব্দটির ওপর একটু বেশি সময় নিলেন, তাতেই কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে, তাঁর এই ইঙ্গিতের লক্ষ্য কে। সকলেই নিরাপদের

দিকে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল—সে কিন্তু নির্বিকার। সে যেমন 'ডায়াস'-এর দিকে চেয়ে বসেছিল তেমনিই রইল, তার মুখের প্রশান্তি এতটুকুও নষ্ট হ'ল না।

চারুবাবু অবশ্য ওদিক দিয়েই গেলেন না। সাধারণভাবে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে যে আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পেয়েছেন, সহকর্মীদের কাছ থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছেন, তারই উল্লেখ ক'রে আবেগ-পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

তারপর খাওয়া-দাওয়া, প্রণাম করার হুড়োহুড়ি, ফার্স্ট ইয়ারের নতুন ভর্তি-হওয়া ছাত্রদের অটোগ্রাফ নেওয়ার গোলমালে মাঝখানের ঐ অপ্রীতিকর অনুচ্ছেদ—নিরাপদর ব্যাপারটার স্মৃতি সকলের মন থেকেই উড়ে গেল।

উপলক্ষ্যটা হ'ল প্রবীণ অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাসের বিদায়-সংবর্ধনা। চারুবাবু ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক। মানুষ এবং অধ্যাপক দুই দিক দিয়েই তাঁর বিপুল খ্যাতি। ছাত্রদের তিনি শুধু গুরু নন—প্রিয় বন্ধুও। চিরকাল বিপদে-আপদে তারা তাঁর কাছে ছুটে আসে। তিনিও যথাসাধ্য উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন, প্রয়োজন বা সাধ্যমত আরও বেশি করতেও চেষ্টা করেন। সেইজন্য বহু পুরাতন ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আজও পর্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। আর অধ্যয়ন-খ্যাতির তো কথাই নেই, বাইরের বহু কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে ভিড় করে তাঁর ক্লাসে, সেজন্য বরাবরই বড় ঘরে তাঁর ক্লাস নেবার ব্যবস্থা করতে হয় কর্তৃপক্ষকে।

এ-হেন চারুবাবুর বিদায়-সংবর্ধনা। খুবই নামকরা অধ্যাপক ব'লে কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে এতকাল কিছুতেই ছাড়তে রাজি হন নি, ক্লাসের সংখ্যা কমিয়ে, অপরাপর সুবিধা দিয়ে ধ'রে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু শারীরিক শক্তির একটা সীমা আছে, চারুবাবু সে সীমাও পার হয়ে এসেছেন। অত্যন্ত কম রক্তের চাপ, ডাক্তাররা বলেছেন ছেলে-পড়ানো তো দূরের কথা—বাড়ি থেকে বেরোনও আর উচিত নয় তাঁর। উনসত্তর বছর বয়স—সেদিক দিয়েও আর কোনোক্রমেই তাঁকে এই নিয়মিত পরিশ্রম করতে দেওয়া ঠিক নয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই কলেজ-কর্তৃপক্ষকে তাঁর মায়া কাটাতে হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, এরপর চাকরি আর রইল না বটে, অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে তাঁর নামটা এঁরা ব্যবহার করবেন এবং কালেভদ্রে কখনও যদি শরীর সুস্থ বোধ করেন বা ইচ্ছা হয় তো চারুবাবু এক-আধটা ক্লাস নেবেন। সেই হিসেবেই আজ এই বিদায়-

সংবর্ধনার আয়োজন।

অনুষ্ঠান অবশ্য খুব ভালোভাবেই চলছিল। কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য একটা পেন্সনের ব্যবস্থা করেছেন। আজকের উপহার হিসাবে একটি আলমারি ও আলমারিভর্তি বই দিয়েছেন। এছাড়া মানপত্র তো আছেই। ছাত্র-ইউনিয়নের তরফ থেকে সোনা-বাঁধানো লাঠি দেওয়া হয়েছে একটা। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে বহু অধ্যাপক ও ছাত্র বহু উপহার এনেছেন, মঞ্চ ভ'রে গেছে সে উপহারে। ফুলও এনেছে অনেকে। রাশি রাশি ফুল।

অভিনন্দন-উপহারের পালা শেষ হ'লে বক্তৃতা। অধ্যক্ষ বলবেন সকলের শেষে, কারণ, তিনিই এই অনুষ্ঠানের সভাপতি। তিনি একে একে অপর বক্তাদের আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। কলেজ-গভর্নিংবডির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সহকর্মী অধ্যাপকদের বলা শেষ হ'লে তিনি মৌখিক সৌজন্য হিসাবেই প্রশ্ন করলেন, 'ছাত্রদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কিছু বলতে চান—'

বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইলেন তিনি সেই বিপুল ছাত্র সমাবেশের দিকে।

অবশ্য তিনি বা অপর কেউই আশা করেন নি যে, কোনো ছাত্র এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে—এমন কি ছাত্ররাও না। কারণ, ইউনিয়নের সেক্রেটারী অভিনন্দন-পাঠের সময়ই তার বক্তব্য শেষ করেছে।

কিন্তু উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ক'রে সেই সমবেত সহস্র দৃষ্টির সামনে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়াল। থার্ড ইয়ারের নিরাপদ ভট্টাচার্য। কাশীর এক পণ্ডিত পরিবারের ছেলে, ফিলজফীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছে। এখানে সে ইংরেজি পড়তে এসেছে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিলিতী ধরনের পাঠ নিতে এসেছে; কিন্তু পণ্ডিত-পরিবারের প্রভাব এখনও এড়াতে পারেনি। গেঞ্জির ওপর মটকার চাদর জড়িয়ে চটি পায়ে সে কলেজে আসে, মাথাতে সামান্য টেরির পিছনে বৃহৎ টিকিও আছে। এ নিয়ে সহপাঠীরা ঠাট্টাবিদ্রূপের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল তা বলা বাহুল্য—কিন্তু সে সব ঝড় তুফানের মধ্যে নিরাপদ সম্পূর্ণ অবিচলিত ও অটল আছে। ফলে ঝড়টাই কমে গেছে ক্রমে ক্রমে—ওর কিছু হয় নি। এখন শুধু ফার্স্ট ইয়ারের নবাগত ছেলেরা তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে এবং গা-টেপাটিপি করে।

নিরাপদকে উঠতে দেখে সকলে বিস্মিত হলেও, বিস্ময়ের বৃহত্তর ধাক্কাটার জন্য তখনও কেউ প্রস্তুত ছিল না। ইতিপূর্বে আর এক কাণ্ড অবশ্য সে করেছে,

সকলে যখন উপহার ও পুষ্পার্ঘ্য দিচ্ছিল তখন সে একখানি ছোট সাইজের পকেট গীতা ওঁর হাতে দিয়ে এসেছে—তাতে লেখা ছিল 'অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাসের করকমলে—গ্রন্থখানি তিনি সর্বদা সঙ্গে রাখবেন এই আশায় !'

নিরাপদ প্রশান্ত মুখে এগিয়ে এল মঞ্চের দিকে। তারপর বিনতভাবে উপস্থিত অধ্যাপকদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে শুরু করলে তার বক্তৃতা। যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে সে বললে, 'অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের খ্যাতি বহুদিন ধ'রেই শোনা ছিল—তাই এ কলেজে এসে পর্যন্ত—তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেওয়ার সময় ছাড়াও—তাঁকে একাগ্রভাবে লক্ষ্য করেছি। তাঁর নিজের বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। এমন সমগ্রভাবে জ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখায় আর কারুর এতটা অধিকার আছে কিনা তা আমার জানা নেই, অন্তত আমি আর দেখিনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও—নিজের কর্মজীবনে এতটা কৃতিত্ব লাভ, ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছ থেকে এতখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করা সত্ত্বেও একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আদৌ সুখী নন্। একটা বিরাট শূন্যতা আছে তাঁর জীবনে—একটি সর্বগ্রাসী রিক্ততা। শুনেছি পারিবারিক জীবনে তিনি খুব সুখী নন। কিন্তু সেটা দুঃখের কারণ হ'তে পারে, তাতে এতটা শূন্যতাবোধ হবার কথা নয়। ··আসলে যে অমৃত মানুষের জীবনে সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেয় সেই অমৃতের সন্ধান তিনি পাননি। সেটা হ'ল ঈশ্বর-প্রীতি। উনি ওঁর স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে একরকম জীবন গঠন ক'রে নিয়েছেন নিজের মত। উনি হয়তো বলবেন যে, উনি অবিশ্বাসও করেন না—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর একটি উপমা দিয়ে গেছেন। মস্ত বড় বাড়িতে শিশু মানুষ হচ্ছে। তার খাওয়া-পরার কোনো অভাব নেই, মা আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন। কিন্তু তবু সেই মায়ের কোলে গিয়ে বসতে না পারলে শিশু পুরোপুরি সুখী হয় কি ? মাকে যখন কাছে পায়, তার উপস্থিতি, তার সান্নিধ্য উপলব্ধি করে, তখন শিশুর বাস্তব কোনো লাভ হয় না সত্য কথা, কিন্তু তবু তখন যেমন তার অন্তরটি ভরে তেমন আর কোনো কিছুতেই ভরে না। এই উপমা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—এই এক অভাবেই অধ্যাপক দাসের জীবনে সব আছে—কেবল কোনো আনন্দ নেই। আজকের দিনে অনেকেই তাঁকে অনেক শুভ-কামনা জানিয়েছেন, আমিও জানাচ্ছি। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরু—আমার প্রণম্য—কিন্তু আমিও ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্বাদ করারও অধিকার আমার আছে। আমি আশীর্বাদ করছি তাঁর এই শূন্যতা যেন পূর্ণ হয়, ঈশ্বরোপলব্ধি হয় তাঁর। Ultimate realisatior

of God—তাঁর যেন হয় !'

এই ব'লে আবারও একটি নমস্কার ক'রে ব'সে পড়েছিল নিরাপদ—সেই বিরাট হলের বিপুল জনতাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে।

গভর্নিং-বডিব সভাপতি তাঁর নিজের গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আর একখানি গাড়ি এল উপহার-সামগ্রী বয়ে নিয়ে। বইয়ের আলমারিটা অধ্যক্ষ পরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন—এই কথা রইল।

গাড়ির চালক, ওঁর চাকর এবং সঙ্গে দুটি-একটি ছাত্র যারা এসেছিল—তারা জিনিসগুলি ওপরে পৌঁছে দিয়ে চ'লে গেল। আবারও একদফা বিদায়-নমস্কার প্রভৃতির পর যাঁরা পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তাঁরা বিদায় গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ এতক্ষণে চারুবাবু একটু হাঁফ ছাড়বার—নিজের দিকে একটু একান্তে নজর দেবার অবসর পেলেন। তার ফল হ'ল এই যে, এতক্ষণ গোলমাল ও উত্তেজনার মধ্যে যে ক্লান্তি তিনি অনুভব করতে পারেন নি—সেই ক্লান্তি ও অবসাদ, গত কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনা ও আবেগের প্রতিক্রিয়া—তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। কোনোমতে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে চাকর কানাইকে বললেন, 'এক গ্লাস জল দে তো বাবা, ঠাণ্ডা জল !'···

অনেকক্ষণ সেইভাবে ব'সে রইলেন তিনি—তেমনি একান্ত অবসন্নের মত। ক্লান্তি যেন কাটছে না কিছুতেই। হাঁটু দুটোয় কোনো জোর নেই। এতটা শরীর খারাপ হয়েছে তাঁর—তা তিনি ওখানে থাকতে একটুও বুঝতে পারেননি তো ! আশ্চর্য !

'বাবু, খাবার দেব এখন ?' কানাই প্রশ্ন করে।

চমকে জেগে ওঠেন যেন চারুবাবু।

'খাবার ! কত রাত হয়েছে রে ?'

'তা পেরায় এগারোটা হ'ল।'

'এগারোটা ! ··ওঁর খাওয়া হয়েছে ?'

'হ্যাঁ বাবু। মা অনেকক্ষণ খেয়ে নিয়েছেন।'

একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন চারুবাবু—তারপর বললেন, 'না রে আমি আর খাব না। কলেজে কিছু খাওয়া হয়েছে—তার ওপর আর এখন খেলে সহ্য হবে না। তুই খেয়ে শুয়ে পড়গে যা !'

চারুবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। শ্লথস্খলিত পা দুটোকে টেনে-টেনে নিয়ে চললেন শোবার ঘরের দিকে। স্ত্রীর ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হয়—অনিচ্ছাতেও

চোখ পড়ল, জ্যোতির্ময়ী তাঁর অভ্যস্ত জানালাটির ধারে তেমনি স্থির হয়ে ব'সে আছেন—প্রতিদিনকার মতই, বাইরের দিকে চেয়ে। চারুবাবু একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন ; ঢুকবেন নাকি একবার ? কী কী পেলেন কলেজে দেখাবেন—অথবা দেখাবার চেষ্টা করবেন নাকি ? পরক্ষণেই প্রশ্নের মূঢ়তাটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

স্বামী-স্ত্রীর আলাদা ঘর বহুকাল থেকেই। তাঁর ঘর—শোবার ঘর হ'লেও তা বই এবং কাগজেরই গুদাম। জ্যোতির্ময়ী ওঁদের বিয়ের দিন কতক পরেই হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। সে আবর্জনা গুছোবার জো নেই, ঘর ঝাঁট দিতে গেলেও হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন চারুবাবু। তার ওপর ছেলেপুলে হ'তে ব্যাপারটা একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল। তখন উভয় পক্ষের সম্মতিতেই পৃথক শয়নঘরের ব্যবস্থা করা হ'ল। সে ছিল ভাড়াটে বাড়ি, তাতে পাশাপাশি ঘর হ'লেও ভেতর দিয়ে দরজার ব্যবস্থা করা যায় নি। নিজে বাড়ি করবার সময় প্ল্যান-মেকারকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে পাশাপাশি ঘর এবং মাঝখানে দরজার ব্যবস্থা করেছিলেন। একবার তখন এ-কথাও ভেবেছিলেন যে, ওখানে কপাটই লাগাবেন না—শুধু একটা খিলেন রাখবেন খোলা—তাতে একটা ঘরের মত মনে হবে দুটো মিলিয়ে—কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা এলে স্ত্রীর ঘরে যে বিষম কোলাহল শুরু হয়ে যায়, সেই ভয়ংকর ব্যাঘাতের কথা স্মরণ করেই সে কল্পনা ত্যাগ করেছিলেন। এখন অবশ্য বিশেষ কেউই আর তাঁদের বাড়িতে আসেন না—তবু মাঝের দরজাটা বন্ধ করাই থাকে। দীর্ঘ দিনের মধ্যে ও দরজার কপাট খোলা হয় নি। পাশাপাশি থেকেও বহুদূরে চলে গিয়েছেন তাঁরা।···

কাপড়-জামা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে মাথায়-মুখে জল দিয়ে এসে শুলেন বটে, কিন্তু ঘুম যে এখন হবে না তা নিজেই বুঝতে পারলেন। স্নায়ু বিষম উত্তেজিত হয়েছে—নানা কারণে ঘুম আসা এখন সম্ভব নয়। আলো জ্বেলে বই পড়বেন নাকি ? বেড্‌সুইচ হাতের কাছেই আছে—বইয়ের অভাব নেই। বিস্তীর্ণ শয্যার অধিকাংশই তো বইতে জুড়ে আছে, প্রত্যহই বই ঠেলে তাঁকে শুতে হয়।··কিন্তু বই পড়ার মতও ঠিক মানসিক অবস্থা নয়। শুধু চোখের সামনে মেলেই রাখা হবে, পড়া হবে না।···

কানাই এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ থম থম করছে। এমনিই করে দিনরাত। কানাই জেগে থাকলেই বা কি ? সে একা কার সঙ্গে কথা কইবে ? কেউ নেই। জ্যোতির্ময়ী আছেন—কিন্তু তিনি গত তিন বছর

কারুর সঙ্গেই কথা কন নি। সেই পরিমল চ'লে যাওয়ার পর থেকেই—

সবাই তো ছিল তাঁর। দুই ছেলে, দুই মেয়ে। এতদিনে নাতি-নাতনিতে এতবড় বাড়িটা কোলাহল-মুখর হয়ে উঠত। অথচ আজ তিনি, বলতে গেলে, শ্মশানে বাস করছেন।

সবচেয়ে মজার কথা এই—তারা সকলেই আছে। বেঁচে আছে। বড় মেয়ে ছাড়া সকলে কাছাকাছিই আছে। বড়মেয়ের বিয়ে হয়েছে আমেদাবাদে—তবু এলে সে-ই আসে। কিন্তু মায়ের এই অবস্থার পর থেকে সে-ও আসতে চায় না।

বড়ছেলে নির্মল। বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে। এম-এ পাস ক'রে সরকারী চাকরি করছে। লেখাপড়াতেও যেমন ভালো ছিল, চাকরিতেও তেমনি টপাটপ উন্নতি করেছে। এখনও করছে। কিন্তু সে ছেলে তাঁর ভোগে এল না। বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন তাঁর এক সহকর্মী অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে, সে শুনে খুব সহজ ভাবেই বলেছিল, 'আমি বিয়ে করব, পাত্রী আমিই ঠিক করব বাবা, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

তিনি অবশ্য আর ব্যস্ত হন নি। আধুনিকতা ও ইন্‌টেলেক্টের অহংকার ছিল মনে মনে—বরং সগর্বে ছেলের কথাটা সবাইকে ব'লে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন শুনলেন নির্মল একটি নার্সের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করেছে, বিয়ের দিনও ঠিক করেছে এবং আলাদা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে 'হায়ার পারচেজ' হিসাবে ফার্নিচার এনে সে ফ্ল্যাট সাজিয়েছে—সেদিন আর কথাটা অত সহজে নিতে পারলেন কৈ?

ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তা আলাদা বাড়ি কেন? এখানে কি স্থানাভাব?'

'আপনি ক্ষেপেছেন বাবা? এক বাড়িতে দুটো গৃহিণী? সে যে বিষম অশান্তি। কেন হয়, এবং হওয়াই যে স্বাভাবিক, একথা তো আপনিই শিখিয়েছেন। তাছাড়া বিয়ে ক'রে আমার পৃথক সংসার হবে, সে সংসারের আমিই কর্তা হ'তে চাই, স্বাধীনভাবে আমার মত ক'রে সংসার করতে চাই। আপনার এখানে থাকলে তো তা হতে পারবে না।'

তা বটে। চুপ ক'রে ছিলেন চারুবাবু, আর কথা বলেন নি।

বিয়ের পর অবশ্য প্রথম প্রথম নির্মল এবং তার বৌ প্রায়ই আসত। মেয়েটি মন্দ নয়। একটু অলস, গুছিয়ে সংসারও করতে শেখে নি। অথচ তা নিয়ে সে কারুর উপদেশ বা অনুযোগ শুনতেও প্রস্তুত নয়। প্রথম দাম্পত্য-

জীবনের ছোটখাট অপূর্ণতার কৌতুকভরা অনুযোগ আনত নির্মল মায়ের কাছে, বৌয়ের আনাড়িপনার খুঁটিনাটি গল্প করত হাসতে হাসতে—মা সেগুলোকে ছেলের যথার্থ অনুযোগ বা বিরক্তি ভেবে বৌকে সংসার-চালনা শেখাতে লেগে গেলেন উঠে প'ড়ে—ফলে বৌ এ-বাড়ি আসা ত্যাগ করল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেও।··আসবার সংখ্যা কমতে কমতে—এখন বছরে একদিন দাঁড়িয়েছে। বিজয়ার পরের দিন। ছোটছেলেটি হবার পর একটা খবরও দেয় নি—লোকমুখে সংবাদ পেয়েছেন।

ছোটমেয়ে হাসি বি-এ পড়তে পড়তেই এক উগ্র বামপন্থী রাজনীতিক দলে জড়িয়ে পড়ল। সভা-সমিতি-বক্তৃতা এই নিয়েই তার দিন কাটত। প্রথম প্রথম নিজের মানসিক উদারতার অহংকারে সেদিকে চোখ বুজে ছিলেন। কিন্তু, ক্রমশই জিনিসটা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠল। জ্যোতির্ময়ী উদ্বিগ্ন হয়ে মেয়েকে বকতে যেতেন—মেয়ে হেসে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিত। শেষ পর্যন্ত পড়াশোনার দোহাই দিয়ে চারুবাবুই মেয়ের গতিবিধিটা একটু নিয়ন্ত্রিত করতে চাইলেন, মেয়ে অম্লানবদনে জবাব দিলে, 'আর হয় না বাবা। আগে শাসন করতেন তো হ'ত। এখন আমি রেস্‌পন্‌সিবিলিটি নিয়ে নিয়েছি, আর ব্যাক-আউট করা সম্ভব নয়!'

আর কিছুদিন পরে চারুবাবুর বিরক্তি প্রকট হয়ে উঠতে মেয়ে ঘর ছাড়ল। পার্টির অফিসে গিয়ে আশ্রয় নিলে। ইতিমধ্যে বি-এ পরীক্ষায় ফেল হবার খবর বেরিয়েছিল, চারুবাবু আশা করেছিলেন সে আবার পরীক্ষা দেবে। কিন্তু মেয়ে সে দিক-দিয়েই গেল না। তার চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ একটি প্রায়-বালক সহকর্মীকে বিয়ে করলে এবং দুজনেই ইস্কুলের দুটি কনিষ্ঠ-মাস্টারি নিয়ে এক জায়গায় বাসা বাঁধল। বাড়ি ছাড়ার পর সে একদিনও আর তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি বিয়ের খবরও দেয় নি। নির্মল গিয়েছিল বিয়ের দিন, ফিরে এসে চারুবাবুকেই তিরস্কার করলে, আপনার জন্যেই এই কাণ্ডটি হ'ল বাবা। নিজেই মেয়ের সর্বনাশ করলেন। অত রাশ আলগা দেওয়া ঠিক হয় নি আগে আগে—আর দিয়েছিলেন যখন তখন আর টেনে ধরতে যাওয়া উচিত হয়নি। রোগা, রুগ্‌ণ একটা ছেলে, আই-এ পাস, ভাল ক'রে কথা বলতেও পারে না। কী করবে বলুন তো—কী খাবে সে? আর ছেলেপুলে হ'লেই বা মানুষ করবে কি ক'রে?

হয়তো চারুবাবু সাহায্য করতে পারতেন তাদের। কিন্তু হাসি বা হাসির বর কোনোদিনই তাঁর কাছে আসে নি, কিংবা সে সাহায্য চায় নি। একদিন মাত্র হাসিকে দেখেছিলেন চারুবাবু। ইস্কুলের ফেরত সম্ভবত টিউশনি সেরে আঁচলে

ক'রে কী সব বাজার নিয়ে ক্লান্তপদে বাড়ি ফিরছে—পিছনে রোগা ঈষৎ কুঁজো একটি ছেলে, সম্ভবত সে-ই তাঁর জামাই, সে-ও একটা ছোট থলিতে কয়লা নিয়ে চলেছে। দু'জনেই শ্রান্ত, অবসন্ন।

চারুবাবুর সঙ্গে চোখোচোখিও হয়েছিল একবার—হাসি কথা কয় নি, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আর পরিমল! তাঁর ছোটছেলে, তাঁর বড় আশা, তাঁর গৌরব।

ইস্কুলের সর্ব নিম্নশ্রেণী থেকে শুরু ক'রে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই বরাবর ফার্স্ট হয়েছে পরিমল। ডাক্তারি পড়তে দিয়েছিলেন তিনি—তাতেও প্রথম দিকটা অদ্ভুত মেধা ও মনোযোগ দেখিয়েছিল সে। তারপরই কি হ'ল - হঠাৎ একদিন পড়াশোনা সব ছেড়ে কোথায় উধাও হ'ল। বাড়িতে নানা অসুবিধা—ছেলেকে হোস্টেলে রেখেছিলেন চারুবাবু– তাই গোড়ার দিকে তার ভাবান্তরের কোনো সংবাদও পান নি, একেবারে অকস্মাৎ একদিন খবর পেলেন তার উধাও হয়ে যাবার।

ওর মা জ্যোতির্ময়ী পাগলের মত হয়ে উঠলেন। বেলুড়ে গেলেন খোঁজ করতে, হরিদ্বারে হৃষীকেশে লোক পাঠালেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানায় খোঁজ করতে লাগলেন। ওর নাকি ছেলেবেলা থেকেই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অসাধারণ কৌতূহল। সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা। সুতরাং, সে যে সন্ন্যাসী হ'তেই গেছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না জ্যোতির্ময়ীর।

ইতিমধ্যে দুটি রাজনীতিক (?) ডাকাতি হ'ল। একটি ব্যাঙ্কে, অপর একটি কোন্ বিলাতী মালিকের কারখানায়। এই ঘটনারই দুষ্কৃতিকারীদের খোঁজ করতে করতে পুলিশ তরাইয়ের জঙ্গলে যাদের ধরলে—পরিমল তাদের একজন। এক বছর ধ'রে মামলা চলবার পর ওর আট বছর জেল হ'ল। সে আজ ঠিক তিন বছরের কথা।

সেই সংবাদ শোনবার পরই জ্যোতির্ময়ীর যে একটা স্তম্ভিত অবস্থা হ'ল—সেটা আর কাটল না কিছুতেই। কথাবার্তা কওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। কেউ স্নান করতে বললে ওঠেন না—কিন্তু হাত ধ'রে টেনে কলঘরে নিয়ে গেলে স্নান করেন। তেমনি হাত ধ'রে ভাতের সামনে বসালে কিছু খানও। বাকি সমস্ত সময়টা চুপ ক'রে ঐ জানালার ধারে ব'সে থাকেন। কখনও কখনও ঐখানেই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন হয়তো—কিন্তু ঠিক ঘুম যাকে বলে তা নেই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—দিনরাত, ঐ এক ব'সে থাকবার ভঙ্গি। মাঝে মাঝে ডাক্তার এসে

জোর ক'রে ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট ক'রে যান, তখন হয়তো ঘুমোন, কিন্তু তার-পরই আবার ঐ এক ভাব।

কারও কোনো কথার জবাবও দেন না। চারুবাবুকেও না। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে বাস করছেন, অথচ আজ তিন বৎসর দু'জনের কোনো বাক্যালাপ নেই।

অকস্মাৎ যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে উঠে বসলেন চারুবাবু।

কেন এমন হ'ল তাঁর ? কেন এমন হ'ল ?

তবে কি ? তবে কি নিরাপদ যা বললে—?

একি তাঁর পাপ ? পাপের ফল ? কিন্তু ঈশ্বরকে তো তিনি অপমানও করেন নি কোনোদিন। তোড়জোড় ক'রে যারা ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিতে চায়, তিনি তাদেরও একজন নন। তাঁর হাসি পায় বরং ওদের কাণ্ড দেখে—তাঁর মনে হয় অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসটাই তাদের বেশি, তাই বাইরে এত উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। অত কেন, তিনি কিছুই করতে চান না। আসলে তিনি অত মাথা ঘামাতেই রাজি নন। বৈজ্ঞানিক মন তাঁর, তিনি জীবনের বাস্তব দিক নিয়েই ব্যস্ত। যা বাহ্য দৃষ্টিগোচর নয়, যা প্রত্যক্ষ তাঁর কোনো কাজে আসবে না, তা নিয়ে অত চিন্তা করার কী আছে ? তিনি থাকেন তো থাকুন—না থাকেন তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। শুধু চারুবাবু তাঁর জন্য ব্যস্ত বা উৎসুক নন।

তবে ?

তবে কি ঐ নিরাপদ ছোকরা যা বললে তাই—?

যদি উনি বিশ্বাস করতে পারতেন, যদি উনি তাঁকে ডাকতে বা ভালোবাসতে পারতেন তাহ'লে আজকের এ রিক্ততা—এ সর্বগ্রাসী শূন্যতা তাঁর পূর্ণ হ'ত··· ?

'It is too late to begin'—মনে মনে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন চারুবাবু। বিছানা থেকে উঠে এসে তিনিও একটা খোলা জানালার সামনে বসলেন।

আচ্ছা, এই যে তাঁর পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডি, এই যে তাঁর সাংসারিক পরিণাম, এর জন্যেও কি তাঁর এই মনোভাব দায়ী ?

আজ প্রথম তাঁর সন্দেহ হ'ল যে হয়তো তাই।

যুক্তিবাদী অতি বৈজ্ঞানিক মন তাঁর। চিরকাল সর্বপ্রকার সংস্কার, সর্বপ্রকার আবেগপ্রবণতাকে তিনি বিদ্রূপ ক'রে এসেছেন। পুরাতন ব'লেই শ্রদ্ধার যোগ্য নয়, গুরুজন ব'লেই নির্বিচারে কারুর আদেশ পালনীয় নয়—এইসব কথাই

শিখিয়েছেন তিনি ছেলেমেয়েদের এবং ছাত্রদেরও।

আজ আরও একটা কথা মনে হচ্ছে তাঁর, আরও একটা সংশয় জাগছে মনে।

তাঁর ছাত্ররা অধিকাংশই জড়বাদী, নাস্তিক, উগ্র বামপন্থী। অতি ভালো ছেলে-সব। খুবই ভালো ছাত্র বেরিয়েছে কয়েকজন তাঁর হাতে—কিন্তু সবাই উদ্ধত, দুর্বিনীত, তার্কিক।

ছেলেমেয়েরাও তাই। অর্থাৎ, যারা যারা তাঁর হাতে মানুষ, তারা প্রায় সকলেই। তাঁর মনের ছায়া যাদের মনে পড়েছে—তাঁর এই বিকৃত, কঠিন, যুক্তি, ও বাস্তব-সর্বস্ব মন।

আর তারই এই পরিণাম, এই ভয়াবহ পরিণতি!

তবে কি, তবে কি নিরাপদর কথাই ঠিক?

হৃদয় সুষমা ও মাধুর্যে পূর্ণ থাকলে তা-ই উপচে পড়ে; নিজের মধ্যে যদি তিক্ততা ও বিষই কেবল থাকে তো চারিদিকে তাই বিকিরণ করবেন—এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

সত্যিই কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারলে, তাঁকে ভালোবাসতে পারলে, তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলে মন সুষমায় ভ'রে ওঠে, মনের এ আগুন নিভে যায়? এই রিক্ততা, এই মহাশূন্যতা মধুতে ভ'রে ওঠে?

তবে কি—তবে কি হাসি চ'লে যাবার পর জ্যোতির্ময়ী যখন দীক্ষা নেবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তাতে বাধা দিয়ে অন্যায়ই করেছিলেন চারুবাবু? জ্যোতির্ময়ীর এই শোচনীয় পরিণামের জন্যও কি তিনিই দায়ী?...

চারুবাবু আর ব'সে থাকতে পারলেন না।

ছুটে গিয়ে পাগলের মত আলমারিগুলো ঘাঁটতে লাগলেন। তাঁর বাবার কয়েকখণ্ড উপনিষদ ছিল—প্রথম বয়সে তিনি পড়েও ছিলেন—সেইগুলো খুঁজতে লাগলেন। আছে হয়তো, এখনও আছে।

এই যে, এই যে—কী এখানা? যাই হোক—এতেই চলবে।

বই খুলতেই প্রথমেই চোখে পড়ল সেই শ্লোকটি, যেটি বাবা প্রায়ই বলতেন, "যেনাহং নামৃতস্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম্?"

তবে কি এ ঈশ্বরেরই নির্দেশ?

এই পৃষ্ঠা খুলে গেল কেন নইলে? কোথায় ছিল নিরাপদ, কেনই বা সে এমন কাণ্ড করতে গেল? তবে কি সে-ও ঈশ্বরপ্রেরিত?

তিনি ত্যাগ ক'রে বসেছিলেন, কিন্তু ভগবান বুঝি তাঁকে ত্যাগ করেন নি।

নিজে থেকে এগিয়ে এসেছেন—কোলে তুলে নিতে।

এতকাল পরে—ছেলেমেয়েদের চরম দুর্ব্যবহারেও যে চোখে জল আসে নি—সেই দুটি চোখ জ্বালা ক'রে জলে ভ'রে এল।

কালই তিনি খুঁজে বার করবেন নিরাপদকে। তাকেই গুরু করবেন মনে মনে—তার কাছ থেকে পথ জিজ্ঞাসা ক'রে নেবেন সেই অমৃতে, সেই পূর্ণতায় পেঁছবার।

আঃ! কখন যে ভোর হবে!

অকস্মাৎ এক ঝাপটায় মাঝের বন্ধ দোরটা খুলে ফেললেন চারুবাবু, স্ত্রীর ঘরে এসে একেবারে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন পাশ থেকে।

'জ্যোতি, জ্যোতি—তুমি দীক্ষা নেবে?'

জ্যোতির্ময়ীর স্তব্ধ স্তিমিত নিরাসক্ত চোখে প্রথম একটা ভাব ফুটল এতকাল পরে। বিস্ময়, কৌতূহল। তিনি অবাক হয়ে তাকালেন চারুবাবুর দিকে।

'ভগবান, ভগবানকে ডাকবে জ্যোতি? চল আমরা কালই কোথাও দীক্ষা নিই। তুমি পূজো করতে চাও? ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করব বাড়িতে?'

প্রশ্ন করতে করতে অসহিষ্ণুভাবে ঝাঁকানি দেন স্ত্রীকে।

তিন বৎসর পরে তাঁর কথার উত্তর দিলেন জ্যোতির্ময়ী, প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে হ'লেও পরিষ্কার শুনতে পেলেন চারুবাবু, উৎসুক ব্যগ্রভাবে বলছেন, 'হ্যাঁ, ওগো এনে দেবে আমাকে—একটি গোপাল-মূর্তি? নিজে হাতে পূজো করব, সেবা করব!'

জীবনে জ্ঞানত এই প্রথম দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন চারুবাবু,—অজ্ঞাত কোন ভগবানকে। আর একটা প্রণাম জানালেন, পুত্রদের চেয়েও অল্পবয়স্ক ছাত্র নিরাপদর উদ্দেশে।

বিয়ের পর থেকেই শুনে আসছি, 'আহা, বেলিটা এমন ঘরেও পড়্‌ল! ওর জন্যে সত্যি—আমার যেন খেয়ে শুয়ে সুখ নেই!'

বলতে বলতেই অপরিসীম দুঃখে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেন আমাদের 'ইনি'!

বিয়ের পর থেকেই শুনছি—কারণ, আমারা দুটি ভদ্রসন্তান—অর্থাৎ দুই ভায়রা একই রাত্রে "উচ্ছুগ্‌গু" হয়েছিলাম! আমার শ্বশুর এক রাত্রেই তাঁর অবশিষ্ট দুটি, সপ্তম ও অষ্টম কন্যাকে পার ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

আর সেই নিশ্চিন্ত হ'তে গিয়েই পাল্লাটা ঠিক রাখতে পারেন নি।

আমি - দুর্বিনয়, মাপ করবেন—একে ওরই মধ্যেই একটু অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান, তার ওপর সরকারী চাকরিও একটা করি ভালো গোছেরই। আর আমার ভায়রা ফণীবাবু নিতান্তই ইস্কুল মাস্টার। তাও সরকারী কোনো ইস্কুলের নয়—সাধারণ একটি 'প্রাইভেট' ইস্কুলের সেকেণ্ড-মাস্টার (আজকাল ওকেই ভদ্রভাবে বলা হয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার)! কেবল একটা বিষয়ে ফণীবাবু আমার ওপরে ছিলেন—তিনি ছিলেন এম-এ পাস; আমি বি-এ। পাস ক'রেই ও ব্যাপারে ইস্তফা দিয়েছিলুম। শুনেছি শ্বশুরমশাই আমার ছোটশালীকে ঐ ব'লেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'কেবল পয়সাটাই দেখিস নি মা—বিদ্বান সচ্চরিত্র পাত্র, শিক্ষাদানে জীবন উৎসর্গ করেছেন—এমন পাত্র দেখে গাছতলাতেও মেয়ে দিতে পারা যায়!'

অবশ্য বেলা যে খুব একটা অসুখী হয়েছিল তা—আমার অন্তত মনে হয় নি কোনোদিন। তাকে তো বেশ হাসি-খুশিই দেখতাম। ফণীবাবু ইস্কুল-মাস্টারি ক'রে কত পেতেন তা জানি না, কিন্তু টিউশনি, খাতা-দেখা প্রভৃতি মিলিয়ে সংসারটা চালিয়ে যেতেন ঠিকই। বাহুল্য না থাকলেও অভাব ছিল না। আড়ম্বর যেমন দেখি নি কোনোদিন, তেমনি দৈন্যদশা দেখেছি ব'লেও মনে পড়ে না। ফণীবাবুরা দু' ভাই, ছোটভাই মণিবাবু বুঝি রেলে কী কাজ করতেন—দু' ভাই মিলেমিশে থাকতেন, দু'টি বৌয়েও বেশ সদ্ভাব ছিল; আমার তো মনে হ'ত ওদের সুখের সংসার। বরং আমারই—

কিন্তু সেকথা থাক। বুড়ো বয়সে ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায়ই বা যাব!...

বেলার কথাই হোক।

আমার স্ত্রী বেলার বহু দুঃখ ও অভাব কল্পনা করতেন। এক একদিন নিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'দু' বোন একসঙ্গে চিরকাল মানুষ হয়েছি, একপাতে খেয়েছি, পাশাপাশি গলা জড়িয়ে শুয়েছি—বন্ধুই বল আর বোনই বল—সবই ছিল ও-ই; আমরা মোটে এগারো মাসের ছোটবড়—বেশি তো নই। এখানে তোমার দৌলতে এত প্রাচুর্য, বলতে গেলে ফেলা-ছড়াই যাচ্ছে কত জিনিস, আর ওদের—! আমার যেন কেমন লজ্জা করে। ভালো খাবার খেতে বসলে, কি তুমি যখন দামী দামী শাড়ি নিয়ে এসো, নিজেকে যেন রীতিমত অপরাধী ব'লে মনে হয়। বাবা যে বেলির কী বিয়েই দিলেন!

প্রতিবাদ করি না, কারণ করা অনর্থক। প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করেছি, কোনো ফল হয় নি। বরং বিপরীত ফলই ফলেছে, আমি হয়তো বলতে গেছি, 'কিন্তু তুমি যতটা বল অতটা হয়তো সত্যিই নয়। এই তো আমি পরশুও গিয়েছিলুম—আমার সামনেই ফণীবাবু খেলেন, আমাকেও জলখাবার খাওয়ালে —এমন কিছু খারাপ খায় না ওরা।'

তার জবাবে ফোঁস ক'রে উঠেছেন একেবারে—অন্য প্রসঙ্গ ধ'রে,—'কৈ, পরশু গিছলে আমাকে তো বল নি একবারও? এত লুকোছাপা কিসের? শালীর ওপর টান দেখলে কি আমি হিংসে করতুম?'

আবার একদিন হয়তো ঐ ধরনের বক্তব্যে জবাব দিয়ে বসলেন, 'ছাখো, তোমার এ ধরনের ঠাট্টা করার কোনো অধিকার নেই। বড়লোকদের এ এক রকমের বিলাস আছে জানি, গরিবদের সান্ত্বনা দিতে বলেন যে, তাঁদের ঐ রকম গরিবানাই ভালো লাগে— কিন্তু গরিবরা যে ঐ ছলনাটুকু বুঝতে পারে না তা ভেবো না। এ হচ্ছে কি জান, ঐ যে ইংরেজিতে যাকে বলে—আঘাতের পরও অপমান করা—তাই!'

স্ত্রীর মেজাজের তল বোধ হয় কোনো স্বামীই কোনোদিন পায় না। আমিও সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। একমাত্র যে পথ আছে—আমাদের স্বামী বেচারীদের শান্তিতে থাকবার—সেই পথই বেছে নিয়েছি। অর্থাৎ, চুপ ক'রে থাকি সব অবস্থাতেই।

তাঁর সহানুভূতিটা শুধু সরব নয়—সক্রিয়ও। ভালো খাবার-দাবার হ'লেই তিনি বোনপো-বোনঝিদের ডেকে পাঠাতেন—নইলে টিফিন-ক্যারিয়ারে ক'রে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। আমাদের চাকর মধুই বেলাদের বাড়ি চিনত, সে-কারণে মধু প্রায়ই দেখতুম অদৃশ্য হয়ে গেছে। আগে আগে রাগারাগি

করতুম—এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর একটি চাকর রেখে অশান্তির দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। মধুরও দোষ নেই, ভবানীপুর থেকে বরানগর যাতায়াতে যথেষ্ট সময় লাগে। ছেলেমেয়েদের আনতে গেলে তো কথাই নেই—তাকে চার বার ঐ পথে যাতায়াত করতে হয়; তাহ'লে সে বাড়িতে থাকে কখন?

এছাড়া—কাপড়-চোপড়, মায় বালিশের ওয়াড়ের থান—অনেক জিনিসই মধ্যে মধ্যে বাড়ি বদল করত তা আমি টের পেতাম। আগে আগে গৃহিণী গোপন করতেন আজকাল আর করেন না। কারণ বুঝেছেন যে, ওতে আমি রাগ করি না। তবে একেবারে সামনা-সামনি প'ড়ে গেলে এখনও একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন, হেসে বলেন, 'ত্থাখো, তোমার মন জানি ব'লেই সাহস ক'রে এসব পাঠাই। সত্যি, তোমার মত মন কটা লোকেরই বা আছে।···আর ঈশ্বর তোমার ছেলেমেয়েদের তো কোনো অভাব রাখেন নি—কার্পণ্য করবই বা কেন?'

আমি হাসতুম শুধু। এক্ষেত্রে—যদি শান্তি রক্ষা করতে হয় তো হাসি ছাড়া উপায়ই বা কি!

অতি বুদ্ধিমান স্বামীরাও এক্ষেত্রে বোকার মত হেসে অব্যাহতি পান—আমিও তাই পেতুম।

অনেকদিন পরে—হঠাৎ এই ভগ্নী-প্রীতিতে যেন একটু ভাঁটা পড়ল।

একদিন লক্ষ্য করলুম যে মধুকে ডাকলেই আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। তারপর মনে মনে অতীত দিনের ছবিগুলো মিলিয়ে দেখলাম যে, বেলার ছেলেমেয়েরা বহুদিন এ বাড়িতে আসে নি। এ বাড়ি থেকেও 'ভালোমন্দ' 'এটা-ওটা' ও বাড়িতে আর যাচ্ছে না অনেক দিন। এমন কি আমার বড়ছেলে পিলুটুর জন্মদিনেও তো কৈ—

গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁগো, বেলাদের খবর কি? অনেকদিন তাদের দেখি নি যে!'

কেমন একরকম বিরস কণ্ঠে জবাব এল, 'কে জানে! কৈ আসেনি তো!'

'তা তুমিও তো কৈ যাও নি! ওদের খবর নাও না একবার।'

'হ্যাঁ। আমার খবর কে নিচ্ছে তার ঠিক নেই। তাছাড়া আমার সময় কৈ? তোমার সংসারের কাজ দিন দিন বাড়ছে বই কমছে কি?'

তিনি আর বেশি আলোচনার অবসরও দিলেন না, কথাগুলো বলার সঙ্গে

সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কেমন একটা খট্‌কা লাগল মনে।

সেইদিনই অফিসের ফেরত বরানগর গেলুম।

বেলা আমাকে দেখে খুব খুশি। দেখলুম ওদের বাড়ি-ঘরের বেশ শ্রী ফিরেছে। বাইরের বৈঠকখানা ঘরটাতে নতুন সোফা-সেট কেনা হয়েছে; চৌকিটাতে দামী চাদর বিছানো, নতুন একখানা পাখাও ঝুলছে মাথার ওপর।

চারদিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললুম, 'ব্যাপার কি গো ছোটগিন্নী? কর্তা কি আজকাল মাস্টারি ছেড়ে ওকালতী ধরলেন নাকি? পয়সার গন্ধ পাচ্ছি যে!'

'থামুন থামুন—নজর দেবেন না। এবার অতি কষ্টে দুটো বাড়তি পয়সা পেয়েছিলেন—তাই।'

'বলি বাড়তিটা এল কোথা থেকে? কৈ—ইস্কুল-মাস্টারিতে উপরি পাওয়া যায় শুনি নি তো!'

'তা উপরিও একরকম বলতে পারেন বৈকি!...উনি আজকাল ইস্কুলের বই লিখছেন যে। গতবার ওঁর ইতিহাসখানা খুব ভালো চলেছিল। প্রায় হাজার টাকা পেয়েছিলেন একখানা বই থেকে। তারই ফল এসব।'

'ভালো ভালো।' সত্যিই খুশি হলুম, 'তা এ সব তো সংসারের গেল। তোমার কী হ'ল? কন্‌ক্রিট কিছু?'

লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা নামায় বেলা, 'হ্যাঁ, তাও কিছু হয়েছে বৈকি! এই যে—এই হারটা আড়াই ভরির।...ওঁর কাণ্ড, আমাকে কিছু বলেনও নি। মেয়ের জন্যে বালা, আর আমার এই হার।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কী বুঝি মনে পড়ল। বললে, 'ছোড়দি আপনাকে বলে নি? এই হারটা যেদিন এল সেদিন ছোড়দি তো এখানে ব'সে।...আচ্ছা, ছোড়দির কী ব্যাপার বলুন তো—সেই যে গেছে আর একদিনও আসে নি। একটা খবর পর্যন্ত নেই। আমি দু'-দুখানা চিঠি লিখলুম, তারও কোনো জবাব নেই।'

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও মুখে বললুম, 'তা তুমিও তো খবর নিতে পারতে!'

'সেটা ঠিক।' ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে বলে বেলা, 'কিন্তু ছোড়দির ঠাকুর-চাকর সব আছে, আমাদের যে হাঁড়ি ঠেলতে হয়। ছোটবৌটার শরীর ভালো নয়, ওকে আজকাল আর আগুন-তাতে যেতে দিই না—ফলে দু'বেলাই তো ঐখানে জোড়া আমি। তাছাড়া একটা চাকরও নেই যে পাঠাব। নিজে যে যাব,

সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার তো লোক চাই। ওর আজকাল একটুও ফুরসুত থাকে না। টিউশনি, ইস্কুলের খাতা এসব তো আছেই—উপরন্তু বেড়েছে বই। রোজই একগাদা প্রুফ নিয়ে বাড়ি ঢোকেন, রোজ রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রাত জেগে উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকেন ঐ প্রুফের ওপর। ছুটির দিনেও একটু রেহাই নেই।… আমার কথা আর বলবেন না—সমাজের বাইরে চলে গেছি একেবারে।'…

বাড়ি ফিরে গৃহিণীর কাছে কথাটা তুললুম, 'বেলিরা বেশ সাজিয়েছে বাইরের ঘরটা, না?'

'কে জানে। আমি তো দেখি নি!' অত্যন্ত বিরসকণ্ঠে জবাব এল। তার-পরই বললেন, 'আমাদের ঐ বাইরের ঘরের সেটটা এবার বদলাব। মিসেস্ মল্লিক একটা নতুন সেট কিনেছেন, সাড়ে চারশ' টাকা দাম। বেশ জিনিসটা—আমি ভাবছি সেই রকম একটা কিনব।'

'আর পুরোনোটা?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি।

'বেচে দেব। সে-ও মিসেস্ মল্লিক খদ্দের ঠিক ক'রে দেবেন বলেছেন। তা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন দাম উঠবে।'

তারপর হঠাৎ—অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে ব'লে ওঠেন, 'আচ্ছা, তুমি বই লেখ না কেন? এত তো পড়, বাড়িতে ঢুকলেই তো আর একটি কথা কইবার উপায় নেই, অমনি আয়না মুখে ক'রে শুযে পড়বে—তা এত লেখাপড়া কী কাজে লাগছে?'

বেশ যেন একটু আন্তরিক বিরক্তির সুর কণ্ঠে।

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন ফণীবাবু এসে হাজির। দেখা হতেই হাসি-হাসি মুখে এক প্রণাম ক'রে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন ছোড়দা, একটা কাজ তো ক'রে ফেললাম!'

'আরে আরে—ব্যাপার কি! এত ভক্তি!'

'কাঠা-চারেক জমি বায়না ক'রে ফেললাম দাদা।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'এই আপনাদের কাছেই। বালিগঞ্জে। কাঁকুলিয়ায় নতুন একটা রাস্তা বেরোচ্ছে—তারই ধারে। দাম বাইশ শ' ক'রে কাঠা, দক্ষিণ-খোলা প্লট, জমিটা ভালোই। ও বার বার বলেছিল যে, বায়না করার আগে আপনাকে দেখিয়ে নিতে—তা মোটে সময় পেলাম না। এবার একদিন চলুন দাদা, ছোড়দিকেও

যেতে হবে।'

'যাব বৈকি। অবশ্যই যাব। ওগো শুনছ—'

খুশি হই সত্যি-সত্যিই।

'ওগো' বেরিয়ে এলেন বিরস বদনে। অথচ একটু আগেই কী একটা নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসাহাসি করছিলেন। ব্যাপার কিছু বুঝলুম না। ফলে উৎসাহসটাও যেন মিইয়ে এল। কতকটা ভয়ে ভয়েই বললুম, 'ফণীবাবু বালিগঞ্জে জমি কিনছেন যে!'

'অ। তাই নাকি! ভাল খবর তো!' নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত কণ্ঠ। যেন ফণীবাবুকে চেনেন না আদৌ। তাই খবরটাতে আনন্দেরও কিছু নেই।

'হ্যাঁ ছোড়দি, আজ বায়না ক'রে এলাম একেবারে। এই কাছেই, কাঁকুলিয়ায়—আপনি আর আপনার কর্তা একদিন চলুন। কবে যাবেন বলুন!'

ফণীবাবু সরল মানুষ, তাঁর উৎসাহ এখনও কমে নি। তিনি বোধ করি কোনো ভাবান্তরও লক্ষ্য করেন নি।

তাঁর ছোড়দি কিন্তু পূর্ববৎ শীতলকণ্ঠেই বললেন, 'আমার সময় কোথায় ভাই, আপনি বরং আপনার ছোড়দাকে নিয়ে যান।···আমার মরবার ফুরসুত নেই।'

তারপর হঠাৎ একেবারে ফণীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন—'ছাখো এ গয়লাটাকে না বদলালেই নয়। দুধ দিচ্ছে একেবারে জল। পয়সা দিয়ে জল খাব কেন? বড় কম তো নয়—মাসে দেড়শ' টাকার দুধ নেওয়া হচ্ছে—আর মাসকাবারটি হ'লেই সব টাকাটা নগদ ধ'রে দেওয়া হয়!··এত সুখ পাবে কোথায়?'

রীতিমত বিস্মিত হলুম ওঁর আচরণে। লজ্জাও বোধ করতে লাগলুম। ফণীর মুখ লাল হয়ে উঠল অপমানে।

কিছুদিন ধ'রেই বোন এবং ভগ্নীপতি সম্বন্ধে ওঁর একটু ঔদাসীন্য লক্ষ্য করছি, কিন্তু এতটা বুঝতে পারি নি। সেবার আমি আসবার পর জোর ক'রে একদিন পাঠিয়েছিলুম—মনে পড়ল—তারপর আর একদিনও যান নি উনি। আমি নানাকাজে ব্যস্ত থাকি, এসব লক্ষ্য রাখার কথা নয়। এখন কিন্তু আর একটুও অস্পষ্টতা রইল না!

উনি ভেতরে চ'লে যেতেই ফণীবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহ'লে আজ আসি দাদা—'

'দাঁড়ান দাঁড়ান; চা-ও তো খাওয়া হ'ল না। ওরে ও মধু—চা আন তাড়া-

তাড়ি মেসোমশায়ের জন্যে।...তাহ'লে একদিন যাওয়া তো দরকার। আমি যাব না হয় কিন্তু—।'

দ্রুত অসংলগ্নভাবে কথাগুলো বলি—অপ্রতিভতা ঢাকবার জন্যে।

তারপর কতকটা স্ত্রীর উপর রাগ ক'রেই বলি, 'আর অন্য দিনে দরকার কি? এখনই তো গেলে হয়। গাড়িটা বার করতে বলি মাধবকে—দাঁড়ান।'

ফণীবাবুর মুখের মেঘ কেটে যায়। স্বল্পে-তুষ্ট ইস্কুল-মাস্টার খুশি হয়ে বলেন, 'তাই চলুন দাদা। শুভস্য শীঘ্রম্।'

একটু পরেই মধু চা নিয়ে এল। শুধু চা এক কাপ। ঠক ক'রে চায়ের কাপটা বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। এ বাড়িতে এ ব্যাপার এই প্রথম।

ফণীবাবু খানিকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাপটা তুলে নিলেন।

তখন সময় ছিল না। রাত্রে বাড়ি ফিরে আর রাগ চাপতে পারলুম না, বেশ একটু চড়াগলাতেই বললুম, 'খামোকা তুমি ভদ্রলোককে অপমান ক'রে বসলে কেন? ছি ছি, দিন দিন কি হচ্ছ তুমি?'

'থাম। কার সঙ্গে কী আচরণ করতে হয় তা আমাকে তুমি আর শেখাতে এসো না।......বলি আত্মীয় তো আমারই। তোমার এত দরদ কিসের? মার চেয়ে ব্যেথিনী তারে বলি ডান!'

'কিন্তু তোমার হ'ল কি?'

'না—মিথ্যে কথা, মিথ্যে আচরণ আমি একদম সইতে পারি না।... বেলিটাও সমান—আর ওরই বা দোষ কি, যে পাল্লায় পড়েছে—সেই রকমই শিখবে তো!...চিরদিন শুনে আসছি, ওদের কিছু নেই, কিছু নেই। গরিব ইস্কুল-মাস্টার এক ভাই, আর এক ভাই কেরানি।..অথচ মড়-মড় করে গয়না গড়ানো হচ্ছে, ফার্নিচার কেনা হচ্ছে আমাকে টেক্কা দিয়ে—আবার বালিগঞ্জ-পাড়ায় জমি কেনা—এসব হচ্ছে কোথা থেকে তাই শুনি, নিশ্চয় ওদের পৈত্রিক পয়সা ছিল মোটামুটি।..আমাদের কাছ থেকে আদায়ের জন্যে ঐ রকম হা-ঘরে সেজে থাকত!'

'কি মুস্কিল, ফণীবাবুর বই আজকাল খুব চলে যে! ইস্কুলের বই থেকে মোটা আয় এখন। যখন ছিল না তখন ছিল না—এখন শুনেছি বই চালু হবার আগেই পাবলিশাররা অ্যাডভান্স দিয়ে যায়!'

'ওগো আমি অত নেকী নই। তোমাকে বোকা বোঝাতে পারে—তাই ব'লে আমাকে পারবে না।…ঐ তো চটি দশ-আনা বারো-আনা দামের বই—তাতে কত পয়সা হয় শুনি? তাছাড়া ওর মুখেই তো আমি কতবার শুনেছি—পাব্‌লিশাররা ঠকায়, জাল হিসেব দেয়—হ্যানা-তেনা…সাতসতেরো। তাই যদি হয় তো এত পয়সা, এসেছে কোথা থেকে? ফট্‌ করে দশ হাজার টাকার জমি কিনে বসলেন!…তাছাড়া আস্পদ্দা কি, আমরা কখনও কি ওর হিত বই অহিত চয়েছি? তা আমাদের একটু জানানো নেই, জিগ্যেস করা, মত নেওয়া নেই—ফট ক'রে জমি বায়না ক'রে এসে একেবারে জানানো। তার মানে, আমিও কেওকেটা নই, তোমাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে জানি!…না বাবু, আমার সাফ্‌ কথা, যেখানে আমার মন মিলবে না, সেখানে আমি হাসিমুখ বজায় রাখতে পারব না। বলে—

যে দিয়েছে মনে ব্যথা, তার সঙ্গে আমার কিসের কথা?
তবু যদি কই কথা, ঘুচবেনা মোর মনের ব্যথা!—'

কিছুতেই পারলুম না বোঝাতে। উনি একদিনও দেখতে গেলেন না—জমি তো নয়ই, বাড়িও নয়। ওদের বরানগরের বাসাতেও যেতে রাজি হলেন না আর।

বেলা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলত, 'কী করলুম আমি রায়মশাই, কেন ছোড়দি এমন বিরূপ হ'ল? ছেলে-মেয়েগুলোকে এত ভালবাসত, তাদের পর্যন্ত একবার খোঁজ করে না। সিণ্টু মিণ্টুকেও আসতে দেয় না—কী এমন অপরাধ করলুম আমি?'

লজ্জিত হতুম। তবে এ ব্যাপার আমার প্রতিকারের বাইরে। বলতুম, 'কী জানি ভাই, মেয়েদের মন জানই তো—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।'

তবু গৃহ-প্রবেশের দিন ধার্য হ'তে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বেলা এসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। ছোড়দির দুটো হাত ধ'রে ব'লে গেল, 'জ্ঞানত তো কিছু করি নি, না-জানতে যদি কিছু অপরাধ ক'রেই থাকি, ছোটবোনকে কি মাপ করতে পার না।'

হাত দুটো জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'তুই তো জানিস বেলি, ওসব নেকাপানা আমার ভালো লাগে না। অপরাধ আবার কিসের! দুটো পয়সার মুখ দেখেছিস, দেমাক হয়েছে। নিজের দেমাক কি কারও চোখে পড়ে?

তা হয়েছে হয়েছে—আমি তো কিছু বলছি না।··আমার ভালো লাগে না, যাই না। তাছাড়া নিজের সংসার বেড়েছে, সময়ই বা কৈ ?'

তবু বেলা রাগ করে নি, বরং যথেষ্ট অনুনয়-বিনয়ই করেছে।

অনেকক্ষণ পরে একটু নরম হয়ে বলেছেন উনি, 'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, তুই যা। দেখি, যাবার চেষ্টা করব খুব। আমার চেয়ে তোর বেশী আপনার-জন রায়মশাই-ই তো রইলেন! উনি যাবেন, ছেলেমেয়েরা যাবে। আমি পারি তো বরং দুপুরের দিকে একবার গিয়ে ঘুরে আসব।'

বেলা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেছে, আমিও কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছি। ভেবেছি বিনয়ে বোধ হয় কাজ হ'ল।

কিন্তু হঠাৎ ওদের গৃহ-প্রবেশের ঠিক আগের দিনটিতে শুনলুম, তারকেশ্বরের কাছে ওঁর কী একটা মানসিক ছিল, ভুলেই গিয়েছিলেন একেবারে, কাল একটা স্বপ্নে মনে পড়েছে কথাটা। আর দেরি করার উপায় নেই, কারণ বাবা রুষ্ট হ'লে আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং সেইদিনই তিনি মধু এবং মিসেস্ মল্লিকের মেয়ে রাণুকে নিয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা রইল, ওদের নিয়ে গেলে হয়তো বেলা ভাববে ছোড়দি ইচ্ছে ক'রেই গেছে।··আমি যেন একটু ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলি। বেলা যেন কিছু মনে না করে!

## লাল-কিল্লা

তখনও সন্ধ্যার অনেক দেরি। সম্রাজ্ঞী ইনায়ৎ বানু একটু অসহায়ভাবেই তাকালেন বাইরের দিকে। কী করবেন তিনি, কী-ই বা করতে পারেন! হে খুদা, আঁধিয়ারটা আর একটু তাড়াতাড়ি পাঠাতে পার না? সম্রাজ্ঞীর লজ্জা আর ইজ্জত রাখতে? আর একটু? অন্তত এই আজকের দিনটার জন্যে?

আরও একবার ফতিমা এসে ফিরে গেল। জানিয়ে গেল যে, সম্রাট্ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন এবার, তাদের গালিগালাজ করছেন।

সম্রাট্—হ্যাঁ, সম্রাট্ তো বটেই। তামাম হিন্দুস্তানের শাহেনশাহ বাদশাহ, সারা পৃথিবীর চোখে আজও দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুঘলসম্রাট্, আবদুল বরাকত, সুলতান শামসউদ্দীন মুহম্মদ রফিউদ্-দর্জাত, বাদশা, গাজী।

তবে? কোথা থেকে এ সাহস, এ ধৃষ্টতা—এতবড় গুস্তাকির এই হেকমৎ আসে? দণ্ডমুণ্ডের মালিক বাদশার হুকুম অবহেলা করার এতবড় দুঃসাহস!

ইনায়ৎ বানু হয়তো এ কথার জবাব আজও দিতে পারবেন না। এমন কি ভাগ্যবিড়ম্বনার ম্লান হাসিটুকুও তাঁর মুখে ফুটবে না। সে শিক্ষা তাঁর অন্তত আছে। সম্রাট্ সম্রাট্ই—অন্তত তাঁর কাছে, তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর কাছে। হয়তো তিনি শুধুই ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যেমন এখন আছেন।

তবু তিনি যেতে পারলেন কৈ? হুকুম তামিল করবার কোনো আগ্রহই তো তাঁর দেহে ফুটল না! কেন?

হায় খুদা, তাঁর যে কোনো উপায় নেই। সে কথা কেমন ক'রে বোঝাবেন তিনি সম্রাট্‌কে? তাঁর যে সত্যভাষণের কোনো উপায়ই নেই সেখানে, তা হ'লে তো এই মুহূর্তে তিনি ছুটে চ'লে যেতেন রুগ্‌ণ স্বামীর শয্যাপার্শ্বে। তা হ'লে কি এতক্ষণ তিনি এইভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন? রাত্রির আঁধার নেমে না এলে কিছুতেই যে তিনি মুখ দেখাতে পারবেন না। বড় সাফ চোখ বাদশার, বড় সাফ নজর। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা চাই, আর তার সঙ্গে চাই সন্ধ্যায়-সেবন-করা অহিফেনের রসে চোখ দুটি একটু তন্দ্রাতুর হয়ে আসা। নইলে—নইলে তিনি দেখে ফেলবেন, আর জবাব চাইবেন। কী বলবেন তখন ইনায়ৎ বানু, কী জবাব দেবেন?

জাফরির কাছে সরে এলেন সম্রাজ্ঞী। সঙ্গে সঙ্গে জ্যৈষ্ঠের এক ঝলক তপ্ত বাতাস তাঁর মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল। চারিদিকে যেন আগুন জ্বলছে। দূর যমুনার ক্ষীণ স্রোতরেখা কিছুমাত্র স্নিগ্ধ ও সরস করতে পারে নি এই মরুভূমির শুষ্ক তপ্ত আবহাওয়া। এখনও সন্ধ্যার অনেক দেরি। দিল্লীর প্রাসাদ-দুর্গের নহবৎখানায় ওঠে নি দিবাশেষের রক্তরাগ। এখনও প্রখর রৌদ্রে ঝাঁ-ঝাঁ করছে প্রাসাদের উঠান। এখনও কেউ ঘরের বার হয় নি। কবুতরগুলো পর্যন্ত ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নিয়ে মুখ বুজে আছে। পথের কুকুরগুলো বোধ হয় আত্মগোপন করেছে কোনো নালার কালবুদে।

না, এখনও অনেক দেরি সন্ধ্যার।

ফতিমাকে তিনি বলেছিলেন, 'তুই গিয়ে বল্ যে তার অসুখ করেছে, বল্ সে উঠতে পারছে না—যা হয় বল্ তুই।'

কিন্তু ফতিমা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিয়েছিল, 'তাতে হিতে বিপরীত হবে বেগমসাহেবা। একবার বলতে গিয়েছিলাম, তিনি বায়না নিলেন, তাঁকেই

পাল্‌কি ক'রে নিয়ে আসতে এখানে। কারুর কোনো কথাই শুনছেন না শাহেনশাহ।'

ক্লান্ত ইনায়ৎ বানু উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোরা যা হয় বল্, আমি আর পারছি না।'

তাড়াতাড়ি ফতিমাকেও সরানো দরকার। চোখের জল যে কোনোমতেই বাধা মানছিল না ইনায়ৎ বানুর। ভয় হচ্ছিল ওঁর, যদি বাঁদীর সামনে মহিষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে, সে লজ্জা যে আর রাখবার জায়গা থাকবে না।

বাদশার অসহিষ্ণুতা এখান থেকেই অনুমান করতে পারছেন বৈকি ইনায়ৎ বানু। বেচারী!

তাঁর স্বামী—তাঁর রুগ্‌ণ, অসহায়, দুর্বল, তরুণ স্বামী!

চিরদিনই এমনি অসহিষ্ণু। শরীর খারাপ হ'লে—আর খারাপ তো হয়েই আছে—এক লহমাও চলে না ইনায়ৎ বানু ছাড়া। ছেলেমানুষের মতই কান্নাকাটি করেন ওঁকে না দেখতে পেলে।

রুগ্‌ণ স্বামীর কাছে বসবার উপায় নেই আজ তাঁর। হে খুদা, এ কী অসহায় অবস্থায় ফেললে তাঁকে!

বেশ তো ছিলেন তাঁরা, এই তো তিন মাস আগেও। সুখে না হোক, স্বচ্ছন্দে ছিলেন। দিল্লীর শাহী-তখ্‌তে বসবার কোনো স্বপ্ন-কল্পনাই তো তাঁদের ছিল না। যা যৎসামান্য মাসোহারা ছিল, তাতেই তো তাঁদের কুলিয়ে যেত! সম্মান? যেটুকু সম্মান ছিল শাহজাদা ব'লে তাতে কোনো ভেজাল, কোন খাদ ছিল না। এ কী বাদশাহী? প্রাসাদ থেকে এক পা বেরোবার উপায় নেই উজিরদের অনুমতি ছাড়া। কাউকে খিলাৎ, ইনাম, জায়গীর, মনসবদারি—কিছুই দেবার সাধ্য নেই। উজিরের অনুমতি নিতে হবে। কবে দরবার দেবেন—তা জানেন কুৎব্‌-উল-মুল্‌ক্। সাধারণ অপরাধী ছাড়া কারুর সাজা মকুব করতে পারেন না বাদশা। সম্রাট্ কোন্ ঘরে শোবেন তাও ঠিক ক'রে দেবেন কুৎব্‌-উল্‌-মুল্‌ক্। যে তখৎ-এ-তাউসের জন্য এত কাণ্ড, তাতেই বা কটা দিন বসতে পেলেন? উজিরদের হুকুমমত তা কখনও দিওয়ান-ই-আমে যায়, কখনও খাসে আসে। এমন কি বাদশার ক্ষিদে পেলেও উজিরের নোকরের কাছে অনুমতি চাইতে হয়। এই কি বাদশাহী? এর চেয়ে এই লাল-কিল্লার যে কোনো বান্দা যে ঢের সুখে আছে!

উঃ, কি কুক্ষণেই ফররুখশিয়র তাঁর এই উজিরদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে-

ছিলেন! বাবরশাহী বংশের সবচেয়ে সুপুরুষ, সবচেয়ে দরাজদিল বাদশা ফররুখশিয়র। সে দুর্দিনের কথা মনে হ'লে আজও ইনায়ৎ বানুর লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করে। তারা এসেছিল, সেই ঘাতকের দল—বিদারদিলকে সিংহাসনে বসাতে। ওদেরই দুর্ভাগ্য যে তার মা ভুল বুঝে তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কোথাও বিদারদিলকে খুঁজে না পেয়েই তারা শীর্ণ দুর্বল কিশোর রফিউদ্-দর্জাতকে নিয়ে এল। তাদের একটা ক্রীড়াপুত্তলি চাই যে, আর চাই তখনই।···সিংহাসন বাদশা ছাড়া থাকতে পারে না। বিশেষত জনপ্রিয় ফররুখশিয়রের ওই অপমানকর এবং অন্যায় পতনে সমস্ত দিল্লীর নাগরিকরা ক্ষুব্ধ। বারুদের স্তূপের মত অবস্থা হয়েছিল দিল্লীর, যে কোনো মুহূর্তে তাতে আগুন লাগতে পারত। সে আগুন একবার পরিব্যাপ্ত হ'তে পারলে হয়তো ঐ উজিরদেরও সাধ্য হ'ত না নেভাবার! বাদশা চাই একটি সেই মুহূর্তে, কাউকে তখ্‌তে বসিয়ে তার নামে হুকুম চালাতে হবে, ফর্মান জারি করতে হবে। তাই না বিশ্বাসঘাতক মারোয়াড়ী রাজা অজিত সিংহ আর কুৎব্-উল্-মুল্‌ক্ একরকম জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন তাঁর স্বামীকে—তাঁর রুগ্‌ণ, দুর্বল, অহিফেনাসক্ত বেচারী স্বামীকে।

যে দু'জন সেই দুর্দিনে হাত ধ'রে নিয়ে এসেছিল রফিউদ্-দর্জাতকে, তাদের একজন মুসলমান – কোরানের নামে শপথ নিয়ে যাঁকে সম্রাট্ ব'লে স্বীকার ক'রে তখ্‌তে বসিয়েছিল, তাঁকেই নিজের হাতে সুর্মার কাঁটা দিয়ে অন্ধ করতে বাধে নি তার; আর একজন হিন্দু—নিজের জামাতাকে হত্যা করার সকল বন্দোবস্ত শেষ ক'রে এসেছেন নিজের সামান্য একটু সুবিধার জন্যে সেই হত্যাকারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে। বাঃ, চমৎকার যোগাযোগ! রাজযোটক বুঝি একেই বলে!

সেইদিনই বুঝেছিলেন ইনায়ৎ বানু—সৌভাগ্য তো ছিলই না কোনোদিন, এবার সুখ এবং শান্তিও বিদায় নিল তাঁদের জীবন থেকে চিরতরে।

ছটফট ক'রে উঠলেন ইনায়ৎ বানু। অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলেন।

সুখ এবং শান্তি না থাক্,—এত অপমান!

ইচ্ছামত যা-খুশি করিয়ে নিয়ে যায় ওই দুই ভাই। সৈয়দ-বংশে নাকি জন্ম ওদের। সৈয়দ! ভারি সৈয়দ ওরা! একবার থুতু ফেলিয়ে আবার তা গেলানোতেই ওদের আনন্দ। বাদশার ওপর বাদশা ওরা—এইটে বার বার প্রমাণ করতে না পারলে ওদের আনন্দ নেই।

ভয় হয় ওঁর, ভারি ভয় হয়!

ভয় হয় ওঁর স্বামীর জন্য। দুর্দান্ত তাতারী রক্ত—ক্ষয়রোগ আর অহিফেনে সুপ্ত আছে মাত্র, মরে নি একেবারে। আকবর শাহজাহান আলমগীরের খাঁটি রক্তই বইছে যে তাঁর ধমনিতে। তাঁর পিতাও যেমন আলমগীর বাদশার সাক্ষাৎ পৌত্র—তাঁর মাতাও তেমন সেই পুরুষসিংহেরই পৌত্রী।

ভয় হয় পাছে কোনোদিন সেই উদ্ধত শাহী-রক্ত জেগে ওঠে প্রতিকারহীন ব্যর্থ রোষে। ফররুখশিয়রের দুর্দশার কথা যে কিছুতেই ভুলতে পারেন না ইনায়ৎ বানু। এই তো সেদিনের কথা। শেষে কি—। ভাবতেও পারেন না সবটা। ওই তো দুর্বল দেহ। ক'টা দিনই বা বাঁচবেন সম্রাট্, বিছানাতে শুয়ে শেষ নিশ্বাসটা ফেলতে ও কি পারবেন না! আকবর আলমগীরের বংশধর ব'লে রেহাই দেবে না ওরা। জাহান্দার শা এবং ফররুখশিয়র দু'জনেই বান্দার বান্দাদের পদাঘাত সহ্য করছেন মৃত্যুর আগে। ওঃ, খুদা!

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বৈকি, এই তিনমাসেই দেখা দিয়েছে। যতই রুগ্ণ, দুর্বল আর অসমর্থ হোন—তিনি আলমগীরেরই প্রপৌত্র এ কথা ভুললে চলবে কেন? মাত্র ক'দিন আগেরই তো কথা! কুৎব্ উল-মুল্ক্ আগের দিন যে জায়গীর তাঁর কোনো আশ্রিতকে বন্দোবস্ত দিয়ে ফর্মান দস্তখত করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, পরের দিন সেই জায়গীরই অপরকে বন্দোবস্ত দেবার ফর্মান সই করাতে এনেছিলেন। বাদশাহের সুগৌর মুখ অরুণবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবু তিনি শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ কি একই নামের অন্য জায়গীর, না, জায়গাটাও এক?' কুৎব্-উল্-মুল্ক্ দেখেও দেখেন নি তাঁর উষ্মা, খুব সহজ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, সেই জায়গাটাই।...এর কাছ থেকে বেশী টাকা সেলামি আদায় হ'ল, তাই একেই দেওয়া ঠিক করলুম।' বেশী কিছু কঠিন কথা বলার সাহস হয় নি বাদশার, তবু ফর্মানের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ঠিকই—উজিরের সামনে। বলেছিলেন, 'এ রকম আহাম্মকির কোনো অর্থ হয় না।' তাঁর মুখের চেহারা দেখে উজির আর জোর করতে সাহস করেন নি এ কথা ঠিক, কিন্তু অপমানটা ভুলতে পেরেছেন কি?

শুধু কুৎব্-উল্-মুল্ক্ই নন—ছোটভাই হুসেন আলি খাঁকেও মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছেন বাদশা।......আশ্চর্য, ওরাই বা কী ভেবেছে! খুশিমত বাদশাহের তখ্তে বসিয়ে আবার টেনে নামিয়ে দিয়ে ওরা কি ভেবেছে ওরা বাদশার বাদশা ব'নে গেছে? সমস্ত কেতা ভুলে গেছে ওরা, সমস্ত রকম শিষ্টাচার? হুসেন আলি খাঁ বাদশার সামনে এসে তাঁর অনুমতি না নিয়েই

ব'সে পড়লেন একটা কুর্সিতে। আজ পর্যন্ত এ সাহস কারুর হয় নি। উজির-এ-আজম আসাদ খাঁ জাহান্দার শার বাবার বয়সী ছিলেন, তবু বন্দী জাহান্দার শার সামনেও তিনি বসতে সাহস করেন নি।

আলমগীরের রক্ত সেদিনও রফিউদ্-দর্জাতকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। উপযুক্ত উত্তর দিতেও দেরি হয় নি তাঁর। বাঁ পা-খানি হুসেন আলি খাঁর সামনে প্রসারিত ক'রে দিয়ে বলেছিলেন, 'মোজাটা একটু খুলে দিন তো উজির সাহেব!'

বাদশা খেলার পুতুল হ'লেও সিংহাসনে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ তিনি বাদশাই। সোজাসুজি বাদশার হুকুম অমান্য করতে সাহস হয় নি, তাই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে ব'সে মোজা খুলে দিতেই হয়েছিল উজিরকে।

কিন্তু সেখানে উপস্থিত না থাকলেও উজিরের তখনকার সেই ভয়ঙ্কর ক্রূর মুখভাব ইনায়ৎ বানু এখান থেকেই কল্পনা করতে পারেন। আজও, এখনও তা কল্পনা ক'রে, এই তো সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওঁর! না জানি হুসেন আলি খাঁ কি পৈশাচিক প্রতিশোধের কথা চিন্তা ক'রে ফেলেছেন এতক্ষণে!

তবু এসব নিতান্তই তুচ্ছ অপমান, সাধারণ তাচ্ছিল্য বা অবহেলা, এর বেশি নয়।

যে যন্ত্রণা গত ক'দিন সইতে হয়েছে ইনায়ৎ বানুকে, তার কাছে এসব কিছুই নয়। এ অপমানের জ্বালায় হয়তো আত্মহত্যাই করতেন ইয়ানৎ বানু, শুধু রুগ্ণ বাদশার মুখের দিকে চেয়েই করতে পারেন নি।

ওই কুৎব্-উল্-মুল্ক, ওই কুৎসিত প্রৌঢ় লোকটা—! ওর লালসা পুরুভুজের মত লালায়িত রসনা মেলে এবার যেন তাঁকে অষ্টবন্ধনে বেঁধেছে। বুঝি এর থেকে পরিত্রাণও নেই। স্বামীর বিছানা ছেড়ে এক এক সময় নড়বার উপায় থাকে না—আর তা থাকে না ব'লেই তো কুৎব্-উল্-মুল্কের মত লোকের সামনে ওঁকে পড়তে হয়। তখন অত ভাবেনও নি তিনি। তাঁর পিতার বয়সীই হবে হয়তো লোকটা; অথচ ওই লোকটাই এমন অনায়াসে এই প্রস্তাব ক'রে পাঠাতে পারল তাঁর কাছে! এমন কুৎসিত প্রস্তাব!

ওঁকে দেখে পর্যন্ত নাকি তার রাতের ঘুম আর দিনের কাজ চ'লে গেছে, কিছুই ভালো লাগছে না তার। এই বেহেস্তের হুরীকে পাবার জন্যে সে সব-কিছু করতে রাজি আছে। যদি ইনায়ৎ বানু প্রসন্ন হন তো সে ওঁর স্বামীকে

তামাম দুনিয়ার বাদশা ক'রে দেবে। আর বাদশার দিনও তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—দরকার হ'লে ইনায়ৎকে সে নিজের প্রধানা বেগম ক'রে আবারও তখ্‌তে বসাবে। যদি চান তো ইনায়ৎ বানু নিজেই শাসন করবেন এই বাদশাহী, আর তাঁর সিংহাসন রক্ষা করবে বান্দার বান্দা কুৎব্‌-উল্‌-মুলুক্‌।

আর এই প্রস্তাব নিয়ে এল কে? তাঁরই হারেমের বড় বাঁদী সদর-উন্নেসা! অথচ তার জিভ কেটে তখনই কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারলেন না সম্রাজ্ঞী। সে ক্ষমতা তাঁর নেই। বরং ওঁর তিরস্কার শুনে ধীর প্রশান্ত মুখেই সে বেরিয়ে গেল। সে জানে, তার পিছনে আছে বাদশারও যে মনিব—তারই শক্তি। সম্রাট্‌ বা সম্রাজ্ঞী কারুর রোষই সেখানে পোঁছবে না।

আর তা জানে ব'লেই দিনের পর দিন অসহায়া সম্রাজ্ঞীর কানের কাছে এসে সেই প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করে সে অনায়াসে। নানা রকম লোভ দেখায়। ভাগ্যের পরিহাস! নইলে হিন্দুস্তানের বাদশার স্ত্রীকে প্রলোভন দেখায় সেই বাদশারই এক বান্দা!

এসব কোনো কথাই বাদশাকে খুলে বলতে পারেন নি ইনায়ৎ বানু। দিনের পর দিন শুধু মিনতি করেছেন, 'এ তখ্‌ত্‌ তুমি ত্যাগ কর বাদশা। এ কিল্লা ছেড়ে, এই অভিশপ্ত প্রাসাদ ছেড়ে চল দূরে কোনো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকি। সুখ না হোক, শান্তি পাবে। এমন বাদশাহীতে আমাদের কাজ নেই।'

হেসেছেন রফিউদ্‌-দর্জাত। নিজের শীর্ণ হাতখানি দিয়ে ওঁর পিঠে কিংবা মাথায় হাত বুলিয়েছেন। নইলে বলেছেন, 'দূর পাগলী, এই তখ্‌ত হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব! দাঁড়াও না, একটু সুস্থ হ'তে দাও। ও দুই ভাইকেই আমি সরাব—'

ব্যাকুল হয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরেছেন ইনায়ৎ বানু। এ প্রাসাদের পাথরের দেওয়ালগুলোও এক-একটি গুপ্তচর। হায় হতভাগ্য স্বামী, তোমার কতটুকু শক্তি-সামর্থ্য আর কতদিন পরমায়ু তুমি জান না ব'লেই এমন অলস কল্পনা নিয়ে থাকতে পার। নইলে হয়তো তুমিও আত্মহত্যা করতে চাইতে।

কিন্তু সব জেনে-শুনেও ইনায়ৎ বানু নিজেকেই বা সামলাতে পারলেন কৈ? সব বুদ্ধি বিবেচনা, সব হিসাব কোথায় ভেসে চ'লে গেল—মুহূর্তের ক্রুদ্ধ হৃদয়াবেগে। তাতার রক্ত যে তাঁর ধমনিতেও বইছে, হিন্দুস্তানের ভিজে জলবাতাস আজও যে তাকে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা করতে পারে নি! অপমান চরমে পৌঁছতে তিনিও আর সহ্য করতে পারলেন না!

উঃ, এখনও মনে হ'লে তাঁর বুকের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে। যদি এটা লাল-কিল্লা না হ'ত, যদি এমনভাবে ওই শয়তান দুটোর পৈশাচিক কবলে এসে না পড়তেন তো এর জবাব তিনি নিজেই দিতেন। পুরুষ লাগত না, নিজের হাতে তরবারি ধ'রে কেটে দু' টুকরো ক'রে ফেলতেন ওই বেশরম বাঁদীকে—

বাঁদীর হাতে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিল কুৎব্-উল্-মুলুক্ আবদুল্লা খাঁ—তাঁকে, ওর মালেকানকে!

লিখেছিল যে, ইনায়ৎ বানুর ঢেউ-খেলানো রেশমের সমুদ্রের মত কেশের স্মৃতি ওকে দিনরাত বেহোঁশ দিওয়ানা ক'রে রেখেছে—সেই কেশের প্রান্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করতে না পারলে এ ব্যাধি আর ওর সারবে না। এখন শুধু ইনায়ৎ বানুর দয়ার উপর নির্ভর করছে তার জান, তার সব কিছু! এই একান্ত আতুরের উপর দয়া কি হবে না ঐ বেহেস্তের হুরীর?

সদর-উন্নেসা এসে সেই কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল তাঁকে—এই তো আজ সকালেই। মাত্র দুই প্রহর আগে।

তখন—তখন ইচ্ছা করেছিল ইনায়ৎ বানুর উন্মাদিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে শয়তানের অনুচর এই সব ক্ষুদে শয়তানগুলোর ওপর। যতগুলো সম্ভব দুশমনকে মেরে নিজেরও প্রাণ দিতে। পারেন নি সে তো শুধু স্বামীর কথা ভেবেই।

রুদ্ধ আক্রোশে পাষাণে মাথা কুটেও মরতে পারেন নি তিনি—ওই একই কারণে। অথচ সহ্য করতেও পারেন নি। তাই একমাত্র যে জবাব এই দুঃসহ স্পর্ধার দেওয়া সম্ভব, তাই তিনি দিয়েছেন। কুটনী বাঁদীকে অপেক্ষা করতে ব'লে নিজে হাতে তাঁর সেই প্রতিমার মত ঢেউ-খেলানো, রেশমের মত নরম ঘন কালো দীর্ঘ চুল—যা তাঁর স্বামীর একান্ত প্রিয়, তাই নিজ হাতে কচকচ ক'রে কেটে এনে সদর-উন্নেসার হাতে তুলে দিয়েছেন।

বাঁদী আর দাঁড়ায় নি। বোধ করি তাঁর সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে—সভয়ে ছুটে পালিয়েছে, তাঁর কেশ হাতে ক'রেই।

তার পর? পরিণাম?

তার পর আর কিছু জানেন না—আর ভাবতেও পারেন না ইনায়ৎ বানু।

নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে ছিলেন তিনি, আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন —তাই বোধ করি শুনতে পান নি ডুলি-বাহকদের পদশব্দ। বাদশার ডুলি এসে পৌঁচেছে

কখন তাঁর মহলে, তাঁর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন বাদশা—তা টেরও পান নি।

'ইনায়ৎ বানু!'

ক্লান্ত, কেমন যেন সকরুণ আহ্বান কানে আসতে একেবারে চমক ভাঙল। সেই ডাকে সুগভীর একটা অভিযোগও বুঝি ছিল!

চমকে ফিরে তাকালেন ইনায়ৎ বানু। ভুলে গেলেন সব কথা, অবগুণ্ঠন দেবার কথাও তাই মনে রইল না। দেখলেন তাঁর শীর্ণ দুর্বল স্বামী দাঁড়িয়ে কাঁপছেন থরথর ক'রে। ছুটে এসে ধরলেন বাদশাকে, সযত্নে শুইয়ে দিলেন নিজের শয্যায়, ভেলভেটের তাকিয়া এনে দিলেন মাথায় ও পিঠের নিচে—যাতে আধ-শোয়া হয়ে থাকতে পারেন সম্রাট্। একেবারে শুয়ে পড়াটা ওঁর পছন্দ নয়। কিন্তু ততক্ষণে বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে বাদশার মুখ। প্রশ্নটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল ওষ্ঠে নিঃশব্দে কেঁপে কেমন যেন আর্তনাদের আকারে বেরিয়ে এল: 'এ কী ইনায়ৎ বানু, এ কী করেছ! কে এমন সর্বনাশ করলে—কেন করলে! আমি বেঁচে থাকতেই?'

ইঙ্গিতে সমস্ত দাসদাসীদের সরিয়ে দিলেন ইনায়ৎ বানু। তারপর একপাত্র শরবত হাতে ক'রে এনে ওঁর পাশে বসলেন নিরুত্তরেই। উত্তেজিত সম্রাট্ দু' হাতে ওঁর কাঁধটা ধ'রে নিজের দিকে মুখখানা ফেরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে কান্নার মত গলায় বললেন, 'বল বল, উত্তর দাও ইনায়ৎ—কেন এমন করলে? অমন সুন্দর চুল তোমার, অমন রেশমের মত সুন্দর চুল—কেন এমন করলে ইনায়ৎ?'

আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না ইনায়ৎ বানু। স্বামীর বুকে আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে শুধু বললেন, 'আমাকে প্রশ্ন কোর না বাদশা, এ প্রশ্ন কোর না। সে অপমানের কথা আমি তোমার সামনে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রেখ যে, কোনোদিন যদি তোমার প্রিয় এই মুখখানাকেও নিজের হাতে আমাকে কুশ্রী বিকৃত করতে হয় তো হাসতে হাসতেই তা করব—তবু আমার প্রভু, আমার বাদশার ইজ্জতকে এতটুকু কলঙ্কিত হ'তে দেব না।'

আড়ষ্ট, পাথর হয়ে গেলেন সম্রাট্। আর একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। আর একটি প্রশ্নও করলেন না। শুধু অনেক—অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাকে মাপ কর সম্রাজ্ঞী। মাপ কর। আমি বড় দুর্বল, বড় অসহায়। তোমার অপমানের শোধ নেবার মত কোনো

শক্তিই আমার নেই। কিন্তু—কিন্তু—বান্দাদের স্পর্ধা এতদূর পৌঁছবে তা আমি ভাবি নি, ভাবতে পারি নি। হে খুদা দয়াময়, তুমি এবার আমাকে টেনে নাও—টেনে নাও।'

এবার মাথা তুললেন ইনায়ৎ বানু। নিজের ওড়নার প্রান্ত দিয়ে বাদশার চোখ দুটি মুছিয়ে দিলেন, বললেন, 'তুমি শান্ত হও, স্থির হও। দেখ, আমি তো বিচলিত হই নি। তোমার শরীর খারাপ, উত্তেজনাতে অকারণ ক্ষতিই শুধু হবে। একটু শরবত খাবে?'

রফিউদ্-দর্জাত অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। তিনি যে আর চাইতে পারছেন না তাঁর স্ত্রীর দিকে।—মুখ ফিরিয়েই বললেন, 'এখন থাক ইনায়ৎ, আমি শান্ত হয়েছি।—'

তারপর নেমে এল একটা অদ্ভুত শোকাবহ নিস্তব্ধতা। আর সেই সঙ্গে বুঝি আঁধারও। জাফ্‌রির ফাঁক দিয়ে এখনও বাইরেটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে। দিনের প্রচণ্ড দাবদাহ এবার জুড়িয়ে আসছে, কবুতর আর ঘরের কোণে নেই। অস্তসূর্যের রক্তাভা এসে পড়েছে লাল-কিল্লার রক্তবর্ণ পাষাণ-প্রাচীরে—এই কিল্লার অধীশ্বরীর রক্তাক্ত হৃদয়ের মতই বুঝি সেটা লাল দেখাচ্ছে।...

একটু একটু ক'রে অন্ধকার ঘনিয়ে এল ঘরের মধ্যে। দিল্লীর প্রাসাদ-দুর্গের এই শাহী মহল্লায় নেমে এল সন্ধ্যা।

অনেকক্ষণ পরে ইনায়ৎ বানু ডাকলেন, 'আলিজা, শাহেনশাহ।'

'আবার ও সম্বোধন কেন ইনায়ৎ বানু? তুমিও কি আমাকে আজ পরিহাস করতে চাও?'

'না না, ছিঃ! শুধু আজ একটি ভিক্ষা চাই। দেবে, দেবে শাহজাদা?'

'নিশ্চয়ই দেব, নিশ্চয়ই দেব ইনায়ৎ বানু। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। যা চাইবে দেব। যা আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে অবশ্য।—'

আবেগে উত্তেজনায় বাদশার গাঢ় কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

'ঠিক বলছ?'

'বাবরশাহী বংশের ইজ্জতের শপথ নিচ্ছি ইনায়ৎ বানু।'

'তুমি এ সিংহাসন ত্যাগ কর। দুটো দিন শান্তিতে, নিশ্চিন্ত হয়ে, তোমার সেবা করতে দাও। আমি আর ভাবতে পারি না। আশঙ্কায় আমার দিনে রাতে ঘুম নেই।'

বহুক্ষণ নিঃশব্দে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন বাদশা। ঘনায়মান অপরাহ্ণের অন্ধকারে তাঁর মুখভাব কিছুই দেখা গেল না—গেলেও সে মুখে হয়তো কিছুই খুঁজে পাওয়া যেত না। আলমগীরের প্রপৌত্র তিনি, আকবরের বংশধর। মনোভাব তাঁদের মুখে ফুটে উঠতে নেই।

যখন তিনি কথা কইলেন, আশ্চর্য শান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠ। শুধু বললেন, 'তাই হবে ইনায়ৎ। এ সিংহাসন আমি ত্যাগ করলুম। তুমি এখনই কুৎব্-উল্-মুল্‌ক্‌কে ডেকে পাঠাও! আর আমার পঞ্জা আনতে বল। তুমি নিশ্চিন্ত হও পিয়ারী, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার হৃদয়ের তখ্‌তের মূল্য তখ্‌ৎ-এ-তাউসের চেয়ে অনেক বেশী, তা আমি জেনেছি।

## আশাতীত

দাদু ও পাশের টেবিল হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, 'দাশু আজকের ফাংশানে থাক্‌ছ তো?'

দাশু মাথা না তুলিয়াই জবাব দিল, 'ক্ষেপেছেন দাদু, পাঁচদিন পরে একটা শনিবার, তাও আমি ঐসব ছাইভস্ম নিয়ে মাতামাতি ক'রে নষ্ট করি! ভারি আপিসের লাইব্রেরি তার আবার বার্ষিক-উৎসব!···দুটো গান, দেড়খানা কমিক আর আড়াইখানা আবৃত্তি। আমি ওতে নেই—'

পুলিনদা ওপাশের টেবিল হইতে প্রায় চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'এবার তোমাদের প্রেসিডেণ্ট কে-হে? ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার নাকি? গতানুগতিক?'

দাদু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'না না, এবার একটা নতুন কিছু করা হয়েছে। এবার প্রিসাইড্ করবেন মিসেস্ চৌধুরী।'

অনেকগুলি কলম সহসা থামিয়া গেল। দাশু, যে কোনো কথাতেই থাকে না, সেও বিবর্ণ মুখ তুলিয়া কহিল, 'কোন্ মিসেস্ চৌধুরী দাদু?

দাদু প্রায় খিঁচাইয়া উঠিলেন, 'নে নে ন্যাকামি রাখ্! মিসেস্ চৌধুরী আবার কটা—আমাদের বিমল চৌধুরীর বৌ আসবে নাকি প্রেসিডেণ্ট হ'তে?··· ডাক্তার-সাহেবের বৌ আসছেন!'

আর বাকি আলোচনা দাশুর কানে গেল না, সে হাতের কাজ ফেলিয়া দূরের জানালার মধ্য দিয়া জেনারেল পোস্ট-অফিসের গম্বুজটার দিকে চাহিয়া রহিল।

দাশুর জীবনযাত্রা অলস বাঙ্গালীকেও বিস্মিত করে। সে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করিয়া যেদিন এই অফিসের ডাকবিভাগে ঢোকে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনাতে, সেদিন সকলেই আশা করিয়াছিল যে, বৎসর-খানেকের মধ্যেই সে হয় য়্যাকাউণ্টস্ না হয় অডিট যে কোনো সেকশনে চলিয়া যাইবে। কারণ, এমনিই এখানকার নিয়ম। চিঠিপত্র পাইলে বেয়ারা দিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া এবং অফিসের চিঠিগুলি খামে আঁটিয়া ডাকে পাঠানো—এই তো কাজ ডাকবিভাগের। আগে এটাকে দপ্তরীখানাই বলা হইত, এখন খাতির করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে 'ডেস্‌প্যাচ ডিপার্টমেণ্ট'—সকলে সংক্ষেপে বলে 'ডাক ডিপার্টমেণ্ট'। তবু অফিসের প্রায় সকলকেই আগে এই বিভাগে ঢুকিতে হয়, তারপর হয় প্রোমোশন। যোগ্যতা, লেখাপড়া এবং কাজের প্রতি অনুরাগ বুঝিয়া বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে পাঠানো হয়। দাশুর বেলাতেও সকলে তাই ভাবিয়াছিল, কিন্তু দাশুর নিজের ইচ্ছা ও অনুরোধেই এই পাঁচ ছয় বৎসর কাজ করিবার পরও দাশু এই একই টেবিলে টিকিয়া আছে—কেবল মাহিনাটা বাড়িয়া আটচল্লিশে পেঁ ৗছিয়াছে এতদিন পরে।

দাশুর সংসারে কেহ নাই, বুড়ী মা দেশের বাড়িতে থাকিয়া সামান্য জমিজমা যা আছে দেখেন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত পাঁচ-দশ টাকা পাঠাইলেই চলিয়া যায়। আর সে থাকে চোরবাগানের একটা অন্ধকার মেসে, সেখানে তাহার মোট খরচা কুড়ি টাকা। ধোপা-নাপিত-জলখাবার ও ট্রামভাড়ায় আর দশটি টাকা যায়—সুতরাং, এই আয়েতেই সে সন্তুষ্ট। সে বিবাহ করে নাই, করিবার ইচ্ছাও নাই, কারণ সে নাকি বড় ঝঞ্ঝাট! সিনেমা-থিয়েটারেও তাহার অনুরাগ নাই, শুধু চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিলেই সে খুশী। বিদেশে যায় না, এমন কি দেশেও যায় না। মা খুব কান্নাকাটি করিলে দুই-তিন বৎসর অন্তর কোনো পূজায় হয়তো বাড়ি যায়। নহিলে দীর্ঘ ছুটির দিনগুলি একাই এই মেসে পড়িয়া থাকে। বড় জোর অফিসের লাইব্রেরি হইতে ছুটির আগে খান-দুই বই লইয়া যায়, সারা ছুটিটা একই বই তিন-চারবার পড়িয়া কাটায়। অবশ্য সময় তাহার থাকেও না বেশী, কারণ ঘুমাইবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ, দৈনিক আঠারো ঘণ্টা ঘুমাইলেও তাহার বিরক্তি আসে না।

তবু হঠাৎ সেদিন, দাশুর এই দীর্ঘ দিনের প্রিয় আলস্যকে ধিক্কার দিয়া তাহার সুপ্ত পৌরুষ লজ্জার আঘাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে মাত্র মাস-ছয়েকের কথা। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার মনে আছে দাশুর—

সেটা এই অফিসেরই ড্রামাটিক-ক্লাবের বাৎসরিক অভিনয়-উৎসব। এই দিনটিতে তাহাদের পাঁচ-ছয়শ টাকার উপর খরচা হয়। সাহেবসুবো সকলেই বাবুদের এই আনন্দ-উৎসবে যোগ দেন বলিয়া ব্যাপারটা বেশ ঘটা করিয়াই অ ত হয়। এবারেও একটা বড় থিয়েটার-হল ভাড়া করিয়া অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল, সে উপলক্ষে জলযোগ এবং সাহেবদের জন্য 'ইত্যাদি'রও ঢালা ব্যবস্থা ছিল—আর দাশুর কাছে সবচেয়ে যেটা লোভনীয় ব্যাপার, পুরা একটি দিনের ছুটি পাওয়া গিয়াছিল।

দাশু সাধারণত এসব ব্যাপারে আসে না, কিন্তু সেদিন তাহাদের অফিসের সরকারী 'দাদু'র চক্রান্তে তাহাকে আসিতেই হইয়াছিল। আগের দিন ছুটির মুখে এমনভাবে চার-পাঁচজনে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল যে, 'নিশ্চয়ই আসিবে' এ প্রতিশ্রুতি না দিয়া তাহার আর উপায় রহিল না। ঠিক কাজের জন্য নয়, কারণ এসব ব্যাপারে উৎসাহ অনেকেরই আছে, কাজের লোকের অভাব ঘটে না—শুধু দাশুর ঘরকুনো বৃত্তিকে ছাড়াইবার জন্যই দাদুর এই ষড়যন্ত্র। সেই জন্যই দাশু আসিতে তাহাকে একটা কাজ দিতে হইল, তাহার উপর ভার পড়িল প্রোগ্রাম বিলাইবার—পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে—সাহেবসুবো এবং অফিসারদের মধ্যে।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখেই প্রোগ্রামের গোছা লইয়া দাশু অগ্রসর হইয়াছিল। যে-কোনো কাজেই তাহার বিরক্তিবোধ হয়, তাহার উপর এই ভিড় এবং কোলাহল তাহার কাছে অসহ্য। তবু উপায় যখন নাই-ই—তখন কাজ সারিতেই হইবে। সে এক এক 'রো' ধরিয়া প্রোগ্রাম বিলি করিয়া যাইতেছিল, কোনো-দিকে না চাহিয়াই। মেমসাহেব এবং বাঙ্গালী, সাহেবদের মেমরাও অনেকে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কৌতূহলই ছিল না দাশুর, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ডাইনে বাঁয়ে পুস্তিকাগুলি প্রায় ছুঁড়িয়াই দিতেছিল। অকস্মাৎ একটা অত্যন্ত মিষ্টস্বরের আহ্বানে তাহাকে থামিতে হইল—'শুনুন'!

কিন্তু ফিরিয়া চাহিতেই এমন প্রবল একটা বিস্ময়ের ধাক্কা আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল যে, সে না পারিল কোনো প্রশ্ন করিতে, না পারিল সেদিক হইতে চোখ নামাইতে। তাহাদের অফিসের ডাক্তার চৌধুরী-সাহেবের পাশে যে

তরুণী মহিলাটি বসিয়াছিলেন, বোধকরি ডাক্তারেরই স্ত্রী, তিনিই তাহাকে ডাকিতেছেন। কিন্তু বিস্ময় সে জন্য নয়—স্ত্রীলোক যে এত রূপসী হয়, মানুষের যে এত রূপ থাকিতে পারে তাহা সে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। দামী সিল্কের শাড়ির উপর একটা ফার দেওয়া লম্বা কোট পরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া-ছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। এমনই রাজেন্দ্রাণীর মত মহিমামণ্ডিত সে মূর্তি যে, কেহ যদি সেদিকে দেখাইয়া দাশুকে বলিত স্বয়ং নুরজাহান সিংহাসনে বসিয়া আছেন তো—দাশু তৎক্ষণাৎ তাহা বিশ্বাস করিত!

মিসেস্ চৌধুরী তাহার দিকে একখানা প্রোগ্রাম বাড়াইয়া দিয়া পুনরায় কহিলেন, 'দেখুন আমার কাছে দু'খানা প্রোগ্রাম এসে গিয়েছে, একখানা আপনি নিয়ে যান—কম পড়তে পারে।'

যন্ত্রচালিতের মতই দাশু তাঁহার হাত হইতে প্রোগ্রামখানি ফেরত লইল। না কহিতে পারিল কোনো কথা, না জানাইতে পারিল একটা ধন্যবাদ। বার-বার মনে হইল যে, কোথায় একটা কী ত্রুটি রহিয়া গেল, অন্তত একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া নমস্কার করা উচিত ছিল – তবু সে কিছুই করিতে পারিল না। এমন কি বাকি প্রোগ্রামগুলি বিলাইয়া আসিয়া যখন সে ক্লান্তভাবে দরজার কাছে গেট-কীপারের জন্য রাখা একটা টুলে বসিয়া পড়িল তখনও সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, যেন মনে হইতেছিল সে একটা কি স্বপ্ন দেখিতেছে, সে স্বপ্ন হইতে এখনও জাগিতে পারে নাই।

ইনিই তাহা হইলে ডাক্তার-সাহেবের বৌ! ইঁহার খ্যাতি সে ইতিপূর্বে শুনিয়াছে। অসাধারণ রূপসী, বিদুষী, মধুরভাষিণী, বিলাত-ফেরত—অনেক কথাই তাহার কানে আসিয়াছে। কিন্তু সে কোনোদিন সে সব কথা মন দিয়া শোনে নাই, কথাগুলি কোনোদিন আবার মনে পড়িবে তাহাও জানিত না—আজ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে, প্রবল বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া যাইবার পর, সে অবাক হইয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখিল যে, সেই সব কথাই তাহার মনে পড়িতেছে।

দাশু সেইভাবেই সেখানে বসিয়া রহিল; কতক্ষণ, তা তাহার মনে নাই। বক্তৃতা, কমিক, গান প্রভৃতি শেষ হইয়া গিয়া অভিনয় শুরু হইয়া গেল, তবু তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল না। একেবারে সহসা. সেই বিশেষ পরিচিত কণ্ঠস্বরেই সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল যে, ডাক্তার-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী চলিয়া যাইতেছেন। স্বামীর সহিত কী একটা কথা কহিতে কহিতে তিনি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন। কথা কহিতে কহিতে বোধ হয় খুবই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই হাতের ভ্যানিটিব্যাগটা খুলিয়া কী একটা বাহির করিতে গিয়া হাতের রুমালটা যে পড়িয়া গেল তাহা লক্ষ্যও করিলেন না, তেমনি গল্প করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

হয়তো দাশুরই উচিত ছিল রুমালখানা কুড়াইয়া দেওয়া। কুড়াইয়াও লইল সে, কিন্তু কি জানি কেন সে রুমালখানা আর ফিরাইয়া দিতে পারিল না। ছোট্ট একরত্তি সিল্কের রুমাল—দামী ফরাসী এসেন্স মাখানো, বহুক্ষণ মুঠার মধ্যে থাকার ফলে ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। রুমালখানা হাতে করিয়া মিনিট দুই মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিবার পর সে অতি সন্তর্পণে বুক-পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি সামান্য জিনিস, উঁহাদের মত লোকের রুমালের কথা মনে থাকিবারও সম্ভাবনা নাই—সুতরাং, রাখিয়া দিলে আর যাহাই হউক, পরস্বাপহরণের পাপ হইবে না।—দাশু মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল।

সেদিন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সকলকার দৃষ্টি এড়াইয়া দাশু মেসে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেটা শনিবার, বাসার অধিকাংশ লোকই অনুপস্থিত। অভুক্ত অবস্থায় নির্জন ঘরের মধ্যে শুইয়া বহুকাল দাশুর চোখে তন্দ্রা নামিল না। সে যে অযোগ্য, সে যে সামান্য বেতন পায়, অলস ও দরিদ্র—এই কথাটা আজ যেন সে প্রথম অনুভব করিল। এ সবই জানা কথা, কিন্তু সেজন্য এই বেদনাবোধটাই নূতন। আজ নূতন করিয়া যেন তাহার মনে পড়িল সে পুরুষ—ঘর, সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—এ সবে তাহার জন্মগত অধিকার। ইহারই সাধনা তাহার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল।

কেন যে এই সব ছাইভস্ম চিন্তা তাহার মাথায় আসিতেছে তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। তাহার যে এই অপরিসীম আত্মধিক্কার ও বেদনাবোধ, তাহার মূলে মিসেস্ চৌধুরী থাকিলেও, তিনিই তাহার লক্ষ্য নন। ঐ আশ্চর্য মহিলাটি সম্বন্ধে তাহার মনে মনে যে পরিমাণ সম্ভ্রমবোধ—বোধ হয় একটু ভীতিও জাগিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনো স্বপ্ন দেখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু, তবু কোথায় একটা মোহ রচিত হইয়াছিল যেন—সেই মোহে মন ডুবিতে গিয়াই বার বার নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার কিছু নাই, অতি সামান্য এক নারী—পল্লীর কুশ্রীতমা কুমারী সম্বন্ধেও স্বপ্নরচনার অধিকার তাহার নাই—এই ধিক্কারটাই তাহার মনে

সেদিন বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, সে দিনের গ্লানিও কাটিয়া গিয়াছে একটু একটু করিয়া। পৌরুষ তাহার একবার মাত্র চোখ মেলিয়াই আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে, কোনো উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আর হয় নাই। শুধু সে সেই অতি-ক্ষুদ্র রুমালখানার মায়া কাটাইতে পারে নাই। আগে সে যে মানসিক জড়ত্বের মধ্য দিয়াই দিন-রাত কাটাইত, এখন সেই জড়ত্ব যেন মধ্যে মধ্যে কেমন কাটিয়া যায়, তখন আসে একটা অকারণ পীড়াবোধ, আর সেই উপায়হীন দুঃখদিনগুলিতে সে এখনও মধ্যে মধ্যে বাক্স খুলিয়া সেই রুমালখানা বাহির করে। অতি কোমল করপল্লবের স্বেদকণার স্মৃতি কবেই বাষ্প হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে—এসেন্সের গন্ধ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দুর্গন্ধে পরিণত হইয়াছে, তবু সে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেখানাকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে এখনও মধ্যে মধ্যে খুব লঘুভাবে নিজের গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া সেই রেশমের মৃদু কোমল স্পর্শের মধ্য দিয়া আরও কোমল কোনো চম্পক-অঙ্গুলির স্পর্শের কথা হয়তো কল্পনা করিতে চেষ্টা করে।

এইভাবেই দিন যাইতেছিল, সহসা আজ আবার মিসেস্ চৌধুরীর নামটা তাহাকে যেন প্রবল একটা নাড়া দিয়া চলিয়া গেল। কী ভাবিতেছিল সে তাহা নিজেই জানে না, শুধু চুপ করিয়া দূর আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে একটা বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চেতনা হইল।

'বাবু, মাদ্রাজ-মেলের ডাক এবার ছাড়তে হবে, আর সময় নেই—'

'হ্যাঁ—এই যে দিই।' তাহার পর মিনিটখানেক চিঠিপত্রে মন বসাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া পাশের বাবুটিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ভাই ইন্দুদা, দেবেন এই চিঠিগুলো ঠিক ক'রে? বড্ড মাথা ধরেছে আমার, চোখ মোটে চাইতে পারছি না!'

ইন্দুবাবু রাজি হইলে সে টেবিল ছাড়িয়া হলের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নিচে সমস্ত লালদীঘি হইতে বিপুল জনতা ও অসংখ্য ট্রাম-বাসের একটা মিলিত বিচিত্র কোলাহল তেতলাতেও আসিয়া পৌঁছাইতেছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার মন ছিল না। সে ভাবিতেছিল মিসেস্ চৌধুরীর কথা। স্থিরবিদ্যুতের মতই তাঁহার রূপ, সরস্বতীর মত সে রূপ সম্ভ্রম জাগায় মনে। সে তাঁহার চেহারাটা ভুলিয়া গিয়াছে নাক-মুখ-চোখ-অবয়বের তথ্যও মনে নাই,

শুধু মনে আছে—আশ্চর্য, অদ্ভুত তাঁহার রূপ।...

হাঁ—দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কতবার মরীয়া হইয়া উঠিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যে-কোনো ছুতায় সে ডাক্তার-সাহেবের বাড়ি যাইবে, মিসেস্ চৌধুরীর সহিত দেখা করিবে সে! কিন্তু তারপর? তিনি যদি প্রশ্ন করেন, 'কেন এসেছ?' কী উত্তর দিবে সে? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তাপ তাহার নিভিয়া যায়। আবার সে ফিরিয়া আসে নিজের জড়ত্বের মধ্যে, অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে।

তবুও, আর একবার তাঁহাকে দেখিবার আশা সে ছাড়ে নাই, হয়তো বা কথা কহিবারও—

সে জোর করিয়া মনকে অফিসের মধ্যে টানিয়া আনিল। ভিতরে আসিয়া দেখিল, তাহারই টেবিলের উপর সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রোগ্রাম ঠিক করিতেছে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে পুলিনদা মাথা তুলিয়া কহিলেন, 'আবৃত্তি তাহ'লে একটার বেশি হচ্ছে না যে! ছাখো, আর কেউ করবে নাকি?'

তাহার পর, যেন ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরেই কহিলেন, 'কি দাশু, নাম দেব নাকি তোমার? একটা আবৃত্তি করবে?'

আবৃত্তি! অকস্মাৎ দাশুর মনে পড়িল, এই একটি মাত্র ব্যাপারে কিছু দক্ষতা তাহাব সত্যই একদিন ছিল। স্কুলে কলেজে ইন্‌স্টিটিউটে সে বহুবার আবৃত্তি করিয়াছে, তাহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা এবং উচ্চারণের স্পষ্টতার জন্য সে প্রশংসাও পাইয়াছে অনেকের কাছে, একবার একটা পুরস্কারও।

সহসা একটা উত্তেজনার ঢেউ যেন তাহার সারা দেহে একটা আলোড়ন তুলিয়া বহিয়া গেল, চোখ-দুটি মুহূর্ত-কয়েকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'দিন নাম, আবৃত্তি আমি করব!'

'করবে?'

এতই অবিশ্বাস্য কথাটা যে, সকলেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে একটু যেন বিরক্ত হইয়াই জবাব দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি যখন তখন নিশ্চয়ই করব। বাজে কথা কি আমি বলি?'

দাদু খুশী হইয়া কহিলেন, 'তা বেশ, ভালোই হ'ল ভাই। তোকে যে দলে টানতে পেরেছি, এই ঢের। তা কী করবি ভাই, প্রোগ্রামে নাম দিতে হবে তো?"

নাম ? সে মুহূর্ত-কয়েক ইতস্তত করিয়া কহিল, 'নাম দিন না, এমনি একটা। আচ্ছা, লিখে দিন রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা।...'

সে ইন্দুবাবুর হাত হইতে 'সঞ্চয়িতা'খানা লইয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। ঝোঁকের মাথায় কথা দিয়া ফেলিয়াই সে কিছুটা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এসব অনেক দিনের কথা, কবেকার কথা মনেও পড়ে না। তখনও কিছু উৎসাহ ছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে কত মুখস্থ করিয়াছে তখন বাজি রাখিয়া। তাহার পর, এই অফিসে ঢোকার পর হইতে, সবই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। আরও কত কবিতা কবি লিখিয়াছেন, পৃথিবী কতটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, সে খোঁজও সে আর রাখে না।

কিন্তু এখন আর ফেরা চলে না। শুধু যে কথা দিয়াছে তাই নয়—যে উত্তেজনা তাহার মুখ দিয়া এতটা প্রয়াসসাধ্য প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়াছে, সে উত্তেজনার তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু একটা তাহাকে করিতেই হইবে—যোগ্যতার যে-কোনো নিদর্শন না দিলে তাহার বাঁচারই আর কোনো অর্থ থাকিবে না!

ঠিক তিনটার সময় ডাক্তার-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিলেন। বড় হলেরই মাঝখানকার চেয়ার-টেবিল সরাইয়া খানিকটা জায়গা করা হইয়াছে, স্টেজও একটা বাঁধা হইয়াছে ছোটখাটো। শিল্পীদের জন্য খানিকটা জায়গা পর্দা ঘিরিয়া দিতেও ভুল হয় নাই। তবু তাহারই মধ্য দিয়া বাহিরের সবটাই দেখা চলে।

দাশু চাহিয়া ছিল মিসেস্ চৌধুরীর দিকে। সেই অবিশ্বাস্য রূপ, প্রতিমার মতই মহিমামণ্ডিত, সম্রাজ্ঞীর মতই দৃপ্ত। সে ভালো করিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, চাহিয়াছিল তাঁহার চাঁপার কলির মত আঙুলের দিকে, মাখনের মত শাদা আঙুলে নীলার আংটিটা যেখানে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে—সেই দিকে। কে জানে কেন তাহার মনে হইতেছিল, এ রূপের সামনে কোনো একটা আত্মত্যাগ না করিতে পারিলে সুখ নাই। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যত কিছু ত্যাগ, যত কিছু আত্মবিসর্জন মানুষ করিয়াছে, সে শুধু এই আশ্চর্য রূপের দিকে চাহিয়াই।

দাদু আসিয়া এক সময় কানে কানে বলিয়া গেলেন, 'এই বক্তৃতাটার পরই ওপ্‌নিং সং—তারপরেই তোর আবৃত্তি—'

সঙ্গে সঙ্গে একটা শৈত্য, প্রবল একটা কম্পন যেন তাহার সর্বাঙ্গে খেলিয়া

গেল। দাশু প্রাণপণে একবার ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—এখনও ফেরার কোনো পথ কোথাও আছে কিনা !·······না, কোনো পথই খোলা নাই, এটুকু যোগ্যতাও যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার আত্মহত্যা করাই উচিত—

সে দৃঢ়হস্তে 'সঞ্চয়িতা'খানা চাপিয়া ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

আচ্ছা, মিসেস্ চৌধুরী কি শুনিবেন তাহার আবৃত্তি? কতকাল এসব অভ্যাস নাই, হয়তো, বা গলা কাঁপিয়া যাইবে, হয়তো ঠিক সময়ে ঠিক উচ্চারণটি হইবে না, একটুখানি বিদ্রূপের হাসি ঐ ঠোঁটে খেলিয়া যাইবে, তাহার পরই স্বামীর দিকে ফিরিয়া নিম্নস্বরে গল্প আরম্ভ করিবেন।

কিন্তু তবু, তবুও আর ফিরিবার পথ নাই !

অনেক ভাবিয়া সে 'পূরবী' হইতে একটা পুরানো, বহুবার আবৃত্তি-করা কবিতাই বাছিয়া লইয়াছে। যাহা হয় হইবে।

দাদু আসিয়া ডাকিলেন, 'কৈ রে দাশু, যা যা—'

সে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়া স্টেজের উপর দাঁড়াইল। একবার একটা যেন কি ঘূর্ণির মধ্য দিয়া চকিতে চোখে পড়িল মিসেস্ চৌধুরীর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত উৎসুক মুখ। তাহার পরই সব একত্রে লেপিয়া গেল। সে জোর করিয়া গলাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বইয়ের দিকে চোখ নামাইল—তাহার পর শুরু হইল আবৃত্তি।

আবৃত্তি করিতে করিতে বহু দিনের ভুলিয়া যাওয়া দিনগুলির অভ্যাস আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। প্রথম যৌবনের সেই আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর !

আবৃত্তি শেষ করিয়াই সে স্টেজ হইতে নামিয়া পড়িল। আর কোনোদিকে সে চাহে নাই, মিসেস্ চৌধুরী তাহার আবৃত্তি শুনিয়াছেন কিনা, তাহাও সে জানে না। তখনও কবিতার রেশ তাহার মন হইতে যায় নাই, উত্তেজনার রক্তিম আভা তখনও তাহার মুখ-চোখ ঘিরিয়া আছে। সে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে, সহসা দাদু আসিয়া ডাকিলেন, 'শোন্—এদিকে আয়—

সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন হয়েছে দাদু? খুব কি খারাপ হ'ল ?'

পুলিনদা পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন, কহিলেন 'মার্ভেলাস্ !······চমৎকার করেছ ভাই—'

দাদু কহিলেন—'আয় না হতভাগা, আমার সঙ্গে। কেমন হয়েছে শুনবি—'

তাহার পর তাহাকে কোনোরূপ প্রস্তুত হইবার অবসর না দিয়াই, একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তিনি হাজির করিলেন মিসেস্ চৌধুরীর সম্মুখে। কহিলেন, 'এই নিন্ আপনার আর্টিস্টকে, বলুন কেমন করেছে ও।'

দাশুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'ওঁর খুব ভালো লেগেছে। উনি তোমার খোঁজ করছিলেন আলাপ করবেন ব'লে—মিসেস্ চৌধুরী—ডাক্তার-সাহেবের স্ত্রী—আর ইনি দাশরথি দত্ত।"

যেন স্বপ্নের মধ্যেই মিসেস্ চৌধুরীর মধুর কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, 'সুন্দর হয়েছে আপনার আবৃত্তি। কবিতাটায় আপনি প্রাণ দিতে পেরেছেন।…বাস্তবিক, এত মিষ্টি গলা আপনার, আর এত পারফেক্ট ইনটোনেশন!—'

বিহ্বল দাশু পাথরের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল নমস্কার করিতে, না পারিল একটা ধন্যবাদের ভাষা কণ্ঠ দিয়া বাহির করিতে। কত দিন, কত রাত্রি সে মনে মনে কল্পনা করিয়াছে যে, মিসেস্ চৌধুরীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, তিনি তাহার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। কেমন করিয়া কী কী কথা কহিবে, সে স্বপ্নও সে দেখিয়াছে বৈকি! কিন্তু আজ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের আকস্মিকতায়, তাহার সমস্তটা যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। সে মূঢ়ের মত, অভদ্রের মত শুধু চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রক্ষা করিলেন দাদুই। তখন আবার স্টেজের পর্দা সরিয়া কী একটা কমিক আরম্ভ হইয়াছে। দাদু তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন, 'এখন চল্ সামনে থেকে, পরে আবার আলাপ হবে। মাপ করবেন মিসেস্ চৌধুরী, আবার ওকে পাঠিয়ে দেব। পেছনের এঁদের অসুবিধা হচ্ছে কিনা!'

চলিয়া যাইবার সময় দাশু কোনোমতে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল।

দাদু দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিলেন, 'রাস্কেল, একটা কথাও কইতে পারলি না?'

দাশু দাদুর হাত ছাড়াইয়া একরকম ছুটিয়াই সামনে সাহেবদের একটা বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল। সমস্ত মানুষের দৃষ্টির বাহিরে যাওয়া প্রয়োজন তাহার। কী ঘটিয়া গেল, কে কী বলিল, কোনো কথাই তাহার মাথায় ঢোকে নাই, শুধু একটা দুর্নিবার লজ্জা যেন তাহাকে উন্মাদের মত ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে, লজ্জা আর একটা অসহনীয় ধিক্কার!…

কল খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জল থাব্ড়াইবার পর যেন সে

একটু প্রকৃতিস্থ হইল। পাশেই ছিল একটা তোয়ালে, মাথা মুছিয়া চুলটা ঠিক করিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইল বড় আয়নাখানার সম্মুখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়িল তাহার অপরিসীম দৈন্য—ময়লা শার্ট, তাহার কলার ও হাতা সবটাই ফাটিয়া ফাটিয়া গিয়াছে। ধুতিটাও জীর্ণতা ও মালিন্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অবশ্য সেটা শনিবার, সাধারণত রবিবারের পূর্বে পোশাক বদলাইবার সুবিধা হয় না। আর সেদিন এসব ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত হইয়াও সে আসে নাই। কিন্তু এসব কোনো কথাই তাহার মনে পড়িল না। শুধু যেন কে কানের কাছে প্রবলবেগে ছি ছি করিয়া উঠিল।

মনে পড়িল মিসেস্ চৌধুরীর বেশভূষার সেই রুচিসম্মত শ্রী এবং নিখুঁত পারিপাট্য। কী মনে করিলেন তিনি কে জানে তাহার দিকে চাহিয়া! দাড়িটাও আলস্যবশত আজ তিনদিন কামানো হয় নাই, চুল কাটা হয় নাই দেড় মাসেরও বেশি। হয়তো তিনি ভাবিলেন যে, তাহার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কবিকেই অপমানিত করিল।

দাদুর উপর তাহার রাগ ধরিতে লাগিল বিষম, কোন্ আক্কেলে তিনি তাহাকে মিসেস্ চৌধুরীর সামনে টানিয়া লইয়া গেলেন! বিন্দুমাত্র বিবেচনা নাই লোকটার!...

আরও মিনিট-দুই শূন্য দৃষ্টিতে আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে ধীরে ধীরে বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল। ওধারে ঘন ঘন করতালি চলিতেছে, হয়তো কমিক শেষ হইল—এবার আছে গান।...সে সকলের দৃষ্টি বাঁচাইয়া রাস্তার ধারে ধারে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শনিবারের অপরাহ্ণ, লালদীঘির ভিড় কমিয়া গিয়াছে, সমস্ত পল্লীটাতে ফিরিয়া আসিয়াছে একটা শান্তি। বড় বড় বাড়িগুলি কিছুক্ষণ পূর্বেই জনকোলাহলে মুখর ছিল এখন আর সেখানে একটি লোকও নাই, নিস্তব্ধ প্রহরীর মত বাড়িগুলি লাল-দীঘির দিকে চক্ষু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কদাচিৎ দুই-একটা ট্রাম এবং চলন্ত মোটরগাড়ি রাজপথের প্রাণ জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র।

দাশু ভাবিতেছিল তাহার এই অভাবিত সৌভাগ্যের কথা। গত ছয়মাস ধরিয়া কখনও মনের গোচরে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে প্রতি দিন-রাত্রিই কি সে এই ক্ষণটির স্বপ্ন দেখে নাই? কী কথা বলিবে তাহা সে তখনও ভাবে নাই, কারণ, সে বরাবরই জানিত এ অসম্ভব, এ অবিশ্বাস্য। তাহার জীবনে কোনোদিন কখনও মিসেস্ চৌধুরীর আগমনের সম্ভাবনা নাই। তবু সে স্বপ্ন দেখিয়াছে

বৈকি! অথচ সেই আশাতীত সুযোগও যখন মিলিয়া গেল, তখন সে—ছি ছি ছি! নিদারুণ লজ্জায় সেই নির্জনেও তাহার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল।...

পিছন হইতে দাদু আসিয়া ডাকিলেন, 'বেশ! তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? মিসেস্ চৌধুরী তোকে খুঁজছেন, উনি এবার বাড়ি যাবেন কিনা। বোধ হয় তোকে চায়ের নিমন্ত্রণ করবেন কাল সকালে—'

কি সর্বনাশ, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবেন! মিসেস্ চৌধুরী! তাঁহাদের বাড়িতে!

সে ব্যাকুলভাবে দাদুর হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, 'আপনি যান দাদু, আমি আসছি এক মিনিটের মধ্যে—এই বাথরুম থেকে—যান, যান, এখনই আসছি আমি।'

তাহার পর পাগলের মত সে ছুটিল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বাহিয়া রাস্তা পার হইয়া লালদীঘির বাগানের মধ্য দিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। যেন কোন্ এক বিভীষিকা তাহাকে তাড়া করিয়াছে, এক মুহূর্ত থামিলে চলিবে না।

সোমবার দিন সকলে মিলিয়া জটলা করিয়া দাশুর অভদ্রতার কথাই আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় তাহার এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল। একই খামের মধ্যে পুলিনদা'র নামে দুইছত্র চিঠি এবং কোম্পানির নামে পদত্যাগ পত্র।

সে দেশে চলিয়া গিয়াছে, চাকরি আর করিবে না।

# বুলাকীপ্রসাদের ব্যাধি

বহুদিন পরে বুলাকীপ্রসাদের সঙ্গে সেদিন দেখা হইল। দেখিলাম এই চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে ঢের। আর একটু মোটা হইয়াছে, এখন বেশ ভদ্রলোকের মতই চুল ছাঁটে, চুলে দুই-এক জায়গায় পাকও ধরিতে শুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যে চাল-ডালের দোকানখানা আয়তনে বাড়িয়াছে, জন-দুই চাকরও রাখিয়াছে—এক কথায় চতুর্দিকেই বেশ শ্রীবৃদ্ধির চিহ্ন।

বুলাকীপ্রসাদ খুব খাতির করিয়া বসাইল। তাড়াতাড়ি চাকর পাঠাইয়া পান-সিগারেট আনাইয়া দিল। চা খাইব কি না তাও প্রশ্ন করিল।

খানিকটা এ-কথা সে-কথার পর কহিলাম, 'ছেলেপুলে কতগুলি হ'ল বুলাকী?' বুলাকী একটু লজ্জিত হইল। ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, 'একটি মেয়ে বাবু। এই বছর তিনেকের হ'ল।' তাহার পর উভয় পক্ষের কুশল-প্রশ্ন একপ্রকার শেষ হইলে উঠিয়া পড়িলাম। একেবারে উঠিবার সময় কথাটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার সে রোগটা এখন কী রকম। আছে এখনও?'

প্রথমটা সে বুঝিতে পারিল না। কহিল, 'কী রোগ বাবু?'

'সেই যে, পরোপকার করার রোগ?'

হো-হো করিয়া বুলাকী হাসিয়া উঠিল। কহিল, 'ও, সেই কথা বলছেন? না, সে রোগ এখন আর নেই। এখন যাই হোক নিজের দু'একটা হয়েছে আরও হবে, তাদের তো দেখতে হবে—। আচ্ছা, বাবু রাম রাম!...'

রাস্তায় বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে বুলাকীর কথাটাই ভাবিতে লাগিলাম। উঃ কী পরিবর্তনই হইল লোকটার! বুলাকীপ্রসাদ আমাদের পাড়াতেই গাড়ি চালাইত, তাহারও পূর্বে তাহার বাবা জানকীরাম ছিল পাড়ার বিখ্যাত গাড়োয়ান। সুতরাং বুলাকীপ্রসাদের ব্যবসাটা ছিল পৈত্রিক, যদিচ জানকীরাম ঠিক বুলাকীর নিজের বাবা নয়। কথিত আছে একেবারে সদ্যোজাত অবস্থাতে জানকীরাম তাহাকে কুড়াইয়া পায়। তাহার সংসার ছিল না, বুলাকীকেই সে বরাবর পুত্রস্নেহে মানুষ করে, মৃত্যুর পরে বুলাকীই তাহার গাড়ি-ঘোড়া আস্তাবল এবং বোধ হয় কিছু নগদ টাকার মালিক হয়।

জানকীর কথা খুব ভালো মনে পড়ে না, কারণ তখন আমার বেশি বয়স নয়, তবে বুলাকীকে স্পষ্টই মনে আছে। যেমন বিরাট চেহারা ছিল, তেমনি গলার আওয়াজ। মাথাটাও কামাইত গুণ্ডার মত করিয়া, সামনে একগুচ্ছমাত্র

চুল থাকিত, বাকি সবটাই ওলের মত কামানো। অর্থাৎ, তাহাকে যাহারা না চিনিত, তাহারা দেখিলে ভয় পাইত। শোনা যায় যে, বহু অপরিচিত ভদ্রলোক কম ভাড়ায় পাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া তাহার গাড়িতে উঠিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু যাহারা উহাকে ভালো করিয়া চিনিত, তাহারা ভয় পাইত না। কারণ, উহার মন ছিল শিশুর মতই কোমল। তাহার দাপটে বরং অন্যান্য গাড়োয়ানদের গুণ্ডামি কিছু কমিয়াছিল, সে নিজে কখনও কাহারও সহিত অভদ্র আচরণ করে নাই। আমরা জানিতাম, বুলাকীর আশ্রয় সবচেয়ে নিরাপদ।

শুধু তাই নয়,—পরোপকার করিবার ইচ্ছাটা ছিল তাহার কাছে ব্যাধির মতই। কিছুতেই না করিয়া থাকিতে পারিত না। কত খোঁড়া কুকুর, ল্যাংড়া বিড়াল আনিয়া যে নিজের আস্তাবলে জড় করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাছাড়া মানুষ তো আছেই—। সেবার একটা ভিখারী রাস্তার ধারে কলেরা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া ঘরে রাখিল, ডাক্তার দেখাইয়া ভালো করিয়া তুলিল, শেষ পর্যন্ত সেই লোকটাই তাহার বাক্স ভাঙ্গিয়া প্রায় ত্রিশচল্লিশটা টাকা লইয়া সরিয়া পড়িল!

তবু কি চৈতন্য হয়! আর একটা কানা ভিখারীর পা ভাঙ্গিয়া যাইতে ঘরে আনিয়া রাখিল, গুরু-আদরে তাহার সেবা চলিতে লাগিল, একটু ভালো হইয়া উঠিতে একদিন কি একটা তুচ্ছ কারণে বুলাকীরই পায়ে এমন এক লাঠি কষাইয়া দিল যে, তিনদিন চুণ-হলুদ লাগাইতে হয়। আর এমনি কত পরিচিত অপরিচিত লোক যে তাহাকে কল্পিত দুঃখের কাহিনী শোনাইয়া সর্বস্বান্ত করিত, তাহার সংখ্যা ছিল না। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককেও আমি ঐ কর্ম করিতে দেখিয়াছি।

কেহ কোনোপ্রকার বিপদে পড়িয়াছে একথা একবার কানে গেলেই হইল, ব্যস্! বুলাকীর আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। যেমন করিয়া হউক, নিজের সর্বপ্রকার ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

এহেন বুলাকীপ্রসাদেরই একদিন 'বিষে বিষক্ষয়' হইয়া গেল। অর্থাৎ, পরোপকারের মধ্য দিয়াই ঐ ব্যাধিটা গেল একেবারে সারিয়া। ঘটনাটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে—

সে-ও ভিখারীদের এক ব্যাপার লইয়াই। মার্কাস্ স্কোয়ারের কাছ দিয়া বুলাকীর গাড়িতে চড়িয়াই আমরা দুই-তিন বন্ধু কোথায় যাইতেছিলাম। সহসা একটা ছোট রকমের মারপিট এবং বালিকাকণ্ঠের কান্নার শব্দ কানে গেল।

চাহিয়া দেখি, বাগানের রেলিং ঘেঁষিয়া খানিকটা ভিড় জমিয়াছে।

বলা বাহুল্য, বুলাকী তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামাইয়া নামিয়া পড়িল। আমরাও ব্যাপারটা কী দেখিবার জন্য নামিলাম। দেখি, একটা খোঁড়া, হিন্দুস্থানী ভিখারী একটা বছর বারো-তেরোর মেয়েকে বেদম ঠ্যাঙ্গাইতেছে এবং আশেপাশে আরও অনেকগুলি ভিখারী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে।

বুলাকীর কনুইয়ের ঠ্যালায় মুহূর্ত মধ্যে ভিড় ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বুলাকী একেবারে কাছে গিয়া সেই ভিখারীটার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল : 'ব্যস্ বহুত হুয়া, খবরদার !' হাতের চাপে বুলাকীর বাহুবল উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। তখন উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই গোলযোগের যে ইতিহাস পাওয়া গেল, তাহা খুবই সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েটির নাম চুনৃরী। চুনৃরীকে বাল্যকালে এই ঘুরউ ভিখারী তিন টাকা দিয়া আর এক ভিখারিণীর নিকট হইতে খরিদ করে, এতদিন মানুষও করিয়াছে। এখন সে যদি আর এক ভিখারীর কাছে বারোটাকা মূল্য পাইয়া বিক্রয়ই করিয়া থাকে তো কী এমন অন্যায় হইয়াছে ! কিন্তু হতভাগা মেয়েটা কিছুতেই তাহার কাছে যাইবে না, যদি বা মারধোর করিয়া পাঠানো হইয়াছিল কাল, আবার আজ পলাইয়া আসিয়াছে। শাস্তিটা এই ধৃষ্টতারই। এখন সে যদি বংশীর কাছে না যায়, তাহা হইলে ঘুরউকে ঐ বারোটাকার উপর আরও একটাকা সুদ ধরিয়া দিতে হইবে, তাহাতে ঘুরউ অত্যন্ত নারাজ।...

মেয়েটিকে প্রশ্ন করা হইলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, ঐ যমদূতটার নিকট সে কিছুতে যাইবে না। ও লোকটা বড় খারাপ, তাহার কাছে গেলে সে মরিয়া যাইবে। বংশী কোথায় খোঁজ করিতে সে ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। যেমন কালো তেমনি কদাকার ও নোংরা। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, এক চোখ কানা, আর এক চোখে ছানির মত শাদা দাগ—দাঁড়ি-গোঁফে বীভৎস ব্যাপার ! সেদিকে চাহিলে আমাদেরই সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, তা ও তো এক ফোঁটা মেয়ে। তাহার উপর যদিও শোনা গেল যে, সে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়াই চুনৃরীকে অবলম্বন করিতে চায়, তথাপি তাহার একচক্ষুর কুৎসিত লোলুপতায় তাহার আসল উদ্দেশ্যও বুঝিতে বাকি রহিল না—

বুলাকী একবার বংশীর দিকে চাহিয়াই চুনৃরীর হাত ধরিল। কহিল, 'আয় আমার সঙ্গে—'

চুনৃরী সভয়ে একবার ঘুরউর দিকে চাহিল, কিন্তু আশ্চর্য, সে বুলাকীকে

এতটুকু ভয় করিল না। বরং যেন পরম আশ্বাসেই তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল। চুনরী চলিয়া যায় দেখিয়া বংশী মরীয়া হইয়া বাধা দিল, একটা কটূক্তি করিয়া কহিল, 'আমি দস্তুর মত বারোটাকা দিয়ে কিনেছি, চালাকি নয়, উনি এখন এসেছেন ফোকটিয়া কত্তাত্তি করতে—এই ছুঁড়ি এদিকে আয়—'

ব্যস্! বুলাকীর একটি চড়ে হাত-কতক দূরে ভিড়ের মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িল সে। বুলাকী চুন্‌রীকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একটা পুতুলের মত অনায়াসে গাড়ির চালে উঠাইয়া দিল। ঘুরউ কতকটা বংশীর এবং কতকটা বুলাকীর ভয়ে বিহ্বল হইয়া একবার পুলিশে খবর দিবার ভয় দেখাইল, আবার একবার সবিনয়ে জানাইল, সে চুন্‌রীকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিবে—সে তাহার কন্যার মত ইত্যাদি। বুলাকী কোচ্‌বাক্সে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, 'তাই করিস্। পুলিশেই খবর দিস্। আমার নাম বুলাকী, আমার গাড়ির নম্বরও মুখস্থ করে রাখ, হাজার ছয়ট্টি!'

সে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সে চুন্‌রীকে আস্তাবলেই আনিয়া রাখিল। দুই পয়সা দিয়া একটা মেটে সাবান কিনিয়া দিয়া তাহাকে কলে পাঠাইল সাফ হইয়া আসিতে, তাহার পর নিজেরই একখানা কাপড় দিয়া কহিল, 'ও-ই কোনোরকমে জড়িয়ে পর। রাঁধতে জানিস্ কিছু? ছাই জানিস্। আচ্ছা, আমি কেমন ক'রে রাঁধি দেখ্—'

অর্থাৎ, চুন্‌রী নিরাপদ আশ্রয় পাইল। সে ভিতরে শুইত, বুলাকী আস্তাবলের বাহিরে খাটিয়া পাতিয়া ঘুমাইত। প্রথম দু'জনে মিলিয়া রন্ধনের কাজ চালাইত, দিন-আষ্টেক পর হইতে চুন্‌রী নিজেই সে ভার হইল, বুলাকী বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল চুন্‌রী মেয়েটি সহজ নয়। সে বেশ সহজভাবেই বুলাকীকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে। ভিতরে যে কুকুর-বেড়ালের দল আশ্রিত ছিল, তাহারা এতদিন যথেচ্ছাচারই করিত—এইবার সেগুলি বিতাড়িত হইল। বুলাকী একটা কি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে গিয়া চুনরীর নিকট ধমক খাইল, 'হ্যাঁ, তাই ব'লে এইখানে খাওয়া-শোওয়া সব, আর এর ভেতর ঐ অনাচার ঢোকাতে হবে নাকি? মাগো, হেগে-মুতে যা নোংরা ক'রে রাখে—'

অগত্যা বুলাকী তাহাদের গাড়ির আস্তাবল হইতে ঘোড়ার আস্তাবলে

লইয়া গেল, সব ধরিল না,—যেগুলি বাড়তি হইল সেগুলির মায়া কাটানো ছাড়া উপায় রহিল না।

এমনিভাবে সবদিকেই একটা শাসনের বন্ধন বুলাকীকে চারিদিক হইতে জড়াইতে লাগিল। সে কোথা হইতে একটা কুটে ভিখারীকে একদিন ডাকিয়া আনিল; বলিয়া গেল, 'এই রাত্তিরে বেচারী আর কোথায় যাবে, এইখানেই একপাশে শুতে দিস্—'

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, চুনৃরী ইতিমধ্যেই তাহাকে কিছু চালডাল দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে। রাগে বুলাকীর সর্বাঙ্গ জলিয়া গেল, কহিল, 'তুইও তো একদিন ভিখারীই ছিলি, ওদের মধ্যেই থাকতিস, আজ এত নবাবী কেন?'

চুনৃরী বিন্দুমাত্র দমিল না। কহিল, 'হ্যাঁ, ভিখিরী ছিলুম ব'লে ঐ কুটেদের সঙ্গে থাকতুম বুঝি? পোড়াকপাল!...তারপর? রোগ হ'লে দেখবে কে? তোমার যা বুদ্ধি!'

এমনি আরও কত খুঁটি-নাটি। ক্রমে এমন ওখানে হইল যে, চুনৃরী যেন সর্বস্বের মালিক। বুলাকী থাকে ভয়ে ভয়ে। তাহার ভবঘুরে মন এতটা বন্ধন সহিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করে। অবশেষে একদিন সে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, চুনৃরীর একটা বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিবে—

চুনৃরীকে কিছু বলিল না। তাহার কানে যে একটা ঝাপ্‌সা খবর না পৌঁছিল তাহা নয়, তবে অতটা গ্রাহ্য করিল না। ভিতরে ভিতরে চারিদিকে পাত্রের খোঁজ চলিতে লাগিল। জ্ঞাতি-গোত্রহীন ভিখারীর মেয়ে, দেখিতেও ভালো নয়—পাত্র মেলা কঠিন। গাড়োয়ানরা তো কেহ রাজি হইলই না, অন্যত্রও পাত্র বিশেষ মিলিল না। অবশেষে অনেক খোঁজ-খবরের পর রামাশিস্ নামে এক ছোকরা রাজি হইল। জেটিতে মাল বহনের কাজ করে, দেশ তাহার বহু দূরে, এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজনও নাই, সুতরাং সে চল্লিশ টাকা নগদ ও একসেট্ রুপার গহনার লোভ সামলাইতে পারিল না। অবশ্য প্রথম পক্ষ নয়, দেশে সে পক্ষের একটি শিশু কন্যাও আছে—তবে ছোকরার বয়স কম, রোজগারও খুব খারাপ করে না। বুলাকীও মন স্থির করিয়া একেবারে কথা দিয়া আসিল।

পুরোহিতও একজন জোগাড় হইল, তাহাকে দিয়া পাঁজি দেখাইয়া জানা গেল, দিন আছে আর চারটি দিন পরেই—তাহার পরে বহুদিন আর বিবাহ চলিবে না।

চুনূরী সমস্ত কথা শুনিয়া খানিকটা যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে অন্যত্র সরিয়া গেল। এ ব্যাপারকে সৌভাগ্য মনে করা ছাড়া যে সে আর কিছু ভাবিতে পারে, ইহাতে যে তাহার আপত্তির কোনো কারণ থাকিতে পারে—এ চিন্তা একবারও বুলাকীর মাথায় যায় নাই। সে বিষম দুশ্চিন্তায় পড়িল, একটু যেন অপ্রতিভও হইল। খানিকটা পরে উনুনের কাছ হইতে জোর করিয়া চুনূরীকে টানিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, 'তোর কী কী গয়না পছন্দ বলতো! যা চাইবি সব গড়িয়ে দেব!'

চুনূরী তবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বুলাকী তখন সন্দেহবশত তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, সে কাঁদে নাই কিন্তু চক্ষু দুইটি লাল। হতভম্ব বুলাকী কহিল, 'কী হ'ল রে?'

এবার চুনূরী কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, 'কেন বিয়ে দিচ্ছ আমার? আমি কী করেছি?'

'দুর পাগল! কী আবার করবি? বয়স হ'লে বিয়ে দিতে হয় মেয়েদের, তা জানিস না?'

চুনূরী রাগ করিয়া কহিল, 'ছাই হয়! এ শুধু আমাকে তাড়াবার ফন্দি! আমি কখ্‌খনো বিয়ে করব না, কখ্‌খনো না—'

'তবে কী করবি?'—বুলাকী প্রশ্ন করিল।

চুনূরী কহিল, 'এইখানেই থাকব। কেন, আমাকে এটুকু জায়গা দিতে পার না?'

বুলাকী হাসিয়া উঠিল, 'বদ্ধ পাগল আর কাকে বলে—'

চুনূরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

কিন্তু তখন মধ্যে আর মাত্র একটি দিন বাকি আছে। আয়োজন বন্ধ রাখা যায় না। বুলাকীর মনটায় একটু গোলমাল বাধিলেও সে বাজার-হাট শুরু করিয়া দিল। সন্ধ্যার ঝোঁকে যখন একগাড়ি বাজার লইয়া হাজির হইল, তখন চুনূরী আবার আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রাগ করিয়া কহিল, 'কী হবে এসব বাজে খরচে? দূর ক'রে দিচ্ছ, এমনি দিলেই হয়!'

বুলাকী হাসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, 'পাগ্‌লী, আমি তোকে দূর ক'রে দিচ্ছি?'

চুন্‌রী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, 'নয়তো কি ? ও লোকটা মাতাল, এর আগের বৌকে মারের চোটে মেরে ফেলেছিল ।'

বুলাকীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, ঈষৎ যেন তীক্ষ্ণকণ্ঠেই কহিল, 'কে বললে তোকে এসব কথা ?'

'ঐ-তো রামরতিয়া বলছিল ।···ভিখিরীর মেয়ে আমি, আমার জন্যে রাস্তাই ভালো । এসব হাঙ্গামে দরকার কি ?···সহ্য না হয় আমাকে, তাড়িয়ে দিলে না কেন ?'

অথচ, এখনও যে সে চলিয়া যাইতে পারে, কোথাও যে তাহার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, এ কথাটা তাহার মনে হইল না একবারও !

বুলাকী উঠিয়া গিয়া রামরতিয়াকে জেরা করিয়া জানিল যে, এ সবই জনশ্রুতি মাত্র। খাঁটি খবর সে কিছু জানে না। ইহার উপর নির্ভর করিয়া বিবাহ ভাঙ্গাও যায় না। কিন্তু মনটা তাহার খারাপ হইয়াই রহিল।

বিবাহের সভা হইয়াছিল গাড়ির আড্ডার খানিকটা অংশ খালি করিয়া। ভোজেরও আয়োজন চলিতেছিল সেইখানেই। বুলাকী ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল আর মধ্যে মধ্যে আড়চোখে চুন্‌রীকে দেখিয়া লইতেছিল। কিন্তু চুন্‌রী কল্যকার উচ্ছ্বাসের পর যে হঠাৎ চুপ করিয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতে আর একটি কথাও বলে নাই। তাহার মুখ দেখিয়াও কিছুই বোঝা গেল না।

জনকতক স্ত্রীলোকও অন্যান্য গাড়োয়ানদের ঘর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের মত করিয়া বিবাহের আয়োজন করিতেছিল, চুন্‌রী বসিয়া দেখিতেছিল। ব্যাপারটা তাহার নিকট বিস্ময়করও বটে। বিবাহ বলিতে এতদিন সে জানিয়াছে ভোজের পরের দিনে উচ্ছিষ্টের প্রাচুর্য। এসব-ও যে আছে, এবং বিশেষ করিয়া তাহার জীবনে ঘটিতে পারে, তাহা সে কোনোদিন ভাবে নাই। সে অবাক হইয়া সব দেখিতেছিল, বিস্ময়ের প্রাবল্যে তাহার দুশ্চিন্তাও যেন অনেকটা চলিয়া গিয়াছিল।

বরং সন্ধ্যার দিকে যখন নূতন রূপার গহনাগুলি পরানো হইল তখন যেন চুন্‌রীর মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়াই উঠিল। বুলাকী সেদিকে চাহিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রাণের আনন্দে এক গ্লাস সিদ্ধির শরবত খাইয়া ফেলিয়া রামরতিয়াকে কহিল, 'টাকা আমার প্রায় দেড়শ'ই খরচ হবে বোধ হয় সবসুদ্ধ, কিন্তু এ ঝঞ্ঝাট যে ঘাড় থেকে নামাতে পারলুম, এই ঢের—'

রামরতিয়া হাসিয়া কহিল, 'হ্যাঁ তোর ঘাড় থেকে কোনোদিন ঝঞ্ঝাট নামবে কি না! একটা যাবে আর একটা জোটাবি—'

আর বেশি কথা হইল না, কারণ ইতিমধ্যেই বর আসিয়া পড়িয়াছে। বর ও বরযাত্রী। বিড়ি, পানের দোনা, ভাঙ্, চা—অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটিই ছিল না। বুলাকী আসিয়া সবাইকে অভ্যর্থনা করিল। বর সাজিয়াছে ভালো। কোরা কাপড়, তাহার উপর আদ্দির ধোয়া পাঞ্জাবি, লম্বা টেরী হইতে প্রচুর লেবুর তেল গড়াইয়া পড়িতেছে। একটু আতরের গন্ধও পাওয়া গেল। এক কথায় চুনুরীর দস্তুরমত বিবাহই হইতেছে। বুলাকী মনে মনে খুশিই হইল।

কিন্তু একটু পরে সম্প্রদানের সময় বুলাকীর ডাক পড়াতে সে বরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই উগ্র তাড়ির গন্ধ পাইল। লেবুর তেল ও আতরেও সে গন্ধ ঢাকে নাই—

অকস্মাৎ যেন কী একটা রূঢ় আঘাতে বুলাকীর সিদ্ধির নেশা ছুটিয়া গেল। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই নজরে পড়িল রামাশিসের চক্ষু দুইটি করমচার মত লাল, ওষ্ঠের দুইপ্রান্তে ফেনা—

সে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'তুই তাড়ি খেয়েছিস ?'

রামাশিস্ উত্তরে জড়াইয়া জড়াইয়া কী একটা কটূক্তি করিয়া জানাইল, তাড়ি সে নিজের পয়সাতেই খাইয়াছে, কাহারও বাবার পয়সায় খায় নাই। বুলাকীর মাথায় নিমেষে যেন খুন চাপিয়া গেল। সে সবেগে একটা চড় মারিল রামাশিসের গালে, রামাশিস্ ঘুরিয়া মেঝেতে পড়িয়াই হুড় হুড় করিয়া বমি করিয়া ফেলিল।

চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বরযাত্রীর দল প্রথমটা রুখিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বুলাকীপ্রসাদের ও তাহার সঙ্গীদের চেহারা দেখিয়া আশ্চর্যরকমভাবে শান্ত হইয়া গেল। অবশেষে বুলাকীর আদেশে বরকে ধরাধরি করিয়া লইয়া তাহারা নিঃশব্দে বিদায় হইয়া গেল। দূর হইতে শুধু একজন শাসাইয়া গেল যে, ইহার শোধ তাহারা লইবে।

কিন্তু সেদিকে বুলাকীর কান ছিল না, সে ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া চুনুরীর আড়ষ্ট ও রক্তশূন্য মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মনোহর ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, 'তাহ'লে এধারে কী হবে বুলাকীপ্রসাদ ?'

বুলাকী আর একবার চুনুরীর দিকে তাকাইতেই সে একেবারে বুলাকীর দুই দুই পা জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিয়া কহিল, 'আমাকে কোথাও পাঠিও না, তাহ'লে

আমি মরে যাব, সত্যি বল্‌ছি—'

বুলাকী এক মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, আমার কাছে থাকতে পারবি চিরকাল ? আমাকে তোর ভয় করে না ?'

চুনরী সবেগে ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, 'একেবারেই না।'

বুলাকী তখন তাহাকে একটা মৃদু ধমক দিয়া কহিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, নে এখন সিধে হয়ে বোস্‌। ঢের হয়েছে—'

তাহার পর মনোহরকে কহিল, 'নাও ঠাকুর, কি মন্তর পড়াবে পড়াও, আমিই ওকে বিয়ে করব—'

ভাবিতে ভাবিতে কখন বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছি জানি না। একেবারে চমক ভাঙ্গিল আস্তাবলটার কাছে আসিয়া। ওখানে এখন করিমবক্স গাড়োয়ান গাড়ি রাখে। বুলাকীর গাড়ি-ঘোড়া সে-ই কিনিয়াছে। বিবাহের মাস-ছয়েক পরেই বুলাকী গাড়ি-ঘোড়া বেচিয়া বেলগাছিয়ায় গিয়া ঐ মুদীখানার দোকানটা খোলে। সে হইলও প্রায় অনেকদিন—বছর-পাঁচেকের কম নয়। কিন্তু তবু মনে হয় যেন সেদিনের কথা।

কী মানুষের কি পরিবর্তন, আশ্চর্য !

## সঙ্কোচ

সেটা বোধ হয় কী একটা ছুটির দিন। হ্যাঁ, বইয়ের দোকানগুলো সব বন্ধ ছিল। তাই অত সন্ধ্যারাতেই পাড়াটা যেন থম-থমে হয়ে উঠেছিল।

অনেকদিন পরে প্রাণ ভ'রে আড্ডা দিয়েছি, মনটা খুশী আছে। হাতে তেমন কাজও নেই—খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটপাথের ওপর ঢালা বইগুলো দেখলুম, তারপর কী খেয়াল হ'ল ইচ্ছে ক'রেই য়্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের পেছনের গলিটা ধরলুম। বহুদিন এ রাস্তায় হেঁটেছি কিন্তু সে সব দিনে দোকান-পাট খোলা থাকে, লোক আর আলোতে এর চেহারা হয় স্বতন্ত্র। আজ এই অন্ধকারে কেমন লাগে, সেটাও দেখতে ইচ্ছে ছিল।

কিন্তু একটুখানি গিয়েই দাঁড়াতে হ'ল। একটি যোল-সতেরো বছরের ছোক্‌রা সন্দেহজনক ভাবে একটা দোকানের রকে ব'সে আছে। মানে, আসলে সন্দেহজনক তার চেহারাটা। চুলগুলো উস্‌কো-খুস্‌কো, গায়ের শার্ট আর পরনের ধুতি শতছিন্ন, মুখটাও কেমন ফুলো ফুলো—খালি পা। ক্লান্তভাবে দোকানের বন্ধ দরজাটায় ঠেস্ দিয়ে ব'সে আছে। ব্যাপার কি, চোর নয় তো? এইটেই প্রথম মনে হয়েছিল, তবে একটু পরেই বুঝলুম তা নয়। ছেলেটা হঠাৎ উঠে ব'সে পিচ্ ক'রে থুথু ফেললে খানিকটা। পাশেই গ্যাসের আলোর থাম, তার উজ্জ্বল আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেলুম, সে থুথুর প্রায় সবটাই রক্ত।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলুম. 'ব্যাপার কি ভাই, শরীর খারাপ লাগছে?'

ছেলেটি ভাল ক'রে তাকালেও না আমার দিকে। বললে, 'শরীরের আর অপরাধ কি? শালারা যা বে-ধড়ক্ ঠেঙ্গিয়েছে! দেখুন না, কাঁচা দাঁত একটা ভেঙ্গে দিয়েছে—' বাঁ হাতের মুঠোটা খুলে দেখালে, সত্যই খানিকটা দাঁত রয়েছে সেখানে।

থুথুর সঙ্গে রক্তের রহস্যটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আমি একটু ব্যস্ত ভাবেই প্রশ্ন করলুম, 'কারা মারলে ভাই এমন ক'রে? কী করেছিলে?'

তেম্‌নি নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর এল, 'পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিলুম। বাসের মধ্যে কি না, পালাতে পারি নি। একবাস লোক পড়ল একেবারে আমার ওপর। তবু ভাগ্যিস্ মার-ধোর ক'রেই ছেড়ে দিলে, পুলিশে দিলে আরও ক্ষোয়ার হ'ত।'

ওর সহজ স্বীকারোক্তিতে রীতিমত কৌতুক বোধ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু কৌতুহলও হ'ল। প্রশ্ন করলুম, 'তা তুমি এই বয়সে এমন পেশাই বা ধরলে কেন? দেখলে তো তোমাকে ভদ্রঘরের ছেলে ব'লে বোধ হয়!'

হঠাৎ সে যেন একটু উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলে, 'কী করব, ভদ্দর লোকের তো ছেলে! তাই ব'লে কি আর উপোস ক'রে শুকিয়ে মরব?'

'কেন, তোমার কি কেউ নেই?'

'থাকবে না কেন! রাবণের গুষ্টি আছে। বাবা ম'রে গেছে অবশ্য। কাকারা আছে শুনেছি, তা তাদের চোখে দেখতে দেয় নি! মা ম'রে যাবার

সোহাগ ক'রে নিয়ে এসেছিল আর পাঠায় নি। বাবা তারপর বে করে, তবু নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে, তখন এরা পাঠালে না! তারপর দিদিমা ম'রে গেলে মামা নিজমূর্তি ধরলে! ইস্কুলে পড়ছিলুম সে সব বন্ধ ক'রে দিলে, চাকরের মত খাটাতে লাগল—বাজার করা, রেশন আনা, গম ভাঙ্গানো, জল তোলা, কয়লা ভাঙ্গা, উনুনে আঁচ দেওয়া—কী নয়? এক ঠিকে-ঝি আছে বাসন মাজার, সে না এলে বাসনও মাজতে হ'ত। কাজে একটু ফাঁক মিলল তো একটা না একটা ছেলেমেয়েকে ট্যাঁকে ক'রে ঘুরে বেড়ানো। সে কথা তো বাদই দিন, তার ওপর বেদম মার ছুতোয়-নাতায়, কত সহ্য হয় বলুন! একদিন পাড়ার একটি লোক ডেকে বললে, হ্যাঁরে ছোঁড়া, তুই কি আর চাকরি পাস না কোথাও? কত মাইনে দেয় এরা? আমি তো অবাক্! বললুম, সে কি মশাই, উনি তো আমার মামা। জিজ্ঞেস করলে, আপন মামা? যখন বললুম হ্যাঁ, তখন বললে,—বাবা, কংস কালনেমিকে যে ছাড়িয়ে গেল এরা! তা হ্যাঁরে খোকা, বিনি মাইনেয় মামার বাড়ি কাজ না ক'রে অন্য কোথাও চেষ্টা ভাখ্‌না, খাওয়া-পরা ছাড়া মাইনেও পাবি।'

এই পর্যন্ত ব'লে ছোকরা চুপ করলে। বোধ হয় ক্লান্তই হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার তখন কৌতূহল বেড়ে গেছে; বললুম, 'তারপর?'

পিচ্ ক'রে আর একবার থুথু ফেললে, আরও খানিকটা রক্ত—কিন্তু সে তা গ্রাহ্যও করলে না। বললে, 'সেই বড় ধিক্কার লাগল জানেন। একদিন তাই দুত্তোর ব'লে বেরিয়ে পড়লুম। নিজের একটা জামাও ছিল না, মামার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ডাইংক্লিনিং গিয়েছিলুম—মামারই ধুতি শার্ট প'রে হাওয়া। গিয়ে উঠলুম ইস্কুলের এক বন্ধুর বাড়ি। সে সব শুনে বললে, ভাখ্ ভাই, আমি ছুতোনাতা ক'রে দু'তিন দিন রাখতে পারি বড় জোর। আমার বাবা তেমন নয়—তারপর থাকলে বকবে।...তাই, তাই সই—তখন ভেবেছিলুম দু'দিনে কি আর কিছু জুটবে না? ও হরি—শহর চষে ফেললুম—যেখানে যা আমার করার মত কাজ আছে—সব বলে রিফিউজি হ'লে পেতে, তোমার তো এদেশে বাড়ি। এদিকে দু'দিন হয়ে গেছে—বন্ধুকে আর উত্ত্যক্ত না ক'রে স'রে পড়লুম। শেষে বাসন-মাজার কাজের চেষ্টা করলুম তাও জুটল না। সবাই সন্দেহ করে ভদ্দর লোকের মত দেখতে অথচ বাসন-মাজার চাকরি চাইছে, চুরিদারী ক'রে পালাবে না—তার ঠিক কি!...দুটো দিন ঘুরে বেড়ালুম রাস্তায় রাস্তায়—না খেয়ে। রিফিউজি ক্যাম্পে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করলুম, তা ওদের ভাষা মুখ দিয়ে বেরোয়

না, ধ'রে ফেলে তাড়িয়ে দিলে।...এমনি দিন কাটছে, সতীশ ব'লে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হ'ল—আমার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু তবু খুব ভাব জমে গেল। অজানা অচেনা—একেবারে রাস্তা থেকে ধ'রে নিয়ে গেল বাসায়, খেতে দিলে, শুতে দিলে। সে যা কাজ করে তাই শেখালে, পকেট মারতে! তা তার চেয়ে আপনার লোক আর আমার আজ কে আছে বলুন! ভাবলুম সে যদি করতে পারে তো আমার আপত্তি কি? সেও এককালে ভদ্দর ঘরের ছেলে ছিল। সতে, হানিফ—কেউ এরা লোক খারাপ নয়। দিলু আছে। একমাস বসিয়ে খাইয়েছে—যদ্দিন না রোজগার করতে শিখেছি!'

'তোমার নাম কী? কী জাত তুমি?'

এইবার যেন প্রথম ওর চমক্ ভাঙল। একটু সন্দেহের সুরে বললে, 'কেন বলুন দিকি, এত নিকেশ নিচ্ছেন? পুলিশের লোক নাকি?... আর কিছু বলব না, স'রে পড়ুন।'

'না ভাই সত্যি ক'রে বলছি, পুলিশের লোক আমি নই, পুলিশে দিতেও চাই না—'

'মাইরি? কালীর দিব্যি?'

'মা কালীর দিব্যি বলছি।'

তখন সে একটু আশ্বস্ত হ'ল, বললে, 'আমি বামুনের ছেলে। নবগোপাল চক্রবর্তী নাম।'

আমার কি খেয়াল চাপল মাথায়। ওরই পাশে ব'সে প'ড়ে বললুম, 'এ কাজের কী ফল তা তো দেখলে। এর ওপর পুলিশে দিলে না হোক ছ'মাস জেল দিত। এ পথে থাকলে মধ্যে মধ্যে ধরা পড়বেই। এসব ছেড়ে দাও।'

'তারপর, খাব কী?'

'ধরো, যদি কোনো কাজ দিই তোমাকে।'

ছেলেটা দার্শনিকের মতই হাসল। বললে, 'মজা মন্দ নয়। পথে পথে আমার বেশ বন্ধু জুটে যায়। কী কাজ দেবেন আমাকে?'

'ধরো, এখন আমার বাসাতে থাকবে। ফাইফরমাশ খাটবে, তারপর ফাঁক পেলে আমার অফিসে কোনো বেয়ারার কাজে টাজে ঢুকিয়ে দেব।...তা মাইনে টাইনে সব মিলিয়ে ভালোই পাবে। তারপর তোমার কপাল, যা পারো, তোমার পথ তুমি বেছে নেবে। লেখাপড়া শিখেছিলে কতদূর?'

একটু চুপ ক'রে থেকে যেন অন্যমনস্কভাবেই বললে 'ক্লাস এইট্ পর্যন্ত

উঠেছিলুম, কিন্তু সে তো চার বছরের কথা, সবই ভুলে গেছি। আঁক খুব ভালো কষতুম। আমার সঙ্গে কেউ পারত না।'

'চার বছর! তোমার বয়স কত?'

'তা আঠারো-উনিশ হ'ল।' তারপর বোধ হয় আমার চোখে বিস্ময় লক্ষ্য ক'রেই বললে, 'আমাকে দেখায় আরও ছোট—না? আমার বাড়টা একটু কম, কিন্তু বয়স হয়েছে।'

'তা হোক, তাহ'লে তাই ঠিক রইল। আমার সঙ্গে চলো—'

'এখনই? সতীশদের বলব না?'

'না, বললে কি আর তোমাকে তারা ছাড়বে! থাক—'

'কিন্তু না ব'লে গেলে কী ভাববে?'

'ভাববে পুলিশের হাতে পড়েছ। এ লাইনে তো এমন হামেশাই হয়।'

হা হা ক'রে হেসে উঠল নবগোপাল, বললে, 'তা মন্দ বলেন নি। হানিফ অমনি একবার ডুব মেরেছিল, সতে বললে, নিশ্চয় শালা ধরা পড়েছে।···চলুন—'

সহজভাবেই উঠে এল আমার সঙ্গে। কিন্তু হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত এসে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। প্রশ্ন করলুম, 'কী হ'ল?'

'নিয়ে তো যাচ্ছেন, বাড়িতে কী বলবেন? চোর শুনলে তাঁরা বাড়িতে ঠাঁই দেবেন? দিলেও ভয়ে ভয়ে থাকবেন সর্বদা। কী দরকার?'

আশ্বাস দিয়ে বললুম, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ভেতরে ঠিক আছ তো?'

একটু ভেবে বললে, 'বোধ হয় তো খাঁটিই থাকতে পারব। আসলে কি জানেন, আমার কাজটা খুব ভালো লাগে নি কখনও। বিশেষ সুবিধেও করতে পারি নি তাই। তিন মাসের মধ্যে কতবার যে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি তার ঠিক নেই।··তা চলুন, বরাত ঠুকে দেখা যাক।'

নবগোপালের আশঙ্কাটা খুব অমূলক নয়। গৃহিণী প্রথমটা খুবই বিদ্রোহ করলেন, 'জেনে শুনে তুমি একটা চোর এনে বাড়িতে ঢোকালে?'

গলায় জোর দিয়ে বললুম, 'না জেনে তো অনেকবার ঢুকিয়েছ, এবার না হয় জেনেই ঢোকালে। তবু সাবধানে থাকবে একটু!'

বললুম বটে, কিন্তু ক'দিন আমারও খুব অস্বস্তিতে কাটল। ঝোঁকের মাথায়

কাজটা ক'রে ফেলে একটু ভয়ে ভয়েই ছিলুম। বিশেষ ছেলেটাকে যেন চিনতে পারছিলুম না। সত্যিই কি এত সরল? না পাগল? কিংবা বদমাইশ? সরলতাটাই হয়তো ভান। বোকা পেয়ে সবটা বানিয়ে বললে!

আমার দ্বিধার ভাব যেতে দেরি হ'ল বটে, কিন্তু আমার গৃহিণীই সব-আগে গ'লে গেলেন। বাড়ির কাজও বিস্তর। ছেলেগুলোর পড়ার খুব ক্ষতি হ'ত আগে—আমারও সকালবেলাটা নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ থাকত না। শ্রীমান্ নবগোপাল যেন চার-চালের ভার তুলে নিলে মাথায়। বাজার করে, রেশন আনে, গম ভাঙ্গায়, ধোপার বাড়ি ছোটে, গয়লা এলে দাঁড়িয়ে দুধ দুইয়ে নেয়—উনুনে আঁচ দেয়, ভোরবেলায় উঠে চা করে। এমন কি ঝি না এলে নিজেই আমার গৃহিণীকে সরিয়ে বাসন মাজতে ব'সে যায়। বলে, 'আমার অভ্যেস্ আছে, আমার কাছে কতক্ষণ?'

আবার নিজেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলে, 'মামার বাড়ির কাজ সবগুলোই যেন ব'সে ছিল আমার জন্যে। তবে তফাতের মধ্যে মার খাওয়াটা নেই, আর খাওয়াটা পুরো মেলে। তার চেয়েও আরাম—ছেলে বইতে হয় না।'

আমার ছেলেমেয়েরাও ওর ভক্ত হয়ে পড়ল খুব। জমিয়ে গল্প বলতে পারে, ঘুড়ি তৈরি করতে অদ্বিতীয়, আর তাদের ফাইফরমাশ খাটে অম্লান বদনে, মায় জুতোগুলো পর্যন্ত বুরুশ ক'রে দেয়।

নবগোপাল মাঝে মাঝে আমাকে তাগাদা করে বটে, 'আমার চাকরির কদ্দূর কী হ'ল মেসোমশাই?' কিন্তু খুব যে তাড়া আছে ওর, তা মনে হয় না।

এরই মধ্যে আমার গৃহিণী একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবরটা দিলেন, 'ওগো শুনছ, আমাদের নবর সত্যিই অঙ্কে খুব মাথা।'

'কেন, কী ক'রে জানলে?'

'আমাদের ছোট খোকার মাথায় বুদ্ধির অঙ্ক কিছুতে ঢুকত না তো, মাস্টার-মশাই তো হিমশিম খেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। নবগোপাল তিন দিনে ওকে কেমন শিখিয়ে দিলে। এখন বেশ বুঝে গেছে।··· আহা ওকে আবার লেখাপড়া শেখালে হয় না?'

ইচ্ছে হ'ল কথাটা মনে করিয়ে দিই, এমন বিনা মাইনের চাকরটিকে স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করতে চাইছ কেন? লেখাপড়া শিখলে কি আর এইভাবে ও থাকবে? কিন্তু নিজে নিজেই লজ্জিত হলুম—আমার স্বার্থের জন্য ওর এত বড় ক্ষতি করি কেন? আর চিরদিনই কিছু এমনি পেট-ভাতায় আমার বাড়ি থাকবে

না—বয়স বাড়বে, নিজের সংসার পাতবার ইচ্ছে হবে, উন্নতির পথ খুঁজবে।

ওকে ডেকে বললুম,'তোমার মাসিমার ইচ্ছে তোমাকে আবার ইস্কুলে দেয়।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর—তবে সে নিমেষের জন্য। পরক্ষণেই ম্লানমুখে বললে, 'এই বুড়ো বয়সে গিয়ে ক্লাস এইট্-এ ঢুকব! বাকি ছেলেরা ঠাট্টা করবে!'

আমি বললুম, 'না না, তোমাকে দেখায় ঢের ছোট—আসল বয়স না বললে বুঝতেই পারবে না। বেশ মানিয়ে যাবে—'

শেষ পর্যন্ত সে আনন্দের সঙ্গেই রাজি হ'ল। তবে আমি তখনই তাকে ইস্কুলে ভর্তি করলুম না—বললুম, 'ক্লাস এইট্-এর বই তো বাড়িতেই আছে, দুপুরে একটু একটু প'ড়ে ঝালিয়ে নাও, আমি একেবারে ক্লাস নাইন্-এ ভর্তি ক'রে দেব!'

পড়ায় তার সত্যিই চাড় ছিল, মাস-তিনেকের মধ্যেই সে এমন তৈরি হয়ে গেল যে, অনায়াসে তাকে ক্লাস নাইন্-এ ভর্তি ক'রে দেওয়া গেল।

জুন মাসের শেষাশেষি আমার ভগ্নীপতির চিঠি পেলুম যে ভাগনী অমলা আই-এ পাস করেছে, তার ইচ্ছা বি-এ পড়ে, কিন্তু সেখানে আর পড়াবার উপায় নেই। এখন যদি আমি আমার বাড়িতে তার থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি তবেই তার বি-এ পড়া হয়।

সেই অমলা, একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফুর্তিবাজ একরত্তি মেয়ে, সে এরই মধ্যে আই-এ পাস ক'রে ফেললে!

কথাটা বেশ গর্বের সঙ্গে আলোচনা করলুম আমরা, রাত্রে খেতে ব'সে ছেলেদেরও বললুম।

নবগোপাল হঠাৎ খাওয়া বন্ধ ক'রে প্রশ্ন করলে, 'আপনার ভগ্নীদের দেশ কোথায় বললেন ?'

দেশের নাম বলতে আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে খেতে আরম্ভ করল।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'ওদের দেশের নাম জানতে চাইলে কেন নবু ?'

'না, এমনি।' তারপর একটু হেসে যেন ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বললে 'আমাদের পাশের বাড়িতে এক ভাড়াটে এসেছিল দিন-কতক, তাদের একটি মেয়ে ছিল—তারও নাম অমলা, প্রায় আমারই বয়সী হবে মেয়েটা—মধ্যে সে আমার কাছে আঁকও শিখেছিল ক'দিন—'

'তার দেশ কোথায় ?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'কে জানে! বলেছিল সে, ভুলে গেছি।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'কত বয়স হবে আপনার ভাগনীর ?'

ঐরকমই ওর কথাবার্তা, আদব-কায়দার ধার ধারে না সে মোটেই! মনে মনে হিসেব ক'রে নিয়ে বললুম, 'আঠারোর বেশি নয়।'

'দেখুন দেখি, আমার চেয়ে ছোট—বি-এ পড়বে। আর আমি—! যাক গে, কালই আমাদের হেড্ স্যার বলছিলেন বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার, কী বলেন, তাই ভেবেই আমার খুশী থাকা উচিত! নয় কি ?'

ভগ্নীপতিকে লিখে দিলুম যে, পাঠিয়েই দাও। যতদিন আমি আছি ভাগনীর লেখাপড়া হবে না, সে কী কথা! এধারেও কলেজে য়্যাড্মিশনের সব ব্যবস্থা ক'রে রাখলুম।

যেদিন আসবার কথা, তার আগের দিন এক চিঠি পেলুম দিদির অসুখ, অমলা সকালের ট্রেনে একাই রওনা হবে, আমি যেন তিনটের সময় নিশ্চয় স্টেশনে থাকি।

গেলুম যথাসময়ে। গাড়ি থেকে নেমে অমলা প্রণাম করল। দিব্যি ফুটফুটে হয়ে উঠেছে। সুন্দরী বলা চলে। আর বড়ও হয়ে পড়েছে ঢের। আগেকার মত আদুরেপনা নেই। বেশ একটি শান্ত সলজ্জ ভঙ্গি ওর কথাবার্তায়, চাল-চলনে। মোটের ওপর খুশীই হলুম।

বাড়িতে পৌঁছে প্রণামাদি সবে সারা হয়েছে এমন সময়ে নব এল ইস্কুল থেকে। সে অত লক্ষ্য করে নি, গৃহিণীই ডেকে বললেন, 'এই যে নব, আমার ভাগনী এসে গেছে।'

নব হাসি হাসি মুখেই এগোচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অমলাকে দেখে যেন পাথর হয়ে গেল। মনে হ'ল মুখের সব রক্ত নিমেষে স'রে গিয়ে কাগজের মত সাদা হয়ে উঠল।

অমলা কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারে নি। তারপরেই ওরও এক আশ্চর্য পরিবর্তন হ'ল। ওর সুন্দর মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। উজ্জ্বল গৌর বর্ণাভায় যেন কে মুঠো মুঠো আবীর দিলে ছড়িয়ে। সে সাগ্রহে দু'-পা এগিয়ে গিয়ে ব'লে উঠল, 'নবুদা তুমি ?'

আমরা তো অবাক্।

আমার স্ত্রী ব'লে উঠলেন, 'তুমি নবুকে চিনতে বুঝি অমলা ?'

কিন্তু তার আগেই আরও বেশি বিস্ময়ের কারণ ঘটল, নবগোপাল অকস্মাৎ ওর হাতের বই-খাতাগুলো ছুঁড়ে তক্তপোশের ওপর ফেলে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

'কী হ'ল, কী হ'ল—আরে—ও নবগোপাল।'

আমরা ডাকাডাকি করতে লাগলুম, ছেলেরা কেউ কেউ ছুটে গেল, কিন্তু ওকে আর ধরা গেল না।

'ব্যাপার কী অমলা ?' হতভম্বের মত প্রশ্ন করি।

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না ছোটমামা। বছর চার পাঁচ আগে একবার গরমের ছুটিতে কাকার বাসায় আসি, তখন কাকা বদলি হন নি, কলকাতাতেই থাকতেন—দর্জিপাড়ায়। তার পাশেই ছিল ওর মামার বাড়ি। দুই বাড়িতে খুব আসা-যাওয়া চলত, নবুদাও আসত। সেই সময়—মানে নবুদা খুব ভালো অঙ্ক বোঝাতে পারত, আমাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিত। ওর মামার বাড়িতে তখন ওকে বড় পীড়ন করত—সেই জন্মে কাকীমা ফাঁক পেলেই কিছু-না-কিছু খাইয়ে দিতেন ওকে। কিন্তু ওর আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল বড় বেশি—খেতে চাইত না সহজে। তারপর একদিন আমি কী কথায় ব'লে ফেলেছিলুম ডালমুট খাবার কথা, নবুদা বুঝি বাজারের পয়সা থেকে লুকিয়ে আমার জন্মে ডালমুট এনেছিল—সরল মানুষ কিনা, ধরা প'ড়ে গিয়ে কী মার খেলে! ওর মামা আমাকেও শুনিয়ে শুনিয়ে কতকগুলো বিশ্রী কথা বললে। সেই থেকে ওর আসা বন্ধ হ'ল আমাদের বাড়ি।...তারপর যখন বাড়ি ফিরি —'

এই পর্যন্ত ব'লে অমলা থেমে গেল। কিন্তু আমার গল্প-লেখকের মন ততক্ষণ গল্পের আভাসে জমে উঠেছে, বললুম, 'যখন বাড়ি ফেরো তখন কী ?

আরও লাল হ'য়ে উঠে অমলা বললে, 'তখন ওকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলুম, লুকিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল দেখা করতে। বলেছিলুম চিঠি দিও, তা বেচারী করুণ মুখে বলেছিল, খাম-পোস্টকার্ড কেনবার পয়সা কোথায় পাব ভাই, তাছাড়া তোমার চিঠি যদি মামার হাতে পড়ে—তোমাকে আবার খারাপ কিছু বলে! থাক্‌গে!...তারপর আর কোনো খবর পাই নি। ম্যাট্রিক পাস করার পর ওর মামার ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়েছিলুম আন্দাজে আন্দাজে—তারও জবাব পাই নি!'

বললুম, 'সে চিঠি নিশ্চয় ওর হাতে পৌঁছয় নি। তাই তো, ছোকরা গেল কোথায়!'

অমলা বললে, 'কিন্তু আমাকে দেখে অমন ক'রে পালাল কেন ছোটমামা ?'

সংক্ষেপে সব বললুম। অমলার মুখ বেদনায় ম্লান হয়ে উঠল, অনেকক্ষণ পরে শুধু বললে, 'আহা বেচারী !'

সেদিন আর নবগোপাল ফিরল না। পরের দিনও না। আর কোনোদিনই না। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলুম, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম, কোনো খবরই পাওয়া গেল না। হঠাৎ এসেছিল, হঠাৎই আবার চ'লে গেল।

অমলা এই ক'দিনে যেন আধখানা হয়ে গেছে। আরও তার পীড়াপীড়িতেই বেশী খোঁজ করতে হ'ল। সে কেবলই বলে, 'আমার জন্যেই এই কাণ্ডটি হ'ল, —হায় হায়, কেন এলুম, হয়তো ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল !'

অনেকদিন পরে জ্বরভাব হওয়ায় আমি বিছানায় শুয়ে আছি, অমলা এসে কাছে বসল।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পায়ে হাত বুলোবার পর সহসা প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা আমাকেই ওর এত লজ্জা করল কেন মামা ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তোমার মনকেই জিজ্ঞাসা করো মা, জবাব পাবে। আয়নাতে আজ কালের মধ্যে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ?'

ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে ওর মুখের চেহারাটা ঠিক ঠাওর হ'ল না—শুধু একটু পরে দু'-ফোঁটা গরম জল আমার পায়ের উপর পড়ায় বুঝলুম উত্তরটা ও বুঝেছে।

## সামান্য পথ

সমস্তক্ষণই জেগে জেগে বই পড়েছি, হাতে ছিল বিলিতী ভুতের গল্প—ঘুম পাবার কথাও নয়, তবু বোধ করি দৈবের ষড়যন্ত্রেই, একেবারে শেষমুহূর্তে কখন চোখ দুটি বুজে এসেছে—কিছুই টের পাই নি। আর অতক্ষণ পরের প্রথম তন্দ্রা ব'লেই হয়তো—এমন গভীরভাবে ঘুমিয়েছি যে, জংশন-স্টেশনের গোল-মালেও ঘুম ভাঙ্গে নি। একেবারে যখন চমক ভাঙ্গল তখন পরের স্টেশন থেকেও ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা করলাম একটি সহযাত্রীকে,'কী স্টেশন এটা ?'

নাম বলতেও বুঝতে পারলাম না।

'জংশনের আর কত দেরি ?'

'জক্‌শ্যন্ ? উ তো কব্ চলা গিয়া।'

সর্বনাশ ! হুইস্‌ল্ দিয়েছে গার্ড, গাড়িও চলতে শুরু করেছে। ভাগ্যিস ছোট একটি য়্যাটাচিকেস্ ছাড়া আর কিছু ছিল না সঙ্গে—কোনোমতে ঘুম-চোখেই চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম।

যাক বাবা—ভাগ্যিস হাত-পা ভাঙ্গে নি।

কিন্তু এ কোথায় এলাম ! একেবারে ছোট্ট নগণ্য স্টেশন। জনপ্রাণী নজরে পড়ে না। আর তেমনি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। একটা কেরোসিনের আলোও কি কোথাও জ্বালতে নেই !

ততক্ষণে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে ভালোমতই। তাকিয়ে দেখলাম টিকিটঘরের খুপরি থেকে একটা আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে বটে। তবু ভালো, ওখানে অন্তত গাড়ি-টাড়িগুলোর হদিস মিলবে।

নক্ষত্রের আলোতে চোখ তখনও অভ্যস্ত হয় নি, কোনোমতে অন্ধকারে হোঁচট্ খেতে খেতে সেই মাটির-সঙ্গে-মিশে-থাকা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে তো স্টেশন ঘরের কাছে এলাম—কিন্তু ও হরি, একি ! দোরে যে চাবি দেওয়া ! টিকিটের খুপরি দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ঘরে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে বটে—যৎপরোনাস্তি কমানো আছে পল্‌তেটা, কিন্তু মানুষের কোনো পাত্তা নেই। গাড়ি আসার সময়ও মাস্টারবাবু ছিলেন কিনা সন্দেহ ! গার্ডের সঙ্গে অনেক সময় বন্দোবস্ত থাকে এসব ফ্ল্যাগ-স্টেশনে, গার্ডই গাড়ি ছেড়ে দেন নিজের দায়িত্বে—আর তিনি থাকলেও গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স'রে পড়েছেন।

তাই তো, এখন উপায় !

কোয়ার্টার একটা আছে একটু দূরে, কিন্তু সেখানেও তো আলো নেই। মাস্টারবাবু ( উনিই বোধহয় টিকিটবাবু—এক এবং অদ্বিতীয় ) ওখানে থাকেন কিনা কে জানে—হয়তো এই গ্রামেই বাড়ি, রাত্রে বাড়িতে চ'লে যান। সাধারণত স্টেশনের পাশে দু-একটা খাবারের দোকান থাকে, 'দুধ দহি'র দোকান তো এখানে অনিবার্য—কিন্তু আমারই অদৃষ্টক্রমে বোধ হয়, এখানে সে রকম কিছুই দেখলাম না।

উত্তর-প্রদেশের এই উত্তর দিকটায় আমি কখনও আসি নি এর আগে।

এখানকার পথঘাট ট্রেন-বাস সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। এক্ষেত্রে কী করা উচিত! কাছাকাছি কোনো গ্রাম থাকলেও না হয় গিয়ে রাতটার মত আশ্রয় নেওয়া যেত কোনো গৃহস্থের বাড়ি। তাও ডাকাত মনে ক'রে আশ্রয় দিত কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক—গ্রামও তো দেখা যায় না।··হয়তো আশে-পাশেই কোথাও আছে, কিন্তু এমনই অন্ধকার যে, মাঠে বনে গ্রামে সব একাকার হয়ে গেছে, বোঝবার কোনো উপায়ই নেই।

অগত্যা এই প্ল্যাটফর্মেই ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম। যা নির্জন চারিদিকে—ভয় হ'তে লাগল—বাঘটাঘ নেই তো? হায়েনা বা নেকড়ে থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। তাছাড়া বসিই বা কোথায়? না আছে একটা বেঞ্চ, না আছে কিছু! স্টেশন-ঘরের যদি একটা বাঁধানো সিঁড়ি থাকত তো না হয় সেইখানেই বসতাম, তাও যে নেই।

ইতস্তত করছি, এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে সহসা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপ কাঁহা জাইয়েগা বাবু?'

যেন মনে হ'ল চারিদিকের অন্ধ আকাশই কথা কয়ে উঠল।

চম্‌কে. প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলাম, 'কে—কে—কৌন হ্যায়?'

এইবার লোকটিকে দেখা গেল। যদি বলি সেই তমিস্রঘন মহাশূন্য থেকেই লোকটি ছায়ামূর্তি পরিগ্রহ ক'রে প্রকট হ'ল—তাহ'লেও খুব ভুল বলা হয় না; এমনিই আকস্মিক আবির্ভাব সে লোকটির।

মিশকালো রং, রেল-কোম্পানির একটি নীল্‌চে-কালো রঙের কোট গায়ে, পরনের ধুতিটাও বোধ হ'ল রঙিন—বড় বড় চুল এবং ঘন চাপ গোঁফ-দাড়ি; অথচ বৃদ্ধ নয়—মনে হ'ল মানসিকের চুল-দাড়ি। সেই রকমই অযত্ন-বর্ধিত—এলোমেলা।

এতই কালো যে, সেই অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের আলোতে চোখটা সয়ে এলেও, তার মুখচোখ কিছুই ঠাওর হ'ল না। শুধু কপালে বোধ হয় একটা সাদা চন্দনের ফোঁটা ছিল—আর কথা কইবার সময় সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত মাত্র দেখা গেল।

সে লোকটি দু'-হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে, 'হম্ পোর্টার হ্যায় বাবু!'

'পোর্টার হ্যায়! কাঁহা গিয়া থা—একো আদমিকা পাত্তা নেহি মিলতা!' কিছুক্ষণ পূর্বের আতঙ্কের সঙ্গে রাগ মিশে দস্তুরমত উষ্ণ হয়ে উঠেছি—প্রায় খিঁচিয়ে উঠলাম।

সে তখন পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে জবাব দিলে যে, সে গ্রামে তার ভাতিজার বাড়ি খেতে গিয়েছিল। তাছাড়া এখন তার ডিউটি নেই।

কতকটা শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'বাপু এখান থেকে জংশন কতদূর হবে?'

'জক্শন্? ' সে মনে মনে হিসেব ক'রে বললে, 'কম্-সে-কম্ সাত-আঠ মিল হোগা বাবুসাব!'

সাত-আট মাইল! দমে গেলাম।

'তা বাপু যাবার গাড়ি ক'টায়?'

'গাড়ি এখন কোথায় বাবু—সেই ভোর চারটায়।'

সর্বনাশ! আমি ওখান থেকে বড় লাইনের যে গাড়ি ধরব সে যে রাত তিনটেয়। এ গাড়ি না পেলে কাল বিকেল পর্যন্ত ব'সে থাকতে হবে।

ঘড়িটা দেখবার চেষ্টা করলাম। পকেটে একটা দেশলাইও নেই। টর্চটা ভেঙে গেছে সেদিন পকেট থেকে প'ড়ে গিয়ে, আর কেনা হয় নি। নক্ষত্রের আলোয় দেখা কি যাবে? ভাগ্যিস আধুনিক বাহারী ঘড়ি নয়—

যতদূর দৃষ্টি গেল—বোধ হয় রাত দশটা হবে। এখন থেকে চুপ ক'রে ব'সে থাকব? সাত-আট মাইল বলেছে—মনে মনে হিসাব করলাম—হয়তো দশমাইল হবে। এদেশের ডালভাঙা ক্রোশ। তাহ'লেও হেঁটে যেতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। অর্থাৎ, রাত একটার মধ্যে জংশনে পৌঁছে যাব। মিছিমিছি চব্বিশ ঘণ্টা মাটি করব!

না। সেই ভালো। এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে জবুথবু হয়ে সারারাত ব'সে থাকা কিছু নয়। তখন আমার জোয়ান বয়স—নিষ্ক্রিয়তাই সবচেয়ে খারাপ লাগত।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লাইন ধ'রে যেতে হবে, না, অন্য রাস্তা আছে? বাঘটাঘের ভয় নেই তো বাপু? কিংবা ডাকাত?'

সে-ই একটু চিন্তা ক'রে জানালে যে, সে যতদূর জানে শেরটেরের ভয় নেই। ডাকুর কথাও তো শোনে নি।...কিন্তু আর একটা পথ আছে এই কোনাকুনি মাঠের মধ্যে দিয়ে, সে পথ দিয়ে যদি যেতে পারি তো রাস্তা প্রায় আধা কমে যাবে!

বিলক্ষণ, তাহ'লে তো বেঁচে যাই। ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক হাঁটা কিছুই নয়।

'তাহ'লে ঐ পথেই যাব।' যতদূর জানা ছিল হিন্দীতে উত্তর দিলাম, 'তা

বাপু যদি-যেতে-পারি বলছ কেন ? অসুবিধাটা কী ?'

'না, তেমন কিছু নয়। ঐ যে মাঠটা দেখছেন, ঐ মাঠের শেষে একটা জঙ্গল পড়ে। পথ আছে—কিন্তু সে ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই পথ। এমন কিছু লম্বা জঙ্গলও নয়—বড় জোর আধা 'মিল' হবে। জঙ্গল পেরিয়ে আবার একটা মাঠ আছে এমনি, তারপর জক্‌শ্যন্‌।'

'তা জঙ্গলে ভয়টয় কিছু আছে নাকি ?'

'না। তেমন কিছু নয়। থোড়া জঙ্গল। শেরটের কিছু নেই।'

'তবে ভয়টা কিসের ? ভূতের ?'

'সীতারাম বাবু। ভূত কোথায় ?'

তখন একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলি, 'তবে ব্যাপারটা কী, খুলেই বল না বাপু। কেবলই তো বলছ তেমন কিছু নয় ?'

'না। কী জানেন—বান্দরের বড় উপদ্রব বাবু! তাই বলছিলুম যে ওপথে যাবেন, না সিধা লাইন ধরবেন ?'

বানর!

হে ভগবান! লোকটা কি পাগল নাকি ? আরে, এই উত্তর অঞ্চলে বানর নেই কোথায় ?

খুব জোরেই হেসে উঠলাম।

'বানরের ভয়! বানর আমার কী করবে ? ব্যাগটা কেড়ে নেবে ? তা বোধ হয় পারবে না। না হয় একটা গাছের ডাল-টাল ভেঙে নিচ্ছি।'

লোকটা যেন চটেই গেল একটু—'আপনি বান্দরকে অত উড়িয়ে দেবেন না বাবু। লঙ্কার রাজা দশানন বান্দরকে গ্রাহ্য করে নি, কারণ কী, সে বান্দর ধ'রে খেত—সেই বান্দরের কাছেই হেরে গেল। মারাও গেল ধরতে পারেন—বান্দরের সাহায্য না পেলে কি রামচন্দ্রজী ওদের মারতে পারতেন ?'

'না না। অগ্রাহ্য করব কেন ?' সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'তাছাড়া আমি তো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না, ওদের সঙ্গে কোনো শত্রুতাও নেই। আমি যাব আমার পথে, ওদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কি ?'

আর বাদানুবাদের অবসর দিলাম না।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে স্টেশন পেরিয়ে সেই পায়ে-চলা পথটা ধ'রেই রওনা হলাম। এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে চারদিক। যে দিকটা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা ভুল হবার নয়—দিক্‌চক্ররেখায় বনের কালো ছায়াটাও দেখতে

পাচ্ছি। বেশ হন্ হন্ ক'রেই হাঁটতে লাগলাম। যখন অত বানর আছে বনে—তখন বাঘ নেই এটা ঠিক। বাঘ বা ঐ জাতীয় কোনো হিংস্র জন্তু থাকলে অত বানর থাকতে পারত না।

যখন আমি রওনা হই, সে পোর্টারটিকে তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম সেইখানেই। খানিক পরে যখন ফিরে তাকালাম—তার আর চিহ্নও নেই। যেমন বাতাস থেকে ফুটে উঠেছিল তেমনি যেন বাতাসেই মিলিয়ে গেল।

গাছের ডাল ভেঙ্গে নেওয়া হয়ে ওঠে নি—কারণ, পথে কোনো গাছই পাই নি। ফসল উঠে-যাওয়া রিক্ত মাঠ ধু ধু করছে, ঘাস পর্যন্ত বিরল সেখানে। জঙ্গলে ঢোকবার ঠিক মুখে গোটা কতক বড় বড় মাটির ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরলাম। এখানকার মাটি প্রায় পাথরের মতই শক্ত, গায়ে লাগলে আঘাত পাবে যে-কেউ। যদি সত্যিই রামচন্দ্রের অনুচররা খুব জ্বালাতন করে তো দু-একটা ছুঁড়ে এবং বাকি ছোঁড়বার ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে।

জঙ্গল এমন কিছু ঘন নয়। বাব্‌লা গাছই বেশি, দু-একটা অন্য কি গাছ আছে। আমগাছও আছে কিছু কিছু—মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় অনেক-গুলো ক'রে। সেই সব 'পকেট'-গুলো কিছু বেশি অন্ধকার, নইলে অন্য জায়গায় রাস্তা ও তার দু'পাশ বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছিল। এদেশের জঙ্গলে নিচে আগাছা থাকে না ব'লে খুব ঘন জঙ্গলকেও যথেষ্ট বনময় ব'লে বোধ হয় না।

অনেকখানি এগিয়ে গেলাম।···বেশ হন্ হন্ ক'রেই চলেছি, কারণ, জঙ্গলটা যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। কতক্ষণই বা লাগবে, পাঁচ সাত মিনিট—বড় জোর দশ।

কিন্তু বানর কোথায় ?

একটা কোনো প্রাণীরও তো চিহ্ন দেখছি না। লোকটা খামকা ভয় দেখিয়েছে। বানর যতটা থাকা উচিত এদেশের গাছপালায়—ততটাও নেই। থাকলেও তারা ঘুমচ্ছে। মনে মনে রাগ হ'ল লোকটার ওপর। আর একটু হ'লেই ভোগাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারলাম যে হঠাৎ এই 'শর্টকাট'টার কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের মনে অপর মানুষকে ভোগাবার যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকে সেই প্রবৃত্তি ওকে ধিক্কার দিয়ে ওঠায় এই 'কিন্তু'র জেরটা টেনেছিল।

বদমাইশ পাজী কোথাকার !

আর একটু হ'লেই আরও মাইল পাঁচেকের ফেরে ফেলেছিল লোকটা!

কিন্তু এই সব কথা যখন ভাবছি তখনও চলছি সমানেই—এটা ঠিক। আন্দাজে মনে হ'ল মিনিট দশেক কেটে গেছে বহুক্ষণ। যে 'রেট'-এ হাঁটছি, দশ মিনিটে আধ মাইল কেন—এক মাইলই পার হয়ে যাবার কথা। কত গজে মাইল হয় এদের! এ দেখছি সেই ডালভাঙা ক্রোশের প্যাঁচেই পড়েছি।

তবে—ভরসার মধ্যে এখনও আমার ক্লান্তি আসে নি একটুও। বেশ অনায়াসেই চলেছি। সেই জন্য মনে অসন্তোষও জমে নি। কতটাই বা হবে—এখনই পেরিয়ে চ'লে যাব।

কিন্তু আরও অনেকক্ষণ হাঁটলাম। অন্তত আরও মিনিট দশেক। কই বনের শেষ কোথায়? দূর মাঠের আলোও তো দেখা যায় না!

আরও পাঁচ মিনিট।

না, এইবার হাঁপিয়ে গিয়েছি। ধূমপানের অভ্যাস নেই, নইলে অনেক আগেই হাঁপিয়ে পড়তাম।...থম্‌কে দাঁড়ালাম একটু। ঘড়িটা দেখবার চেষ্টা করলাম—এত আলো নেই যে, ভালো বোঝা যায়। তবু মনে হ'ল এগারোটা বেজে গেছে বহুক্ষণ। তার মানে অনেক হেঁটেছি। একটু কোথাও বসতে পারলে হ'ত, গাছতলায় বসব নাকি?...কেমন একটু যেন ভয় ভয়ও করে। যা নিস্তব্ধ থম্‌থমে বন!...

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার ফিরে তাকালাম।

পিছনের মাঠও যে কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিছুমাত্র আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক কোন্ দিকে স্টেশন বা মাঠটা ছিল। চারদিকে শুধু নিবিড় ঘন বন—প্রাণ-স্পন্দন-হীন—নিস্তব্ধ!

এই বার ধীরে ধীরে একটা সংশয় এবং আতঙ্ক মনে দেখা দিল। পথ গুলিয়ে ফেলি নি তো? হয়তো কোনো চক্রপথে অবিরাম ঘুরছি, তাই বন আর শেষ হচ্ছে না।

সর্বনাশ! গোলক-ধাঁধায় পড়লাম নাকি!

লোকজনের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই যে, চিৎকার ক'রে ডাকলে কেউ এসে উদ্ধার করবে। দিনের আলো না ফুটলে কোনো উপায়ই হবে না। তাও কি হবে!

ভয়ে হতাশায় হাত-পা যেন ভেঙ্গে এল। ডাক ছেড়ে খানিকটা কাঁদতে পারলে খুশী হতাম।

আচ্ছা—পথ ভুলই বা হবে কী ক'রে ? যতদূর মনে পড়ছে মাঠ ছেড়ে বনে ঢুকে এই একটি পথই দেখেছি, ডাইনে বাঁয়ে আর কোনোদিকে হেলেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না। আর কোনো পথও তো ছিল না। তখন যেন মনে হচ্ছিল সোজা বনটাকে দ্বিধা-বিদীর্ণ ক'রে রাস্তাটা চ'লে গেছে।

তবে ?

এই সময় একটা সিগারেট কি অন্তত খানিকটা নস্যির অভাব বেশি রকম অনুভব করতে লাগলাম। একটা কিছু নেশা করতে পারলেও খানিকটা আশ্বাস পেতাম।

বসব নাকি ? আর যে দাঁড়াতে পারছি না।

বসাই যাক। চেয়ে দেখলাম একটা আম-গাছের নিচেই দাঁড়িয়ে আছি। যাক কাঁটাগাছ তো নয়—বেশ আরাম ক'রে ঠেস দিয়েই বসলাম।

কী অন্যায়ই করা গেছে—ঐ সামান্য একটু তন্দ্রার খেসারত যে এতখানি দিতে হবে তা কে জানত! নিদেন স্টেশনে ব'সে থাকলেও হ'ত, ভোরের গাড়িতেই চ'লে যেতাম। তবু সে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের জগৎ—এমন ভয়াবহ নির্জন বন নয়।

কী বিপদে পড়লাম এবং কেমন ক'রে এ থেকে অব্যাহতি পাব ভাবছি—বেশ একটু ব্যাকুল ভাবেই—তাই হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তবে ঘুমুই নি এটা ঠিক, চোখও বুজি নি। কিন্তু, হঠাৎ যেমন খেয়াল হ'ল যে এবার ওঠা দরকার, এর পর ব'সে থাকলে ঘুমিয়েই পড়ব, তাছাড়া এই গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরোবার চেষ্টা করা উচিত আর একবার—মুখ তুলে চারদিকে তাকিয়ে—চমকে শিউরে উঠলুম।

একি!

আমার চারদিকে, আমাকে ঘিরে—বহু দূর দুরান্তর পর্যন্ত যেখানে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, যতটা দৃষ্টি যায়—শত শত, সহস্র সহস্র—হয়তো লক্ষ লক্ষ বানর! নিঃশব্দে স্থির হয়ে ব'সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তাকিয়ে আছে কিনা তা অবশ্য ঠিক দেখি নি, কিন্তু কেমন যেন আমার মনে হ'ল সেই মুহূর্তে—এরা আমার দিকে তাকিয়েই আছে!

একি, আমি চোখে ভুল দেখছি না তো ?

এ কি মায়া ? আমার আতঙ্ক-কল্পনা ?

ভালো ক'রে চোখ মেলে চাইলাম—যতটা সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে। না—ভুল

নয়। চিমটি কাটলাম নিজের পায়ে খুব জোরে—না, সমস্ত অনুভূতিই ঠিক আছে। ঐ তো একটার গা ঘেঁষে একটা—পর পর যেন নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র বূ্যহ রচনা ক'রে ব'সে আছে। একেবারে নিঃশব্দে—

কখন এল ওরা?

কোথা দিয়ে এল?

একটা গাছের ডাল নড়ার শব্দও তো পাই নি, পাই নি 'ধুপ্' ক'রে মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ। অথচ এত কাছে—ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনেও খুব সম্ভব, এক বিঘৎ নড়লেই গায়ে গা ঠেকবে।

কি বিপদ! এদের মতলব কী?

কামড়াবে নাকি? এতগুলো বানর—ইচ্ছে করলে নিমেষে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিতে পারে। ভয়ে যেন বিবশ হয়ে এল স্নায়ু—হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

আর অমন নিশ্চল হয়েই বা ব'সে আছে কেন? আর নিঃশব্দে একটু নড়লে চড়লে কি একটু কিচ্‌কিচ্ করলেও তো বাঁচতাম।

একটা অজানা ভয় যেন মৃত্যু-শীতল হিমস্পর্শ নিয়ে মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেল।

কী করব? কী করা উচিত?

এমন ক'রে ব'সে থাকলে পাগল হয়ে যাব যে!

হা-হা ক'রে হেসে উঠলাম। যেন কতকটা নিজের মনে সাহস আনবার জন্যই। তাছাড়া ওদের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও দেখা বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল।

কিছুই হ'ল না কিন্তু। তেমনি নিশ্চল স্থির হয়ে ব'সে আছে। তেমনি একদৃষ্টে চেয়ে।

আচ্ছা ওগুলো পাথরের নয়তো? কিংবা মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে যেমন—অসংখ্য হরিণ—তেমনি কিছু নয়?

এগিয়ে যাব নাকি? ঠেলে পথ ক'রে নিলে কি হয় ওদের মধ্য দিয়ে?

অসীম সাহসে ভর ক'রে প্রাণপণ চেষ্টায় একবার মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম সামনের বানরটার কাছে। না, পাথরের তো নয়, ঐ তো চোখ পিট্‌পিট্ করছে। তবু নিশ্বাসের শব্দ হয় না কেন? এতগুলো প্রাণীর নিশ্বাসের আওয়াজও তো কম হবে না।

না—যেতেই হবে আমাকে। আমি বিংশ-শতাব্দীর সভ্য মানুষ, বুনো বানরকে ভয় করব?

উঠে দাঁড়ালাম

সে যে কী সাধনা, ঐটুকু দেহ নাড়বার জন্যে! কী চেষ্টায় যে সেটা সম্ভব হ'ল তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। শুধু আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুতে নড়াতে পারত না তখন, ভয় এমনই পেয়ে বসেছে আমাকে! উঠে দাঁড়াতে আরও অনেকখানি দৃষ্টিগোচর হ'ল। সর্বত্রই ঐ এক। কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নেই। প্রায় একই আকারের গোদা গোদা রূপী বানর। একটার গায়ে গা ঠেসিয়ে আর একটা।

এত বানর পৃথিবীতে আছে?

এগোবার চেষ্টা করলাম। একটা পা ফেললামও, কিন্তু ওরা তেমনি নিশ্চল! এমন শান্ত নিস্পন্দ বিরোধিতা এর আগে আর কোথাও দেখি নি।

ঠিক ওদের গায়ে পা ঠেকাতে ভরসায় কুলোল না কিছুতেই। অথচ,—অথচ এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব কী ক'রে?

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা হ'ল। লোকটার কথা শুনলে কী ক্ষতি হ'ত আমার! এই দেশেরই লোক, সব জানে শোনে!

'হেই! এই যাঃ! হট্।'

মুখে গরু তাড়াবার মত শব্দ করলাম। ফল পূর্ববৎ! মনে পড়ল পকেটের মাটির ডেলার কথা। দু-একটা ছুঁড়ব নাকি? যদি রেগে সবাই মিলে আক্রমণ করে?

করুক। না হয় মরেই যাব। কিন্তু এ অবস্থা যে অসহ্য।

ছুঁড়লাম একটা মাটির ডেলা। আর একটা। যে ক'টা ছিল পাগলের মত নিঃশেষ করলাম। পাগল হয়েই উঠেছিলাম বোধ হয়। কিন্তু কিছুই হ'ল না—এমন কি ঢিলগুলো গায়ে লাগার মত শব্দও হ'ল না। আর ওরাও নির্বিকার!

আচ্ছা—ভূত নয় তো? ভূতে ভয় দেখাচ্ছে না?

রাম-নাম করব?

'রাম, রাম, রাম।' বার কতক রাম-নামই করলাম, বেশ চেঁচিয়ে।

এইবার ফল একটা ফলল। তবে যা আশা করেছিলাম তার বিপরীত।

হঠাৎ মনে হ'ল সেই বানরবাহিনী—বাহিনী না ব'লে বোধ হয় কটক বলাই উচিত—সেই লক্ষ লক্ষ বানর এক সঙ্গে হেসে উঠল। নিঃশব্দ হাসি—মানুষের মত। হয়তো তখন ভুল দেখেছি, কিন্তু নিশ্চিত মনে হ'ল—ওদের সেই কোটি

কোটি ঈষৎ হল্‌দে দাঁত আধো-অন্ধকারে আমার দিকে চেয়ে বিকশিত হয়েছে এবং ওদের স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি বিদ্রূপ আর উপেক্ষার হাসি হাসছে। কিন্তু নড়ে নি কেউ, সংখ্যাও কমে নি—বরং মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই তারা বাড়ছে।

চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম প্রাণপণে—এইটুকু শুধু মনে আছে। আর কিছু মনে নেই।

যখন আবার অনুভূতি ফিরল তখন দেখলাম একটা মাঠেই শুয়ে আছি। দূরে গ্রাম, রেলের লাইন, সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় ঐ সেই জংশন।

খানিকটা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম জ্ঞান আমার এমনি হয় নি। দুটি হিন্দুস্থানী লোক লোটা হাতে দাঁড়িয়ে, আমার মুখে মাথায় জল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম অনেক পিছনে সেই বনের রেখা।

'বাবুজী এখন কেমন বোধ করছেন ?'

সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী—তবু কী স্নেহ ও উদ্বেগ তাদের কণ্ঠে। মনে হ'ল প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

ঘাড় নেড়ে জানালাম, ভালো বোধ করছি। উঠে দাঁড়ালামও। ঐ যে য়্যাটাচিকেস্‌টাও প'ড়ে আছে দেখছি।

'কেমন ক'রে এমন হ'ল বাবুজী ? এখানে এলেন কোথা থেকে ? বাড়ি কোথায় ? মূর্ছার অসুখ আছে নাকি ?' ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন। এ কৌতূহল স্বাভাবিক। রাগ হ'লেও মনকে যুক্তি দিয়ে সে রাগ দমন করলাম। সংক্ষেপে বললাম সব কথা।

বৃদ্ধটি যেন শিউরে উঠল, 'বাবুজী, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে আপনি এসেছেন ? কী সর্বনাশ !'

'কেন বলো তো ? কী আছে ও বনে ?'

'মাফ কিজিয়েগা বাবু !' বুড়ো আর দাঁড়াল না, দু'হাত তুলে, বোধ করি কোনো দেবতার উদ্দেশে—হয়তো বা ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যেই, প্রণাম জানাল—তারপর দ্রুত গ্রামের পথ ধরল।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স যেটির, স্টেশনটা দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ওহি জকশ্যন্‌ হ্যায়, চলে যাইয়ে।"

সেও দ্রুত বৃদ্ধের পশ্চাদ্ধাবন করলে। এত তাড়াতাড়ি চ'লে গেল ওরা যে কিছুতেই আমি এই দুর্বল শরীরে ওদের ধরতে পারলাম না।

অগত্যা স্খলিত দুর্বল পদে জংশনের পথই ধরলাম। রহস্যটা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেল আমার কাছে। জংশনেও দু'-একজনকে প্রশ্ন করেছি, কেউ বিস্মিত হয়েছে, কেউ নিরুত্তরে হাত তুলে প্রণাম ক'রে ওদেরই মত স'রে পড়েছে।

## একটি গল্প

আমাদের পাশের দোতলা বড় বাড়িটা যে কোনো কালে ভাড়া হবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, প্রথমত বাড়িটা প্রকাণ্ড—দ্বিতীয়ত, যেমন অন্ধকার তেমনি হাওয়া-বাতাসহীন। যিনি প্ল্যান করেছিলেন তাঁর ঘরের সংখ্যার দিকেই দৃষ্টি ছিল, আলো-বাতাস নিয়ে তত মাথা ঘামান নি।

সুতরাং, অকস্মাৎ বাড়িটায় মিস্ত্রী লাগতে দেখে কৌতূহল হ'ল—দু' পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, পাড়ার ডাক্তার ভূপতি রায় স্বয়ং দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটাচ্ছেন।

'ব্যাপার কী ডাক্তারবাবু, বাড়িটা কিনলেন নাকি?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি। খোঁচাও ছিল একটু। ভূপতিবাবু যদিচ অনেক দিন বসেছেন এখানে—খুব পশার জমেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

'না ভাই—সে বরাত কি করেছি। ভাড়া নিলুম।'

'ভাড়া? এত বড় বাড়ি—?'

'হ্যাঁ! শ্বশুরমশাই এসেছেন যে বর্মা থেকে। ভাগ্যিস্ উনি আগেই জাহাজ পেয়েছিলেন—এখন তো বোমার হিড়িক, বুঝতেই পারছেন—আসা সম্ভব হ'ত না। উনি যেন আগে থাকতে জানতে পেরেই রিটায়ার করেছিলেন।'

'তাহ'লে তো বেশ কিছু দিন হ'ল এসেছেন। এতদিন ছিলেন কোথায়?'

'ছিলেন প্রথম একটা হোটেলে—তখনও মালপত্র সব এসে পৌঁছয় নি। একরাশ টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে হোটেলে রইলেন সাত মাস, তারপর সাহেবপাড়ায় বাড়ি নিয়েছিলেন, এখন কলকাতাতেও যা ঘন ঘন সাইরেন বাজছে, আর থাকতে সাহস হচ্ছে না, এইবার নজর পড়েছে শহরতলীর দিকে। বুঝলেন না?'

বুঝলুম বৈকি! ওঁর শ্বশুর প্রকাণ্ড বড়লোক, রায়বাহাদুর খেতাব আছে। ওখানে তিন চারটে বিলিতী ফার্মের ডাক্তার ছিলেন—সব জড়িয়ে মাইনে

পেতেন প্রায় আড়াই হাজার টাকা। এ ছাড়া একটা ডিস্‌পেনসারীও ছিল—তাতে ওষুধ বেচেও অনেক টাকা পেতেন। কাঠের কারবারও নাকি ছিল কিছু। এ সব কথা আমরা ডাক্তারবাবুর কাছেই বহু বার শুনেছি, যেটা ওঁর মুখে শুনি নি—অন্যত্র, অর্থাৎ মেয়ে-মহলে শুনেছি, সেটা হচ্ছে এই যে, ভদ্রলোকের দুটি পরিবার—ছেলেবেলায় বিয়ে-করা বাঙালী স্ত্রী ছাড়াও একটি বার্মিজ গৃহিণী ছিল, তাঁরই সাহায্যে ওখানে অত কাজকারবার জমাতে পেরেছিলেন। তাঁরই জন্য বাংলাদেশে ফেরবার ইচ্ছা থাকলেও এতদিন আসতে পারেন নি। এখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঠিক সময় বুঝে গত হয়েছেন, ফলে যুদ্ধের হিড়িক আসবার আগেই কারবার সব বিক্রি ক'রে জাল গুটিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এখানে ফিরতে পেরেছেন এবং এখানেও একটা দুটো বিলিতী ফার্মে রেঙ্গুনের নজির দেখিয়ে কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

'এত বড় বাড়ি তাঁর লাগবে?' একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করি।

'না। মানে, আমিও এসে থাকব কিনা!···রায়বাহাদুরের বড় ইচ্ছা। বিশেষ ক'রে আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ বিষম জেদ করছেন।'

'ঘরজামাই?' একটু হেসে প্রশ্ন করি।

'বাই নো মিন্‌স্। আমি আমার সেপারেট এস্টাব্লিশমেণ্ট্ মেন্‌টেন করব। শুধু একত্র থাকা, এই যা—এত বড় বাড়ি, ঘরের তো অভাব নেই। তবে হয়তো বাড়িভাড়াটা লাগবে না আমার।'

আরও অনেক কিছুই লাগবে না তা জানি। তবুও বলি, 'আপনার বাবা? তিনিও কি এখানে—'

'নূনা। তিনি আপাতত আমার ছোটভায়ের ওখানে থাকবেন—সোদপুরে—'

এই পর্যন্ত। দিন সাতেক পরে ভুপতিবাবুই আগে এসে উঠলেন এ-বাড়ি, তারপর দেখি একদিন মহা হৈ-চৈ ক'রে রায়বাহাদুর এসে পড়লেন। সাত আটখানা লরী ক'রে শুধু মালই এল—খাট-আলমারি-আয়না-ডেস্ক-চেয়ার-টেবিল-লোহার সিন্দুক—আরও কত কি! তারপর এলেন মানুষ। যেমন রায়-বাহাদুর তেমনি তাঁর স্ত্রী। যেমন মোটা তেমনি লম্বা—দশাসই মানুষ। রায়-বাহাদুরের রং-টা তবু চলনসই, গৃহিণী একেবারে আবলুস কাঠ। ভুপতিবাবুর মার রংই পেয়েছেন বোঝা গেল! ঐ রংয়ের ক্ষতিপূরণ দশটি হাজার টাকা দিতে

হয়েছিল ভূপতিবাবুকে। ভদ্রমহিলাকে বাধ্য হয়েই বার্মিজ সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়েছিল। উপায় কি? ঐ চেহারায় বলবার কিছু নেই।

সে যাই হোক—দিন কতক আমাদের পাড়াসুদ্ধ লোকের আলোচনার খোরাক জুটল। যে যখন সময় পায় রাস্তা থেকে হোক নিজেদের বাড়ি থেকে হোক ঐদিকে তাকিয়ে থাকে, আর সন্ধ্যার পর আমাদেরই রকে একত্র হয়ে কে কতদূর কী লক্ষ্য করলে, তারই হিসাব মেলায়। দেখা গেল, ভদ্রলোকের আরও একটি মেয়ে আছে—সেও মা'র ধাঁচে গেছে, অমনি আবলুস কাঠ। মেয়েটিও সধবা, তবে তার স্বামী বোধ হয় ঘর করে না কিংবা কোনো বিদেশে আছে—মানে জামাইয়ের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। তৎসত্বেও মেয়েটির অবস্থা ভালো—শাড়ি ও গহনার বাহার ভূপতিবাবুর স্ত্রীর চেয়ে তার ঢের বেশি।

রায়বাহাদুরের সন্তান বলতে এই দুটি মেয়ে, এরাই একদিন সব সম্পত্তির মালিক হবে। সে জন্য আদরও বেশী! তবে ভূপতিবাবুর স্ত্রী প্রিয়বালা এতকাল চোখের আড়ালে ছিল ব'লে অতটা আদায় করতে পারে নি, যতটা তার দিদি রাজবালা করেছে। এর জন্য, মেয়েমহলে শুনেছি প্রিয়বালার মনোভাব দিদি ও মা সম্বন্ধে খুব প্রসন্ন নয়। এখানে চোখের সামনে আসাতে আর একটি জিনিস যা লক্ষ্য করলুম তা হচ্ছে এই—রাজবালার তিনটি ছেলেমেয়েও আদর-আবদার ঢের বেশী পেয়েছে দিদিমার কাছে। তাদের যা সব পোশাক, তার যে-কোনো একটির দামে আমাদের বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়ের ব্যবস্থা হয়।

প্রিয়বালার ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম ঈর্ষিত নেত্রে তাকাত তাদের দিকে—দিন কতক পরে দেখলুম দিদিমার টনক নড়েছে—তাদের জন্যও নতুন নতুন পোশাক আমদানি হচ্ছে।

ভূপতিবাবু বেচারা বাঁচলেন এবার। সেই কথাই আমরা আলোচনা করি, যা পসার ওঁর, তাতে সংসার চালানো কষ্টকরই ছিল! বলা বাহুল্য, ওঁর 'সেপারেট এস্টাব্লিশমেণ্টের' কোনো চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলুম না।

রায়বাহাদুরের ঐশ্বর্যের চমকটা আমাদের এই শহরতলীর কেরানিপ্রধান পাড়ায় বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি করল। ঝি চাকর ঠাকুর আয়া—বড়লোকের যেগুলি অবশ্য পালনীয় সেগুলি সবই আছে। বাজারের সেরা মাছ যায় ওঁদের বাড়ি। গ্যারেজের অভাবে নাকি গাড়ি কিনতে পারছেন না, তবে যখনই উনি বেরোন না কেন, ট্যাক্সি ছাড়া এক-পা নড়েন না। প্রত্যহ চাকরি

করতে যান সে জন্য একটা ট্যাক্সির সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করা আছে। জমি ও বাড়ির দালালরাও হাঁটাহাঁটি করছে, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলাফলটা না দেখে উনি নাকি মনস্থির করতে পারছেন না!

তা হোক—রায়বাহাদুরের যে সম্পদ আমাদের মনে সব চেয়ে ঈর্ষার সৃষ্টি করল তা কিন্তু ওঁর পুরানো চাকর হারান। এমন বিশ্বাসী এবং কর্মঠ ভৃত্য যে এ বাজারে পাওয়া যায়, তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। বহু দিনের চাকর নিশ্চয়ই, কারণ এক কর্তা এবং গিন্নীই তাকে নাম ধ'রে ডাকেন আর সবাই বলে হারানদা। ডাক্তারবাবুও বলেন হারানদা, ছেলেমেয়েরাও বলে হারানদা। অনেক দিনের চাকরকে লোকে দাদাই বলে—এঁরা যে এখনও সে ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন তা দেখে আমাদের ভালোই লাগত।

ক্ষয়া-ঘষা একরত্তি মানুষ। রং এককালে ফরসাই ছিল, এখন সেটা পুড়ে তামাটে হয়ে উঠেছে। বয়স কত তা অনুমান করবার উপায় নেই। মাথার চুল পাকে নি বটে,তবে এত পাতলা হয়ে গেছে যে, হারান কোথাও বেরোবার আগে জলে ভিজিয়ে সযত্নে সেগুলি পেটো পেড়ে আঁচড়ে নেয়—তবু মাথার চামড়া সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না! গায়ের চামড়া শিথিল হয় নি, কিন্তু কুঁচকে গেছে—কতকটা পার্চমেণ্ট কাগজের মত প্রাণহীন ও শুকনো মনে হয়। আধ-ময়লা খাটো কাপড়, আর ছেঁড়া গেঞ্জি—এখানে যতদিন এসেছে ততদিনই দেখছি ঐ এক বেশ—কেবল সাড়ে দশটায় যখন পোস্টাফিসে ডাক আনতে যেতে হয়, কিংবা ভূপতিবাবুর কোনো প্রয়োজন থাকলে ওঁর বালিগঞ্জের চেম্বারে ভাত পেঁ ীছে দিয়ে আসতে হয়, তখন সেই ময়লা কাপড়েরই কোঁচাটা কোমর থেকে খুলে কোঁচা দেয় এবং একটা ছিটের শার্ট কোথা থেকে বার ক'রে পরে। অর্থাৎ,বেশ সেজেগুজেই যায়। তবে জুতোর বালাই নেই—না রাজবেশে, না রাখালবেশে!

কিন্তু খাটুনিটা কি সাধারণ খাটে!

আমাদের পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে ওদের বাড়ির অনেকখানিই দেখা যেত এবং যেহেতু সেই ঘরটিই আমার, সেই হেতু অনেক সময় অনিচ্ছাতেও অনেক কিছু দেখতে হ'ত। দেখতুম—ভোরবেলা কেউ চোখ খোলবার আগেই হারানকে উঠে উনুনে আঁচ দিতে হ'ত। অন্য যে চাকরটি ছিল তাকে ডেকে তুলতে গেলে মিনিট দশেক কসরত করতে হয়—কাজেই,উনুনে আঁচ দেবার ফাঁকে ফাঁকে তাকে ডাকা চলত। তারপর সে যেত দুধ আনতে, হারান তখন ঠাকুরের দোরে গিয়ে ঘা দেবে। ঠাকুর উঠে প্রাতঃকৃত্য করতে যাবেন—ততক্ষণে হাওয়া দিয়ে উনুন

ধরাবার কাজও হারানের। উনুন ধরলে চায়ের জল বসানো—কর্তা, গিন্নী, দুই মেয়ে, জামাই—এঁদের চাই 'বেড-টি', সে চা ক'রে ওকেই দিয়ে আসতে হ'ত ঘরে ঘরে। এইবার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতেন ঠাকুরমশাই। তিনি যতক্ষণে দুধ চাপিয়ে ছেলেদের দুধ গরম করতেন ততক্ষণে হারানকে পাঁউরুটি কেটে, বিস্কুটের টিন খুলে মাখন সংগ্রহ ক'রে রাখতে হ'ত। ছেলেমেয়েদের টোস্ট বিস্কুট সন্দেশ দুধ খাওয়ানো—সে এক পর্ব। সে ভারটি সম্পূর্ণ হারানের। কাউকে ধমক দিয়ে, কাউকে বাপু-বাছা ক'রে, কাউকে বাঁশি কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে। অমন ক'রে নাকি হারানের মত কেউ খাওয়াতে পারে না—ওদের মায়েরাও না। তাই সে কাজ শুধু ওরই।

এর পর—যেদিন ঝি এসে জুটল সেদিন সে-ই জলখাবারের জোগাড় দিলে ঠাকুরকে, নইলে সেটাও হারানের ডিউটি। কোনোদিন লুচি-আলুভাজা, কোনোদিন হালুয়া-বেগুনি, কোনো দিন বা সিঙ্গাড়া-পুডিং। এই সব পর্ব চুকলে এক পেয়ালা চা অদৃষ্টে জুটল তো ভালোই ( সেটা জুটলে অবশ্য পেয়ালায় সানায় না, হারানের কলায়ের প্রকাণ্ড মগ আছে—সেই মগভর্তি চাই ওর )—নইলে সে মায়াও ত্যাগ ক'রে বাজারে ছুটতে হয়। এই বাজার যাবার পথে চণ্টুর দোকানে ব'সে একটা বিড়ি খাওয়া—এইটুকু ছিল ওর বিলাস বলুন, অবসর বলুন সব। চণ্টু ঐ বিড়িটি বিনামূল্যে দিত—বড় খদ্দেরের চাকর ব'লে, নইলে নাকি বাড়িতে বিড়ি খাবার হুকুম নেই, গিন্নীর মাথা ধরে।

বাজার—তাও ফরমাশ-বিশেষে একবার কি দু'বার যেতে হবে। দু'হাতে দু'খলি নিয়ে এলেই যেদিন কাজ চলত, সেদিন ঐ একবারেই বেচারার পরিত্রাণ, নইলে আবার ছুটতে হ'ত একবার। বাজার গেল তো মুদিখানার প্রয়োজন। তারপর এটা-ওটা ফাইফরমাশ; 'হারান একবার এইটে টেলিফোনে ব'লে এস তো!' 'হারান একবার ধোপার বাড়ি যাও দিকি, কী করলে মাগী দশদিন কাপড় নিয়ে গিয়ে—দেখে এস দিকি।' কিংবা ভুপতিবাবুর 'হারানদা কাল ডাইং ক্লিনিং থেকে আমার পোশাকটা এনে রাখো নি? যাও, যাও—এখুনি বেরোতে হবে।' নয় তো 'হারানদা, দর্জি কী বললে কাল? যাও নি?…একটা কাজ যদি মনে ক'রে করবে। যাও খোঁজ নাও গে—' এ ছাড়া ছেলেরা তো আছেই—'হারানদা পেন্সিল?' 'হারানদা আমার কাগজ?'…এই সব করতে করতেই ন'টা বাজবে। তখন ছেলেমেয়েদের স্নান করানো ভাত খাওয়ানোর পালা। ওরা কেউই নাকি হারানদা ছাড়া আর কারুর হাতে বাগ মানে না।

সে পর্ব শেষ করতে করতে দশটা বাজে, তখন যেতে হয় ডাকঘরে। সেখান থেকে ফিরে কর্তার খুচরো ফরমাশ থাকে! বালিগঞ্জ-কসবায়—ছুটোছুটি। কয়লা ঘুঁটে প্রভৃতি সংসারের বাজে ব্যাপারে নজর রাখারও তার এই অবসর।

একেবারে বারোটা নাগাদ কর্তা বেরিয়ে গেলে ঠাকুরের মনে প'ড়ে যায় হারানকে জলখাবার দেওয়া প্রয়োজন—'ও হারানদা, আজ কি জলখাবার খেতে হবে না!'

ভোরের সেই ঠাণ্ডা লুচি কিংবা হালুয়া। কোনোদিন তাও থাকে না—হারান মুখ কাঁচুমাচু ক'রে এসে নিজেই প্রশ্ন করে, 'আজ কিছু রাখো নি—ঠাকুর-মশাই?'

'না হারানদা। আজ সব ফুরিয়ে গেছে।' কিংবা হয়তো বলে, 'একদম ভুলে গিয়েছি।'

'তা এক কাজ করো। খানকতক আলুভাজা দাও দিকি, আর এক বাটি মুড়ি।'

রান্নাঘরেই উবু হয়ে ব'সে সেই জলখাবার খাওয়া হয়। তারপর কর্তা-গিন্নী সকলের খাওয়া হয়ে গেলে ওর স্নানের ছুটি মেলে। স্নান শেষ ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢাকা খুলে ভাত খেতে হয়। এর পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম অবশ্য মেলে। সেই সময়টা হারান এসে বসে কোনোদিন আমাদের রকে—নয় তো চণ্টুর দোকানে, একটা বিড়ি খেতে খেতে ঝিমোয় একটু—

তারপর গিন্নীর বাজার করার দরকার থাকলে সঙ্গে কলকাতা ভবানীপুর যেতে হয়। তা সারতে সারতেই ছেলেমেয়েরা আসে ইস্কুল থেকে। তাদের জলখাবার খাওয়া হ'লে তাদের নিয়ে বেড়াতে যেতে হয়—আরও হাজারো কাজ এসে পড়ে সন্ধ্যার সময়। একেবারে ছুটি মেলে রাত বারোটায়। ঝি, ঠাকুর, চাকর সবাই একসঙ্গে খেতে বসে—হারানদাও। এই সময় ওর মুখে হাসি ফোটে—গল্পগুজব করার সময় পায় বেচারী।…

এমন চাকর দেখে হিংসে করব না তো কিসের হিংসে করব বলুন? ফটিকবাবু সম্প্রতি বড়বাবু হয়েছেন সেকশ্যানের, তিনি সব শুনে বলেন, 'কত মাইনে পায়? দু'চার টাকা বেশি দিলে আসে না?'

মণীশবাবু বলেন, 'পাগল! কত দিনের পুরোনো লোক দেখছ না, মায়ায় প'ড়ে গেছে যে। নইলে কি আর ঐ গাধার খাটুনি খাটে?'

এখানে আসার পাঁচ সপ্তাহ পরে রায়বাহাদুরের স্ত্রী কনিষ্ঠা কন্যাকে নিয়ে

যাকে বলে 'সোস্থাল কল' দিতে এলেন। আমার বৌদি তো বিষম ব্যস্ত। ছুটোছুটি ক'রে আসন ইত্যাদি এনে দিলেন। চা খাবেন কিনা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করতে উত্তর এল, 'চা ভাই আমি খুব খাই।...তবে যা-তা চা মুখে রোচে না। একটু—পষ্ট কথা বলতে কি ভাই, তোমাদের ঘর-দোরের ছিরি দেখে ম'নে হচ্ছে তোমরা খাও-দাও ভালো। না রে পিও?...ও আমরা দেখেই, ধ'রে নিতে পারি।'

বৌদি তো অবাক। তবু তাঁকে আতিথ্যের আয়োজন করতে হয়।

এ-কথা সে-কথার পর—বর্মায় তাঁরা কী রাজার হালে ছিলেন, জজ-ম্যাজেস্টার থেকে শুরু ক'রে ছোটলাট পর্যন্ত ওনাকে কী রকম খাতির করত, তাঁর নাতি-নাতনিরা পর্যন্ত কী রকম আরামে ও বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এরই অজস্র গল্প একতরফা ক'রে যাওয়ার পর, বোধ হয় একটু নিশ্বাস নেবার জন্য থামতেই বৌদি একসময় হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা আপনার বড় জামাইটি কোথায়? তাঁকে তো দেখি না। তিনি বিদেশে থাকেন বুঝি?'

এ প্রশ্নের যে ফল হ'ল একেবারে অদ্ভুত।

প্রিয়বালা মাথা হেঁট ক'রে একখানা মাসিক কাগজের পাতা ওল্টাতে লাগলেন, আর গৃহিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলা দিয়ে বাতাবি লেবু গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন!

বৌদি তো অপ্রস্তুতের একশেষ। আমি আমার ঘর থেকে সবই দেখতে পাচ্ছিলুম, আমারও লজ্জার শেষ রইল না। হয়তো অত্যন্ত দুঃখের কোনো ব্যাপার, হয়তো মারাই গেছেন—কি পালিয়ে গেছেন কোথাও—কিংবা আর কিছু? সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না দূর থেকে তো অত বোঝা যায় না—

গৃহিণী অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন, 'না বললে তোমরা বুঝতে পারতে না বাছা, কিন্তু কি জান, মিছে কথা আমি মোটে বলতে পারি না। সে জন্যে রায়বাহাদুরের কাছে আর কত বকুনি খাই।.. সে ভাই আমার পোড়াবরাত—বলতেও লজ্জা করে।'

বৌদি বাধা দিয়ে বলতে গেলেন, 'থাক থাক—না হয় নাই বললেন।'

'না বাছা। আজ হোক কাল হোক একদিন শুনতে পাবেই। মিথ্যে মিথ্যে চেপে গিয়েই বা লাভ কি?...আমার তো ভাই এই দুটি মেয়ে ষেটের—বড় আদরের। তাই শখ হয়েছিল ঘরজামাই রাখব। ও বর্মা-মুলুকে ভালো ছেলে তো পাওয়া যায় না, স্বজাত স্বঘর একটি ছেলে পেলুম, দিব্যি ফুটফুটে দেখতে, তখন

ইস্কুলে পড়ছে। মেয়েও আমার ছোট, সবে দশ বছরের। ছেলের বাপকে দশটি হাজার টাকা গুণে দিয়ে ছেলে নিয়ে এলুম ঘরে—যে ইস্কুলে পড়ত সে ইস্কুল ছাড়িয়ে ভালো ইস্কুলে দিলুম, ভালো মাস্টার রাখলুম, ইচ্ছে ছিল ভালো ক'রে পড়িয়ে ডাক্তার করব—ওনার জায়গায় বসবে। ভাই, এমন মন্দ অদেষ্ট, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর হ'ল। ম্যাট্রিক আর কিছুতেই পাস করতে পারলে না। ছ'বছর চেষ্টা ক'রে ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বসল। তাই এমন, শ্বশুরের ব্যবসা-বাণিজ্য ছাখ্ একটু, কত কর্মচারী রয়েছে, মাইনে নিচ্ছে, তুই-ই না হয় সব বুঝেপড়ে নে —তা নয়, এমন ছোটলোক-ঘেঁষা, কেবল ঝি-চাকরদের সঙ্গে মিশবে, গল্প করবে, আর যত ঘরকন্নার কাজ দেখবে। উনিও ওকে কারবারে বসাতে চাইলেন না, বললেন, কী পরিচয় দেব? তারপর তো এই চ'লে এলুম—ব্যস হয়ে গেল। কেমন যেন জবুথবু মত হয়ে গেছে—নইলে ভাই অত বয়স ওর নয়, যা দেখায়। ছেলেও হয়েছে বিয়ের অনেক পরে! ঐ তিনটি।'

বৌদি তবুও বুঝতে পারলেন না। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনার সে জামাই কি এখানে আছেন?'

'ওমা বুঝতে পারো নি? ঐ যে হারান, বাজার-হাট-টাট করে।'

হারান? হারানদা? এঁদের জামাই? কী সর্বনাশ! আমি তো স্তম্ভিত, বৌদিও তদ্রূপ।

'কী আর করবে, না আছে একটা আত্মসম্মান-জ্ঞান, না আছে একপয়সা রোজগারের চেষ্টা। কর্তা বলেন, থাক, ঐ বাজারহাটই করুক। মনে করব সরকার রেখেছি। তাই তো উনি এবারে একেবারে জেদ ক'রে বসলেন ডাক্তার পাত্তর দেখে তবে বিয়ে দেব। পিওর আমাদের তো এই সেদিন বিয়ে হ'ল বলতে গেলে।'

বৌদি আর থাকতে পারলেন না, বললেন, 'তবু ওঁর পোশাক-আশাকগুলো তো একটু দেখে শুনে—'

'পোড়াকপাল! ও কি সেই মানুষ? অমনি থাকতেই ভালোবাসে।'

বৌদি এ-কথা সে-কথার পর আর একটি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ওঁর ছেলে-মেয়েরাও কি ওঁকে হারানদা বলে?'

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে গৃহিণী বলেন, 'হ্যাঁ—মানে ঐ শুনে বলে আর কি! যা ছিরির বাপ—বাপ ব'লে না জানাই ভালো!'

এর পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে হারানদার সঙ্গে ভাব জমে গেছে। কতকটা ইচ্ছে ক'রেই ভাব করেছি। দু'পয়সার বিড়ি কিনে রেখে দিই, এসে রকে বসলেই একটা বিড়ি আর দেশলাই বার ক'রে দিই। দেখতে দেখতে ওঁর কপালের পার্চমেণ্টের মত কোঁচকানো চামড়া যেন খুলে মসৃণ ও বিস্তৃত হয়ে যায়, মুখে হাসির মত একটা উজ্জ্বলতাও ফুটে ওঠে। নানান্ গল্প করেন হারানদা—বর্মা-মুলুকের গল্প। ওঁর বাপের বাড়ির গল্প, মা, ভাই, বোন! পদ্মফুলের মত সুন্দরী একটি ছোটবোন ছিল—তার কী হ'ল কে জানে! বিয়ের পর এঁরা আর কোনো খোঁজ-খবর রাখতে দেন নি। বোমার হিড়িকে পালাতে পেরেছিল কি জাপানীদের হাতে রইল—কি মারাই গেল! ছেলেবেলায় ওঁর একটি বার্মিজ মেয়ের সঙ্গেও ভাব হয়েছিল, খুব সুন্দরী সে। ওঁর বিয়ের খবর পেয়ে আর সে কথা কয় নি ওঁর সঙ্গে। আর কখনও না। এমনি নানান্ গল্প—টুকরো টুকরো, অসংলগ্ন। আমার মনে হয়, এই জীবন-যাপন ক'রে ক'রে ওঁর মাথাতেও একটা গোলমাল হয়েছে। বেশিক্ষণ একটা জিনিস ভাবতে পারেন না, গুছিয়ে কথা বলতেও পারেন না।

একদিন সোজাসুজি জিজ্ঞাসা ক'রে বসি, 'আচ্ছা এমনটা কী ক'রে হ'ল হারানদা?'

'কী ভাই?'

'এই যে বিনা-মাইনের চাকরের স্তরে নেমে এলেন?' সাহস ক'রেই বলি। জানি যে কারুর অপমানেই আর রুষ্ট হবার ক্ষমতা নেই ওঁর।

হারানদা কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'কেমন ক'রে যে হ'ল তা জানি না। প্রথমটা খুব যত্ন করেছিলেন এঁরা, বড়মানুষির চূড়োন্ত। তাতেও কতকটা যেন অমানুষ হয়ে গেলুম, আর সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ে ক'রে সুখী হই নি—মন ভেঙ্গে গিয়েছিল, কেমন একটা যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, যে লোভে এরা ষড়যন্ত্র ক'রে আমার এমন করলে, সেই লোভে ঘা দেব—জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে। নইলে লেখাপড়ায় আমি খুব খারাপ ছিলুম না, সে খবর ওঁরা আমাকে কেনবার আগে ভালো ক'রেই নিয়েছিলেন।'

'তারপর?

'তারপর আর কি! যখন সত্যিই অমানুষ হয়ে গেলুম এরা তাচ্ছিল্য আর অবহেলা শুরু করলে। যত করে তত যেন আরও অমানুষ হয়ে যাই। কতকটা জন্তুর মত আর কি, বোঝ না? প'ড়ে মার খায় অথচ নড়ে না—তেমনি জন্তু

হয়ে গেলুম। আসলে পালাবার ক্ষমতা চ'লে গিয়েছে। কোনো কাজ শিখি নি, কোনো বৃত্তি না—কোথায় যাব কী করব কিছু জানি না। পাখি খাঁচায় ঢুকে উড়তে ভুলে গিয়েছে, এখন খোঁচা দিলে নিঃশব্দে খোঁচা খাই—ডানা ঝাপ্‌টাতেও পারি না আর!'

এই পর্যন্ত ব'লে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাও আর একটা বিড়ি দাও, স'রে পড়ি। কর্তা আজ আবার সকাল ক'রে আসবেন, হুকুম হয়েছে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। এ বেলা যেন কারা কারা খাবে সব—'

নিঃশব্দে ব'সে আর একটি বিড়ি টেনে নির্বিকার প্রসন্ন মুখে উঠে চ'লে যান।

উনি তো নির্বিকার হয়েই থাকেন, কিন্তু কে জানে কেন আমি স্থির থাকতে পারি না। ওঁর এই জানোয়ারের মত প'ড়ে মার খাওয়া আমার গায়ে যেন ছুঁচের মত বিঁধত! কোনোমতে ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারলে আমি যেন বেঁচে যাই—এরা জব্দ হোক। আমার রকম-সকম দেখে বৌদি হাসতেন, 'তুমি অমন গজরাচ্ছ কেন? বলে যার বিয়ে তার মন নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই—তোমার হয়েছে তাই।'

আবার নিজেই বললেন, 'তাও বলি—মানুষটাকে নিজেরা বোঁটা ছিঁড়ে এনে ওর ভেতরের প্রাণশক্তি নিঃশেষ ক'রে দিয়ে এখন অমন ক'রে থ্যাৎলাবে কেন, তাইতে আমার আপত্তি। তাছাড়া নিজেরা করেছে অমানুষ, এখন আবার অমানুষ ব'লে গাল দেয়। আর ওর বৌটাই বা কী, এধারে তো শাড়ি-গয়নার শেষ নেই, কিন্তু যার জন্যে শাড়ি-গয়না পরা তাকেই এত হেনস্তা! ও মানুষটা না থাকলে কী করতে তাই শুনি?'

আমি অনেক ভেবে ভেবে একদিন কথাটা পাড়ি হারানদা'র কাছে, 'হারানদা, এখান থেকে চ'লে যেতে চান?'

চম্‌কে ওঠেন হারানদা, 'এখান থেকে? চ'লে? সেকি! কোথায়?'

'যাবেন কোথাও?'

'খাব কী ভাই?'

'চাকরি করবেন।'

'কী চাকরি করব ভাই, আমাকে কে কাজ দেবে?'

'যদি দেয়। আমি যদি যোগাড় ক'রে দিই?'

'লেখাপড়া যা শিখেছিলুম সব তো ভুলে গিয়েছি। কী কাজ করব ?'

'লেখাপড়া না হ'লেও চলবে। সরকারী অফিসে বেয়ারার চাকরি—দেখুন। মাইনে কম বটে, কিন্তু যুদ্ধের দৌলতে য়্যালাউন্স-ট্যালাউন্স নিয়ে প্রায় পঞ্চান্ন টাকা পাবেন। থাকবার জায়গাও ক'রে দিচ্ছি। নিজে শান্তিতে নিরাপদে থাকতে পারবেন।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে হারানদা বললেন, 'হাজার হোক তবু এখানে শ্বশুরবাড়িতে আছি, এ আশ্রয় ছেড়ে বেয়ারার চাকরি করতে যাব ! লোকে কী বলবে ?'

'একে কি আপনি শ্বশুরবাড়ি থাকা বলেন হারানদা ? এই কি সম্মানের থাকা।' বোমার মত ফেটে পড়ি আমি, 'সরকারী অফিসের বেয়ারা, কত ম্যাট্রিক-পাস ছেলে মাথা কুটে মরছে ঐ চাকরির জন্যে দেখুন গে যান। তাতে আপনার মান যাবে ? কে দেখছে, কে আপনার পরিচয় পাবে ? কলকাতায় চাকরি করবেন, ওখানেই থাকবেন। বলবার মত লোকটা পাচ্ছেন কোথায় ?'

অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে বলেন, 'তা বটে, তবে কি জানিস ভাই, বহুদিনের অভ্যেস, দেখি একটু ভেবে দেখি।"

এর পর থেকে আমার কাজ হ'ল দেখা পেলেই হারানদাকে তাতানো। এতে যেন একটা ষড়যন্ত্রের স্বাদ পেতুম, বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ ক'রে ষড়যন্ত্রকারীরা যে উত্তেজনা পায় তারই কতকটা অনুভব করতুম। কিন্তু হারানদাকে তাতানো যেন শিব-অসাধ্য কাজ। বড়ই দুর্বল মানুষটা, শুধু দেহে নয়—মনেও। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে যেন সাহসে কুলোয় না ওঁর কিছুতেই। সে ছবি মনে আঁকতে গেলেই কপালে ঘাম দেয়—

অবশেষে একদিন বললেন, 'হাজার হোক নিজের ছেলেপুলে ছেড়ে—'

'যে ছেলেপুলেরা আপনাকে বাবা ব'লে জানলই না, তাদের কাছে থেকেই বা কী সুখ ? বরং চ'লে যান, নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে চাই কি একদিন ওরাই আপনার মূল্য বুঝবে। একদিন ফিরিয়ে আনতে চাইবে মাথায় ক'রে। সসম্মানে ফিরতে পারবেন তখন। কিছু যে মনুষ্যত্ব এখনও আপনার আছে তা ওদের বুঝতে দিন।'

তবু হারানদা'র সেই এক কথা, 'তা বটে, দেখি একটু ভেবে দেখি।'

অবশেষে একদিন সামান্য কী একটা বাজারের খুঁত ধ'রে রায়বাহাদুর কঠোর তিরস্কার করাতে কী মনে হ'ল ওঁর—আমার কাছে বললেন, 'দুত্তোর !

তুমি ভাই ছাখো—ব্যবস্থা কর যা হয় একটা। তবে ব'লে-ক'য়ে যেতে পারব না, সে সবাই মিলে এমন হৈ-হৈ করবে, এতকালের অভ্যেস, মুখের সামনে জন্তু হয়ে যাব আবার। লুকিয়ে যেতে হবে।'

'দেখুন, ঠিক তো? খাকৃতাই হব না লোকের কাছে ব'লে?'

'না, না, না। তিন সত্যি করছি!'

তখন চাকরির জন্য ভাবতে হয় না। নিজেই দরখাস্ত লিখে দিয়ে এক জায়গায় কাজ ঠিক করলুম। আমাদের অফিসের সঙ্গে লাগোয়া সে অফিস। একটা সস্তার বাসাও ঠিক করা হ'ল। কথা রইল নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা হারানদা একটা কাপড়-জামা বগলে ক'রে বেরিয়ে আসবেন—আমি নিয়ে গিয়ে সেই বাসায় রেখে আসব। বিছানা-মাদুরও চেয়ে-চিন্তে একরকম যোগাড় ক'রে রাখলুম। বাসায় যা আগাম দেবার কথা তাও নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিলুম। এককথায় আমারই উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। এ যেন আমার ব্যক্তিগত জয়লাভ!

নির্দিষ্ট দিনের আগের রাত্রে আমার ভালো ক'রে ঘুমই হ'ল না! রাত চারটে বাজতে-না-বাজতে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত। কিন্তু হারানদা কৈ?

সাড়ে চারটে, পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা!

রান্নাঘরেও তো নেই! ছাদের ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখলুম ঠাকুরই আজ আঁচ ধরাচ্ছে। ব্যাপার কী?

ওদের চাকর দুধ আনতে এদিক দিয়েই যায়, তাকে ধরলুম, 'হারানদার খবর কি বেহারী?'

'হারানদার জ্বর হয়েছে কাল থেকে খুব!...'

'জ্বর হয়েছে। সেকি!'

'হবে না। এই বর্ষা, উনি শোবে একটা মাদুরে। খাট-বিছানা থাকতে ঘরে যাবে না—বারান্দায় শোবে বারো মাস। তা কী হবে বলুন।'

সেদিন গেল, তার পরও দু'তিন দিন আর পাত্তা পেলুম না। দিন চারেক পরে একদিন দেখি মুড়ি-শুড়ি দিয়ে এসে হাজির।

হৈ হৈ ক'রে উঠলুম, 'কি, ব্যাপার কী হারানদা? দিলেন তো সব কাঁচিয়ে! কী জ্বর হয়েছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা?'

একটু চুপ ক'রে থেকে হারানদা বললেন, 'আসল কথা কি শুনবি ভাই, তোর ঐ মতলবের কথা ভেবে ভেবে ভয়ে আমার জ্বর এসে গেল!'

'সেকি!...তাহ'লে? ও প্ল্যান একেবারে ছেড়ে দিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই। আমাকে মাপ কর্। আসলে বড্ড মায়ায় প'ড়ে গেছি ওদের, কাটিয়ে যাবার আর সাধ্য নেই।'

'মায়ায় পড়েছেন? কার, ছেলেমেয়েদের?'

'শুধু ছেলেমেয়েই বা বলি কী ক'রে? বৌটাও, দেখে না দেখে না—সেদিন যেমন শুনলে জ্বর হয়েছে জোর ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে—নিজের বিছানা থেকে তোশক বার ক'রে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে বিছানা করিয়ে শোওয়ালে। এ ক'দিন ঘরেই শুতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। ভালোও বোধ হয় বাসে একটু। এদের ছেড়ে যাই কী ক'রে বল্ দেখি?'

এই ব'লে কেমন একরকম দুর্বল ভাবে হাসেন একটু। অপ্রতিভ ভাব, তাহ'লেও মুখে বেশ যেন একটা তৃপ্তি ফুটে উঠেছে।

একটা বিড়ি খেয়েই উঠে পড়েন, 'দেখি একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যেতে হবে, প্রিয়বালার ভেঁটকি মাছের কাঁটা খাবার শখ হয়েছে। পোয়াতি কি না—ঐ সব উদ্ভট শখ! উঠি ভাই, কিছু মনে করিস নি।'

ব্যস্ত ভাবে চ'লে যান হারানদা। সে-ই আধ ময়লা কাপড়, ছিটের শার্ট ও খালি পা—অধিকন্তু একখানা পুরানো খদ্দরের চাদর মুড়ি দেওয়া।

## অভিমান

প্রকাণ্ড বড় দো-মহলা বাড়ি, তাহারই গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে ছোট একটি চালা—দৃশ্যটা বড়ই বিসদৃশ, তবু দিনের পর দিন দেখিতে দেখিতে ব্যাপারটা সকলেরই সহিয়া গিয়াছে। আর সত্য বলিতে কি, বড় বাড়ির পাঁচিলের গায়ে যদি ওটা ঠেকিয়া না থাকিত তাহা হইলে হয়তো আর চালাঘরটির অস্তিত্বই থাকিত না এতদিন, এমনই তাহার জীর্ণ দশা।

বড় বাড়িটি ছোটভাইয়ের, চালাটি দাদার।

অর্থাৎ, চালাটাই পৈতৃক আমলের সম্পত্তি; দাদা আই-এ পাস করিয়া আর লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই; মাইনর ইস্কুলে হেড্‌মাস্টারি করিতে গিয়াছিলেন। ফলে এই যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির যুগেও (একচল্লিশ বছর হেড্-মাস্টারি করিবার পর) মাহিনা ও ভাতা মিলাইয়া আয় দাঁড়াইয়াছে মোট

বাহান্নটি টাকা। তাহাতে আর যাই হোক চালা ফেলিয়া পাকাঘর তোলা যায় না, চালাও সারানো কঠিন। আর ছোটভাই দাদার আয়ে লেখাপড়া শিখিয়া ইনসিওরেন্সের দালালি শুরু করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার মাসিক আয় দু'হাজার টাকারও উপর। কোম্পানি মাহিনা, ভাতা, কমিশন দিয়া পুষিতেছেন, তৎসহ স-পেট্রোল একখানি মোটরগাড়ি ফাউ।

কিন্তু আমাদের বীরেন মাস্টারমশাইয়ের সে জন্য কোনো ক্ষোভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে ঠিক নির্বিকারও নহেন, বরং সগর্বে যখন তখন পরিচিতদের কাছে গল্প করেন, 'আমার ছোটভাই তা ব'লে আমার মত ভিখিরী নয়। সে মস্ত লোক, আগের দিন হ'লে দুয়োরে হাতি বাঁধা থাকত। এখন মোটর থাকে। আর কত বড় বাড়ি, সে কি আর আমার মত ভাঙ্গা চালায় থাকে! হা-হা হা! ইহারই মধ্যে মস্ত যেন একটা রসিকতার সন্ধান পাইয়া নিজেই হাসিয়া খুন হন।

কখনও বলেন, 'আমার ভাই কানুকে চেনো না? ঐ যে ধীরেন রায়? মস্ত বড়লোক। ও আমার আপন ছোটভাই!' এই অবিশ্বাস্য সংবাদটি দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শ্রোতাদের উপর সংবাদের প্রভাবটা লক্ষ্য করেন, তাহার পর পুনশ্চ সগর্বে বলেন, 'তোখোড় ছেলে, বুঝলে না! প্রথম যখন ইনসিওরেন্সের দলালিতে ঢুকল, তখন ওকে দেখলে কষ্ট হ'ত। না খেয়ে না দেয়ে ঘুরে বেড়াত—জল নেই, রোদ নেই, হিম নেই—আজ দেখ তার পয়সা খায় কে! করলে তো এই সব নিজের চেষ্টায়! এ্যা!'

শ্রোতাদের মধ্যে কেহ হয়তো বলিয়া বসে, 'আপনি তো বড়ভাই, তার এখন পয়সা হয়েছে—উচিত তো আপনাকে এখন ওর দেখা। কতই বা খরচ আপনার? এখনও কি আর সামান্য ঐ ক'টা টাকার জন্য আপনাকে মাস্টারি করতে দেওয়া ওর উচিত!'

তাহাতে বীরেনবাবু চটিয়া যান, বলেন, 'তা, কী করবে? ও ছাপোষা মানুষ, ওর ছেলেমেয়ে আছে, সব পয়সা তো আর বিলিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া আমি বড়ভাই, ওর কাছ থেকে নেবই বা কেন! ভগবান তো এখনও একেবারে অক্ষম করেন নি? যতদিন পারব খেটে খাব!'

চালাঘরটার উল্লেখে বলেন, 'ঐ বেশ আছে, তুমিও যেমন। আমিই বা ক'দিন? যেমন আমি হেলে পড়েছি, আমার ঘরও তেমনি!

শুধু ভাই বলিয়া নয়, পৃথিবীতে যেন কাহারও উপর কোনো অভিমান ছিল না

ভদ্রলোকের। বাজার হইতে মাছের থলি প্রায়ই শূন্য লইয়া ফিরিতে হয়, তবু কোনোদিন কোনো অনুযোগ করেন না। বরং গৃহিণীকে আসিয়া বলেন 'জানো বড়বৌ, আজ অনেক পয়সা রোজগার করেছি সকালবেলা!' তারপর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বুঝাইয়া দেন—'এই যে ধরো না মাছের পয়সা তো বাঁচলই, তার সঙ্গে তেল মসলা কয়লা সব ধরো। এটা তো খরচ করব ব'লেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, যখন বেঁচে গেল তখন রোজগার ব'লেই ধরব বৈকি!' সামান্য একটু ডাল ও তেঁতুল উপলক্ষ্য করিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াও উদ্গার ছাড়েন সশব্দে, 'আঃ! যাই বল বড়বৌ, আজকের খাওয়াটা বড় ভালো হয়েছে। কাঁটা-খোঁচা কোথাও নেই, ডাঁটা ছিব্‌ড়ের বালাই ছিল না—একেবারে নিষ্কণ্টক খাওয়া। এমনি খাওয়াই আমার ভালো লাগে!'

তাঁহার সমসাময়িকদের অনেকেই আজ ধনী। এমন কি যাহারা অনেক পরবর্তী কিংবা ছাত্রস্থানীয় তাহারাও যখন প্রকাণ্ড মোটর চাপিয়া কাদা ছিট্‌কাইয়া চলিয়া যায়, তখন তিনি আন্তরিক আনন্দে বলিয়া ওঠেন, 'আমাদের সন্তুও মোটর কিনেছে? বা-রে, আমি তো জানতুম না! কবে কিনলে? বেশ বেশ! বড় আনন্দ হ'ল। কী করে? চৌরঙ্গীতে হোটেল করেছে? এটা তো মন্দ নয়—কী বা হ'ত চাকরির জন্যে ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়িয়ে—হয়তো শেষ পর্যন্ত যাট টাকা মাইনে। তবু ওর যে স্বাধীন ব্যবসার দিকে মন গেছে এই ভালো। চৌরঙ্গীতে ওসব হোটেলে খায় কারা? সাহেবরা খায়? বেশ তো! যাক্—ছেলেটার জন্যে বড় দুর্ভাবনা ছিল। গ্রামার আর আঁক মোটে মাথায় ঢুকত না, কতদিন ভেবেছি কী ক'রে খাবে ছেলেটা! বড় ভালো হয়েছে। বে-থা করেছে? ভালো ভালো, একদিন দেখে আসব।'

কিংবা একদিন হয়তো বাজারের পথে কোনো হঠাৎ-বড়লোকের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া পড়িয়া তাহার চারপয়সা দামের সিগারেটটি নষ্ট করাইয়া বলেন, 'কী রে সুনু—তুই নাকি কী সব ব্যবসা ক'রে পয়সাকড়ি করেছিস? হতভাগা, মাস্টার-মশাইকে একবার খবরটা দিয়ে আসতে পার না? তোদের ভালো হয়েছে শুনলে আমাদের মনটাতে কত আনন্দ হয় বল্ দেখি! বৌমাকে একবার ডাক না, খোকা হয়েছে না খোকা? ডাক ডাক, দেখি আশীর্বাদ ক'রে যাই!'

তারপর বধূমাতার মাথায় হাত বুলাইয়া ছেলেটাকে লুফিয়া নাচাইয়া আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হন। প্রত্যাশা যে তাঁহার কিছু নাই তা সেই হঠাৎ-বড়লোকেরাও বোঝে। অপ্রস্তুত হইয়া আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। বীরেন মাস্টার-

মশাই কিন্তু এককাপ চা পর্যন্ত খাইতে রাজি হন না, বলেন, 'হ্যাঁ, ঐ সব অভ্রমানবি নেশা ঢুকিয়ে দাও, তারপর মরি আর কি! না না, চাল পাল্‌টানো কিছু না। তা খবর-টবর দিস, আবার নতুন খোকাখুকি হ'লে।'

ঈর্ষা নাই, বিদ্বেষ নাই কোনো দুঃখবোধ পর্যন্ত নাই। হা-হা করিয়া হাসিয়া, চেঁচাইয়া পরের গুণ দশকাহন করিয়া প্রচার করিয়া এবং দোষ প্রাণপণে ঢাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ান মনের আনন্দে। স্ত্রী আগে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোনোমতে একটা মোটা কাপড় জামা ও ক্যাম্বিশের জুতা পাইলেই মাস্টারমশাই মহা খুশী। একান্ত অভাব হইলে আট-দশ টাকার টিউশনি জুটাইয়া লন, আবার কোনোমতে দিন চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা হইলেই ছাড়িয়া দেন। অন্য কোনো মাস্টার-মহাশযের অভাব তাঁহার চেয়ে বেশী বুঝিলে যাচিয়া নিজের টিউশনি তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আসেন।

কিন্তু মানুষ যত অভিমান ত্যাগ করে এবং বেদনাবোধকে উড়াইয়া দেয় ভগবান হয়তো ততই তাহাকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষা হইতে বীরেন মাস্টার-মশাইও বাদ গেলেন না।

একটি মাত্র কন্যাকে বহু দুঃখ করিয়া, ধার-দেনা ভিক্ষা করিয়া পাঁচ জনের সাহায্যে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। দোজবরে হইলেও পাত্রটি ভালো, অল্প বয়স, ভালো রোজগার করে। এই বিবাহের পর হইতেই যেন আরও নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা মেয়েটি বিধবা হইয়া একদিন বাপের কাছেই ফিরিয়া আসিল। রোজগার ভালো করিলেও জামাই কিছু রাখিয়া যান নাই, জমিজমাও কোথাও কিছু নাই। ছোট ভাই একজন আছে, সে-ও রীতিমত ছাপোষা।

গৃহিনী আছড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার চোখের জল শুকাইতে চায় না কিছুতেই। পাড়ার লোক পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু বীরেনবাবু নির্বিকার। কন্যাকে কাছে বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধু বলিলেন, 'ভগবানের মার মা—দুঃখ ক'রে এর হাত থেকে পার পাবি না। যত কাঁদবি—কান্না আর ফুরোবে না। সে তো ফিরে পাবার নয়, ভাগ্য তো পাল্‌টানো যায় না। এর একমাত্র ওষুধ হ'ল কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা।'

তিনিও কার্যত তাহাই করিলেন। সকালে বাড়িতে কোচিং ক্লাস বসাইয়া প্রায় টাকা পনেরো আয়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং সন্ধ্যায় কন্যাকে পড়াইতে

শুরু করিলেন। গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'যতটা আমার বিদ্যেতে কুলোয় পড়িয়ে ইস্কুলে দেব। একটা পাস করলে হয়তো ছোটখাটো মাস্টারি বা কোনো চাকরি যোগাড় করতে পারবে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে পারে তবে তো!'

পাড়ার অল্পবয়সী তরুণরা কেহ কেহ আসিয়া বলিল, 'ওর আবার বিয়ে দিন মাস্টারমশাই—এই বয়স থেকে ঐ রকম হয়ে থাকবে?'

'ছাখ্‌না বাবা, পাত্র যদি সেরকম পাস! আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে বিধবাই হোক আর যাই হোক, বিনা পয়সায় কি আর বিয়ে হবে? আমার তো একটা বিয়ের দেনাই শোধ হয় নি এখনও। কোথা থেকে আর টাকা পাব? প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা পর্যন্ত খেয়ে ব'সে আছি।'

ফলে উৎসাহ নিভিয়া যায় অনেকেরই। রূপ নাই, মেয়েটি কালো—তাহার উপর বিত্তহীনা, আবার বিধবা। এ মেয়ের পাত্র জোটা সহজ নয়, জুটিলও না। বীরেনবাবু সেজন্য কোনো অনুযোগ করিলেন না, যেমন আগেও বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখান নাই। মেয়ে কমলা তখন প্রতিবাদ করিলে বরং বলিয়াছিলেন 'কোথায় পাব মা পাত্র যে আবার বিয়ে দেব? ওরা আমাকে ভালোবাসে, কথাটা বললে—মিছিমিছি প্রতিবাদ করি কেন? ওরাও খুঁজুক, আমিও তোকে পড়িয়ে যাই।'

কিন্তু আসল আত্মাভিমানের জায়গায় ঘা পড়িলে দেখা গেল যে, ভগবানের পরীক্ষায় পাস করা অত সহজ নয়।

যে ইস্কুলে বীরেনবাবু হেড্‌মাস্টারি করিতেন সেটি ছিল তখন এ অঞ্চলের একমাত্র ইস্কুল। এখন অনেকগুলি ইস্কুল হইয়াছে, তবু এ ইস্কুলে ছাত্র কমিবার কথা নয়—এতদিন খুব কমেও নাই। কারণ, এ অঞ্চলের অধিকাংশ অভিভাবকই ছিলেন বীরেনবাবুর ছাত্র। সম্প্রতি বহু নূতন বাসিন্দা আসায় একটা গণ্ডগোল বাধিয়াছে। বীরেনবাবু প্রাচীনপন্থী, গাধা পিটিয়া ঘোড়া করার কথাই তিনি জানেন, তাঁহার ধারণা কঠোর শাসন ছাড়া ছেলেদের লেখাপড়া হয় না। কিন্তু এখনকার ছেলেরা সে সব শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদ করে, অভিভাবকরা আসেন নালিশ করিতে, প্রথম হেড্‌মাস্টার পরে সেক্রেটারীর কাছে। কোনো কোনো অভিভাবক ইস্কুলের কার্যনির্বাহক-কমিটিতে ঢুকিবার চেষ্টাও করেন, উদ্দেশ্য এই বুড়ো হাব্‌ড়া ইস্কুল-মাস্টারটাকে তাড়ানো।

সেক্রেটারী এবং কোনো কোনো কমিটি-মেম্বার মাথা চুল্‌কাইয়া ইতস্তত

করিয়া কথাটা নিবেদন করেন। কিন্তু বীরেনবাবু একেবারেই উড়াইয়া দেন, 'হ্যাঁ, ছেলেদের মারবে না, ধ'রে সন্দেশ খাওয়াবে! গোবেড়েন না দিলে ঐ সব গাধারা মানুষ হয়? ঐ তো সব অন্য ইস্কুলের বাবুরা, কী মানুষই সব করেছেন ছাত্রদের। বাঁদরামি বেড়েই চলেছে চারদিকে, আর বিদ্যে যে কত হচ্ছে, তা দু'-একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা কইলেই তো বুঝতে পারবে বাবাজী! ওসব কথা আমাকে শুনিও না। দেখি, যাই একবার সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে! ওঁর ঐ নতুন ব্যাকরণের কতকগুলো যুক্তি আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না!'

এ রোগ তাঁহার বহু কালের। কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি, কিংবা ব্যাকরণগত সংজ্ঞা লইয়া মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই ছোটেন সুনীতি চাটুয্যের কাছে, কোনো অঙ্কের বইতে ভুল লেখা আছে মনে করিলে সুরেন গাঙ্গুলীর কাছে এবং ইংরেজীর জন্য জে, এল্ ব্যানার্জির কাছে গিয়া তাঁহাদের ব্যস্ত ও বিব্রত করিয়া তোলেন। জে, এল্ ব্যানার্জির মৃত্যুর পর আবার কে এক অধ্যাপককে ধরিয়াছেন। পড়াশোনার পদ্ধতি লইয়া মাথা ঘামান না তত, যত ঝোঁক নির্ভুল তথ্যের দিকে। বইতে কোনো একটি শব্দ ভুল লেখা আছে কিনা না দেখিয়া কোনো বই পাঠ্য করেন না।

কিন্তু এসব বিষয়ে আধুনিক হইলেও শাসন-ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই সেকেলে। দু'-একজন কমিটি-মেম্বার এবং একাধিক সেক্রেটারী প্রেসিডেন্ট অনেকবার বিলাতী বই হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাকে ওয়াকিবহাল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। এ সম্পর্কে কোনো কথা তিনি কানেই তুলিতে চান না, বলেন, 'রেখে দাও রেখে দাও—ভারি জানে ওরা, তাই পণ্ডিতি করতে এসেছে। আমি এই তেতাল্লিশ বছর ধ'রে গরু-গাধা চরাচ্ছি, আমি জানি না, ওরা জানে! ওসব, বুঝলে না বাবারা, নতুন নতুন কথা ব'লে শুধু পণ্ডিতি দেখানো!'

অথচ, একটা কথা তিনি ইদানীং নিজের মনের কাছে অন্তত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে, তাঁহার ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা খুব ধীরে ধীরে নিয়মিত ও নিশ্চিত ভাবে কমিয়াই চলিয়াছে। অনেক ইস্কুল হইয়াছে চারিদিকে সত্য কথা, তেমনি যুদ্ধের দৌলতে এই সব শহরতলীতে লোকসংখ্যাও এত বাড়িয়াছে যে, সর্বত্রই স্থানাভাব। সেক্ষেত্রে তাঁহার ইস্কুলে যদি তিন বছরে দেড়শ'টি ছাত্রসংখ্যা কমিয়া মোট একশত সাতষট্টিতে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে চিন্তার কথা

বৈকি! সরকারী গ্র্যাণ্ট বা দান আছে সত্য কথা, তবু এখনই মাসিক ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যে দুইবার রিজার্ভ ফাণ্ডে হাত দিতে হইয়াছে, বাড়িটা আর না সারাইলে নয়, তবু চোখ কান বুজিয়া ভাঙ্গা ঘরেই দিন চালানো হইতেছে। এধারে বাজার দর হিসাবে মাস্টার-মহাশয়দের মাগ্‌গিভাতা বা মাহিনা কিছু বাড়ানো নিশ্চয়ই উচিত—কিন্তু সে কথা এখন চিন্তা করাও অসম্ভব।

মাস্টারমশাই যেন কতকটা নিজের মনকেই সান্ত্বনা দিবার জন্য গলা চড়াইয়া বলেন, 'আসলে এতগুলো হাইস্কুল, এর মধ্যে মাইনর ইস্কুল চলে? সবাই চায় একেবারে হাইস্কুলে দিতে। ব্যাটারা বোঝে না যে, মাইনর ইস্কুলে বনেদটা কত শক্ত হয়ে যায়!'

অঙ্কের মাস্টার জীবনবাবু তাঁহার দড়িবাঁধা চশমাটার মধ্য হইতে জুলজুল করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলেন, 'তাই যদি বলেন তো—এখনকার কোনো ইস্কুলেই তো জায়গা নেই—এখান থেকে অত পথ হেঁটে সব বালিগঞ্জের ইস্কুলে যাচ্ছে; ঢাকুরের ইস্কুলটাও তো মাইনর, সেখানেও তো ছাত্র খুব কম নয়। শুনেছি এ সেশনে প্রায় সাড়ে তিনশ'র ওপর হয়ে গেছে—তাই না পূর্ণ?'

বীরেনবাবু হঠাৎ চেঁচাইয়া ওঠেন, 'তাহ'লে আমার জন্যই ছেলেরা সব চ'লে যাচ্ছে, এই তো? তা বেশ, তোমরাই ভালো ক'রে ইস্কুল চালাও, আমি চ'লে যাচ্ছি।'

জিভ্ কাটিয়া হাতজোড় করিয়া জীবনবাবু বলেন, 'ছি ছি, তাই কখনও বলতে পারি? এসব কী বলছেন! আমি বলছি এখানকার কতকগুলো লোকের বদ্‌মায়েসি আছে। তারা চায় ইস্কুলটা উঠিয়ে দিতে।'

বীরেনবাবু আবার খুশী হইয়া ওঠেন, কিন্তু তবু ঢাকুরিয়া এম-ই স্কুলের ছাত্র-সংখ্যার তথ্যটা কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করে মনের মধ্যে। কোথায় যেন একটা বিবেকের সূক্ষ্ম প্রশ্ন শুনিতে পান অন্তরে অন্তরে,—এটার জন্য কি তাহা হইলে তিনিই দায়ী?

নূতন জীবন-স্রোত যে বিপুল কোলাহলে চারিদিক ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, কানে তুলা দিয়া তাহার আগমনের শব্দটাকে হয়তো এড়ানো যায়, কিন্তু সে প্রলয়ঙ্কর আবির্ভাবের ফলাফলকে ঠেকাইবেন কী করিয়া? বিভ্রান্ত বীরেনবাবুর সদানন্দময় ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া ওঠে, একটির পর একটি।

কুটিল একটা সংশয়ে প্রতিদিনকার জীবন যেন বিষাইয়া ওঠে ; তাহা হইলে কি তিনি ভুলই করিয়া আসিতেছেন এতদিন ?

ইতিমধ্যে সরকারীদপ্তর হইতে এক নিমন্ত্রণ আসে।

গান্ধীজীর বেসিক-এডুকেশন সম্বন্ধে সরকার প্রবীণ শিক্ষকদের সহিত পরামর্শ করিতে চান। দেশের সমস্ত প্রাইমারী বা মাইনর ইস্কুলেই নাকি অতঃপর এই বুনিয়াদী-শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। আহ্বান পাইয়া বিহ্বল বীরেনবাবু বাজার হইতে তাড়াতাড়ি দুই একখানি বই কিনিয়া আনেন—এ সম্পর্কে তথ্যাদি আছে বলিয়া শুনিয়াছেন—এমন সব বই। কিন্তু তাহাতে বিস্ময় আরও বাড়ে। রাগে জ্বলিয়া ওঠেন, 'এ আবার কী! প্রথম দু'বছর ছেলেদের কোনো অক্ষর পরিচয়ই হবে না। ঝাঁটা মারো অমন শিক্ষার মুখে!'

সেক্রেটারী তরুণ উকিল, এ বিষয়ে তাহার খুব উৎসাহ, সে বুঝাইয়া বলে, 'অক্ষর দু'বছর না শিখলেও চলবে, মাস্টারমশাই,—দুটো বছর ব্যাকরণ কি নামতা মুখস্থ না করলে কিছু ক্ষতি হবে না। চারদিকে তো চেয়ে দেখছেন উচ্চশিক্ষা পেয়েও কী সব বাঁদর তৈরি হচ্ছে এক একটি। একটা ডিসিপ্লিন নেই, নাগরিকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, হাইজিনিক সেন্স্ নেই—কেউ সমাজের জন্যে নিজের ব্যক্তিগত এতটুকু স্বার্থ ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এই তো আমাদের অধিকাংশ দেশবাসী; এসব শিক্ষিত লোক নিয়ে কী হবে বলুন তো? এমনিতেই তো আমাদের দুর্নাম আর লাঞ্ছনার শেষ নেই—এর পরে যে পৃথিবীর কোনো জাতের কাছে মুখ দেখাতে পারব না; মনটা তৈরি হোক্, প্রথম কতকগুলো মূল শিক্ষা পেয়ে যাক্—তারপর আপনাদের পুঁথিগত বিদ্যা না হয় শিখবে 'খন্। এমনিতেই তো কেবল বইয়ের ওপর বই চাপাচ্ছেন তাদের মাথায়, চারবছরের ছেলেমেয়ে থেকে আর ওটা শুরু করেন কেন? মস্তিষ্কটা একটু ভালো ক'রে ডেভেলপ্ করবার সময় দিন না, পরে বরং আরও তাড়াতাড়ি শিখবে। আর যে সব লোক চাষবাস বা হাতের কাজ করবে, তাদের অত হিষ্ট্রীর সন-তারিখ কিংবা ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়ে কী হবে বলতে পারেন? তার চেয়ে সুস্থ হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে থাকবার শিক্ষা, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শিক্ষা—ঢের, ঢের বেশী দরকারী।'

বলাবাহুল্য, এসব কোনো কথাই বীরেনবাবু বুঝিতে পারেন না, বিশ্বাসও করেন না! চিরকাল যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, নিজে দীর্ঘকাল যেভাবে

চলিয়াছেন—এখন তাহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন বা ভিন্ন রকমের কিছু একটা শুনিয়া বিস্ময়বোধ হয় বৈকি ! প্রস্তাবটার উপর একটা বিদ্বেষও জাগে মনে মনে।

তবুও বীরেনবাবু চিন্তিতভাবে ইস্কুলে আসেন। দিন পাল্‌টাইয়াছে, এসব দিনে তিনি অচল—এটাই ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

ইস্কুলে পা দিতেই জীবনবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলেন, 'অশোক সেই কানেক্‌শন বানান ভুল লিখেছিল ব'লে আপনি কাল তার কান ম'লে দিয়েছিলেন—আজ তার বাবা এইমাত্র এসে যাচ্ছেতাই ক'রে গেল ইস্কুলসুদ্ধ ছেলের সামনে।'

'তার মানে ?' চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া ওঠে বীরেনবাবুর, 'এসব কী বেয়াদপি ! ছেলের হয়ে বলতে আসতে তাঁর লজ্জা করে না ? অসভ্য ছেলে—ভুল লিখবে আবার তর্ক করবে ! বলে, আজকাল সাহেবরা এই বানানই নাকি লিখছে। আপনি কি সাহেবদের চেয়েও ভালো ইংরেজী জানেন ?…ওকে চাবকানো উচিত।'

জীবনবাবু সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে বলেন, 'কিন্তু ওর বাবাও যে সেই কথা ব'লে গেল মাস্টারমশাই ! বলে নতুন নতুন বানান হচ্ছে, কত সংশোধন হয়ে গেল ইংরেজী ব্যাকরণের, কিছু জানবেন না—শুধু ঘরের কোণে ব'সে গুণ্ডামি ! ছেলেটার কান লাল হয়ে রয়েছে আজও, যদি কালা হয়ে যেত ? ঐ বুড়ো কি তার ক্ষতিপূরণ করতে পারত ? আরও সব যা যা ব'লে গেল মাস্টারমশাই, মুখে আনবার নয়। ছেলেদের সামনে আপনাকে পাগল. মুখ্‌খু কত কী বললে !'

'হারামজাদা !' বোমার মত ফাটিয়া পড়েন বীরেনবাবু, 'আমি এখনই যাব সে হারামজাদার কাছে, দেখিয়ে দিক আমায়—কোথায় ঐ বানান লেখা আছে।'

তিনি পাগলের মত ছড়ির উদ্দেশে হাত বাড়ান।

জীবনবাবু তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'সেই তো মুস্কিল, প্রমাণ সে হাতে ক'রেই এনেছিল। এই যে একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ, আর এই একটা আমেরিকান বই—দাগ দিয়ে রেখে গেছে। আবার স্পর্ধা কত, বলে ছেলেদের ভুল শেখানোর জন্য তাঁরই কান ম'লে দেওয়া উচিত। তাছাড়া সামান্য একটা ইংরেজী বানান, আজকাল যা অনবরতই পালটাচ্ছে, আমেরিকানরা যা একেবারে যা-নয়-তাই ক'রে দিলে, তার জন্য আমার ছেলের প্রধান ইন্দ্রিয় একটা নষ্ট ক'রে দেবেন আপনারা ?'

মাস্টারমশাই কাগজ ও বইখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশ্য একটা কাগজ কি একটা বইই সব নয়—প্রাচীন ইংরেজী বানান বজায় রাখিয়াছে আজও অধিকাংশ লোক, এসব যুক্তি দিয়া অভিভাবককে ঠাণ্ডা করা যায়। পুরাতন বানানের দৃষ্টান্তই বেশী—কিন্তু এসব কথা নয়, বীরেনবাবুর মনের মধ্যকার মূল প্রশ্নটাই মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ধারণা, তাঁহার পদ্ধতি ক্রমশ অচল হইয়া পড়িতেছে—এটাই বড় কথা। অথচ, এইসব নূতন চিন্তা, নূতন ধারণাকেও তাঁহার মন সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না, তিনি আজও বিশ্বাস করেন যে, ছেলেমেয়েদের এ প্রশ্রয় দিলে তাহাদের সর্বনাশই করা হইবে।

একটা সূক্ষ্ম অভিমানও মাথা চাড়া দেয় বৈকি, একটা অত্যন্ত বেদনাবোধ। তাঁহার এতদিনের ঐকান্তিকতার কি এই পুরস্কার ?

সেদিন আর পড়ানো হইল না। বীরেনবাবু সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি চলিয়া আসিলেন। ছেলেরা না তাঁহাকে দেখিতে পায়। এই দীর্ঘ দিন তাঁহার আসন ছিল ছাত্রদের সম্ভ্রম ও ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ অপমানের পর—এই শ্রেণীর ধৃষ্টতা প্রকাশের সমুচিত জবাব দিতে না পারিলে আর তাহাদের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া ?

পরের দিন সেক্রেটারীর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া আবার স্মিত প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইলেন বীরেনবাবু !

সেক্রেটারী একেবারে হৈ চৈ করিয়া উঠিল, 'এ কী করছেন মাস্টারমশাই ? কালকের সেই ব্যাপার তো ? আমি আর প্রেসিডেন্ট কালই রাত্রে ব'সে স্থির করেছি যে, এর একটা সিরিয়াস স্টেপ নেব। সে একটা বাঁদর, দু'পাতা বই প'ড়ে ভাবছে নিজেকে মস্ত পণ্ডিত। বিদ্যা দেখাতে এসেছে আপনার কাছে। তাকে দিয়ে প্রকাশ্যে মাপ চাইয়ে তবে ছাড়ব।'

বীরেনবাবু হাসি হাসি মুখেই বলিলেন, 'না বাবা তার জন্যেও নয়, আমিও তো বুড়ো হচ্ছি, এই বেয়াল্লিশ বছর মাস্টারি হ'ল—সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এর পর ভীমরতি হয়েছে ব'লে তোরাই তাড়িয়ে দিবি তো, তার চেয়ে মানে মানে স'রে পড়া ভালো নয় কি ?'

সেক্রেটারীদের এইটাই বহু দিনকার মনোভাব—সুতরাং, আর দুই একবার তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার ভদ্রতা-সম্মত চেষ্টা করিয়াই হাল ছাড়িয়া দিল—সেটা

বীরেনবাবুও লক্ষ্য করিলেন। অহমিকায় ঘা পড়িলে খুব উদাসীন লোকও সজাগ সতর্ক হইয়া ওঠে বোধ হয়। তিনি কহিলেন, 'তাহ'লে উঠি বাবা? আর এই ক'টা দিন আমাকে ছুটিই দে, কখনও তো ছুটি নিই নি।'

মাস্টারমশায়ের সংসারের কথাটা সেক্রেটারীর অজানা ছিল না, কতকটা সেই বিবেচনাতেই এতকাল তাহারা মাস্টারমশায়ের কাছে অবসর গ্রহণের কথা কখনও পাড়িতে পারে নাই। এখনও সে কথাটা মনে করিয়াই সেক্রেটারী ইতস্তত করিতে লাগিল। কিন্তু বীরেনবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া অগত্যা বলিয়া ফেলিতেই হইল, 'কিন্তু আপনার সংসার চলবে কিসে মাস্টারমশাই?'

'দেখা যাক্!' অত্যন্ত নিশ্চিন্তকণ্ঠে উত্তর দেন বীরেনবাবু, 'আঢ্যিদের শুনেছি খাতা লেখবার একটা লোকের দরকার—দেখি, আমাকে নেয় কি না। নইলে, ঐ রকম যা হোক্ কিছু একটা জুটিয়ে নিতে হবে বৈকি।'

তাহার পর প্রণত সেক্রেটারীর মাথায় হাত রখিয়া নির্মল প্রসন্ন চিত্তে আশীর্বাদ করিলেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, সুখে থাকো, সুস্থ থাকো। জয়ী হও, ভগবান তোমার ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখুন। আজ বাবা আসি।'

আর কিছুতেই কাহারও অনুরোধেই সে পদত্যাগপত্র বীরেনবাবু প্রত্যাহার করিতে রাজি হইলেন না।

## সভাপতি

অনুপম এর আগেও দু'-একটা সাহিত্যসভায় গিয়েছে বৈকি! কিন্তু সে সাধারণ বক্তা হিসেবে, একবার বুঝি প্রধান-অতিথিরূপেও কোথায় গিয়েছিল। সভাপতি এই প্রথম। কেবলমাত্র তাকে নিয়ে যাবার জন্যই সভার উদ্যোক্তারা বিস্তর তেল পুড়িয়ে গাড়ি নিয়ে আসবেন এই টালিগঞ্জ পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে সুদূর সভাস্থলে নিয়ে যাবেন এবং সভা ভাঙলে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। এতখানি অর্থব্যয়, এত ঐকান্তিকতা শুধু তারই জন্য। সেদিনকার সেই উৎসব সমারোহের সে-ই একমাত্র নায়ক।

এর মধ্যে এত আনন্দিত হবার কী আছে, এ তো তার সাহিত্য-সাধনার প্রাপ্য পুরস্কার—এমনি নানা কথায় মনকে বোঝালেও, এই ব্যাপারটিতে আনন্দিত না হয়ে পারে না অনুপম। বিশেষত সকালে বাজার যাবার পথে রাস্তার মোড়ের কাগজওয়ালার কাছ থেকে তিন-চারখানা দৈনিক চেয়ে নিয়ে উল্টে দেখেছে সে, সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এই বিশেষ সভার খবরটাও ছাপা আছে। তার নামও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে সভাপতিরূপে। না, ছাপার ভুল কোথাও নেই, ছাপ ওঠে নি এমনও হয় নি। বেশ পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে তার নামটা।

অবশ্য ভালো ক'রে ভেবে দেখলে, সত্যিই এতে আনন্দিত হবার এমন কিছু কারণ নেই। আর্থিক লাভ নেই অনুপমের এক পয়সাও। বরং খানিকটা সময় নষ্ট, হয়রানি—মেহনত, এমন কি অর্থব্যয়ও কিছু আছে। ফরসা কাপড়-জামা চাই তো! গরজ তাদেরই, তারা সভা ডেকেছে, সভাপতি চাই তাদের, নইলে সমস্ত আয়োজন পণ্ড। কৃতজ্ঞতা যদি এক্ষেত্রে কারুর প্রাপ্য হয় তো, সে তারই।

তবু আনন্দ একটু হয় বৈকি!

এর মধ্যে একটা সম্মানের প্রশ্ন আছে যে, একটা স্বীকৃতির প্রশ্ন আছে। সে যে ভালো সাহিত্যিক, পাঠক-মহলে তার যে কিছু খ্যাতি মিলেছে—এই সভাপতি-রূপে আহ্বান করার মধ্যে সেই কথাটাই কি মেনে নেওয়া হচ্ছে না? এত লোক থাকতে তার কাছেই ওরা এসেছে, একমাত্র তাকেই ওদের প্রয়োজন। অন্য অনেক সাহিত্যিক ছিল, তাদের কারুর কাছে যেতে পারত ওরা। তা না গিয়ে তার কাছেই এসেছে। এতেও কি খুশী হবার, একটু গর্বিত বোধ করার কারণ নেই?

অনুপমের সাহিত্য-সাধনার পথটা যে খুব মসৃণ নয়, তা বলাই বাহুল্য। ক'জন সাহিত্যিকের ভাগ্যেই বা তা হয়। সে কাজ করত কী একটা মার্চেন্ট অফিসে—টাকা সত্তর মাইনে পেত। তাতে যুদ্ধের আগে একরকম চ'লে যেত। তারপর বিবাহ করলে। তখন আর ঐ স্বল্প আয়ে সংসার চলে না। লেখার অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকেই, এখন তাই নতুন ক'রে ঝালিয়ে লিখতে বসল —গল্প আর কবিতা, গল্পই বেশী। পাঠালে বিভিন্ন কাগজে, কেউ ফেরত দিলে কেউ দিলে না। ছাপালে না কেউই।

এক্ষেত্রে হতাশ হবারই কথা, কিন্তু দৈবক্রমে একদিন ওর এক বন্ধুর সঙ্গে

পথে দেখা হয়ে গেল। সে এক বিখ্যাত দৈনিকে চাকরি করে। তাদের রবিবারের সংখ্যা সম্পাদনা করে সে। এই যোগাযোগে অনুপম একটা গল্প পাঠালে—সে গল্প ছাপাও হ'ল। কিছুদিন পরে আর একটা, তারপর আরও।

এইবার ভরসা ক'রে সে অন্য কাগজেও লেখা পাঠাতে লাগল—দু'-একটা ছাপাও হ'ল। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, এরই মধ্যে এক-আধ জায়গায় কিছু কিছু পারিশ্রমিকও মিল্‌ল। হোক্ সামান্য, তবু নিজের রচনার মূল্য—ওর সেদিন মনে হয়েছিল যেন বিনাশ্রমেই পেলে সে টাকাটা।

টাকাটার প্রয়োজনও ছিল সেদিন খুব বেশী। অফিসে যা মাইনে পেত তার সঙ্গে মাগ্‌গি ভাতা যোগ হয়েও সংসার চলে না। অথচ খাটতে হয় ভূতের মত। সেখান থেকে ফিরে রাত্রে আর এতটুকু পরিশ্রম করার শক্তি থাকে না। থাকলেও বাজার, রেশন, গয়লা—এ সব ক'রে সময় পাওয়া যায় না।

এই সময় হঠাৎ ও একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ ক'রে ফেল্‌লে। চাকরিটি দিলে ছেড়ে। স্ত্রী সুপ্রিয়াকে বললে, 'ভাবছ কেন, সাহিত্য ক'রে খাব। তাতে যদি একবেলা খাই তো সেও ঢের ভালো, ঢের বেশী সম্মানের।'

আসল কথা, এই সময় সে অধিকাংশ দিনই অফিসে মন দিয়ে কাজ করতে পারছিল না। নিয়মিত হাজরেও পড়ত না। তার মত কনিষ্ঠ কেরানীর এত গাফিলতি সইবে কে? অফিস তাই ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল।

কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারলে। যে সব কাগজ লেখার মূল্য দেয় তাদের সংখ্যা খুব পরিমিত। তাদের ছাপবার সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, প্রতি সপ্তাহে একই লোকের লেখা তো ছাপা সম্ভব নয়। দৈনিকে বড় জোর মাসে একবার বেরোতে পারে, মাসিক-পত্রিকায় তিন মাস অন্তর। সেভাবে যদি নিয়মিত লেখা যায় তাহ'লেও মাসিক একশ' টাকা আয় তোলা সম্ভব নয়। তবু তখন যুদ্ধের বাজার—অবস্থা সকলেরই সচ্ছল।

অগত্যা অনুপম প্রকাশকদের দ্বারস্থ হ'ল। গল্প সে ভালোই লেখে বটে, তার নামও তাঁরা শুনেছেন, কিন্তু ছোটগল্পের বইয়ের কিছুমাত্র চাহিদা নেই। লাইব্রেরি থেকে যাঁরা বই কিনতে আসেন তাঁর আগেই ব'লে দেন, 'দেখুন বই যা দেবেন তাতে টুকরো গল্প না থাকে। টানা গল্প চাই।' অর্থাৎ, সকলেই উপন্যাস চান।

'কিন্তু কাগজে যে এত গল্প ছাপা হয় সেগুলোর গতি কী হবে?' প্রায় হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে অনুপম।

'ঐ নগদ বিদায় যা পেলেন।' একজন প্রকাশক বুঝিয়ে দেন ওকে।

একখানা ছোটগল্পের বই তবু এক প্রকাশক দয়া ক'রে ছাপলেন—শর্ত হ'ল তার জন্য অনুপম কোনো টাকা চাইবে না। তিনি বললেন, 'এতে যে আপনার নাম ছড়াবে, ধ'রে নিন ঐটেই লাভ।'

তথাস্তু।

আর একজন প্রকাশক দিলেন পঞ্চাশটি টাকা। উপদেশ দিলেন, 'উপন্যাস লিখুন, বেশী ক'রে টাকা দিতে পারব।'

তা তো পারবেন, কিন্তু তার অবসর মেলে কৈ ?

তার আগে যে হাঁড়ি চড়ার বন্দোবস্ত করতে হয়। খবর নিয়ে জানলে অনুপম যে ছেলেদের য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস এ-সবের খুব চাহিদা আছে। অগত্যা তাই লিখতে বসল। প্রথম প্রথম ভেবেই পেত না কী লিখবে, কিন্তু এখন চালাক হয়ে গেছে। দেখছে যে, এ ধরনের বই নিজস্ব রচনা খুব কম লোকেরই আছে। সবাই সাগরপারের বই প'ড়ে অজীর্ণ উদ্গার করেন। অনুপমও সেই পথ ধরল। কিন্তু তাতেই বা ক'টা টাকা পাওয়া যায় ? পরিশ্রম করতে হয় ঢের বেশী। বই পড়া, তাকে আত্মসাৎ করা, তারপর লেখা। কত বই হয়তো কাজেও আসে না, তবু সেগুলো প'ড়ে দেখতে হয়।

এতদিন পরে সে বুঝতে পেরেছে যে, কেরানীগিরির চাইতে ঢের বেশী পরিশ্রম এতে। অথচ এত যশও নেই। ছোটগল্প সে সত্যিই ভালো লিখতে পারত, হয়তো এখনও পারে, কিন্তু পড়বে কে ? যদি বা পড়ে—কিনবে না। প্রতিদিনকার উদরান্নের সংস্থান করতে করতে ভালো উপন্যাস ভাবাও যায় না, লেখা তো যায়ই না। ছোটগল্পের কিছু চাহিদা হয় পূজার সময়। টাকাও কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সে টাকা কোনো কাজেই দেয় না। পূজার নানা খরচ রাঘব বোয়ালের মত সব আয়টাকেই গিলে নেয়।

কিন্তু আজ আর ফেরবার উপায় নেই। নতুন ক'রে কেরানীগিরি শুরু করা যায় না। পাবেও না হয়তো। এই অজ্ঞাত অখ্যাত জীবনই তাকে যাপন করতে হবে—সাহিত্যের নামে কলম পিষে।

এমনি হতাশা যখন প্রায় তাকে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ক'রে তুলেছে সেই সময় এল এই সভার আহ্বান !

তবে তো একেবারে ব্যর্থ হয় নি। তবে তো তাকেও চেনে দু'চারজন, স্বীকার করেছে তাকে সাহিত্যিক ব'লে !

সেই জন্যই ওর বিশেষ একটি আনন্দ, সেই জন্যই ওর এই গর্ব।

গাড়ি এল ঠিক পাঁচটার সময়।

অনুপম প্রস্তুত হয়েই ছিল। সারা সকাল ধ'রে সুপ্রিয়া জামা-কাপড় সাবান কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি ক'রে রেখেছে। ইস্ত্রি তো ছাই—ভাঁজ করে বিছানার নিচে রেখে দেওয়া, দেহের চাপে যা ইস্ত্রি হয়। তবু তাতেই মন্দ দেখাচ্ছে না। অনুপম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক ক'রে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়িটা ভালো নয়, বহুদিনের পুরানো গাড়ি—ঝর্ ঝর্ করতে করতে চলল, দু' তিনবার খারাপও হ'ল। তা হোক্—অনুপম মনটাকে বোঝালে, ভালো গাড়ি পরে দেবেই বা কেন? আর এতে তো তেল খরচা কম হচ্ছে না। এবং সে খরচা হচ্ছে শুধু তাকে নিয়ে যাবার জন্যই।

সভাস্থলে পেঁাছে কিন্তু তার মনটা দমে গেল।

দর্শক বা শ্রোতা—যা-ই বলুন, তার সংখ্যা খুবই কম। শুধু শ' খানেক ছোট ছেলে সামনের ফরাসে ব'সে মহা হৈ চৈ করছে। তরুণ বা প্রবীণের সংখ্যা জনা-ত্রিশের বেশী হবে না। অবশ্য এ ছাড়া উদ্যোক্তারা আছেন— সেও জন-পনেরো-কুড়ি।

ওর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে একজন উদ্যোক্তা বললেন চুপি চুপি, 'লোক হবার কথা ঢের বেশী, মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, আজ একটা ভাল খেলা আছে কিনা এখানে, সবাই সেইখানে গেছে। এটা আমরা জানতুম না।'

যথারীতি সভা আরম্ভ হ'ল। কে যেন একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল ওর গলায়। সভাপতির নাম যিনি প্রস্তাব করতে উঠলেন তিনি ওর নামটা ভুল বললেন এবং পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। নাটক অনুপম জীবনে লেখে নি। কিন্তু তবু কোনো প্রতিবাদ করতে ওর মন সরল না। কী হবে মিছিমিছি মেজাজ খারাপ ক'রে?

তারপর শুরু হ'ল সভার কাজ। এইবার একটু একটু ক'রে জ্ঞানলাভ করলে অনুপম, সভা সাহিত্যর জন্য নয়—আসলে এদের নিজেদের আবৃত্তি ও গান শোনানোর উপলক্ষ্য এটা। একটি প্রবন্ধ পঠিত হ'ল—প্রলাপে পূর্ণ। তাছাড়া অসংখ্য আবৃত্তি। যারা করছে তাদের কারুর উচ্চারণ শুদ্ধ নয়, কবিতার লাইন মুখস্থ নেই—মানে তো বোঝেই না। আবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে চলল গান। কী তার বাণী, আর কী যে তার সুর কিছুই বোঝার উপায় নেই। দু'-একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার চেষ্টা করলে, কিন্তু অনুপম দেখলে সেগুলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত ব'লে চিনতে কষ্ট হয়। আকৃতি-প্রকৃতি, অর্থাৎ বাণী ও সুরে কিছুই

ওর পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না।

এই কষ্টকর ব্যাপার চলল রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। ছেলেপুলেরা সমানে হৈ-চৈ ক'রে যাচ্ছে, শুধু যখন কোনো একটা পর্ব শেষ হচ্ছে তখন ঘন ঘন করতালি এবং শিস্ দিয়ে নিজেদের উৎসাহ প্রকাশ করছে তারা।

এর পর যখন সভাপতির অভিভাষণ দিতে উঠল অনুপম তখন বয়স্করা সবাই চ'লে গেছেন। আছে ঐ ছেলের দল। অনেক ভালো ভালো কথা সে ভেবে এসেছিল, কিন্তু এখন এদের কাছে সে সব কথা বলতে ওর লজ্জা বোধ হ'ল। অথচ কী বলবে, কী বলা উচিত তাও ভেবে পেলে না। কোনোমতে সেই সব বড় বড় কথা—সাহিত্যের রসবস্তু ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া ভাবে ব'লে ব'সে পড়ল! এইটুকু সভা, ক'টাই বা লোক কিন্তু তবু মাইক ও লাউড-স্পীকার ভাড়া করা হয়েছিল ঠিকই। মাইকের সামনে বলতে উঠে লজ্জায় অনুপমের মাথা কাটা যাচ্ছিল।

সভা ভেঙ্গে যখন অনুপম উঠল তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তিতে সে অবসন্ন। উদ্যোক্তারা ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে অবশ্য কিছু জলযোগ করালেন। ঠাণ্ডা সিঙ্গাড়া, দুর্গন্ধ পান্তুয়া। তার সঙ্গে কানাভাঙ্গা কাপে কড়া তেতো চা। সম্ভবত সামনের রাস্তার ধারের দোকান থেকে আনানো। তবু তাই প্রাণপণে গিলল অনুপম। নইলে সে আর দাঁড়াতে পারছে না তখন।

এইবার ওঁরা আসল কথাটা পাড়লেন। যে গাড়িখানা বিকেলে পাওয়া গিয়েছিল সেটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে, অন্য গাড়িও যোগাড় হ'ল না। অনুপম যদি কিছু মনে না করে তো বাসেই—অবশ্য বাস্ এখন সব খালিই যায়, কোনো অসুবিধা হবে না।

তবু একবার ক্ষীণকণ্ঠে অনুপম বললে, 'ট্যাক্সি, এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না?'

'দেখুন—' একজন খুব সঙ্কুচিতভাবে বললেন, 'ট্যাক্সি বড্ড বেশী নেবে এখান থেকে, আমাদের ফাণ্ড পারমিট করছে না। শুধু তেলের খরচটা হ'লে দিতে পারতুম। এক মাইক ভাড়া করতেই বিস্তর বেরিয়ে গেল কিনা!'

অগত্যা অনুপমকে উঠতে হ'ল। দু'-তিনজন এসে বাস্ অবধি পেঁৗছে দিয়ে গেল। কে একজন আনা-চারেক ভাড়া দিতে এসেছিল, অনুপমের আত্মসম্মানে বাধল। সে নিলে না।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। যেখানে বাস্ বদল করার কথা, সেখানে

বাস্ আর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত হাঁটতে শুরু করলে। কিন্তু পথও বহু দূরে, ঘণ্টাখানেক চলবার পর একটা চলতি রিক্সার সঙ্গে দর ক'রে উঠে বসল। একটা টাকাই ছিল পকেটে, তার সবটারই মায়া ত্যাগ করতে হ'ল, নইলে এত রাত্রে, এতটা পথ সে যেতে প্রস্তুত নয়।

সুপ্রিয়া তখনও জেগে বসেছিল। দোর খুলে দিয়ে বললে, 'বাবা ধন্যি তোমার সভা করতে যাওয়া। এই এত রাত অবধি কিসের সভা? কৈ, গাড়ি এল না?'

সংক্ষেপে অনুপম বললে, 'না পথে খারাপ হয়ে গেছে—'

সুপ্রিয়া ভাত বেড়ে দিলে, ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। তাও পরিমাণে অত্যন্ত অল্প। একটু অপ্রস্তুতভাবেই বললে, 'ভাত বোধ হয় তোমার কম হবে। কী করব একদানা চাল নেই ঘরে। এমন আটাও নেই যে দু'খানা রুটি গড়ি। ছেলেমেয়ে দুটো কাল সকালে যে কী খাবে তা জানি না—বাসী রুটি থাকলে তবু খায়। কাল সকালে যতক্ষণে রেশন আসবে ততক্ষণে হাঁড়ি চড়বে।'

একটা হিমের মত কী যেন মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে যায় অনুপমের। শেষ টাকাটি যা তার হাতে ছিল, এইমাত্র রিক্সাওলাকে দিয়ে এসেছে সে।

পরক্ষণেই মনে প'ড়ে যায় কথাটা, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুপ্রিয়া বলে, 'হ্যাঁ। নইলে রাত বারোটা পর্যন্ত উপোষ ক'রে ব'সে থাকব নাকি? ক্ষিদে পায় না?'

মিছে কথা ব'লেই এত কথা বললে সুপ্রিয়া—তা অনুপম জানে। যেখানে তার ভাতই পরিমাণে কম সেখানে সুপ্রিয়া আগে খেয়ে নেয় নি এটা ঠিক। কিন্তু তারও তখন আর খুঁচিয়ে সত্যি কথা জানবার অবস্থা নয়, সে সব ভাতগুলোই খেয়ে উঠল।

পয়সা কাল সকালেই চাই। যে প্রকাশক দু' পাঁচ টাকা দিতে পারেন বাড়ি গেলে, তিনি কিছু কপি হাতে না পেলে দেবেন না। অগত্যা এখনই কপি লিখতে বসতে হবে। যতই রাতই হোক্, আর যত ক্লান্তই হোক্ সে।

সংকীর্ণ ঘর, তার সবটাই প্রায় তক্তপোশে জোড়া। তাতে মলিন বিছানা এবং শতছিন্ন মশারি, সেখানে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে। তার পাশে শোওয়া যায় কোনোমতে, কিন্তু ব'সে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।

অগত্যা, এইমাত্র যেখানে সে ব'সে খেলে, ফালি-মত সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু,

সেইখানেই হ্যারিকেন নিয়ে লিখতে বসল অনুপম। এখনও সেখানটা ভিজে, উচ্ছিষ্টের গন্ধ ছাড়ছে।

'আবার এত রাত্রে লিখতে বসলে?' সুপ্রিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'উপায় নেই। তুমি শুয়ে পড়ো। আমাকে অন্তত সাত-আটখানা কাগজ যেমন ক'রে হোক্ ভরাতেই হবে।'

## পরিণাম

সিসি বোস বরাবরই, ঐ যাকে বলে, একটু মহৎ-পূজারিণী গোছের ছিল, অর্থাৎ কিনা "হিরো ওআরশিপার"—মেয়েলী কথায় বলা যেতে পারে শক্তের ভক্ত। তা না হ'লে, ধরুন ছেলেবেলায় দেখতে শুনতেও মন্দ ছিল না, এতদিনে কবে ভালো ঘরে বিয়ে-থা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারত। ঐ ঝোঁকটার জন্যেই না এত বিপত্তি!

আর, আমাদের মনে হয় এর জন্যে ওর ঠাকুরদাই অনেকখানি দায়ী। তিনি যদি ওর নাম মাতঙ্গিনী জগদম্বা না হোক্—কমলা বিমলা, এমন কি রেবা ইরা রাখতেন তাহ'লেও এ ঝোঁকটা ওর হ'ত কিনা সন্দেহ। তিনি আদর ক'রে "এটি আমার মেম-মেম নাতনী—আমার বিবি-বিবি নাতনী" ব'লে নাম রাখলেন সিসিলিয়া। একেবারে বিলিতী নাম। একটু বড় হ'তেই ওর মাথায় গেল যে, যে হেতু পাড়ার বুঁচি-পুটি-খেঁদি-ক্ষেন্তির সঙ্গে ও-নামে কোথাও মিল নেই—না আটপৌরে না পোশাকী—সে-হেতু মানুষটাও ও একটু অসাধারণ! চালচলনটাও একটু ভিন্ন রকমের হওয়া চাই ওদের থেকে।

তার ওপর ওর ঠাকুরদা অনেক বেশী বয়স অবধি ওর চুল রেখেছিলেন 'বব্' ক'রে—ভালো বিলিতী অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক পরিয়েছিলেন, ফ্রক প'রে বেড়াবার শোভন বয়সটা পার হয়ে যাবার পরও—তাতে ক'রে ওর মেজাজটা গেল আরও বিগড়ে—

ওর প্রথম-প্রণয়ের ইতিহাস শুরু হয়েছিল ছ'বছর বয়সে। পাড়াতে কেলো ছিল ছেলের সর্দার। পরের বাগানের পাঁচিল টপ্‌কে ফুল চুরি করতে,

পেয়ারার সরু ডালে এগিয়ে গিয়ে পেয়ারা পাড়তে এবং ইস্কুল পালাতে তার জুড়ি ছিল না এ পাড়ায়। বলা বাহুল্য সিসি তার ভক্ত হয়ে উঠল। বিশেষ ক'রে যেদিন কল্‌কে ফুলের একটা অপল্‌কা ডাল ভেঙ্গে পড়তে পড়তে ও হঠাৎ পাশের নিমডালটা ধ'রে নিজেকে সামলে নিলে, সেদিন সিসি ওর মার ঘরের মিট্‌সেফ থেকে সন্দেশ চুরি ক'রে না এনে দিয়ে পারলনা। শেষ পর্যন্ত ধরা প'ড়ে মার খেলে (চুরি করার জন্য শুধু নয়, চুরি ক'রে নিজে খাওয়ার জন্য)—তবু কী জন্য অপরাধ এবং কার জন্য কিছুতেই বললে না।

ভয় নেই—কেলোর বয়সও তখন সাত-আট। তবু হয়তো অনায়াসে সে দেবদাসের ভূমিকায় পৌঁছাতে পারত যদি না শিগ্‌গিরই কেলোর বাবা বদলী হয়ে কাঠিহারে চ'লে যেতেন। অতএব, ও পর্বের ঐ-খানেই পরিসমাপ্তি। সিসির বিরহ ছিল তিন-চার দিন। সে ভালো ক'রে খায় নি, পড়ে নি, মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়িয়েছিল। ওরা মা মেয়ের এই ভাবান্তরের কারণ খুঁজে না পেয়ে স্বামীকে ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দেবেন ভাবছেন—এমন সময় সিসি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

এর পর বছর-দুইয়ের খুব বিস্তৃত ইতিহাস জানা নেই। তবে পূজারিণীরা শ্রদ্ধাস্পদ ছাড়া বাঁচতে পারে না—সুতরাং পূজার পাত্র কেউ কেউ ছিল নিশ্চয়। আপনারা লক্ষ্য ক'রে দেখবেন পুরুষের মধ্যেও এই ধরনের চরিত্রের অভাব নেই। লতার মত এরা সর্বদা শক্ত গাছের ডাল খোঁজে, তাদের আশ্রয় ক'রে নিশ্চিন্ত হয়। তবে লতার সঙ্গে তফাত এই যে লতা তার সমস্ত ভার ছেড়ে দেয় মহীরুহকে, কিন্তু মানুষ-লতাকে কিছুটা মহীরুহের ভারও বইতে হয়—কিছু ফায়-ফরমাশ খাটা, কিছু বকুনি, বা মার খাওয়া (বয়স ভেদে) কিছু কিছু বা ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিত হওয়া—এসব সহ্য করতে হয়, এবং আনন্দেই সহ্য করে ওরা। সেইটেই তাদের গর্ব ও সান্ত্বনা।

সে যাই হোক্—ইতিহাসটা যখন আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে অশোক। পাড়ার বিখ্যাত তরুদির ছেলে। এই তরুদির কাজ ছিল বেলা দশটায় স্বামী অফিসে গেলে ও ছেলেমেয়েরা ইস্কুল গেলে একবার বেরিয়ে পড়তেন 'রোঁদে'—পাড়ার সমস্ত কেচ্ছা গৃহ হ'তে গৃহান্তরে সংগ্রহ ও বিতরণ করতে করতে একেবারে সিংহীদের পুকুরে স্নান ক'রে বাড়ি ফিরতেন বেলা তিনটেয়, তখন বিকেলের উনুনে আঁচ দিয়ে নিজে সকালের ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত খেতে বসতেন। এর ভেতর ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানোর সময় কৈ?

স্বামীও অফিস থেকে বেরিয়ে লোহার বাজার ঘুরে বাড়ি আসতেন রাত নটায়, সুতরাং অশোকের পাথরে পাঁচ কীল, সে ইস্কুল যাওয়ার থেকে না-যাওয়া দিনের সংখ্যাটা বাড়িয়ে ফেললে এবং ডাংগুলি থেকে শুরু ক'রে ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি সমস্ত রকম খেলাতেই অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন ক'রে 'হিরো' হয়ে উঠল। আরও বহু গুণ তার ছিল। পাড়ার সমস্ত দোকানে ধার ক'রে খাবার খেত এবং বন্ধু বা স্তাবকদের খাওয়াত—বলত 'ধরা পড়লে মার খাওয়াটা একদিনের, দেড়মাস দু'মাস মিষ্টি খাওয়ার পর একদিন খাওয়া যায়। জানি দেনা তো বাবাকে শুধতেই হবে।' এছাড়া ইস্কুলের মাইনে মেরে দেওয়া এবং মার বাক্স ভাঙ্গা তো আছেই। সবচেয়ে—এগারো বছরের ছেলে যেদিন প্রকাশ্যে মাঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলে, সেদিন থেকে মনে মনে পূজা না ক'রে থাকতে পারলে না সিসি।

কিন্তু ওর বরাতটাই এমনি। খুব বাড়াবাড়ি হ'তে অশোকের বাবার টনক নড়ল, তিনি ওকে 'রাঁচি' না কোথাকার কোন্ ইস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। এবার বিরহটা সামলাতে একটু বেশী সময় লাগল—দিন দশেক প্রায়।

আপনারা বলবেন এসব তো ছেলেমানুষি। কাজের কথাটা পাড় তো বাপু।

আমিও মেনে নিচ্ছি এসব ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষি যেটা নয় সেটা ওর শুরু হয়েছিল বছর ষোল বয়সের সময়ে। তখন ও ক্লাস নাইনে পড়ছে। মাঠে মাঠে ঘোরা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু ইস্কুলে যাওয়া বা বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার তো কোনো বাধা নেই। তাছাড়া মাঠের দিকে চেয়ে দোতলার বারন্দা কি তিন-তলার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। অর্থাৎ, মাঠের বার্তা এসে পৌঁছয় অন্তঃপুরেও। কাজেই ওদের পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটে দত্ত-গিন্নীর সঙ্গে যখন মায়ের খুব মাখামাখি শুরু হ'ল এবং সেই সুযোগে দত্ত-গিন্নীর মেজছেলে নন্তুর আসা যাওয়ার বাধা রইল না তখন সিসি অনায়াসে এই ছফুট লম্বা ছেলেটিকেই মাঠের অধুনা সমস্ত মারামারির নায়ক ব'লে চিনতে পারলে। নন্তুরও বোধ হয় এই একই বয়স। তবু ঈশ্বর তাকে এমন অপরূপ স্বাস্থ্য ও শক্তি দিয়েছেন যে তাকে বয়সে অনেক বড় ভেবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে আটকাল না। ইতিমধ্যেই গুণ্ডা ব'লে ওর নাম রটে গিয়েছিল পাড়ায়—যদিচ বিড়ি সিগারেট নন্তু আজও খায় কি এবং ইস্কুলেও খুব গবেট ছাত্র নয় সে।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য—বুদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এটুকু রূপান্তর অনায়াসে কর

যেতে পারে—বিশেষ মেয়েদের বেলায়। সিসি বললে, 'তুমি তো শুনেছি পাটীগণিতে খুব পাকা। আমাকে একটু দেখিয়ে দেবে নন্তুদা? ঐ ঘোড়ার ডিম ঐকিক নিয়ম আর সুদকষা ও কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।'

নন্তুর মা হেসে বললেন, 'বেশ তো তোরা একসঙ্গে ব'সে সন্ধ্যেবেলা তো পড়তে পারিস।' ব'লে গলা নামিয়ে সিসির মাকে চুপি চুপি বললেন, 'দেখতেই ঐ রকম তেধ্যাড়াঙ্গা লম্বা, নইলে বয়স তো কিছুই না।'

বোস-গিন্নী বিগলিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—সে আমরা দেখে বুঝতে পারি না। ওসব কথা আমার মাথাতেও যায় নি। তুমি যেমন ক্ষ্যাপা।'

হয়ে গেল বন্দোবস্ত পাকা। পড়ার ফলাফল যাই হোক—পড়াটা জমল খুব। অবশ্য সেজন্য সিসিকে মূল্যও কম দিতে হয় নি। চড় চাপড় গাঁট্টা—এটা ছিল নন্তুর আদরের মধ্যে। বল খেলে পায়ে ব্যথা ক'রে এলে পা টিপে দিতে হ'ত। যথেষ্ট জোরে না দিতে পারলে লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। ব্যায়াম ক'রে এলে পেশী শক্ত হয়ে যায়—তার জন্য মাসাজ করতে হয় কী ক'রে শিখিয়ে দিয়েছিল নন্তু, কিন্তু ওর ঐ বিশাল কঠিন দেহে কী ক'রে মাসাজ করবে সিসি ভেবে পেত না। ঘামে হাত পিছলে যেত বার বার—( অনেক সময়ে ইচ্ছে ক'রেও—কারণ, হুমড়ি খেয়ে পিঠে পড়া যেত, পিছন থেকে ওর দেহের বলিষ্ঠতা অনুভব করতে পারত ) সে জন্য রাগ ক'রে নন্তু একদিন কামড়ে দিয়েছিল ওর আঙুলে, কেটে রক্ত বার হয়ে গিয়েছিল। সেটা জানালায় চিপ্‌টে গেছে ব'লে চালাতে হয়েছিল।

বছর খানেক কাটবার পর দুই গিন্নীরই টনক নড়ল। তখন বোস-গিন্নী দোষারোপ করেন দত্ত-গিন্নীকে—দত্ত-গিন্নী করেন বোস-গিন্নীকে। সে যাই হোক্, নন্তুর এ বাড়ি আসা এবং সিসির ও বাড়ি যাওয়া বন্ধ হ'ল। তার ফলে গোটা পড়ার সময়টা চিঠি লিখতেই কেটে যেত রোজ। সে চিঠি পৌঁছে দেবারও লোক পাওয়া যেত। পাড়ার অনেক মেয়েই নন্তুর এবং অনেক ছেলেই সিসির ফরমাশ খাটবার জন্য আগ্রহান্বিত। ব্যাপারটা কতদূর গড়াত বলা যায় না—কারণ, নন্তুর আরও বহু ভক্তিমতী সেবিকা জুটল এবং সে খবর পেয়ে সিসি রেগে চিঠি দেওয়া বন্ধ করলে। তাতে কারুরই পড়াশুনোটা অবশ্য এগোল না। দু'জনেই সে বছর ফেল করলে।

সিসি ফেল ক'রে কিন্তু সত্যিই সামলে গেল। মন দিয়ে প'ড়ে পরের বছর আবার পাস করলে ফার্স্ট ডিভিশনেই।

এই সময়ে অনেকগুলি বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। এর আগেও।

কিন্তু মেয়ে যখন পাস করে নি তখন সিসির বাবার আঁচ ছিল যেমন তেমন খেতে পায় চাকরি বাকরি করে এমন একটি ছেলে। সে রকম দু'-একটি খোঁজ আসে নি যে তা নয়, কিন্তু মা বললেন, 'আমার সুন্দরী মেয়ের পাশে দাঁড়াবার মত পাত্তর চাই বাপু। হোঁদল-কুৎকুতে ধ'রে দিতে হবে এমন কী অরক্ষণা হয়েছে ?'

ফলে কোনো সম্বন্ধই পাকে নি। মেয়ে যখন একটা পাস করলে বাপেরও আঁচ গেল বেড়ে। বললে, 'গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই ছেলে, দেশে জমি-জায়গা কি শহরে বাড়িঘর থাকা চাই।'

দুটো পাসের পর স্থির হ'ল এম-এ পাস জামাই হবে, কিংবা ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার। তিনটে পাস, অর্থাৎ বি-এস্-সি পাস করার পর মেয়ে বললে, 'সেদিন আর নেই বাবা, যে তোমরা যা ধ'রে দেবে তাই 'পতি পরম গুরু' ব'লে মেনে নেব আর সেবা করব। আমার পাত্র আমি নিজে খুঁজে নেব। সময় হ'লে নিজেই বলব—ও সব বাজে লজ্জা আমার নেই।'

তথাস্তু! ভয়ে বাপ মা চুপ ক'রে গেলেন।

এম-এস্-সি পড়বার সময় সিসি আবিষ্কার করলে যে, ওদের এক প্রফেসার এই পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেন নি—যথেষ্ট ইন্‌টারেস্টিং মেয়ের দেখা পান নি ব'লে। অত্যন্ত সচ্চরিত্র, কোনো মেয়েই কোনোদিন টলাতে পারে নি। সিসি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে এর ধ্যান ভাঙ্গাতেই হবে। নইলে সিসিলিয়া নামই মিথ্যা আমার।

বান্ধবীরা বললে, 'ও কিরে, তোর কী প্রবৃত্তি! ও যে বুড়ো!'

'হোক বুড়ো। জ্ঞানতপস্বী তো। শিবও তো বুড়ো ছিলেন, তবু তার জন্য উমা অপর্ণা হয়ে তপস্যা করেছিলেন। অতএব একটা অধ্যাপকের জীবনে যদি একটু সেবা, একটু মমতার ছোঁয়াচ দিতে পারি সেটা কি আমার কম লাভ হবে মনে করিস ?'

তবে সিসির তপস্যা উমার মত কঠিন হ'ল না। লেক্‌চারের পর সব মেয়ে যখন বেরিয়ে যায় সিসি এসে চেয়ারের কাছে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে দু'-একটা। অধ্যাপক রায় যখন উৎসাহিত হয়ে ওকে সেই সব প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানের জটিল রহস্যগুলি (যা নাকি খুবই সহজ এবং স্থূল—সিসিও যা বহুক্ষণ পূর্বেই বুঝেছে) বোঝাতে থাকেন তখন গদগদ চিত্তে শোনে সিসি, বিস্ফারিত হয়ে

থাকে ওর চোখ, দৃষ্টি হয়ে ওঠে একাগ্র—তাতে যেমন ফোটে শ্রদ্ধা, তেমনি বিস্ময় —আর ঠোঁট-দু'টি একটু ফাঁক হয়ে ভেতর থেকে শুভ্র সুন্দর দাঁতের আভাস উঁকি মারে। অর্থাৎ, হাঁ করে শুনছে এই ভাব ফুটিয়ে তোলে সমস্ত ভঙ্গিতে।

ফল হ'ল অচিরাৎ। অধ্যাপক লেকচারের সময় ওকে ডেকে সামনে বসান। পড়ান শুধু যেন ওকে লক্ষ্য ক'রেই। তেমনি শ্রদ্ধা, তেমনি ঐকান্তিকতাই ফুটে ওঠে সিসির চোখে। তাতে আরও উৎসাহিত বোধ করেন রায়। একদিন পড়া শেষের প্রশ্নোত্তর-বাসরে অধ্যাপক ঝোঁকের মাথায় ওর চিবুক ধ'রে নেড়ে দিলেন, পরের দিন ওর হাতটা ধ'রে মুঠো ক'রে রইলেন। তার পরের দিন ঘরে ডেকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে এখন থেকেই কিছু কিছু রিসার্চ কর। তোমার মত রিসার্চ-য়্যাসিস্টাণ্ট পেলে আমি এই বয়সেও একটা কিছু দেওয়ার মত দিয়ে যেতে পারি বিজ্ঞানের জগতে। এমনি শ্রদ্ধা—এমনি অনুসন্ধিৎসা না থাকলে হয়? মারী কুরীকে যদি না পেতেন তাহ'লে পিয়েরে কুরী কিছু করতে পারতেন, না মারীরই কিছু হ'ত তাঁকে না পেলে!'

সিসি সলজ্জ বিনয়ে মাথা হেঁট ক'রে বললে, 'আমি কি আপনার সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। তুমিই পারবে। কাল থেকেই শুরু করে দাও।'

কুরী-দম্পতির উপমাটা খুবই ভালো হয়েছিল। হয়তো এ প্রণয়-পর্বের পরিণতি তেমনিই একটা কিছু হ'ত—যদি না অত সহজে জয় ক'রে সিসির আগ্রহটা কিছু স্তিমিত হয়ে আসত। ও সত্যি-সত্যিই মনে মনে যখন ভাবতে শুরু করেছে বৃদ্ধের সঙ্গে ঘর করতে গেলে কী কী অসুবিধায় পড়তে হবে, তখন হঠাৎ একদিন ওদের কলেজে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে এক সাহিত্যিক-সভাপতির সম্মান দেখে ওর মাথা গেল গুলিয়ে। তিনি এলেন যেন দিগ্বিজয়ীর মত। সবাই এগিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলে তাঁকে, গলায় ফুলের মালা পড়ল, সভাপতি-বরণ করতে গিয়ে ওদের এক নামজাদা অধ্যাপক কত কি স্তুতি করলেন—তাতে সবিনয়ে নুয়ে পড়লেন না সভাপতি, বরং প্রসন্নস্মিত মুখে সেটাকে নিজের প্রাপ্যের মত গ্রহণ করলেন, দেবতা যেমন ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন তেমনি ভাবে—তারপর যখন তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেন তখন কী নিস্তব্ধতা ও একাগ্রতা চারিদিকে, সকলে গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে, তারও পরে সভা ভাঙ্গলে অটোগ্রাফ নেবার জন্য কী হুড়োহুড়ি সকলকার। সে

কী ধাক্কাধাক্কি এবং কাড়াকাড়ি; খাতার সাদা পাতায় সামান্য একটা কালির আঁচড়ের জন্য। শুধু তো একটা নাম-সই, তারই এত মূল্য!

সিসি মন স্থির ক'রে ফেললে। সাহিত্যিককেই সে বাকি জীবনটা পূজা করবে। যদি সারা জীবনের জন্য কাউকে সঙ্গী করতেই হয় তো এমনি লোক বেছে নেওয়াই ভালো। পথ সে দেখতে পেয়েছে এবার, আর ভুল হবে না, আর এদিক ওদিক তাকাবে না সে।

এ সাহিত্যিক অবশ্য ওর স্বজাতি স্বঘর নন। তা না হোক—ওতে আর আজকাল আটকায় না।

সে কিছু লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে, কিছু বা কিনে, সেই সাহিত্যিকের সব বই প'ড়ে ফেললে। তারপর লিখলে এক দীর্ঘ চিঠি—ওর বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে (ভদ্রলোক কথাসাহিত্যিক—অর্থাৎ কিনা নভেল-লেখক) নানা প্রশ্নের অজুহাতে অজস্র স্তুতি ক'রে। সাহিত্যিকটির নাম—আসল নাম নাই বললুম—ধরা থাক সুদর্শন। সুদর্শন এতদিন সাহিত্য-চর্চা ক'রে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকা সম্বন্ধে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন এই চিঠি। এমন ভক্তিমতী পাঠিকা কখনও কেউ পেয়েছে কিনা সন্দেহ, সুদর্শন তো নয়ই। সুতরাং, তিনিও দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এমনি চিঠি লেখালেখি বার তিনেক, তারপরই সাক্ষাৎ। দেখা গেল সুদর্শন মৃতদার—বয়সও খুব বেশী নয়। একটি মেয়ে আছে, সে থাকে মামার বাড়ি। সিসি ওকে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ জানালে বাড়িতে। তারপর চা-পানের উপলক্ষে করলে আমন্ত্রণ—তারপর অকারণেই শুরু হ'ল ওর আসা। মাস-দুই পরে উদ্দেশ্যটা সিসি খুলে বললে বাবার কাছে।

ওর বাবার তখন রিটায়ার করার বয়স হয়ে গেছে, টেনে টুনে আর একটা বছর এক্‌সটেন্‌শ্যন্ পাবেন কিনা সন্দেহ—আশা করতে শুরু করেছিলেন কবে যে মেয়ে পাস ক'রে ভালো রকম একটা চাকরি খুঁজে নেবে, এমন সময় এই আকস্মিক আঘাত। এমনিতেই যথেষ্ট দুঃখিত হবার কথা, তারপর পাত্রের বিবরণ শুনে একেবারে অবাক—যাকে বলে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

'সাহিত্যিক? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'তার মানে?' মেয়ের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে সপ্তমে চ'ড়ে উঠল, স্বর হয়ে গেল তীক্ষ্ণ।

'বা, এতদিন ধ'রে এত বেছে শেষকালে আর পাত্তর পেলি না, সাহিত্যিককে বিয়ে করবি? বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবার সাহিত্যিক, আরশোলা আবার

পক্ষী! দেখ্‌গে যা—হয়তো নেশাভাঙ্‌ করে, তাও ধার ক'রে। যা-যা, ও সব পাগলামি ছাড়্‌।'

সিসি বাধা পেলেই কঠিন হয়ে ওঠে। বললে, 'তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি মেলবার পথ তো রাখ নি বাবা—কোনোমতে একটা পাস করার পরই যদি তোমার মত কেরানীগিরিতে ঢুকিয়ে দিতে, তাহ'লে এতদিন কলম পিষে হয়তো তোমার মতই রুচি হ'ত—মিছিমিছি এত লেখাপড়া শেখাতে গেলে কেন?'

'সেইটাই দেখছি অন্যায় হয়ে গেছে।' তিনিও গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কেরানী-গিরির পয়সাতে লেখাপড়া শিখছ কেরানী বাপকে অপমান করবার জন্যে, সেটা তখন ভাবি নি। আর লেখাপড়া শেখাতে চাওয়ার মত রুচিটা অত বছর কেরানীগিরি করার পরও কী ক'রে ছিল তাই ভাবি—'

'ঐ তো তোমার দোষ বাবা। সবতাতেই বাঁকা বাঁকা কথা বল। আমি কি তোমাকে অপমান করার জন্যই কথাটা বলেছি?'

'না মা, তুমি সোজা কথাই বলেছ, আমি বাঁকা অর্থ করেছি।'

উনি চুপ ক'রে যান। কিন্তু সিসি চুপ করে না। সুদর্শনকে সে বিয়ে করবেই—সে মন স্থির করেছে।

বাবাও জানিয়ে দিলেন, বিয়ে সে করতে পারে, কিন্তু বাবার কাছে এক পয়সা পাবার আশা যেন না করে। এখনও না—এর পরেও না।

'সে তো জানিই বাবা। শুধু তাই কেন কোনোদিন সাধ্যে কুলোয় তো যে টাকাটা তুমি আমার পেছনে খরচ করেছ এতকাল, সেটাও শোধ দেবার চেষ্টা করব।'

সুদর্শনও অবশ্য টাকার কথা ভাবেন নি। দু'খানা বইয়ের কপিরাইট বেচে বিয়ের খরচটা যোগাড় করলেন। রেজেস্ট্রী ক'রেই বিয়ে হ'ল, কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দিকে সুদর্শনের ঝোঁক বেশী ব'লে সেটাও হ'ল! ফলে, বিয়ের আনুষ্ঠানিক আচারের যোগাড় করতে ও বরযাত্রী কন্যাযাত্রী খাওয়াতে—খুব কম ক'রেও শ-পাঁচেক টাকা খরচা হয়ে গেল। এ ছাড়া বিয়ের দান ও গহনা কিছু—তাতেও হাজার দুই। সিসি কিছুই চায় নি, কিন্তু পুরানো চুড়ি ভেঙ্গে যখন নতুন চুড়ি হ'ল এবং তার সঙ্গে এল ভালো হার ও কানবালা, তখন আপত্তিও করলে না।

সিসির বাবা খুশী হলেন না বটে—সিসি হ'ল।

বন্ধু-বান্ধবরা অভিনন্দন জানালেন, সহপাঠিনীরা তো রীতিমত ঈর্ষিত! ওর

প্রতিপত্তি ও সম্মান যেন বেড়ে গেল অনেকখানি। ভুল করে নি সাহিত্যিককে বেছে নিয়ে সে, ঠিকই করেছে। এমন কি আত্মীয়রাও সকলেই যেন সম্ভ্রমের চোখে দেখছেন। অতবড় সাহিত্যিক হ'ল আমাদের জামাই! সিসির বরাত ভালো।

বিবাহের পরের দিন যখন শাশুড়ী বধূ-বরণ ক'রে তুললেন তখনও সিসির মন্দ লাগল না। একবাড়ি লোক, বৌভাত ফুলশয্যার ভিড় ও কোলাহল সবটা মিলিয়ে উৎসবের নেশা লাগল ওর মনে। বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের বধূজীবন তো মন্দ নয়। বেশ একটা যেন নূতনত্ব আছে—এতকালকার একঘেয়ে জীবনের পর এ একটা বৈচিত্র্য বটে।

কিন্তু বিবাহের পরও যখন দেখলে যে, মাথায় কাপড় দিয়ে থাকতে হয়, শাশুড়ীর কাছে ব'সে রান্নার যোগাড় দিতে হয়, খাওয়ার সময় তাঁকে হাওয়া করতে হয়, রাত্রে তিনি ঘরে শুতে গেলে তবে নিজের ঘরে আসবার অনুমতি মেলে এবং সবচেয়ে স্বামী বাইরে বন্ধু-বান্ধব ও ঘরে বই-লেখা নিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন—তখন সে যেন হাঁপিয়ে উঠল।

একদিন সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে।

'ওগো শুনছ, আমি একটু বেরোব।'

'কোথায়?'

'তা জানি না। যেখানে হোক—'

'সে আবার কী? সঙ্গে কে যাবে? মাকে বলেছ?'

'সঙ্গে আবার কে যাবে! এতকাল কি কেউ সঙ্গে যেত? আমি একাই যাব।'

'সেটা কি ঠিক হবে? মা কী ভাববেন? মা বাবা…ওঁদের বলেছ?'

'বলতে হয় তুমি বল। ওঁরা কেমন একরকম ক'রে তাকান এবং গম্ভীর হয়ে থাকেন—আমার ভালো লাগে না।'

'হ্যাঁ, ওঁরা অতটা আধুনিকতা পছন্দ করেন না।'

'তাহ'লে তুমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না?'

'না।'

'আসলে তুমিও পছন্দ কর না কোনো রকমের আধুনিকতা।' রাগ ক'রে বলে সিসি।

'নট অফ্ দি মার্ক। তা যদি বলো তো তাই। উৎকট আধুনিকতায় সুখ নেই, এই আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অভিজ্ঞতারই ফল।'

'তাহ'লে আধুনিকাকে বিয়ে করলে কেন ?'

'ঠিক আমি তো করি নি। তুমিই করেছ।'

'তখন বলো নি কেন তোমার বাড়ির এই ধারা ?'

'তুমি তো জানতে চাও নি।'

রাগ ক'রে দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে চ'লে গেল সিসি, দু'দিন কথা কইলে না। কিন্তু সুদর্শন নির্বিকার। এমনিতেও তো তার টিকি দেখা যায় না, বাড়িতে যতক্ষণ থাকতো আগে, তাও কমিয়ে দিলে। গভীর রাত্রিতে ফিরেও বই নিয়ে ব'সে থাকে ইজিচেয়ারে—

অগত্যা সিসিকেই আবার ঝগড়ার সূত্রটা ধরতে হ'ল।

'এমন ক'রে আমার দিন কাটে কী ক'রে বলতে পার ? কী করব আমি তাই ব'লে দাও।'

'সংসারে কাজের অভাব কী ? মাকে একটু রিলিফ দাও না।'

'আমি কি হাতা-বেড়ি-খুন্তি ধরবার জন্যেই এতগুলো লেখাপড়া শিখেছিলুম ?'

'তবে কি শুধু ব'সে থাকবে ব'লে শিখেছিলে ? ডিগ্রিটা কি আলস্যের চাপরাস ? পুরুষরাও তো এতগুলো লেখাপড়া শেখে, তাদের তো খেটে খেতে আপত্তি হয় না—বা, করলে চলে না।'

'ও পয়সা-রোজগারের কাজ সোজা, সবাই করতে পারে।'

'বেশ, সেই সোজা কাজটাই কর। টাকা যদি রোজগার করতে পার তো আপত্তি নেই।'

খানিকটা গুম্ খেয়ে সিসি বললে, 'বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি চাকরি করতে বেরোতে হয় তো লোকে কী বলবে ? বাবা-মা কী মনে করবেন ? সবাই ভাববে যে এত বেছে-বেছে খুব বিয়ে করলে সিসি বোস !'

'তাহ'লে ঘর-সংসার ত্যাখো। ইকোয়াল পার্টনারশিপ ইন্ লাইফ। দু'জনকেই কিছু কিছু করতে হবে—জীবনের অংশীদার তো !'

'সেই ঘর-সংসার ! তোমরা না বোহেমিয়ান লাইফ পছন্দ কর ?'

'কাব্য দেখে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো! আর তাছাড়া যদি তাই হবে তো বিয়ে করব কেন ? বোহেমিয়ান লাইফে তো বন্ধনের কথা নেই। আমি যদি নিত্য-নূতন স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম ক'রে বেড়াই তুমি সুখী হবে ? তা-ছাড়া ওতে সুখ নেই। গৃহের শান্তি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আলাদা জিনিস।'

'বললে অনেক কথাই বলা যায়। খুব তো পার্টনারশিপের কথা বলছ তোমার সঙ্গে সভা-সমিতিতে যাবার সময় তো আমায় ডাকো না সম্মানের ভাগ নিতে!'

'দোহাই তোমায়! সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী —ওরকম রোমান্টিক প্রণয় আমার নেই, স্বীকার করছি! তাছাড়া দু'জনেই যদি সভা-সমিতি ক'রে বেড়াই তো জীবনযাত্রাটা চলে কিসে? ধোপার হিসেব, গয়লার ফর্দ, মাসকাবারী বাজার, সংসারের জিনিসপত্র ঝেড়ে মুছে রাখা, খাদ্য-খাবারগুলো নির্ভেজাল এবং পরিষ্কার হচ্ছে কিনা দেখা, রান্না—এর কোনোটাই তুচ্ছ নয়। জীবনের শুধু স্বাচ্ছন্দ্য তো নয়—প্রয়োজনের দিকও বটে ওগুলো। বালিগঞ্জের অতি আধুনিক ধনীদের দেখছি, আমার বন্ধু-বান্ধবদের মতে অতি আধুনিক মধ্যবিত্তদেরও দেখছি—কেউই যে সুখী তা আমার মনে হয় না। বিদুষী বা শুধু মডার্ন স্ত্রীকে বিজ্ঞাপন ক'রে বেড়ানোর মধ্যে বাহাদুরি আছে, কিন্তু সুখ নেই। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকিয়েও দেখেছি। একটু স্নেহের কাঙাল হয়ে থাকে সারা জীবন!'

'থাক। ওসব বক্তৃতা শুনতে চাই নি। স্বার্থপর কাপুরুষ কোথাকার, এত যদি সেকেলে মন তোমার তো মডার্ন মেয়েকে বিয়ে করতে গিছলে কেন? পাড়াগাঁয়ের জংলী নোলকপরা মেয়ে আনতে পার নি?'

'দু'জনেরই ভুল হয়েছে সিসি। আমি ভেবেছিলুম সায়ান্স-পড়া মেয়ে জীবনটাকে ফ্যাশনের চোখে না দেখে তার সত্য মূল্য দেবে।'

অনেক ঝগড়া ক'রেও কোনো ফল হয় না। অগত্যা কাজের অভাবে (বই পড়তেও ওর ভালো লাগে না—আধুনিক নভেলগুলো পর্যন্ত শুষ্ক, হেভি রিডিং—অতএব অপাঠ্য—এই ওর বিশ্বাস) সংসারেই মন দিতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় অঘাতটা ওর সেইখানেই অপেক্ষা করছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যিকের আয় বাঁধা থাকে না, হঠাৎ আসে। সুতরাং, তার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ীর আস্থা নেই। ওর দেওর সত্তর টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকেছে ব'লে তার খাতির এবং আদর দুই-ই বেশী। অফিস যেতে হয় ব'লে সে কিছুই করে না। বাড়ি-সুদ্ধ লোক তটস্থ। সুদর্শনকে সবাই বেকার ভাবে।

সিসি দু'-একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, তিনশ টাকার কম সংসারের খাওয়া-দাওয়া চলে না যখন এবং দেবরের সত্তর টাকার মধ্যে মাত্র চল্লিশ টাকা

অর্থাৎ, বাড়িভাড়াটাই পাওয়া যায় শুধু (সাবেকী ভাড়া চলছে তাই—বাড়িওলা নালিশের ভয় দেখাচ্ছে)—তখন যেমন ক'রেই হোক আর যেভাবেই হোক বাকিটা যোগাচ্ছে তার স্বামীই, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। অশান্তিই বেড়েছে—খাতির বাড়ে নি।

তার ওপর নিত্য অভাবেও সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুদর্শনকে বললেই শোনে 'বইয়ের বাজার বড্ড মন্দা। এই আর জোটাতে পাচ্ছি না।'

রেশন, তেল, ঘি, মাখন, বাজার, কাঠ, কয়লা, দুধ—এগুলোর সংস্থান করতেই নিত্য একটা যুদ্ধ করতে হয়। স্নো-পাউডার তো চুলোয় যাক—শাড়ি-সায়াই দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। পুরানো ভাঁড়ার খালি হয়। একদিন সিসি বাপের বাড়ি গিয়ে জোর ক'রে কুমারী জীবনের কাপড়গুলো বার ক'রে নিয়ে আসে, কিন্তু সেই বা ক'দিন?

তার ওপর স্বামীকেও সে পায় না। শিল্পী মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক, আর স্বার্থপর এটা সে বুঝেছে। স্বামী শুধু যেন প্রয়োজনের জন্যই বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীরও যে প্রয়োজন আছে তা স্বীকার করেন না। আশেপাশের সামান্য কেরানীরাও তাদের স্ত্রীকে নিয়ে কত আদিখ্যেতা করে—আর সে? ভাবতেও সিসির চোখে জল আসে।

অবশেষে একদিন রেশন আনাও বন্ধ হয়! দু'মাস কোনো টাকা পায় নি কোথাও থেকে সুদর্শন। সিসিকে চিঠি লিখতে হ'ল বাবাকে, 'বাবা শখানেক টাকা ধার দিতে পার? পনেরো দিনের মধ্যেই শোধ দেব।'

বাবা চিঠি লেখেন 'বুঝেছি মা! এই দশ টাকা পাঠালুম, রেশনটা আনিয়ে নিও।'

চাকরি খুঁজছে এখন সিসি। গোটা সত্তর দরখাস্ত দিয়েছে—কোনো ফল হয় নি। ওর ইচ্ছা আছে চাকরি পেলে স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাসা করবে—না হয় একাই কোথাও গিয়ে থাকবে। কিন্তু মুস্কিল—হয় তো সেটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে না। কারণ, তাতে সুখ আছ, স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু সম্মান নেই। লোকের বিদ্রূপ সওয়াটা বড় কঠিন। আর চেনা লোক নেই কোথায়? তবে চাকরিটা চাই। বাবাকে সে দেখিয়ে দেবে একবার।

এতদিনে ও বুঝছে পূজা যদি কাউকে করতেই হয় তো ভালো বিলিতী মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবুকে।

হায়রে! তাই যদি করত সে!

## অনুরাধার স্বপ্ন

অনুরাধা রান্নাঘরের কাজ শেষ ক'রে এসে ঘড়ি দেখলে দুটো বেজে সতের মিনিট। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বাঁচল, অনেক কষ্টে আজ একটু সকাল ক'রে কাজ সেরে নিতে পেরেছে—অন্যদিন এ-সময়ে তার খাওয়াই চোকে না। মামার ঘরে উঁকি মেরে দেখলে তিনি অগাধে ঘুমোচ্ছেন, তার পাশের চেয়ারে ব'সে মামীও ঘুমিয়ে পড়েছেন—চারটের আগে কারুরই ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনা নেই। এক জেগে আছেন আশুবাবু। কিন্তু, তিনি নিরীহ লোক, পাঁচটা নাগাদ চা পেলেই খুশী, তার আগ যে কিছু চাইবেন না তিনি, তা সে জানত।

অনুরাধা ভিজে চুলগুলি পিঠের ওপর এলিয়ে বাঙ্‌লোর বারান্দায় এসে বসল। এসে অবধিই মেঘলা যাচ্ছিল, আজ তিন-চারদিন পরে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঝল্‌মল্‌ করছে রোদ চারধারে। প্রথম হেমন্তের মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়ায় সে রোদ কড়া লাগে না, বরং গায়ে লাগলে যেন কেমন একটা আবেশের সঞ্চার হয়। বাঙ্‌লোর পশ্চিমদিকটা অবারিত খোলা, বহুদূর, বোধ হয় কয়েক মাইল অবধি চ'লে গেছে উঁচু-নিচু ঢেউ-খেলানো মাঠ, কোথাও বা সামান্য কিছু চাষ হয়েছে, কোথাও বা এমনি ডাঙ্গা প'ড়ে আছে—মধ্যে মধ্যে দু'-একটা মহুয়া আর শাল গাছ—এ যেন স্বপ্ন, স্বপ্নের দেশ! ঐ যে দূরে পাহাড়ের রেখা, দুপুরের রোদে নীল দেখাচ্ছে, ওখানে যাওয়ার কথা অনুরাধা ভাবতেই পারে না। ক'দিন ধ'রে পাহাড়ের গায়ে মেঘের যে খেলা দেখছে সে, তা যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন—এ ক'দিন তার মনে হয়েছে যে মেঘ চ'লে গেলে হয়তো পাহাড়গুলিকে আর ভালো দেখাবে না, কিন্তু আজ এই দুপুরে তার আরও ভালো লাগছে। কতদূর কে জানে, ওখানে কি যাওয়া যায় না? উঃ, পাহাড়ে চড়বার কথা মনে হ'লে আনন্দ যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে, সত্যিই যদি কোনোদিন ওখানে যাওয়া যায় তাহ'লে হয়তো খুশিতে সে মরেই যাবে।

অনুরাধা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পরেশনাথের পাহাড়টা দেখে নিলে—বেশ

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই প্রথম দিনই ওরা দেখতে পেয়েছিল, তারপর ক'দিন মেঘলা থাকায় মোটে দেখা যায় নি, আবার আজ সকাল থেকে দেখা দিয়েছে। ছোট্ট মন্দির, আর তার নিচে কী একটা সাদা বাড়ি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—ওখানে কি আর যাওয়া হবে কোনোদিন? মামী আজও বলছিলেন বটে যে, তোর মামা একটু সেরে উঠলে আশুকে নিয়ে বেড়িয়ে আসব একদিন, কিন্তু সে তাঁরাই শুধু যাবেন হয়তো। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই—অনুরাধা মনে মনে জোর দিয়ে কথাটা বললে। মামার ভার তার ওপর দিয়ে দুই ভাই-বোন বেড়িয়ে আসবেন।

সে একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিলে। না-ই হ'ল তার পরেশনাথ পাহাড়—দরকার নেই। এই মাঠটাতেই যদি সে একটু বেড়াতে পেত আপন মনে কিংবা ওদের বাড়ির পেছনের ঐ নিবিড় শালবনটাতে! কাল যেন কে বলছিল বনটাতে বাঘ আছে, থাক্‌গে বাঘ—তাকে যে বাঘে খাবে না এটা নিশ্চিত। 'বন' সে ছোটবেলা থেকে শুনেই এসেছে—একবার ঢুকে সে দেখতে চায় তার সত্যিই ভয় করে কিনা—কী রকম না জানি তার ভেতরটা! আর ঐ মাঠ, শুধু শুধু একা ঐ মাঠে সে যদি ঘুরে বেড়াতে পারত, এমনি—আপন মনে!

এমন যে দেশ হয়, এতখানি ফাঁকা মাঠ যে পৃথিবীর কোনো দেশে থাকা সম্ভব তা সে কল্পনাও করতে পারে নি কোনোদিন, এত নভেল প'ড়েও না। বাবার অফিস-লাইব্রেরি থেকে আনা উপন্যাসে সে অনেক দেশের বর্ণনাই পড়েছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায় নি। মন তার থাকত পাত্রপাত্রীদের সুখ-দুঃখের মধ্যেই, কারণ জন্মে পর্যন্ত সে দেখেছে তাদের রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের সেই সরু কানা গলিটা—কখনও-কখনও কলকাতারই দু'-একটা চওড়া রাস্তা দিয়ে গিয়েছে হয়তো ঐ রকম আর একটা সরু গলির মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে ঢুকছে, এ ছাড়া আর কিছু না। যা সে কখনও দেখে নি তার ধারণা তো নয়ই, কল্পনা করাও যে অসম্ভব!

আচ্ছা, সে যদি চুপি চুপি মাঠটা একটু ঘুরেই আসে? ঐ যে কারা ইটের পাজা পুড়িয়ে রেখেছে, তারই আড়ালে বড় মহুয়া গাছটা পর্যন্ত?...কে আর জানতে পারবে? মামার ঘুম ভাঙলেও তিনি চারটের আগে বালি খাবেন না। সুতরাং, তারও খোঁজ পড়বে না।...এখন হয়তো আড়াইটে—চারটে পর্যন্ত, দে-ড়-ঘ-ণ্টা—সে অনেক সময়।.. অনুরাধা চঞ্চল হয়ে উঠল দুপুরের রোদে মহুয়া গাছের ছায়াগুলো যেন কী এক আশ্চর্য মায়া বিস্তার করে। অনুরাধার মনে

হ'ল ঐ দূরের মহুয়া গাছটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে একবার মাঠটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে, মিষ্টি হাওয়ায় যেন সমস্ত মাঠটা জুড়ে খুশির ঢেউ উঠেছে, সে দিকে চাইলে মন আপনি আনন্দে ভ'রে ওঠে।...সে আর থাকতে পারল না, নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বাগান পেরিয়ে এক সময়ে সত্যিই মাঠে গিয়ে পড়ল।

প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল, চলছিলও আস্তে আস্তে, কিন্তু বাড়িটা ইটের পাঁজার আড়ালে মিলিয়ে যেতেই তার সব সঙ্কোচ চ'লে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল একটু ছুটলে কী হয়? কিংবা এমনি খানিকটা লাফালাফি করলে? মাঠের যে দিকেই নজর যায়, কোথাও কেউ নেই, একটা গরু-বাছুর এমন কি ছোট ছেলেও দেখা যায় না। চাষ রয়েছে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু তা আগলাবার প্রয়োজন নেই ব'লেই বোধ হয়, কেউ আসে নি। এই সীমাহীন নিঃসঙ্গতা অনুরাধার সমস্ত দেহে একটা পুলক-চাঞ্চল্যের স্রোত বইয়ে দিলে যেন—সে ঠিক না দৌড়লেও এমন জোরে চলতে লাগল যে, তাকে আর যাই হোক বেড়ানো বলা চলেনা। কিন্তু উপায় কি, এমন অবস্থায় আস্তে চলার কথা অনুরাধা ভাবতেই পারে না। কোথাও বিশেষ ক'রে সে যেতে চায় না, সে পথ হারিয়ে, দিক হারিয়ে, এমনি ক'রে একা এই বিস্তীর্ণ মাঠে ঘুরে বেড়াতে চায় শুধু। তার কুড়ি বছর বয়সটাও যেন পেরিয়ে একেবারে আট-দশ বছরে চ'লে গেছে, যখন চলা মানেই ছুটে চলা, যখন চুপ ক'রে থাকার মত শাস্তি আর নেই—যখন পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুও বিস্ময়ের চমক লাগায় ক্ষণে ক্ষণে—

অনেক দূর, অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কলকাতায় তাদের বাড়ির তো সেই দেড়খানা ঘর আর সরু একফালি রক—উঠোন পর্যন্ত নেই। হাঁটবার প্রয়োজনই হয় না সেখানে, অভ্যাসও নেই।...তাছাড়া, চলতে চলতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল এই মাঠের মধ্যে কে জমি কিনে রেখে গেছে, ছোট্ট একটা পিল্‌পের ওপর ইংরেজীতে মালিকের নাম লেখা। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ, তার সঙ্গে লোকালয়, সমাজ, সবটা মনে প'ড়ে গিয়ে সে যেন তার এই অবাধ উদ্দাম গতির জন্য একটু লজ্জিতও হয়ে পড়ল। সে যেন এতক্ষণ বহু লক্ষ বৎসর ডিঙ্গিয়ে সভ্যতার সেই আদি ইতিহাসের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল, মাত্র তিনটি ইংরেজী আদ্য-অক্ষরের আঘাতে আবার বিংশ শতাব্দীতে ফিরে এল।

আস্তে চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পা যেন ভারী হয়ে এল, বসা একটু চাই-ই কোথাও, নইলে আবার এতটা পথ ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের বাঙলো, লোকালয় বহু পিছনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, পথ গেছে হারিয়ে, কিন্তু তার জন্য অনুরাধা চিন্তিত নয়, মোটামুটি দিকটা তার ঠিক আছে— কিছুদূর গিয়ে একটা টিপির ওপর উঠলেই তাদের বাড়ি দেখতে পাবে আবার, তা সে জানে। এখন যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে কোথাও একটু ছায়াতে বসা। এই রোদে এতটা দৌড়ে তার গরমও হচ্ছিল ভীষণ, ঘামে ব্লাউজ ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে, কপাল, গলা ঘামে ভেসে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক চেয়ে ওর নজরে পড়ল কতকগুলো কল্‌কে গাছ এক জায়গায় ঝোপ হয়ে রয়েছে, আর তারই ঠিক পাশে একটা মহুয়া গাছ। সে দূর থেকে ছায়াটা দেখেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেললে। তারপর কোনোমতে অবসন্ন পা-দুটো টেনে নিয়ে গিয়ে গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

আঃ! কী মিষ্টি হাওয়া, অনুরাধার সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল যেন। সে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে রইল। চোখ বুজে থাকলেও, সামনের সেই নীলাভ পাহাড় আর ঝলমলে সবুজ মাঠ তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল ব'লে তা যেন সে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। সেইভাবে ঠাণ্ডা বাতাসে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে সে যেন ভুলেই গেল পঁয়ষট্টি টাকা মাইনের কেরানীর কুড়ি বছরের আইবুড়ো মেয়ে সে—ওর হঠাৎ মনে হ'ল ও যেন রূপকথার রাজকন্যা, এখনই ঐ সামনের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে তার রাজকুমার আসছেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে, উজ্জ্বল শ্যাম তাঁর বর্ণ, গলায় বকুলের মালা, কাছে এসে ব'সে তাঁর হল্‌দে উত্তরীয়ে ওর মুখের ঘাম মুছিয়ে মুদিত চোখের পাতায় চুমো খেয়ে খুব আস্তে ডাকবেন, 'অনু, অনুরাধা!'···সেই অনুভূতি আর আশা এমনিই তীব্র হয়ে উঠেছিল ওর মনে যে, সে চুম্বনের স্পর্শ যেন সে সত্যিই অনুভব করলে। তীব্র সুখের অসহ যন্ত্রণায় চম্‌কে শিউরে চোখ মেলে চেয়ে দেখলে সে একাই—কেউ কোথাও নেই। সমস্তটাই তার স্বপ্ন— দিবাস্বপ্ন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনুরাধা উঠে বসল। তার রাজকুমার কোনো দিনই আসবে না, তা সে জানে। তার মনে প'ড়ে গেল তাদের সেই সরু অন্ধকার গলির সেই দেড়খানা ঘর, আর একপাল রুগ্ণ ভাইবোন। বাবার পঁয়ষট্টি

টাকা মাইনে, তাতে চাল-ডাল ঘরভাড়াই হওয়া কঠিন। শেয়ালদা স্টেশনে কাজ করেন ব'লে বাজার মাছ কিছু কিছু এমনি পান, তাইতে কোনোমতে চলে। যুদ্ধ বেধে কী-সব বাড়তি টাকা পাচ্ছেন, চাল-ডাল পাচ্ছেন অনেক সস্তায়, তবু তাদের বাড়িতে দুধ বন্ধ হয়ে গেছে, তারা খায় র' চা, আর ছেলে-মেয়েরা খায় ফ্যান। বাবা বাড়িতে একটা গামছা প'রে থাকেন—

আর অনুরাধা? তার দিন কাটে রান্না ক'রে, বাসন মেজে, ভাইবোনদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর চেঁচিয়ে, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আর কেঁদে। তার বাপের টাকা নেই—তার ওপর, তার ওপর সে কুৎসিত। সুতরাং, তার বিয়ের কথা এখন কেউ কল্পনাও করে না। সে যে কত কুৎসিত তা সে জানে, আয়নায় অনেক রকম ক'রে মুখ দেখেও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা পায়নি কখনও, প্রতি বারই মনে হয়েছে আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিই। একমাত্র তার বাবা বলেন, 'রাধা যখন বিকেলে চুলটি টান ক'রে বেঁধে কুমকুমের টিপ পরে তখন বেশ দেখায়।...কিছু টাকার সংস্থান হ'লে ছেলে দেখতুম, ওকে কেউ অপছন্দ করবে না, তুমি দেখো!'

কিন্তু, মা সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব দেন, 'তুমি তো বেশ দেখবেই, তোমার মত দেখতে হয়েছে কিনা! রং কালো হ'লেও ক্ষতি ছিল না, গড়নটা সুদ্ধ তোমার মত মদ্দাটে মদ্দাটে হ'ল!'

না, তার রাজকুমার কোনোদিন আসবে না। অবশ্য সে অভাব অনুভব করবার মত অবসরও বিশেষ তার মেলে নি। কাজে আর অকাজে, বাড়িতে থাকলে তার নিশ্বাস ফেলবারই অবকাশ থাকে না। নেহাত মামার অসুখ, চেঞ্জে আসা দরকার, মামীরও শরীর ভালো না ব'লে মামী নিজে গিয়ে বললেন—তাই এই ছুটি মিলেছে। মামীর হাতে দু'পয়সা আছে, ছেলেপুলে নেই ব'লে তার মা-বাবা খুব সমীহ করেন--ভবিষ্যতের আশাতে নিজের অনেক অসুবিধা ক'রেও মা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

অনুরাধা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে একবার। কিন্তু, পা তখনও যেন কাঁপছে অনভ্যাসের ফলে, তাছাড়া, সে ভেবে দেখলে চারটের এখনও অনেক দেরি। আর হয়তো এমন অবসর মিলবে না। সে আবার ব'সে পড়ল তেমনি ক'রে গুঁড়িতে ঠেস দিয়েই, কিন্তু এবার আর চোখ বুজল না, দূরের রেললাইনটার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে একটা শুকনো মহুয়া পাতা নিয়ে নাড়-চাড়া করতে লাগল।

আচ্ছা সত্যি, কেউ কি কোনোদিন তাকে ভালোবাসবে না? কেউ তাকে বুকে টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে অমনি ক'রে ডাকবে না? উপন্যাসের নায়িকাদের মত তারও কণ্ঠে, কপোলে, ললাটে বারবার চুমো খেতে খেতে কোনো তরুণ কোনোদিন উন্মত্ত হয়ে উঠবে না?...

অকস্মাৎ একটা তীব্র ব্যথায় যেন সে অস্থির হয়ে উঠল। এ সব কী ছাইভস্ম ভাবছে সে? ছি!...জোর ক'রে মনটাকে অন্য কথায় আনবার চেষ্টা করলে সে। আচ্ছা এই জমিটাতে কী বুনেছে? মুগ-কড়াই, মটর না অড়র ..কে ওর মালিক কে জানে...

আবার ঘুরে-ফিরে তার মন তাদের সেই সংকীর্ণ গলিতে ফিরে গেল। এ-রকম সে ছিল না। অন্য কোনো আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নেই ব'লে বাবা তাকে উপন্যাস যোগাতে শুরু করেছেন বহুদিন থেকেই—পড়েছেও অনেক, কিন্তু তাহ'লেও তার নিজের মনে কোনোদিন এসব কথা আসে নি। যত গোলমাল বাধল ওপরের তলার ঐ নতুন ভাড়াটেরা আসার পর থেকেই। পরেশ আর তার বৌ—ছোট্ট দু'টি লোকের সংসার, কাজ কম। তাই দিনরাত ফষ্টি-নষ্টি নিয়েই আছে ওরা। তাও ছিল ছিলই—কী কুক্ষণেই যে নীলিমা সেধে অনুরাধার সঙ্গে ভাব ক'রে জোর ক'রে ওপরে টেনে নিয়ে গেল, সেই থেকেই অনুরাধার যত অশান্তির শুরু। লজ্জার বালাই নীলিমার ছিল না, অনুরাধার সামনেই সে পরেশের গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ত, পিঠে কিল মেরে পালাত, খপ্ ক'রে চশমা কেড়ে নিয়ে চ'লে যেত—এমন কত কি! পরেশও সময় এবং সুযোগ পেলেই দিত তার জবাব। এমনি ক'রে তাদের প্রণয়লীলার মধ্যে প'ড়ে অনুরাধারও কেমন যেন নেশা লাগল। সে নিজের কাজ ফেলে, মায়ের বকুনি অগ্রাহ্য ক'রেও যখন তখন দিনরাত ওদের ঘরে আসত, সেধে নীলিমার কাজকর্ম ক'রে দিত। সে জানে যে তার এই যখন তখন আসাটা পরেশ পছন্দ করত না, বরং বিরক্তই হ'ত তবু সে পারত না না-এসে। একদিন সে আড়াল থেকে নিজের কানেই শুনেছিল পরেশ বলছে, 'ঐ ছুঁড়িটা যখন তখন আসে কেন বল তো? বারণ করতে পার না?'

নীলিমা রাগ ক'রে জবাব দিয়েছিল,—'ছুঁড়ি ছুঁড়ি ক'রো না ব'লে দিচ্ছি, ওসব কি অসভ্য কথা! আসে তাতে আমাদেরই উপকার হয়।'

পরেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ তোমাদের উপকার করতেই আসে কিনা!...কি রকম ডাইনীর মত চায়, কখ্খনো ওর মতলব ভালো নয়—দেখে নিও।'

কিন্তু, তবুও অনুরাধা তাদের সঙ্গ ছাড়তে পারে নি। সে যেন আফিং-এর নেশা, বিষ জেনেও খেতে হয়। হয়তো, হয়তো সে পরেশের জন্যই যেত শেষ-পর্যন্ত! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবা, তাদের এই গলির মধ্যে, তার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন একটি তরুণের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নি।

পরেশের কঠোর কথা তার সয়েছিল, কিন্তু সইল না তার অনুকম্পা। সেদিনের কথা মনে হয়ে এতদিন পরেও, এই সুদূর প্রবাসেও তার মুখ লাল হয়ে উঠল, কানের কাছে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। কী যে দুর্মতি ওর হয়েছিল সেদিন, পরেশ অফিস থেকে এসে জামা গেঞ্জি খুলে রেখে কলঘরে গিয়েছিল স্নান করতে, নীলিমা তখন রান্নাঘরে চা করছে—অনুরাধা কী একটা কাজে খালি ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর জামাগুলো প'ড়ে আছে দেখে তুলে রাখতে গেল। কিন্তু, গেঞ্জি হাতে নিয়ে কী দুর্জয় লোভ হ'ল ওর, কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারলে না। গেঞ্জিটার মধ্যে নিবিড়ভাবে মুখ গুঁজে দিয়ে ও যেন তারই অঙ্গের আঘ্রাণ পাবার চেষ্টা করতে লাগল যার দেহের স্পর্শ কোনোদিনই সে পাবে না।...সেই দিবাস্বপ্নে সময়ের হিসেব গিয়েছিল হারিয়ে, হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখলে পরেশ। উঃ—সে ওর কী লজ্জা! কোনোমতে ছুটে পালিয়ে এল বটে, কিন্তু তখনই একেবারে নিচে নামতে পারল না। ওর বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছিল, অপমানে লজ্জায় গলা উঠেছিল শুকিয়ে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে তখনও, পরেশের কথা কানে এল, 'ওগো, আমার এই গেঞ্জিটা কেচে দিও তো!'

নীলিমা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কেন? কালই তো ওটা ভেঙেছ—?'

'তা হোক, দিও।'

অনুরাধার সবচেয়ে যেটা ভয় ছিল যে, হয়তো তার এই নির্লজ্জতার কথা পরেশ নীলিমার কাছে বলবে, সেটা কেটে গেল বটে, কিন্তু তার এই দয়া আর ঘৃণা—দুইই যেন তীরের মত গিয়ে বিঁধল ওর বুকে। সেদিনের পর বহুদিন আর সে ওপরে ওঠে নি, শেষে নীলিমার অনুনয়ে যদি বা আবার যেতে শুরু করেছিল, পরেশের সামনে আর কখনও যায় নি।...

কথাটা মনে পড়লে আজও তার লজ্জায় ও অপমানে মাথা কুটতে ইচ্ছা করে, আজও মাথার মধ্যে রক্ত উঠে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। অনুরাধা চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। আর না, এবার বাড়ির দিকে ফেরা যাক—পৃথিবীর কোনো ভালো

জিনিসে যার অধিকার নেই, বিধাতা যার ভবিষ্যৎ চিরকালের মত কালি লেপে দিয়েছেন, স্বপ্ন দেখাও তার পাপ।…সে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহমন নিয়ে আবার চলতে শুরু করল—এবার বাড়ির দিকে, কাজ আর কর্তব্যের দিকে। চায়টেয় বার্লি চাই, তারপর চা, একটু পরে ছানার জল। সময় নেই।

কিন্তু, খানিকটা চলবার পরই সেই মাঠ, দিগ্‌দিগন্ত জোড়া সেই ঢেউ-খেলানো মাঠ, পাহাড় আর হেমন্তের সেই মধুর বাতাস, তার সারা দেহে আবার যেন মায়া বুলিয়ে দিল। পা ক্লান্ত, তবু ইচ্ছা হয় ছুটে যেতে। মনে হয় ঘরবাড়ি মানুষ সব থাক প'ড়ে, যতক্ষণ না সূর্যদেব ঐ পাহাড়টার আড়ালে মিলিয়ে যান ততক্ষণ এমনি যেখানে খুশি, যেদিকে খুশি ঘুরে বেড়ানো যাক্।… হয়তো মনের মধ্যে কোথায় আশাও জাগে যে, কোনো-একটা মহুয়া গাছের আড়াল থেকে এখনই কোনো তরুণ বেরিয়ে আসবে, যে সেধে তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, যে জানতে চায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা।· ·

হঠাৎ তার বাঁ-হাতখানা তুলে সে দেখতে লাগল। মনে হ'ল যে তার হাতের গঠন তো খুব খারাপ নয়, আঙুলগুলো সরু বটে, কিন্তু সুডৌল, হয়তো চাঁপার কলি নয়, কিন্তু কবিরা যে সব আঙুলকে আগুনের শিখার মত ব'লে বর্ণনা করেন—সেই রকমই। কাজ ক'রে বাসন মেজে শক্ত হয়েছে, কিন্তু তবু শীর্ণ নয়, প্রথম যৌবনের রসোচ্ছলতা আজও তাকে নিটোল রেখেছে।

একটা ধান-ক্ষেতের মধ্যে অনেকটা জল জমেছিল, কালো স্বচ্ছ জল, আয়নার মত জলজল করছে। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে আবার কী মনে হ'ল, ফিরে এসে অনুরাধা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভালো ক'রে দেখা যায় না, তবু সেই পড়ন্ত বেলার রোদে তার উত্তেজিত এবং আরক্ত মুখখানা, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম ভালোই লাগল। এর চেয়ে ঢের খারাপ মুখ সে দেখেছে অনেক মেয়ের, ঢের বেশী কুৎসিত আর কালো। তবু তারা সুখেই ঘরকন্না করছে, তাদের নিয়েও স্বামীরা ঘর করে, তাদের ভালোবাসে—তাদের চুমো খায়।…

ভালোবাসা পাবার এবং ভালোবাসবার একটা তীব্র কামনায় অনুরাধার সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন টন্ টন্ ক'রে উঠল। সে চায়—হ্যাঁ, আর গোপন ক'রে লাভ নেই—সে চায় কারুর উত্তপ্ত চুম্বনের আবেশে তার চোখ দু'টি বুজে আসবে, সমস্ত দেহ এলিয়ে পড়বে কারুর কঠিন বাহুবন্ধনের মধ্যে। কানের কাছে

বাস্তবে অমরার সঙ্গীতের মতই তার অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন। এ যদি জীবনে একদিনও আসে, একটি মিনিটের জন্যও—তাহ'লেও সে খুশী, বাকি সমস্ত জীবনটা সে সেই মুহূর্তের স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দিতে পারবে।...আর সেই সুতীব্র সুখের চরম অনুভূতির মুহূর্তটি যেন আজই তার অন্তরের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে, সে লগ্ন তার আজই আসা চাই, আজই—আর অপেক্ষা করার সময় নেই তার!

বাড়িতে ফিরে ঘড়ি দেখলে চারটে বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু—তার সৌভাগ্যক্রমেই বোধ হয়—মামা বা মামী কারুর ঘুম ভাঙ্গে নি। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—একই সঙ্গে স্বস্তির ও অবসাদের—তারপর আবার বাইরের বারান্দাতে এসে দাঁড়াল।

সবাই ঘুমোচ্ছে, চাকরটা পর্যন্ত, শুধু আশুবাবু তখনও বই পড়ছিলেন, জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলে অনুরাধা।

অদ্ভুত মানুষ এই আশুবাবু। মামীমার ভাই, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কোথাকার এক ইস্কুলে নাকি মাস্টারি করেন। মোটা-সোটা গোলমাল মানুষটি, অত্যন্ত নির্বিরোধী লোক, হয় ইস্কুলের পরীক্ষার খাতা, নয় বই—একটা পেলেই তিনি খুশী। শরীর খারাপ হবার ভয়ে দুপুরে ঘুমোন না, মেপে একশ' গজ হেঁটে ব্যায়ামের কর্তব্য শেষ করেন এবং জামা-কাপড়-চশমা-ছাতা কোনোটাই কাজের সময় খুঁজে পান না—এমনি অন্যমনস্ক। আগে আগে এঁকে দেখলেই অনুরাধার হাসি পেত, এখন তাঁর অসহায় ভাব দেখে দয়া হয় ওর। নিজে থেকেই সব গুছিয়ে দেয়।

একটুখানি ইতস্তত ক'রে অনুরাধা ওঁরই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আশুবাবু মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'অনু, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, বেড়িয়ে এলে নাকি?'

কথাটার জবাব না দিয়ে সে আর একটা প্রশ্ন করলে, 'ওটা কী পড়ছেন—উপন্যাস?'

আশুবাবু বললেন, 'না—ওটা ঐ শিক্ষা-সংক্রান্ত একটা বই। মনে করছি আসছে বছর বি-টি পরীক্ষা দেব, তারই জন্য একটু পড়াশুনা করছি।...কতদূর গিয়েছিলে?'

অনুরাধা কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়ে বললে, 'ঐ পাহাড়ের দিকটায়, অনেক দূর। আপনি যান নি ওদিকে, না?'

আশুবাবু ওর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে জবাব দিলেন, 'এইগুলো তোমরা বড় খারাপ করো। বাড়ি থেকে বেরোনো অভ্যেস নেই কখনও, এখানে এসেই এতটা হেঁটে এলে। এইরকম হঠাৎ পরিশ্রমে অসুখ করে তা জান?'

আশুবাবুর পক্ষে এতটা উদ্বেগ যেন অপ্রত্যাশিত। অনুরাধা একটু অপ্রস্তুত-ভাবে হেসে বললে, 'খুব বেশী দূর তো যাই নি।'

'হুঁ, যাও-নি বৈকি! এখনও হাঁপাচ্ছ দস্তুরমত, এই ঠাণ্ডায় ঘেমে উঠেছ।... এর ওপর যেন জল খেয়ে ব'সো না এখনি। ওতে সর্দিগর্মি হয়।'

আশ্চর্য! এত ব্যাপার লক্ষ্য করতে তাঁকে অনুরাধা এই প্রথম দেখলে। অকস্মাৎ যেন ওর বুকটা কিসের একটা উত্তেজনায় দুলে উঠল। সে তাঁর চৌকিটারই একপাশে ব'সে প'ড়ে বললে, 'আমার কখনও অসুখ করে না।'

তারপর কণ্ঠস্বর অকারণেই নামিয়ে প্রশ্ন করলে, 'চা খাবেন এখন? করব?'

আশুবাবু বিস্মিত হয়ে বললে, 'এত সকালে কেন? এখনও তো সময় হয় নি।'

'নাই বা হ'ল সময়। একদিন না হয় অসময়েই খেলেন।'

'দরকার নেই। একটু পরে তো স্টোভ জ্বালতেই হবে, সেই সময় একবারে হবে'খন। দিদি উঠুক—'

অনুরাধা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আপনি বিদেশে এসেও খালি খালি বই পড়েন।...দুপুরবেলা বেড়াতে যে কী ভালো লাগে! যাবেন কাল ঐ পেছনের শালবনটাতে?'

শিউরে উঠে আশুবাবু জবাব দিলেন, 'বাপরে! ওখানে শুনেছি বাঘ আসে।'

'আচ্ছা তাহ'লে মাঠে যাবেন, ঐ ইটের পাঁজাটার ওপারে?'

'তা যেতে পারি। কিন্তু, আমি বেশী দূর হাঁটতে পারব না, আগেই ব'লে রাখছি।'

অনুরাধা অন্যমনস্কভাবে বইটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ এক সময়ে আশুবাবুর একটা হাতের ওপর নিজের ডান হাতখানা রাখলে। আশুবাবু একটু বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলেন, তারপর ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বললেন, 'তুমি বড্ড বেশী পরিশ্রম করেছ অনু, তোমার হাত থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে।'

অনুরাধা জবাব দিলে না, শুধু মাথাটা ওর আর একটু হেঁট হয়ে গেল, আর তার ফলে ওর পিঠ থেকে কয়েক গোছা চুল শিথিল হয়ে এসে পড়ল আশুবাবুর বাঁ হাতখানার ওপর।

আশুবাবু ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বললেন, 'এখানে তোমার খাটুনিও হচ্ছে খুব, না?'

অনুরাধা প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে একটু যেন জড়িত কণ্ঠে বললে, 'কিচ্ছু না, বাড়িতে এর থেকে ঢের বেশী খাটতে হয়। আর তাছাড়া কাজ করতে আমার একটুও কষ্ট হয় না।'

ওর হাতখানা তখনও আশুবাবুর হাতের মধ্যে ঘামছিল, তিনি একটুখানি তাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'সত্যি, শুধু আমার জন্যই তোমাকে কত বেশী খাটতে হয়।...আমার চিরকালই এইরকম স্বভাব, কিন্তু সেজন্যে আমার বাড়ির লোকেরা আর মাথা ঘামায় না, নিজের জিনিস হারাই নিজেই খুঁজে বার করি, অনেক সময় হয়তো পাইও না, কিন্তু কী করব?'

জবাব দিতে গিয়ে অনুরাধার গলা কেঁপে গেল, সে বললে, 'আপনার বাড়ির লোকেরা আপনাকে চিরদিন পায়, তাদের কাছে আপনার দাম কম। আমি তো দু'দিন মাত্র আপনাকে কাছে পেয়েছি, আমি আপনার অসুবিধা ঘটতে দেব কেন?'

আশুবাবু কী যেন একটা রসিকতায় হেসে উঠে বললেন, 'তা বটে। তবে অভ্যেসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—এই যা।...বাস্তবিক তুমি যা যত্ন করছ, তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

অনুরাধার মাথা আরও ঝুঁকে পড়েছিল, ওর নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলেন আশুবাবু। সে নতমুখেই জবাব দিলে, 'শুধু যত্ন করার জন্যই মনে থাকবে—আর কোনো কারণ নেই?'

কথাটা আশুবাবু বুঝতে পারলেন না ঠিক, কিন্তু নিজের নির্লজ্জতায় অনুরাধার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। সে দিকে চেয়ে বোকার মত একটু হেসে আশুবাবু বললেন, 'তা বটে—তা তুমি বলতে পার বটে।' তারপর, অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি ভীষণ ঘেমে উঠেছ অনু, মুখচোখ রোদে লাল হয়ে উঠেছে—যাও, একটু শুয়ে পড়োগে।'

অনুরাধার কণ্ঠ যেন বিকৃত হয়ে উঠেছে, সে প্রাণপণে সহজ করবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'আমি এখন শোব না—শুতে ভালো লাগছে না।'

উদ্বিগ্নকণ্ঠে একটু সস্নেহ তিরস্কারের ছোঁয়া দিয়ে আশুবাবু বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না তোমার কতটা পরিশ্রম হয়েছে—এখন একটু বিশ্রাম না করলে এরপর ভারি শরীর খারাপ করবে।......যাও, যাও, এখুনি আবার দিদি উঠে পড়বেন, আর তাহ'লে সেই রাত এগারোটার আগে ছুটি পাবে না। —না, না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না—ওঠো আগে।'

ওর যে হাতখানা তখনও আশুবাবুর মুঠোর মধ্যে আলতো ধরা ছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে আশুবাবু একটু মৃদু ঠেলাও দিলেন ওকে।

অনুরাধা আর কথা কইলে না, ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সত্যিই নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। যে অকারণ এবং অবোধ অশ্রু ওর চোখে উপ্‌চে উঠতে চাইছিল এতক্ষণ, এইবার তা নীরবে ওর বালিশের ওপর ঝ'রে পড়তে লাগল।

## আশুবাবুর স্বপ্ন

'অনুরাধা, অনুরাধা, অনুরাধা'—

মেসের সেই অন্ধকার তেতলা ঘরের চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে আশুবাবু পাগলের মত আপন মনে ডেকে উঠলেন। তাঁর এই লক্ষণটা দেখা দিয়েছে কিছুদিন থেকেই, অন্তরের সমস্ত বেদনা নিংড়ে এই ডাক যেন আপনা থেকে বেরিয়ে আসে, 'অনুরাধা, অনুরাধা!' তিনি কি পাগল হয়ে যাবেন নাকি? রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে কতদিন পাশের অন্ধ শূন্যতাকে জড়িয়ে ধরতে গেছেন, আর এমনি ভাবে আকুল হয়ে ডেকেছেন বার বার। সে ডাক অনুরাধার কানে পৌছাবে না তা তিনি জানেন, আজও নয়, কোনোদিন নয়। এ ডাকের আকুলতা যে কোনোদিন অনুরাধার অন্তর স্পর্শ করবে, সে সম্ভাবনাও নেই—তবু, তবু তিনি না ডেকে পারেন না। মনে হয়, নাই বা সাড়া এল, তবু পাশের এই বিস্তৃত অনন্ত শূন্যতা যা সম্ভবত অনুরাধাকেও ছুঁয়ে আছে, সেই মহা-শূন্যতাই সাক্ষী থাক তাঁর এই বেদনার, বুক-ফাটা এই আহ্বানের। চারিপাশের শব্দ-তরঙ্গে অন্তত এই একটি নামের ঢেউ তিনি রেখে যাবেন, সে ঢেউ হারিয়ে

যাবে তা তিনি জানেন, তবু তো তিনি রেখে গেলেন। হয়তো এসবও তিনি ভাবেন না, শুধু না ডেকে থাকা সম্ভব নয় ব'লেই তিনি বার বার এমন ক'রে ডাকেন— 'অনুরাধা, অনুরাধা, অনুরাধা।'

অথচ, এ-রকম ছিল না; অর্থাৎ সেদিন পর্যন্ত ছিল না। আশুবাবু তাঁর স্কুলমাস্টারি নিয়ে এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স অনায়াসে কাটিয়ে দিয়েছেন। পড়াশুনোর ক্ষতি হয় ব'লে তিনি মেসের এই একটি মাত্র তেতলার ঘর সবটাই ভাড়া নিয়েছেন, সে জন্য তাঁকে ডবল সীট-রেণ্ট দিতে হয়। কিন্তু, সে-ও তো অনেক দিন হয়ে গেল—এগারো বছর এই মেসে কাটল তাঁর, কখনও তে এইরকম একা, এইরকম নিঃসঙ্গ বোধ হয় নি নিজেকে, বরং নিচের ঐ সব কেরানী বাসাড়েদের হুল্লোড় থেকে যে স্বতন্ত্র থাকতে পারেন এই জন্যই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়েছেন বার বার। অথচ আজ, আজ এই নির্জনতা যেন তাঁকে গ্রাস করতে আসে, এই নিঃসঙ্গতাই যেন তাঁকে পাগল ক'রে দেয়। দোতলার নগেনবাবুর ঘরে যারা হুল্লোড় করছে, তাদের মত তিনিও যদি তাস খেলাতে মেতে ঐ রকম চেঁচাতে পারতেন তাহ'লে বোধ হয় অনেকটা শান্তি পেতেন, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আশুবাবু মনে মনে স্বীকার করলেন, আজ আর নতুন ক'রে সে অভ্যাস করা সম্ভব নয়।

ভেতরে ঢুকে আলো না জেলেই আশুবাবু জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন—আশপাশের সব বাড়িই প্রায় মেস, সারাদিনের পর শ্রান্ত কেরানী ও ছাত্রদের কলগুঞ্জনে জেগে উঠেছে। আরও নিচে থেকে ঠাকুর-চাকরদের কোলাহল, রান্নার গন্ধ অত ওপরেও এসে পৌছয়—সবাই বেশ আছে, কাজে ও অকাজে ব্যস্ত। শুধু তাঁরই যেন জীবনের খেই গেছে হারিয়ে, বিপুলা ধরিত্রীর জীবন-প্রবাহের সঙ্গে তাঁর আত্মার কোনো যোগাযোগ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। বহুক্ষণ জানালার কাছে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি নিচের সেই কলরবের দিকে কান পেতে রইলেন। মন তাঁর কিছুতেই নেই,—শুধু একটা কথা বার-বার তাঁর বিহ্বলতাকে আঘাত করছে—তিনি একা, একা।

অথচ, একটা বছর আগেও, এ কথা যে তাঁর মনে আসা সম্ভব কোনোদিন, তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর দিদির বাসা এই কলকাতাতেই, নিঃসন্তান লোক তাঁরা—আশুবাবু খুব সুখেই থাকতে পারতেন সেখানে, কিন্তু একা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবার লোভেই তেতলার এই ছোট্ট ঘরটি তিনি ছাড়তে পারেন নি।

একা থাকতেই তিনি চেয়েছিলেন—তাঁর স্কুল আর বই—এ ছাড়া কোনো কথা তিনি ভাবতেও চান নি। কী সংযত জীবনযাত্রাই ছিল তাঁর—মাপা, ওজন করা, কোথাও কোনো অনিয়ম বা ব্যতিক্রম ছিল না। ঠিক সময়ে খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যের সমস্ত নিয়মগুলি পালন ক'রেই তিনি সুখী ছিলেন। এই বিপুল বিশ্বের চারিদিকে মন হারিয়ে যাবার, পাগল হবার মত যেসব ফাঁদ পাতা আছে, তার খবরও তিনি কোনোদিন রাখেন নি। কিন্তু আজ এত দিন পরে, প্রায় প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে অকস্মাৎ এ তাঁর কী হ'ল? কী যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি-হাওয়া তাঁকে তার চিরাচরিত অভ্যাসের পাদপীঠ থেকে উড়িয়ে নিয়ে দিকহারা কূলহারা মহাসমুদ্রে এনে ফেলেছে—কোথাও কোনো দিশা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। নিয়মের বিবেচনার যে শৃঙ্খলা তিনি তাঁর চতুর্দিকে রচনা করেছিলেন, তা সেই ঝড়ের মুখে কখন টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় খ'সে পড়েছে—তার চিহ্নও নেই।

আশুবাবু যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। এ তিনি আর সইতে পারছেন না, এই নিঃসঙ্গতা, এই নিঃসীম একাকীত্ব তাঁর অন্তরের সমস্ত অনুভূতিকে যেন দ'লে পিষে দিয়ে যাচ্ছে। মাতালের মত দুর্বল পায়ে কোনোমতে এগিয়ে এসে আলোটা জেলে ফেললেন। আলোতে তবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হওয়া যায়। মনে পড়ে যে, মানুষের ঢের কাজ আছে—যা অসম্ভব, যা সুদূর তার পেছনে দৌড়ে ক্লান্ত হওয়া ছাড়াও।

তিনি জোর ক'রে মনকে সক্রিয় ক'রে তুলতে চাইলেন। নাঃ, পড়াশুনো করা দরকার।

টেবিলের ধারে এসে ব'সে অসহায়ভাবে আশুবাবু একবার স্তূপীকৃত বইগুলোর দিকে চাইলেন। কতদিন তার একটারও পাতা খোলা হয় নি, ধুলো জ'মে রয়েছে। আগে তিনি কখনও কবিতা পড়তে পারতেন না, ও তার অর্থহীন ন্যাকামি ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু, ইদানীং তাঁর কবিতা পড়তে ভালো লাগছে ব'লে একখানা 'সঞ্চয়িতা' কিনেছিলেন। সেখানাও বহু দিন খোলা হয় নি। আশুবাবু কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই 'সঞ্চয়িতা'-খানা টেনে নিলেন। একা হ'লেই তাঁর আবেগ অসহ্য হয়ে ওঠে, আর তখন যেন হাত-পাও কাঁপতে থাকে—যদিচ এ দুর্বলতার কোনো কারণই তিনি খুঁজে পান না। আজও বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর আঙুলগুলো কাঁপছিল—

অন্যমনস্কভাবেই পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ক'টা লাইন চোখের সামনে জ্বলে উঠল—

'বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল, তারপরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে থেমে যাওয়া বাণী।'

আশুবাবু বইটা বন্ধ ক'রে রাখলেন। এ লাইনগুলো যেন তাঁরই মনের কথা, কবির লেখনীতে মূর্ত হয়েছে, তাঁরও হৃদয়ের বীণা অকস্মাৎ একটি আঘাতেই সেদিন বেজেছিল—তারপর আর কোনো চিহ্ন মেলে নি, আজও তাঁর সমস্ত সত্তা সেই আঘাতের রেশটুকুকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

তাঁর মন চ'লে গেল বহু দূরে। ছোটনাগপুর জেলার একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে। ভগিনীপতির অসুখ, তিনি চেঞ্জে যাবেন, অভিভাবক হিসেবে সঙ্গে যেতে হয়েছিল আশুবাবুকে। আর কাজ করবার জন্যে সঙ্গে গিয়েছিল অনুরাধা—দিদির ভাগিনেয়ী। নিতান্ত সাধারণ কুরূপা মেয়ে—এর বেশী পরিচয় তিনি জানতে চান নি, জানবার প্রয়োজনও হয় নি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আশুবাবুর ঔদাসীন্য বিখ্যাত, সে ঔদাসীন্যের সরোবরে কোনোদিন অনুরাগের তরঙ্গ উঠবে তা কেউ ভাবে নি, এমন কি তিনি নিজেও না। তবে মেয়েটি তার ছোটখাটো স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখত—তাঁর অসহায় ভোলা স্বভাব দেখে স্বেচ্ছায় বহু কাজ ক'রে দিত, এটা তিনি প্রথম থেকেই লক্ষ্য ক'রে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা সাধারণ স্নেহকে অতিক্রম করার মত নয়।

তারপর হঠাৎ এক মধ্যাহ্নে ওর কী হ'ল, সকলের বিশ্রামের অবসরে পশ্চিমের দিগন্তজোড়া মাঠে অনুরাধা বেরিয়ে পড়ল একা, কোন্ এক অজ্ঞাত মোহে, নিজের যৌবনের কী এক দুর্বার মায়ায়। ফিরে যখন এল, ওর মুখের দিকে চেয়ে আশুবাবু চম্‌কে উঠলেন। দূর পাহাড়ের নীলিমা ফুটে উঠেছে ওর চোখে, দৃষ্টি হয়েছে স্বপ্নালু। কী স্বপ্ন দেখেছে কে জানে, কিন্তু তার অঞ্জন তখনও ওর মুখে-চোখে রয়েছে লেগে, ওর নিতান্ত শ্রীহীন মুখেও লাগিয়ে দিয়েছে যৌবনের জাদু। ওর সেই আরক্ত শ্রমক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে আশুবাবুর জীবনে সেই প্রথম কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল, চোখ আর তিনি ফেরাতে পারলেন না।

অনুরাধা ওঁরই বিছানায় এসে বসেছিল। ওঁর একখানা হাত সে তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে, তার দু'টি গুচ্ছ চুল স্খলিত হয়ে এসে পড়েছিল ওঁর সমস্ত বাহুমূল ঢেকে। কী কথা তখন তিনি বলেছিলেন তা আর আজ মনে নেই—ইস্কুল-মাস্টার তাঁর বহু দিনের অভ্যস্ত কাজ ক'রে গিয়েছিল—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বোধহয় কী উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন বুঝতে পারেন নি কী বলেছিলেন, বুঝতে পারলেন যখন উঠে যাবার সময় হতশায় অনুরাধার চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠল।

তারপর—তারপরও হয়তো অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু তার কোনোটাই আশুবাবু নিতে পারেন নি। তাঁর বহু দিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় প্রণয়ের ঠাঁই ছিল না—সেটা প্রণয় কি না তাও তখন তিনি বুঝতে পারেন নি। শুধু বুঝে ছিলেন মেয়েটিকে তাঁর ভালো লেগেছে, তার সঙ্গ নেশার মত পেয়ে বসেছে তাঁকে। এমনি ক'রে জীবনের পরম লগ্ন বৃথা কেটে গেল, আশুবাবুর অসহায়, ব্যাকুল মন তার কোনো মুহূর্তটিকেই কাজে লাগাতে পারল না।

আশুবাবু অস্থির হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আলোটা অসহ্য লাগছে তাঁর—তিনি স্বপ্নই দেখতে চান, সে স্বপ্ন বেদানাদায়কই হোক। আলো নিবিয়ে দিয়ে আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন কৃষ্ণপক্ষের চাদ উঠেছে পূব আকাশে। তারি একটা রেখা তার শার্সিতে এসে পড়েছে নিচের কোলাহল তখনও তেমনি রয়েছে, নগেনবাবুর ঘরে তখনও চলেছে তেমনি মাতামাতি।

আবার তাঁর মন চ'লে গেল অনুরাধার কাছে। পশ্চিম থেকে ফিরে তারই বহু অনুরোধে আশুবাবু ওদের বাড়ি যেতে শুরু করলেন, প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়। সন্ধ্যার টিউশনি তাঁকে ছেড়ে দিতে হ'ল, তবু এ নেশা তিনি ছাড়তে পারলেন না। এর দু'-একদিন পরেই অনুরাধাদের বাড়ির ওপর তলার ভাড়াটেরা চ'লে গেল, এল যুগলরা। যুগল আশুবাবুর খুড়তুতো ভাই, বয়সে তাঁর চেয়ে কিছু ছোট হ'লেও বন্ধুর মত ছিল সে। আশুবাবুর সম্পর্কে যুগলের সঙ্গেও এদের ঘনিষ্ঠতা হ'তে বাধল না। সন্ধ্যাবেলার আড্ডা জ'মে উঠল।

তারপর যে কোথা দিয়ে কী হ'ল আশুবাবু জানেন না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন যুগলের প্রসঙ্গে অনুরাধার মুখে রক্তিমা ফুটে ওঠে, আর তার প্রসঙ্গে যুগলের দৃষ্টি হয়ে পড়ে নত। এর কয়েক দিন পরেই যুগল তাঁকে

অনুরোধ করল অনুরাধার সঙ্গে তার বিয়ের কথাটা বাবার কাছে পাড়বার জন্য। আশুবাবুর বুকের একটা দিক যেন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠল, তবু তিনি মুখ ফুটে যুগলকে কিছু বলতে পারলেন না—কাকার কাছে তাঁকে কথাটা পাড়তে হ'ল এবং তাঁরই প্রাণপণ চেষ্টায় প্রস্তাবটা একদিন পাকা কথায় পরিণত হয়ে গেল।

এর পর অনুরাধা আর যুগলের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। যুগল ওঁর কাছে তার যা কিছু মনের কথা খুলে বলে, অনুরাধা কানের কাছে করে গুঞ্জন। তাদের প্রণয়লীলার আদিপর্বের প্রতিটি ইতিহাস সুতীক্ষ্ণ ছুরির মত আশুবাবুর বুকে কেটে কেটে বসে, তবু ওদের কথা তাঁকে শুনতে হয় এবং—এবং ওদের সান্ত্বনা দিতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়। অনুরাধা তাঁকে অনুরোধ করেছে, বিয়ের বাজার ক'রে দেবার জন্য, যুগলও তাই।—আজ ক' দিন ধ'রেই যুগলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাঁকে বাজার করতে হচ্ছে। তারপর ফিরে গিয়ে অনুরাধাকে দেখিয়ে অনুমোদন ক'রে নেওয়ার ভারও তাঁর। এই পরিশ্রমের পরিবর্তে বর-কন্যার প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অঞ্জলি ভ'রে নিয়ে আসছেন তিনি—

কী যেন এক অসহ্য যন্ত্রণায় আশুবাবু ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলেন। প্রীতি, কৃতজ্ঞতা কিছুই চান না তিনি, এমন কি বোধ হয় ভালোবাসাও না। যা অসম্ভব যা কোনো দিন তিনি পাবেন না, তার আশাও তাঁর আর নেই। শুধু তিনি অনুরাধাকে জানাতে চান যে তিনি তাঁকে ভালোবাসেন, সমস্ত অন্তর দিয়ে, সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়ে তিনি অনুরাধাকে ভালোবাসেন—শুধু এইটুকু জানাতে চান তিনি, আর কিছু নয়। তাঁর উপক্রুত, ক্ষত-বিক্ষত বক্ষের শেষ রক্তকণা দিয়ে তিনি তাকে ভালোবাসেন, ওর নিশ্বাসের শব্দে তাঁর রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে, স্পর্শে তাঁর সমস্ত স্নায়ু হয়ে আসে অবশ, ওর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক কাঁপতে থাকে—এই কথাটা আজ অনুরাধার জানা চাই, যেমন ক'রে হোক!

কতদিন চেষ্টা করেছেন আশুবাবু, অনভ্যস্ত রসনায় প্রণয়-নিবেদনের ভাষা গেছে আটকে—কিছুতেই শেষ পর্যন্ত বলা হয় নি। কতদিন অর্ধোচ্চারিত কত কথা অনুরাধার নব-প্রণয়ের আবেশ-মাখানো দৃষ্টির দিকে চেয়ে লজ্জায় থেমে গেছে—নিজের চুল পাকা ও টাক পড়ার কথা মনে হয়ে কণ্ঠ এসেছে বুজে। কিন্তু, তবু এ কথা যে তাঁকে শোনাতেই হবে। ব্যাধ জানবে না তার শিকার কেমন ক'রে ম'ল? মায়াবিনী জানুক একটা প্রাণের সমস্ত আলো সে কেমন ক'রে

নিঃশেষে নিবিয়ে দিয়েছে!—একটা সুবিপুল সম্ভাবনাকে কী কঠিন পায়ের আঘাতে সে ভেঙে দিয়ে গেছে!

যদিও আশুবাবু ভালো ক'রে জানেন যে, ঠিক তাঁর মনের কথা, তাঁর এই অন্তরের অপরিসীম শূন্যতার কথা কোনোদিনই অনুরাধার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, এমন ক'রে শুধু পুরুষই ভালোবাসতে পারে,—এই প্রচণ্ড আবেগ মেয়েরা কোনো দিনই ভাবতে পারবে না। তাছাড়া, ওঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল অনুরাধার প্রণয়বিহ্বল অন্যমনস্ক চোখ দু'টি, আশুবাবু যখন তাঁর এই দুঃখ জানাবেন তখন হয়তো সে ব'সে ভাববে যুগলের কোনো একটা ছোট্ট রসিকতার কথা, তার প্রতি ওর প্রেমের ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তির কথা। সে অলস-মদির চিন্তার মধ্যে আশুবাবুর কান্না কোথায় হারিয়ে যবে, তার অর্ধেকটা অর্থও অনুরাধার মনে প্রবেশ করবে না।

তবু, তবু আর যে সময় নেই! আশুবাবু যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। আর তিনটি দিন, তারপর এ কথা তাকে শোনাবার অধিকারও তাঁর থাকবে না। নাই বা সে বুঝল আজ, এরপর কোনোদিন, ওর কোনো বেদনার রাত্রে আজকের এই প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া কথাগুলো তাদের সত্য অর্থ নিয়ে অনুরাধার মনের কূলে কি দেখা দেবে না? তাঁর এই এমন একান্ত-ক'রে-চাওয়ার ইতিহাস চিরদিনের মতই হারিয়ে যাবে?

আশুবাবুর চোখের শিরা দুটো যন্ত্রণায় টনটন ক'রে উঠল। কিন্তু, তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। এ লজ্জাও তাঁকে পেতে হয়েছে—যেদিন ওদের বিয়ের তারিখ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল, সেদিন রাত্রে তিনি ছেলেমানুষের মতই কেঁদেছিলেন বহুক্ষণ ধ'রে। কিন্তু আজ আর না।

নিচের তলায় কার ঘড়িতে ঠং ঠং ক'রে ন'টা বাজল। অনুরাধার বাবা এখনও ফেরেন নি। অফিস থেকে বেরিয়ে টিউশনি ক'রে তিনি বাজারে যান —এখনও ঢের দেরি। ওর মা-ও রান্নাঘরে—এখন গেলে হয়তো একাই পাওয়া যাবে ওকে। যাবেন নাকি আর একবার, কোন ছুতোয়? আগ্রহে আশু-বাবুর বুক কাঁপতে লাগল, কিন্তু আজও যদি কিছু না বলতে পারেন? আজও যদি কথাটা মুখে বেধে যায়? কিংবা, বলতে গিয়ে যদি দেখেন অনুরাধার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে?

তালাটার জন্য হাত বাড়াতে গিয়েও আশুবাবু থেমে গেলেন। উপেক্ষা তিনি সয়েছেন, অপমান সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু, পরক্ষণেই জোর ক'রে মনকে কঠিন করলেন। না, তাঁকে এই কথাটি, মনের এই নিভৃত সংবাদটি পৌঁছে দিতেই

হবে অনুরাধার কাছে। তিনি বুকের রক্ত দিয়ে যে পূজা করলেন, তার ইতিহাসটা অন্তত দেবতা জানুন।

আশুবাবু যখন ওদের বাড়ি পৌছলেন তখন অনুরাধা সেদিনের কেনা জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে তুলে রাখছিল। ওঁকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'আপনার কথাই ভাবছিলুম, আপনি কি হাত গুণতে জানেন?'

আশুবাবুর বুক প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল অকস্মাৎ। কোনোমতে মুখের বিবর্ণতা চেপে প্রশ্ন করলেন, 'কেন বল তো?

মাথা নত ক'রে অনুরাধা বলল,'বাবাকে আমার ব্যবহারের জন্য একটা ভালো ক্রীম আনতে বলেছিলুম, বাবা এক দেশী ক্রীম এনে দিয়েছেন, সে যেন খড়ির গুঁড়োর মত লেগে থাকে। ওঁর অত ফরসা রং, পাশে গিয়ে কী ক'রে দাঁড়াব বলুন তো? প্রথমে দেখে কী ভাববে ওঁর বাড়ির লোকরা। আপনি আমাকে একটা বিলিতী ক্রীম, আর খুব দামী পাউডার এনে দেবেন। কেমন?'

আঘাতটা সামলে নিয়ে আশুবাবু জবাব দিলেন, 'কালই আনব।'

একটু থেমে অনুরাধা বললে, 'বাস্তবিক, আপনার কাছে আমার ঋণের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে—আপনি না থাকলে কী হ'ত! ওঁকে কোনোদিন পেতামই না।'

আশুবাবু শুষ্ক কণ্ঠে কোনোমতে স্বর টেনে এনে কথাটা পাড়তে যাবেন, অনুরাধা বললে, সেই কোডারমার কথা মনে আছে আপনার? সেই দুপুরের কথাটা? যেদিন আপনি আমাকে অতদূর বেড়াতে যাবার জন্য বকলেন? সেদিন আমি স্থির করেছিলুম আত্মহত্যা করব। কী কষ্ট যে সেদিন হয়েছিল কী বলব, যাকে কেউ কোনোদিন ভালোবাসলে না—ভালোবাসবে না, তার বেঁচে লাভ কী?'

একবার যেন শিউরে উঠে অনুরাধা বললে, 'ভাগ্যিস, সেদিন সত্যি আত্মহত্যা করে বসি নি। সে-দিনকার কান্নাতেই বোধ হয় ভগবানের টনক নড়ল, আমার রাজপুত্তুর এলেন এতদিন পরে।'

সলজ্জভাবে একটু হাসল অনুরাধা। আশুবাবু ওর হাতখানার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসেছিলেন, আবারও তাঁর লগ্ন বয়ে গেল, বলা হ'ল না। অনুরাধা একটু পরে বললে, 'আচ্ছা আপনি আমাকে কী দেবেন বলুন তো? যাই দিন—একখানা গানের বই দেবেন ভালো দেখে—'

বিস্মিত হয়ে আশুবাবু প্রশ্ন করলেন, 'গানের বই ? তুমি কি গান জান ।'

অপ্রতিভভাবে হেসে অনুরাধা বললে, 'না, তা জানি না। তবু এমনি মুখস্থ করব। ও গান গাইতে পারে, কিন্তু গানের লাইন ওর মনে থাকে না, সেগুলো তো অন্তত কাছে থাকলে যুগিয়ে দিতে পারব ।'

আবারও দু'জনে চুপচাপ। আশুবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল, তিনি অন্যমনস্ক ভাবেই মুছে ফেললেন। সে দিকে চেয়ে অনুরাধা তাড়াতাড়ি একটা পাখা টেনে নিয়ে হাওয়া করতে করতে বসল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে গলা নামিয়ে বললে, 'আমার কিন্তু অনেক দিনের একটা শখ আছে, আপনাকে মেটাতে হবে ।'

'কী শখ ?' দুর্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আশুবাবু।

'আমি বিয়ের পর ওঁর সঙ্গে আর একবার কোডারমায় বেড়াতে যেতে চাই। —ওঁরও খুব ইচ্ছা, কিন্তু আপনার কাকার কাছে কথা পাড়বার সাহস নেই ওঁর। আপনি যদি ব'লে দেন একটু—'

আশুবাবু একটু হাসলেন। সে হাসির অর্থ অনুরাধা বুঝল না, সে শুধু ওঁর মুখের কথার আশ্বাসটুকুই শুনল, 'খুব চেষ্টা করব ।'

এমনি ক'রে আরও কিছুক্ষণ চলল ওদের টুক্‌রো টুক্‌রো আলাপ। অনুরাধার অন্তরের দৃষ্টি প্রসারিত আছে সুদূর ভবিষ্যতে, সেই স্বপ্নের কথাই ব'লে যেতে লাগল সে। কেমন হবে তার ঘরকন্না, তার ছেলেমেয়ে, কেমন ক'রে সাজাবে সে তাদের—এই সব। তার সে স্বপ্নের মধ্যে অশুবাবুর কোনো স্থান নেই, তা তিনি জানেন। আরও জানেন যে, এই সুখ-স্বপ্নের দেওয়ালে তাঁর কান্না ধাক্কা খেয়ে নিজেই আহত হবে, সে দেওয়ালে এতটুকু কাঁপন লাগাতে পারবে না। সে হাস্যকর চেষ্টা আর তিনি করলেন না, এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ তাহ'লে চললুম ।'

'চললেন ?' অনুরাধা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল', 'আর একটু বসুন না, বাবার আসবার সময় হ'ল তো ।'

'না যাই। বড় মাথা ধরেছে ।'

অনুরাধা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'শুয়ে পড়ুন না তাহ'লে একটু। মাথা টিপে দিই—'

আশুবাবু জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে বললেন, 'না থাক—কাজও আছে একটু ।'

সদরের কাছে, যেখানে ওপরের সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে, সেইখানে গিয়ে ওঁর প্রায় ধাক্কা লাগল যুগলের সঙ্গে, সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সে। সে ওঁকে চিনতে পেরে বলল, 'কে ছোড়দা ? ও, তুমি এসেছিলে বুঝি ? তাই শ্রীমতীর এত দেরি!'

আশুবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই কি তাহ'লে ওর জন্যেই—'

যুগল হেসে বললে, 'নইলে কি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম!—প্রকাশ্যে তো আর দেখা হবার জো নেই, এইখানে আমাদের গোপন সাক্ষাৎ চলে।—নইলে থাকতে পারে না ও নিজেই—আমি কি করব!'

তারপর একটু ইতস্তত ক'রে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার ক'রে আশুবাবুর হাতে দিয়ে বললে, 'দেখত কেমন হ'ল ?'

আশুবাবু ওপর-থেকে-এনে-পড়া ক্ষীণ আলোয় জিনিসটা খুলে দেখলেন—একজোড়া মিনে-করা আর্মলেট। যুগল অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'ওর বড় শখ। ওর বাবা দিতে পারবেন না, এখানেও সে রকম কোনো কথা নেই। তাই আমিই গড়িয়ে দিলুম চুপিচুপি—ওর বাবার নাম ক'রেই দেওয়াব। এখানে এলে আর আমার দেবার স্বাধীনতা থাকবে না তো!'

'বেশ হয়েছে' ব'লে আশুবাবু গয়নাটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। যুগলও ওঁর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এসে বললে, 'দেখ ভাই ছোড়দা, আর একটা কথা রাখতে হবে। এতই যখন করলে তখন শেষ রক্ষা কর।'

'কী ?' প্রশ্ন করলেন আশুবাবু।

'ওর বড় ইচ্ছে একটা হনিমুন ট্রিপ দিই। কিন্তু, আমার হাতে যা কিছু ছিল এই বিয়েতেই খরচ হয়ে গেল। শ'-দুই টাকা ধার দিতে হবে তোমাকে।—তা ছাড়া কথাটা তোমাকেই বাবার কাছে পাড়তে হবে—এটি করতেই হবে ভাই, সত্যি কথা বলতে কি, ও শখ আমারও ছিল।

'আচ্ছা, সে হবে'খন।' ব'লে আশুবাবু এগিয়ে গেলেন।

অন্ধকার পথ, থম্‌থম্ করছে। রাস্তাও তখন নির্জন হয়ে এসেছে। ক্লান্ত পা টেনে চলতে চলতে হঠাৎ যেন আশুবাবুর মনে হ'ল আজ তাঁর কাছে ঘর-বার সব সমান হয়ে গেছে। তাঁর তেতলার সেই নির্জন ঘর আর এই অন্ধকার রাস্তায় কোনো তফাত নেই। তবু, তবু তাঁকে চলতে হবে—একসময়ে

সেই ঠাণ্ডা, জনহীন, সঙ্গিহীন ঘরে পৌঁছাতেও হবে তাঁকে। আর কোথাও স্থান নেই তাঁর।

চলতেই লাগলেন তিনি, অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে—আর আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে—'অনুরাধা, অনুরাধা।'

বলা হ'ল না তাঁর, কিছুই বলা হ'ল না। আর কোনোদিন হবেও না। শুধু এই ডাকই রইল তাঁর। এ তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

## জননায়ক

প্রায় চল্লিশ বছর আগে বিহারের এই ছোট শহরটিতে এসে 'হনুমান দাস কেদারনাথ' ফার্মের মালিক কেদারনাথ যখন তাঁর মুদিখানার দোকান খোলেন তখন তাঁর কল্পনা ছিল তিনি লক্ষপতি হবেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর ব্যবসা ক'রে তিনি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁর ছেলে রঘুবীরপ্রসাদ একলক্ষ টাকা শুধু দরিদ্রদের দান ক'রে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, কারও কারও অদৃষ্টে সিদ্ধি আসেন 'ভাবনা'র কূল ছাপিয়ে—কল্পনার বহুগুণ বেশি হয়ে। রঘুবীরপ্রসাদও বাপের উপযুক্ত পুত্র, তিনি আরও দশ বৎসরের মধ্যে ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করালেন যে, তাঁকে সেই শহরের মালিক বললেও অত্যুক্তি হ'ত না। একটা চিনির কল, একটা তেলের কল, তিনটে পেট্রোল-পাম্প, কেরোসিনের গুদাম, গোটা চারেক বাস-লাইন, একটা বিরাট কাপড়ের দোকান এবং প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা জোড়া এক গোলদারি দোকানের মালিক হয়ে বসলেন তিনি। এ-ছাড়া শহরে বাড়ি এবং দেহাতে জমিদারী কত যে তিনি করেছিলেন তা বোধ হয় তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুরও ভালো ক'রে জানা ছিল না। অবশ্য, কমলার এই অযাচিত প্রসাদের তিনি অপব্যবহার করেন নি। একটি ধর্মশালা, একটি হাসপাতাল এবং একটি অতিথিশালা সম্পূর্ণ তাঁর পয়সাতেই চলত। এ ছাড়া সমস্ত রকম স্বদেশী উৎসাহেই তাঁর দান থাকত মোটা অঙ্কের রূপ ধ'রে।

এ হেন রঘুবীরপ্রসাদ একদিন তাঁর বাস-স্টেশনের অফিসে বসে কী একটা হিসাব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন এমন সময়ে একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী

মেয়ে ঈষৎ ত্রস্তপদেই সিঁড়ি ক'টা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে প্রশ্ন করলে, 'রঘুবীর-বাবু কোথায় বসেন ?'

কণ্ঠস্বর খুবই মিষ্ট আর তা শান্ত করবার একটা চেষ্টাও ছিল, তবু ব্যাকুলতা-টুকু ধরা পড়ল। রঘুবীরপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে তাকালেন এবং তাকিয়েই রইলেন। বাঙালীর মেয়ে, খুব যে সুন্দরী তা নয়—বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চোখ দুটিও খুব আয়ত নয়—অসাধারণত্ব দেহের কোথাও নেই, তবু তার দীর্ঘ ঋজু দেহে এমন একটি মিষ্ট ছন্দ ছিল যে, সেদিক থেকে চোখ ফেরানো সত্যিই শক্ত। বিশেষ ক'রে তার দৃষ্টি এমন আশ্চর্য প্রাণপূর্ণ যে, সে চাহনি অপর দৃষ্টিকে প্রায় চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে। রঘুবীরপ্রসাদ যুবক নন, বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেচে, বিভিন্ন ব্যবসায়ের হিসাব এবং স্বদেশী-আন্দোলনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর চোখ থেকে রঙ বিদায় নিয়েছে বহু দিন, তবু চোখ নামাতে তাঁর একটু দেরিই হ'ল।

চোখ নামিয়ে রঘুবীরপ্রসাদ বললেন, 'বলুন।'

'ওঃ, আপনিই ?' মেয়েটি যেন একটু অপ্রতিভ হ'ল। এত বড় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারকে সে এমন সাধারণ খদ্দরের পোশাকে খোলা অফিসে ব'সে থাকতে দেখবে আশা করে নি বোধ হয়। সে একটু থতিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখুন, আমি একটু বিপদে পড়েছি। আমি আপনাদের ঐ থানার পাশের বাংলোটায় থাকি—'

রঘুবীরপ্রসাদ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাড়ি সম্বন্ধে কিছু যদি বলবার দরকার থাকে তো কষ্ট ক'রে আমাদের ম্যানেজার কুঞ্জবাবুর কাছে যেতে হবে। তিনিই ও-সব দেখেন শোনেন, আমি বলতে গেলে, কোনো খবরই রাখি না। আপনার কথার ঠিকমত জবাব আমি হয়তো দিতে পারব না।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বর আবারও যেন কেঁপে উঠল। সে বললে, 'না দেখুন দরকারটা আপনার কাছেই। কুঞ্জবাবুর কাছে আমি গিয়েছিলুম, তিনি বললেন আপনার হুকুম না পেলে তাঁর কিছু করবার নেই।'

তারপর একটুখানি, বোধ হয় এক মুহূর্ত থেমে মেয়েটি বললে, 'আমার দাদা অসুস্থ, তাঁকে সারাতেই আমার এখানে আসা, এখন যদি আবার ফিরে যেতে হয় তাহ'লে আর তাঁকে বাঁচানো যাবে না।'

রঘুবীরপ্রসাদ যেন কোথায় একটু আলো দেখতে পেলেন, বললেন, 'কী অসুখ তাঁর ?'

'অনেকদিন পরে কালাজ্বরে ভোগবার পর শেষের দিকে একটু প্লুরিসির মত

হয়েছিল তিনি সে সব থেকে সেরেই উঠেছেন, সেই জন্যই তাঁকে নিয়ে চেঞ্জে এসেছি। এখানে এসে পথের কষ্টে একটুখানি শ্রম-জ্বরের মত হয়েছে—কুঞ্জবাবু সন্দেহ করছেন টি-বি, কিন্তু টি-বি কিছুতেই নয়, আপনি বিশ্বাস করুন।'

রঘুবীরপ্রসাদ বললেন, 'দেখুন, আমি এসব কিছুই দেখি নে, কুঞ্জবাবুর ওপরই সব ভার আছে। তিনি ভালো বুঝে যা ব্যবস্থা করতে চান তার ওপর কথা বলা কি আমার উচিত? তাহ'লে কাজের গণ্ডগোল হয় না কি?'

'কিন্তু', মেয়েটির চোখে জল ছলছলিয়ে এল, 'তাহ'লে কোথায় যাই বলুন, এখানের সব বাড়িই তো আপনাদের। এখনই ফিরতে গেলে দাদা পথেই মারা যাবেন।'

রঘুবীরপ্রসাদ জবাব দিলেন, 'বেশ, আপনার দাদা যতদিন না সুস্থ হন, তাঁকে এখানকার হাসপাতালে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু, নিয়ম যেটা আছে সেটা ভাঙতে আমি পারব না। তাছাড়া একবার জানাজানি হয়ে গেলে ও বাড়ি কেন, আমার কোনো বাড়িই সহজে ভাড়া হবে না।'

'কিন্তু, আপনারা কেন ধ'রে নিচ্ছেন যে তাঁর টি-বি হয়েছে। আমি বলছি যে তাঁর টি-বি নয়।'

'বেশ তো, কয়েকটা দিন তিনি হাসপাতালেই থাকুন না। সুস্থ হ'লে না হয়—'

'সে হয় না।' মেয়েটি বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠেই বললে, 'তাঁর যা সেন্‌সিটিভ নার্ভস, হাসপাতালে গেলে একদিনও বাঁচবেন না।'

রঘুবীরপ্রসাদও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তাহ'লে আমি আর কী করব বলুন, কুঞ্জবাবুর ব্যবস্থা বদল করা আমি সঙ্গত মনে করি না।'

মেয়েটির চোখে যেন এক মুহূর্তের জন্য আগুন জ্বলে উঠল, সে অকস্মাৎ তার হাতের দু'গাছি চুড়ি খুলে রঘুবীরের সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বললে, 'টাকা আমার হাতে যথেষ্ট নেই এখন, আপনি এই দুটো চুড়ি রেখে দিন, এর যা দাম এখন তাতে আপনার ঐ দুটো ঘরের প্লাস্টারিং খসিয়ে নতুন ক'রে প্লাস্টারিং আর চুনকাম নিশ্চয়ই করাতে পারবেন—যদি দাদার অসুখটা টি-বিই প্রমাণ হয় তাহ'লে এইতেই তো আপনার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে।'

রঘুবীর যেন একটু বিরক্ত হয়েই এবার বললেন, 'দেখুন, এসব ঝঞ্ঝাট আমরা করতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন!'

মেয়েটি এবার সোজাসুজি জ্বলে উঠল, বললে, 'কিছুই পারেন না আপনারা, শুধু একটা অসুস্থ লোক আর একটা মেয়েছেলেকে পথে বার ক'রে দিতে পারেন, না ?…সে কাজটাও অত সহজ ভাববেন না, আমি ও বাড়ি ছাড়ব না। দেখি, কী ক'রে আপনারা আমাদের ওখান থেকে উঠিয়ে দেন! যা পারেন করবেন—'

সে তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিমেষের মধ্যে তার বাড়ির পথে অদৃশ্য হ'ল।

রঘুবীরপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন, তারপর একটা বেয়ারাকে দিয়ে কুঞ্জবাবুকে ডাকিয়ে পাঠালেন। কুঞ্জবাবু বসেন গোলদারি গদিতে, তিনি শশব্যস্তে চ'লে এলেন। কারণ, রঘুবীরবাবু তাঁকে ডেকে পাঠান কদাচিৎ, প্রয়োজন হ'লে প্রায় নিজেই যান।

কুঞ্জবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'থানার পাশের ঐ নতুন বাংলোটা কে ভাড়া নিয়েছে ? কার মারফত এসেছে ওরা ?'

কুঞ্জবাবু জবাব দিলেন, 'ওটা কলকাতা থেকে চিঠি লিখে ওঁরা ঠিক করেন। ইন্দ্রাণী বোস, এই নামেই মনিঅর্ডারে টাকা আসে। তখন তো জানি না যে, ওঁরা ও-রকম রুগী আনবেন, চেহারা দেখে মনে হ'ল টি-বির লাস্ট স্টেজ—'

রঘুবীর বললেন, 'যদি তা-ই হয়, ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে এই ক'দিন, ওঠাতে গেলেও দু'-একদিন আরও লাগবে। তাতে আর দরকার নেই।'

কুঞ্জবাবু খুবই বিস্মিত হলেন। এসব ব্যাপারে রঘুবীর কোনোদিন তাঁর ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন নি। তিনি মাথা চুলকে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু—'

'সে রকম হ'লে এরপর বাড়িটা ভেঙে দিলেই চলবে।'

রঘুবীর আবার তাঁর কাগজে মন দিলেন।

দিন-দুই পরে একদিন রঘুবীরপ্রসাদকে একটু কাজে থানায় আসতে হয়েছিল। ফেরবার পথে কী খেয়াল হ'ল তিনি সোজা রাস্তাটা ছেড়ে তাঁর বাংলোর পাশের গলিটাই ধরলেন। বাংলোর সামনে অনেকটা জমি খালি প'ড়ে আছে, দু'-একটা শালগাছ আর আতাগাছ আপনিই জন্মেছে। এখানে বাগান করার কল্পনাও করে নি কেউ। তারই মধ্যে একটা পাথর পড়েছিল বহুকাল ধ'রে। সেই পাথরটার ওপর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রাণী, শালবনের ফাঁকে সূর্যদেব যেখানে অস্ত

র্যাচ্ছিলেন সেই দূর আকাশের বিশেষ প্রান্তটির দিকে চেয়ে। সহসা পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে রঘুবীরবাবুকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু, সে মুহূর্ত মাত্র, চোখোচোখি হবার পর একটি মহূর্ত মাত্র তার সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে, 'কী সৌভাগ্য আমাদের, আসুন, আসুন—নেমে আসুন পথ থেকে—'

রঘুবীর সামান্য একটুখানি ইতস্তত ক'রে নেমে এলেন, প্রতি-নমস্কার ক'রে বললেন, 'আপনার দাদা কেমন আছেন?'

ইন্দ্রাণী জবাব দিলে,'ভালোই আছেন কাল থেকে, কিন্তু সে তো আপনারই দয়া। শুনলুম, আপনিই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি তো 'ফি' পর্যন্ত নিলেন না আমাদের কাছ থেকে। কুঞ্জবাবুও আজ সকালে এসে খবর নিয়ে গেছেন—'

তারপর সহসা থেমে বললে, 'এখানেই বসবেন, না ভেতরে যাবেন?'

রঘুবীর একেবারে পাথরখানার ওপর ব'সে পড়ে বললেন, 'এখানেই বসছি—'

'উঁহু, উঁহু, বসবেন না, বসবেন না—আমি আসন আনছি।'

সে ছুটে ভেতরে গিয়ে দু'খানা আসন নিয়ে এল। রঘুবীরবাবুকে জোর ক'রে তুলে পাথরের ওপর একখানা আসন পেতে দিলে, আর একখানা মাটির ওপরই বিছিয়ে নিজে ব'সে পড়ল। তারপর একটু দম নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আপনি যদি এত অনুগ্রহই করবেন তো সেদিন মিছিমিছি অত রাগিয়ে দিলেন কেন?... ছি ছি, দেখুন দেখি, আমিও কতকগুলো কড়া কথা ব'লে এলুম।'

রঘুবীর এতক্ষণ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই, ওর পরিশ্রমের ফলে আরক্ত ও ঈষৎ স্বেদসিক্ত সুডৌল ললাটের দিকে চেয়ে ছিলেন, ওর কথাটা থামতে যেন চমক ভেঙে উঠে উত্তর দিলেন, 'মিছিমিছি তো রাগাই নি, আপনাকে যা বলেছিলুম সবই সত্য। শেষকালে আপনারা উঠে গেলে বাড়ি ভেঙে দেব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে কুঞ্জবাবুকে রাজি করিয়েছি—'

কথাটা ব'লে ফেলেই রঘুবীর বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। ইন্দ্রাণীর মুখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠেই বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি সামলে নিয়ে বললেন, 'অবিশ্যি যদি আপনার দাদার রোগটা খারাপ ব'লেই শেষ পর্যন্ত জানা যায়—'

ইন্দ্রাণী কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে অথচ চাপাগলায় বললে, 'কিছুতে তা জানা যাবে না, আমি বলছি আপনাকে, তা নয়। দাদার কথা যদি সব শোনেন, তাহ'লে বুঝতে পারবেন কেন ওঁর চেহারা অত রোগা!'

রঘুবীর জিজ্ঞাসুনেত্রে শুধু চাইলেন। এর পর কিন্তু আলাপ দ্রুত জমে উঠল; ইন্দ্রাণীর দাদা সুব্রত কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। ওদের বাবা মা ছেলেবেলাতেই মারা যান, মানুষ করেন ওদের ছোটমাসি। বাড়ি শ্রীরামপুর। দাদা মাস্টারি নেবার পর নিজে দু'বার এম্-এ পাস করেন, ইচ্ছে ছিল বোনকেও এম্-এ পাস করাবেন, কিন্তু এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় দাদার খরচপত্র কিছুতেই কুলোচ্ছে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে, দুটো টিউশনি ক'রেও কুলোচ্ছে না দেখে ইন্দ্রাণী বি-এ পাস করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিজেও জোর ক'রে একটা ইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছিল—মাস ছয়েক মাস্টারি করেওছে, এমন সময় এই বিপত্তি। আগে কালাজ্বর, তারপর প্লুরিসি। জমানো কিছুই ছিল না—ইন্দ্রাণীর সামান্য দু'-একটা গহনা ও সুব্রতর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা সবই গেছে। ইন্দ্রাণীর চাকরিও বাধ্য হয়েই ছাড়তে হয়েছে। চিকিৎসা ও পথ্যের যোগাড় করাই দায়—দাম দেওয়া তো আরও দুঃসাধ্য। ডাক্তাররা অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু চেঞ্জে না গেলে সেরে উঠতে পারবেন না কিছুতেই, এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন। ইস্কুলের ছেলেরা ও অন্য মাস্টারমশাইরা চাঁদা ক'রে একশ' টাকা তুলে দিয়েছেন, তাই নিয়েই ও এখানে এসে পড়েছে। ভরসার মধ্যে দেশে এখনও একটা পুরানো বাড়ি আছে, সেইটেই বিক্রি করতে ব'লে এসেছে। মাসির হাতেও হয়তো কিছু আছে। কিন্তু, যিনি চিরকাল ওদের জন্যেই সব কিছু বিসর্জন দিলেন, তাঁর এই অতিবৃদ্ধ-বয়সের শেষসম্বল শেষ করতে ও রাজি নয়। তিনিও ওদের সঙ্গে এসেছেন। ইত্যাদি—

রঘুবীর এতক্ষণ প্রায় নিঃশব্দেই ওর সুদীর্ঘ কাহিনী শুনে যাচ্ছিলেন। অবাক লেগেছিল ওঁর মনে। তিনি বিশেষ লেখাপড়া করবার সুযোগ পান নি, তবে এই বিপুল ব্যবসায়ের সম্পর্কে এসে চলনসই রকমের একটু ইংরেজী তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। লেখাপড়া-জানা মেয়ে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ কিন্তু তাঁর কখনই হয় নি। ও সম্বন্ধে বরং একটা ভয়ই ছিল তাঁর মনে। তিনি তাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছিলেন যে, বি-এ পাস মেয়েও কেমন অবলীলাক্রমে, কত সহজে, তাঁর সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রে যাচ্ছে। তাঁর ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই এর কোথাও!

হঠাৎ যেন ইন্দ্রাণীই সচকিত হয়ে উঠল, 'আমিই খালি ছাই-ভস্ম বকে যাচ্ছি, আপনি তো একটা কথাও কইছেন না। নিশ্চয়ই আমাকে খুব অসভ্য ভাবছেন!'

অপ্রস্তুত হয়ে রঘুবীর বললেন, 'না না, তা নয়, তবে আপনার কাহিনী আপনারই তো বলবার কথা, আপনি বকে না গেলে কে বলবে বলুন ?'

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ইন্দ্রাণী বললে, 'দাদা একটু সামলে উঠলেই আমি কিন্তু একদিন আপনার বাড়ি যাব। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসব। আপনারা শুনেছি ভয়ঙ্কর বড়লোক, কিন্তু তাই ব'লে কি আর তিনি কথা কইবেন না আমার সঙ্গে ?

হেসে রঘুবীর বললেন, 'নিশ্চয়ই কইবেন, তবে আমার মত বাংলা তিনি বলতে পারেন না, তা কিন্তু আমি আগেই ব'লে রাখছি।'

ইন্দ্রাণী কান পেতে কী একটা শুনে বললে, 'দাদা বোধ হয় উঠেছেন। চলুন, আলাপ করিয়ে দিই—'

সুব্রতর ঘুম ভেঙেছিল সত্যিই, তবে উঠে বসবার শক্তি তখনও তার হয় নি, তাই শুয়েই ছিল। রঘুবীরপ্রসাদ ঘরে ঢুকতে কোনোমতে উঠে বসল। তার অপরিসীম কৃশতা ও পাণ্ডুরতা দেখেই রঘুবীর কুঞ্জবাবুর সন্দেহের কারণ বুঝতে পারলেন। হয়তো তাঁরই সন্দেহ সত্য—অন্য রোগের ছিদ্রপথে চরম রোগই কখন্ প্রবেশ করেছে এই শিক্ষাব্রতীর বুকে।

সামান্য দু'-একটা কথা কয়েই রঘুবীর উঠে পড়লেন। যাবার সময়ে আর একবার নিজের বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি দ্রুত শালবনের মধ্যকার রাস্তটা ধ'রে একসময়ে ইন্দ্রাণীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে চ'লে গেলেন।

এর দিন-তিনেক পরেই একটি অত্যন্ত স্থূলকায়া বাঙালী মহিলা এলেন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে। পরিচয়ে জানালেন তিনি এখানকারই একটি বাঙালী মেয়ে-ইস্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস্—কুমুদিনী মিত্র। ইস্কুলটিতে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু না হয় সে ইস্কুলে পর্যাপ্ত মেয়ে, আর না পাওয়া যায় স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকের কোনো সহানুভূতি। 'হনুমানদাস কেদারনাথ' এস্টেটের একটা মোটা মাসিক সাহায্য পাওয়া যায় ব'লেই কোনোমতে এখনও টিকে আছে, নইলে কবেই উঠে যেত। অবশ্য লোকাভাবও খুবই। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। সামান্য বেতনে বাইরে থেকেও কেউ এসে থাকতে চায় না। স্কুল চালাবার রীতি-পদ্ধতি জানেন, এমন কাউকে কিছুদিনের মত পেলেও কুমুদিনী নূতন ক'রে সব ব্যবস্থা করতে পারতেন। কুমুদিনী নিজে আই-এ পাস করেছেন বটে, কিন্তু ইস্কুলের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই।

সব কথা শেষ ক'রে কুমুদিনী আসল কথাটা পাড়লেন,'শুনেছি আপনি মাস্টারি করেছেন কিছুদিন কলকাতায়, আর থাকবেনও এখানে তিন-চার মাস—এই সময়টা আমাদের একটু সাহায্য করুন না। এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত তো।... আমরা আপনাকে তিন মাসের জন্য একশ' টাকা ক'রে মাইনে দিতে পারব।' ইন্দ্রাণী মুহূর্তখানেক চুপ ক'রে থেকে বললে, 'রঘুবীরবাবুর সঙ্গে আপনাদের ইস্কুলের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি ?'

'আছে বৈকি! তিনিই তো আমাদের সেক্রেটারী।'

'আমার সব কথা তাঁর মুখেই শুনলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, নইলে কোথা থেকে জানব বলুন !'

ইন্দ্রাণী মাথা নত ক'রে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'দেখুন কাজ আমি করতে পারি, কিন্তু মাইনে আমি পঞ্চাশ টাকার বেশি নিতে পারব না।'

'কেন ?' বিস্মিত হয়ে কুমুদিনী প্রশ্ন করলেন।

'পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আমার প্রাপ্য—একশ' টাকাটা দান।'

কুমুদিনী কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর বললেন, 'বেশ তাই হোক। কাল থেকেই যাবেন তো? ঝি পাঠাব, না রঘুবীরবাবুর গাড়িটা পাঠাতে বলব ?'

'কতদূর ?'

'এই তো, মিনিট-পাঁচেকের পথ'—

'তাহ'লে ঝি-ই পাঠাবেন।' কুমুদিনী বিদায় নিলেন।

পরের দিন থেকেই ইন্দ্রাণী ইস্কুলের কাজে লেগে গেল। গিয়ে দেখলে কাজ সত্যিই অনেক করবার আছে। ইস্কুল সেটাকে না ব'লে ইস্কুলের পরিহাস বলাই উচিত, এমনই বিশৃঙ্খল অবস্থা সেখানকার। ইন্দ্রাণী বেশীদিন মাস্টারি করে নি, হেড্ মিস্ট্রেস তো ছিলই না, কিন্তু তবু কী করা উচিত সে সম্বন্ধে তার সহজবুদ্ধি দিয়েই একটা ধারণা ক'রে নিতে পেরেছিল, ফলে তিন-চার দিন যেতে না যেতেই মোটামুটি ব্যবস্থাটা ক'রে ফেললে সে।

ইতিমধ্যে রঘুবীরবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। রঘুবীরবাবু ইস্কুলেও আসেন নি। তিনি ইন্দ্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহই করেছিলেন সেটা ইন্দ্রাণীর মনের কাছে অজানা ছিল না, কিন্তু সে অনুগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজেকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলবেন হয়তো, এই আশঙ্কা ক'রে ইন্দ্রাণী আগে থাকতেই একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু, এই চারদিনের মধ্যেও তার কোনো আভাস পর্যন্ত না পেয়ে তার সে বিরক্তি

সত্যকার কৃতজ্ঞতায় পরিণত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল ওঁর বাড়িতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে সে, সেটা এবার পূর্ণ করা দরকার। সে আর দেরি না ক'রে শনিবার দিনই ছুটির পর ইস্কুলের ঝিকে সঙ্গে ক'রে রঘুবীরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হ'ল।

রঘুবীর তাঁর স্ত্রীকে ইন্দ্রাণীর কথা ব'লেই রেখেছিলেন, তাই নর্মদা বিস্মিত হ'লেও ওর পরিচয়টা অনুমান ক'রে নিলেন খুব শীঘ্রই এবং ভাঙা বাংলাতে অভ্যর্থনা জানিয়ে একেবারে ওপরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। নর্মদার বয়স হয়েছে, ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, চেহারাও সাধারণ বিহারী মেয়েদের মতই, সুন্দরও নয়—কুশ্রীও বলা চলে না। এককালে তন্বীই ছিলেন হয়তো—এখন একটু স্থূলতার দিকে মোড় ফিরেছেন।

আলাপ জমে উঠল দ্রুত! নর্মদা এক সময়ে বললেন, 'আপনি কলকাতার মেয়ে, লিখাপড়িও ঢের শিখেছেন, গান গাইতে পারেন নিশ্চয়ই। একটা গান শুনান না!'

ইন্দ্রাণী লজ্জিত মুখে বললে, 'কিন্তু সে যে সব বাংলা গান!'

'তা হোক না বাংলা গান, কথা বুঝছি আর গান বুঝব না?'

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে গাইতে হ'ল। রবীন্দ্রনাথের দু'-তিনখানা গান গেয়ে সে যখন থামল তখন নর্মদা মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'বড়ি মিঠা আছে আপনার গলা। হামার মেয়েদের আপনি দু'-একখানা গান শিখাইতেন তো ভালো হ'ত—'

ছেলেমেয়েদেরও তিনি ডাকলেন। বড় ছেলেটির বয়স বছর ষোল, এখানকার ইস্কুলে পড়ে। তারও ওপরে একটি মেয়ে আছে। সে এখন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। আরও গুটি চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে ওঁর। সবগুলিই বেশ শান্ত আর ভদ্র। নর্মদা ওদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই ওদের দু'-একখানা গান শিখাইয়া দেন তো বড় ভালো হয়। এখানে কোই জানে না, অথচ আমার বড় শোনবার শখ আছে'—

ইন্দ্রাণী তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলে। তারপর প্রচুর জলযোগ ক'রে চা খেয়ে একসময়ে তার হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে চারটে বাজে, এইবার তার বাড়ি ফেরা উচিত। দাদার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এবার আমি বাড়ি যাব দিদি, সে ঝিটা আছে কি?'

নর্মদা জবাব দিলে, 'ঝিকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁর অফিস যাবার সময় হয়েছে, উনিই গাড়ি ক'রে পৌছাইয়ে দিবেন।'

চমকে উঠে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলে,—'রঘুবীরবাবু কি বাড়িতে আছেন নাকি? কই, তাঁকে তো দেখলুম না!'

নর্মদা হেসে জবাব দিলে, 'তিনি বিশ্রাম করছেন ওপরে। অন্য দিন এর আগেই বেরিয়ে যান, আজ অপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, পৌঁছে দেবেন ব'লে—'

ইন্দ্রাণী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'এ কিন্তু ভারি অন্যায়। মিছিমিছি তাঁর দেরি হয়ে গেল, তাছাড়া আমি গানটান গাইলুম—কী মনে করলেন তিনি!'

রঘুবীরপ্রসাদ বোধ হয় কাছেই কোথাও ছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বললেন, 'আমার গান শোনা কি নিষিদ্ধ মিস্ বোস?'

'না, তা নয়—তবে—'

ইন্দ্রাণী ভালো ক'রে জবাব দিতে পারলে না।······

রঘুবীর শহরটা একটু দেখাবার জন্য গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়েই চললেন। দূরে পাহাড়ের নীল রেখার মধ্যে সূর্যদেব ঈষৎ রক্তাভ দেহে ঢ'লে পড়েছেন, দু'ধারে শালবন আর ধানের ক্ষেতে তার লাল আলো এসে প'ড়ে কেমন যেন স্বপ্নের সৃষ্টি করেছিল। সে দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে রঘুবীর একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে স্ত্রীর অনুরোধটা আমি একটু বাড়িয়ে দিতে চাই—'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমার ছেলেমেয়েদের আপনি যদি এই ক'মাস একটু বাংলা পড়াতে আর গান শেখাতে পারতেন তো আমার সত্যিই উপকার হ'ত।'

ইন্দ্রাণী ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'শেখাতে পারি যদি পারিশ্রমিক না নিতে হয়।'

রঘুবীর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু, এটাকে আপনি সাধারণ টিউশনি ব'লে মনে করতে পারছেন না কেন?···সবটাই আপনি উপকার করবার চেষ্টা ব'লে মনে করছেন এই তো মুস্কিল!'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু, এটা কি তাই নয়? অন্তত অনেকটা?······আপনি তো শুনেছি মিথ্যা বলেন না কখনই!'

রঘুবীর হেসে বললেন, 'মিথ্যা বলি বৈকি—তবে প্রয়োজন না হ'লে বলি না। কিন্তু, আমার সত্যই উপকার হ'ত।'

ইন্দ্রাণী বললে, 'বেশ তো। কিন্তু, আপনিই বা পারিশ্রমিক দেবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার একটু উপকার করার সুযোগই দিন না!···আপনার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না, তাই একদিন কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে গিয়েছিলুম, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন!'

রঘুবীর একটু হেসে বললেন, 'আমার সম্বন্ধে এরই মধ্যে কী এত জানলেন?'

'জানলুম যে, আপনি এই বয়সেই স্বদেশী-আন্দোলনে বার-চারেক জেল খেটেছেন, এখানকার কংগ্রেসী ব্যাপার সমস্তই আপনার আনুকূল্যে চলে। অন্তত কুড়িটি নিঃস্ব পরিবার আপনার দানে জীবনধারণ করে; প্রতিদিন আপনার গোলা থেকে দু'-মণ ক'রে চাল ভিক্ষা দেওয়া হয়—আর কত শুনবেন নিজের প্রশংসা?'

আরক্ত মুখে রঘুবীর বললেন, 'আর শুনতে চাই নে। এ নিশ্চয়ই মিসেস্ মিত্রের কাজ!'

হেসে ফেলে ইন্দ্রাণী বললে, 'কুমুদিনী-দির নিন্দা করাই স্বভাব বটে!'

গাড়ি ততক্ষণে শহরের বাইরে দিয়ে ঘুরে আবার শহরে প্রবেশ করেছে। দূরে লাইব্রেরি-হলের সামনের মাঠে কী উপলক্ষে জনসমাগম হয়েছে। সেদিক দেখিয়ে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলে, 'ওখানে কি সভা হবে নাকি কিছু, রঘুবীরবাবু?

'হ্যাঁ। আমিই সভাপতি।'

'এখনও সময় হয় নি বুঝি?'

হাতঘড়িটা দেখে রঘুবীর জবাব দিলেন, 'সময় হয়ে গেছে বৈকি!···একটু দেরিই হ'ল।'

ব্যস্ত হয়ে উঠে ইন্দ্রাণী বললে, 'তবে তো বড় অন্যায় হয়ে গেল। আপনি না হয় সভায় যান, আমি এইটুকু একাই যেতে পারব। আমিও যেতুম তবে দাদা—'

রঘুবীরবাবু বললেন, 'আপনার জন্যও ঠিক দেরি হয় নি মিস্ বোস। আসল কথা আজ একটা বড় ক্লান্তি অনুভব করছি—। আপনি ব্যস্ত হবেন না। সারাজীবনই তো ঠিক সময়ে হাজিরা দিলুম, একদিন না হয় একটু দেরিই হ'ল—

তাঁর কণ্ঠে অপরিসীম শ্রান্তি লক্ষ্য ক'রে ইন্দ্রাণী উদ্বিগ্ন হয়ে রঘুবীরবাবুর মুখের দিকে চাইলে। কিন্তু, সে মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না, কারণ তিনি তখন গাড়ির কোণে মাথা রেখে চোখ বুজেছেন।

অবশ্য এইটুকুই যথেষ্ট—রঘুবীরবাবুর ইতিহাসে অবসন্নতা নেই কোথাও, তা

সে বহুবার শুনেছে কুমুদিনীর মুখে। সে একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলে, 'আজ কি সভাতে যেতেই হবে?'

'আমি তাদের কথা দিয়েছি, সুতরাং একটা বাধ্যবাধকতা আছে বৈকি!'

তখন গাড়িটা ইন্দ্রাণীর বাংলোর সামনে এসে পৌঁছেচে। ইন্দ্রাণী বললে, 'তাহ'লে একটুখানি দাঁড়ান, অমি দু'-মিনিটের মধ্যেই এককাপ চা তৈরি ক'রে দিচ্ছি। এই অবস্থায় সভার কচ্‌কচিতে যেতে আমি কিছুতেই দেব না'

রঘুবীরবাবু চোখ মেলে চাইলেন। খুব ম্লান একটুখানি হেসে বললেন, 'এ কিছু নয় মিস্ বোস, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া চা আমি খাই না'—

ইন্দ্রাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'না তা হয় না। আপনি বসুন, আমি লেবু দিয়ে এক গ্লাস শরবতই ক'রে দিচ্ছি। যখন এতই দেরি হ'ল তখন আর দু'-মিনিটে কিছু ক্ষতি হবে না।'

ইন্দ্রাণী উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ছুটে চ'লে গেল। রঘুবীরবাবুও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার গাড়ির কোণে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। তিনি বাইরে কোথাও কখনও খান না কিছু, কোনোদিনই না, তবু আজ ইন্দ্রাণীকে ক্ষুণ্ণ করতে তিনি পারলেন না। একটু পরেই ইন্দ্রাণী যখন শরবত নিয়ে ফিরে এল, তখন তিনি নিঃশব্দে ওর হাত থেকে শরবতের গ্লাসটি নিয়ে নিঃশেষে পান ক'রে গ্লাসটি ফিরিয়ে দিলেন। তিনিও কোনো কথা কইলেন না, ইন্দ্রাণীও না, শুধু গাড়ি ছেড়ে দেবার পর তার মনে হ'ল যে, ইন্দ্রাণীর নমস্কার তিনি ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেলেন!

রঘুবীর চ'লে গেলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রাণী কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারল না। সুব্রত অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে, তার যা দরকার মাসিমাই দিয়েছেন সব—সুতরাং কাজ কিছুই ছিল না। সুব্রতের সঙ্গে দু'-একটা কথা কইবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ও একখানা বই নিয়ে বসল, কিন্তু বইতেও মন দিতে পারলে না। সমস্ত কাজের মধ্যেই বার বার রঘুবীরবাবুর সেই ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর কানে বেজে ওকে উন্মনা ক'রে তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে কতকটা নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল এবং এক মোটা গোছের সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে বেড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলে, 'কোথায় যাচ্ছিস রে ইন্দু!

বোধ হয় একমুহূর্ত ইতস্তত ক'রে সে জবাব দিলে, 'এমনি একটু বেরুচ্ছি। এখানে একটা মিটিং আছে, মনে করছি একটু ঘুরে আসব।'

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সুব্রত বললে, 'যা যা, একটু ঘুরে আয়।...সত্যি, একা একা বন্ধ হয়ে থাকা—'

কাছারির পেছনের বিরাট আম-বাগানটা পেরিয়ে ইন্দ্রাণী যখন সভাস্থলে পৌছুল, তখন সভার অন্য বক্তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, স্বয়ং সভাপতিই বক্তৃতা করছেন। এ যেন রঘুবীরবাবুর সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। তাঁর কণ্ঠ এখনও তেমনি শান্ত ও সংযত বটে, মুখের প্রশান্তি কোথাও খর্ব হয় নি, কিন্তু যে কথাগুলি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ ভেদ ক'রে বার হয়ে আসছিল তা যেন এক একটি অঙ্গার-খণ্ড—তেমনিই তার জ্বালা, তেমনিই তার তেজ! বিষয় ছিল মিউনিসিপ্যালিটির কী একটা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ—সব কথা ইন্দ্রাণী বুঝতেও পারলে না, তার মনেও রইল না অর্ধেক—কিন্তু সে স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই মধ্যবয়সী বিহারী ভদ্রলোকটির দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রী এঁকে সম্মানিত করে নি, শিক্ষার সুযোগ পাওয়া তাঁর সম্ভব নয়—কিন্তু শুধু প্রখর সহজ বুদ্ধি ও আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান তাঁকে যে মহিমা ও কর্মক্ষমতা দিয়েছে, তার কাছে ইন্দ্রাণীর মাথা নত না হয়ে পারল না।...

ইন্দ্রাণী বসেছিল সভার পিছনেই, তখন সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে, সভাস্থলের সামান্য আলোকে তাকে সেই ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু বোধ করি, তার প্রস্ফুটিত সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখ এবং নিষ্পলক চাহনিই একসময়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন রঘুবীরবাবুর বক্তব্য গোলমাল হয়ে গেল, তারপরই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে পুনরায় তাঁর পূর্বকথার জের টেনে নিলেন। বক্তব্য অবশ্য আর বেশী ছিল না, মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল, সভাও ভাঙল সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু, সে তথ্যটা বুঝতে ইন্দ্রাণীর আরও মিনিটখানেক সময় লাগল। তার পাশ থেকে অন্য মেয়েরা উঠে সভাস্থল ত্যাগ করছে দেখে তার চৈতন্য হ'ল, সে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

কিন্তু, বাইরে এসে আবার একটু গোল বাধল। এখানকার পথঘাট এখনও তার আয়ত্ত হয় নি, তাছাড়া অন্ধকারে ঠিক বোঝাও যায় না—কোন পথ ধরবে ভাবছে সে, এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং রঘুবীরপ্রসাদ, ঈষৎ চমকে দিয়ে বললেন, 'চলুন, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।'

ইন্দ্রাণীর সমস্ত দেহ অকস্মাৎ যেন কী কারণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ওঁর সঙ্গ নিলে। রঘুবীরবাবুই একটু পরে বললেন,

সভায় যোগ দেবার আপনার ইচ্ছা হয়েছিল জানলে আমি তখনই অপেক্ষা করতুম—'

ইন্দ্রাণী এবার যেন একটু জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'না, ঠিক তা নয়। তখন বুঝতেও পারি নি। দাদার যা দরকার আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল, আর বিশেষ কোনো কাজও ছিল না হাতে—তাই।...আপনার গাড়ি কোথায় গেল, হেঁটে ফিরতে কষ্ট হবে না?'

'না, এইটুকু তো! বেড়াতে বেড়াতে চ'লে যাব। আপনার সঙ্গে দেখা করব ব'লেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি যে নিজে ইচ্ছে ক'রে আজ আমাদের সভায় যোগ দিয়েছেন, আমার বক্তৃতা আপনাকে শোনাতে পেরেছি—এ কথাটি চিরদিন আমার মনে থাকবে!'

ইন্দ্রাণী জবাব দিতে পারলে না, তার কেমন যেন মনে হ'তে লাগল যে, কথা কইতে গেলেই ওর গলা কেঁপে যাবে।

আর একটুখানি চলবার পরই ওদের বাংলো পৌঁছে গেল। একেবারে দোরের কাছে এসে রঘুবীরবাবু বললেন, 'তাহ'লে আমি যেতে পারি—মিস্ বোস?'

কী ছিল সে কণ্ঠস্বরে কে জানে, ইন্দ্রাণীর যেন নিমেষে সব গোলমাল হয়ে গেল। সে কিছু ভাবলে না, ভাববার অবসরও ছিল না, শুধু অন্ধ আবেগের প্রেরণায় সেই অন্ধকারেই তার ডান হাতখানা এগিয়ে দিলে রঘুবীরের দিকে। রঘুবীরও দু'হাতে ওর হাতখানা চেপে ধ'রে কম্পিত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'এ আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য ইন্দ্রাণী, এ আমার কল্পনার অতীত!'

মুহূর্তের আবেগ মুহূর্তেই কেটে যায়—ইন্দ্রাণীও সেই একটি মুহূর্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হ'ল। বিষম লজ্জায় ওঁর মুঠোর মধ্যে থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটেই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল, একটা নমস্কার করার কথাও মনে রইল না।

এরপর রঘুবীরবাবুর বাড়ি যাওয়া ওর উচিত হবে কিনা, ভাবতেই দু'দিন কেটে গেল। কিন্তু নর্মদাকে ও একরকম কথাই দিয়েছে স্মরণ ক'রে তৃতীয় দিনে স্কুলের ফেরত রঘুবীরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। নর্মদা ওকে দেখে আদর-অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রঘুবীরবাবু আছেন কিনা জানা গেল না, জানবার প্রয়োজনও নেই—তবে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দেখা হ'ল না। সে-দিনও না, তার পরের দিনও না। পর পর সাতদিন ইন্দ্রাণী গেল ওঁদের বাড়িতে

ছেলেমেয়েদের পড়াতে এবং গান শেখাতে, কিন্তু গৃহকর্তা একদিনও কোনো ছলেই ওদের সামনে এলেন না। পাছে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আর লজ্জায় সে সহজভাবে কথা বলতে না পারে এই ভয়ই ছিল ইন্দ্রাণীর, কিন্তু সে ভয় যখন অমূলক প্রমাণিত হ'ল তখন সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল। এবং সে ক্ষোভ যেদিন নিজের কাছে ধরা পড়ল সেদিন সে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠে স্থির করলে যে, সে নর্মদাদের বাড়ি আর যাবে না।

সেই ভেবেই সেদিন সে ইস্কুলের ফেরত সোজা বাড়ি ফিরে এল। সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'পড়াতে গেলি নে ?'

'শরীরটা ভালো লাগছে না দাদা !'

বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে সুব্রত প্রশ্ন করলে, 'সে কি রে ! কী হয়েছে ?···জ্বরটর হয় নি তো ?'

'না না। এমনি—মাথাটা একটু ধরেছে—'

সে সুব্রতকে এড়িয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেল। ভালো লাগছে না ওর কিছুই, কিছুতেই মন নেই যেন। একটা তিক্ততা জমা হয়েছে অকারণেই মনের ভেতর—তার কারণ অনুসন্ধান করতে ও ভয় পায়। একটা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা, একটা অপমানকর বেদনা ওকে ভুলতে হবে এটা ঠিকই, কিন্তু তার কোনো পথই চোখে পড়ছে না যে !

সে একখানা বই কোলের ওপর ফেলে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের শালবনের দিকে তাকিয়ে ছিল, সহসা একসময় পথের ওপরের শুকনো অর্জুন পাতাগুলো মচ্‌মচ্‌ ক'রে উঠতে ও চম্‌কে চেয়ে দেখলে স্বয়ং রঘুবীরবাবু আসছেন, তাদেরই বাড়ির দিকে।

সে চকিতে ত্রস্ত হয়ে উঠল, নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার নিজের বেশভূষায় চোখ বুলিয়ে, খোঁপাটা ঠিক ক'রে নিলে—কিন্তু, তখনই অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল না। বাইরে চেয়ার নিয়ে বসেছিল সুব্রত, সুব্রতই রঘুবীরবাবুকে অভ্যর্থনা ক'রে বসালে। ইন্দ্রাণী উৎকর্ণ হয়ে ব'সে রইল অন্ধকারেই।—

অন্যান্য কুশল-প্রশ্নের পর রঘুবীরবাবু বললেন, 'মিস্ বোস আজ আমাদের বাড়ি যান নি, তাঁর অসুখ-বিসুখ কিছু করল কি না, তাই খোঁজ করতে এসেছি। আমি জানতুমও না, আমার স্ত্রী চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন অফিসে, জোর হুকুম—এখনই ওঁর খবর নিতে হবে—'

একটু হেসে রঘুবীরবাবু মুঠো খুলে একখানা কাগজ দেখালেন।

সুব্রত বললে, 'হ্যাঁ, ওর মাথাটা ধরেছিল নাকি, সেইজন্যেই যেতে পারে নি। ইন্দু ও ইন্দু, রঘুবীরবাবু এসেছেন!'

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ধ'রে তার পরিহিত শাড়িখানা আরও একটু ভদ্রভাবে নামাবার চেষ্টা ক'রে একসময়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার কণ্ঠ-কপোলের রক্তিমা অন্ধকারে চোখে পড়ল না কারুর, কিন্তু সেই শীতার্ত হেমন্ত সন্ধ্যাতেও তার ললাট যে স্বেদসিক্ত হয়ে উঠেছিল তা একটু চেষ্টা করলেই দেখা যেত।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রঘুবীরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এখন কেমন আছেন? মাথাটা ছেড়েছে?...সন্ধ্যাবেলা একটু মাঠের দিকে বেড়ালে বোধ হয় ভালো হ'ত। অতিরিক্ত পরিশ্রমেই বোধ হয়—'

বহু চেষ্টায় যে স্বর বার হ'ল তা যেমন শুষ্ক তেমনি তীক্ষ্ণ—ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে, 'না, এখন ভালোই আছি।'

ওঁরা দু'জনেই সে কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠলেন। সুব্রত বললে, 'কিন্তু, রঘুবীরবাবু কথাটা ভালোই বলেছেন, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু পায়চারি করা উচিত।'

নিজের কণ্ঠস্বরের অকারণ তীক্ষ্ণতায় ইন্দ্রাণী নিজেই লজ্জা পেয়েছিল। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'কোথায় আর পায়চারি করব, তার চেয়ে নর্মদাদিদির ওখানেই একটু বেড়িয়ে আসি। আপনি যান, আমি নিজে গিয়েই তাঁর চিন্তা দূর করব—'

ওর মনে রইল না যে, কথাটা ও শুনেছিল আড়াল থেকে, সুতরাং সে কথার উল্লেখ না করাই উচিত। কিন্তু রঘুবীরবাবু সহজভাবেই কথাটা নিলেন, জবাব দিলেন, 'আমাকেও বাড়িই ফিরতে হবে, যদি আপত্তি না থাকে, না হয় আমার সঙ্গেই চলুন।'

একমুহূর্তেরও অল্প সময় ইতস্তত ক'রে ইন্দ্রাণী বললে, 'চলুন।'

সে চাদরটা জড়িয়ে পথে যখন নেমে এল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে, তার ফলে শাল ও আমবনের মধ্যে জেগেছে মর্মর—সে শব্দ যেন ভীত ক'রে তুলল ইন্দ্রাণীকে। সে চলতে চলতে একবার একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে শিউরে উঠল। অন্ধকারেও তার সে শিহরন লক্ষ্য ক'রে রঘুবীরবাবু বললেন, 'ভয় পেলেন নাকি? ভয় কি? ওটা শুকনো পাতার আওয়াজ

লজ্জিতা ইন্দ্রাণী কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা জোর দিয়ে বললে, 'বড্ড শুকনো পাতা

চারিদিকে আপনাদের এখানে !···বাগানগুলো রোজ ঝাঁট দেয় না কেন ?···দু' চোখে দেখতে পারি না আমি পাতাঝরার সময়টা।'

অন্যমনস্ক ভাবে রঘুবীর জবাব দিলেন, 'হেমন্তকালটাই খারাপ ইন্দ্রাণী, মানুষের বেলাও তা-ই। যৌবন চ'লে যায়, পাতাঝরার সময় আসে তারও, অথচ বার্ধক্যের রিক্ততাকে সে মেনে নিতে চায় না।'

তিনটি অক্ষরের একটি শব্দ—মনের অবচেতন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা—ইন্দ্রাণীর সারা মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে গেল, অকস্মাৎ তার দু'টি চোখ ভ'রে উঠল জলে। সে আর কথা কইলে না, নিঃশব্দে সেই সুতীব্র বেদনার মাধুর্যকে রক্তাক্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে করতে এগিয়ে চলল।

রঘুবীরবাবুও তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

সুব্রত সেরে উঠেছে। তার মন এবার এই অলস মন্থর অবসরে উঠেছে হাঁপিয়ে। কিন্তু, ইন্দ্রাণীর কাছে বাড়ি ফেরার কথাটা পাড়তে তার সাহস হয় না। কারণ, শরীর তার সুস্থ হ'লেও সবল হয় নি—সে কথা সে নিজেই জানে। আর ইন্দ্রাণী, তার দিন চলেছে কী এক উদ্দেশ্যহীন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। তার সমস্ত চিন্তা যেন কেমনতর এলোমেলো হয়ে গেছে। বাড়ির কথা, তার অতীত জীবনের কথা—যেন মনে হয় কোন যুগের কথা—সেখানে ফিরতে হবে বটে, কিন্তু কবে তা সে জানে না।

ইস্কুলে ওকে খাটতে হয় খুব বেশী। ইস্কুলের অনেকটা সুবন্দোবস্ত হয়ে গেছে, উন্নতিও হয়েছে ঢের, সেজন্য কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সেক্রেটারী রঘুবীরবাবুও এর মধ্যে দু'তিন দিন এসে সব দেখেশুনে ওকে উচ্ছ্বসিত স্তুতি জানিয়ে গেছেন এবং খুব সম্ভব তাঁরই প্ররোচনায় কমিটির এক বিশেষ সভায় ইন্দ্রাণীকে অনুরোধ করা হয়েছে বেশী মাইনে নেবার জন্য।

ইস্কুলের পর নিয়মিত ভাবেই নর্মদার বাড়ি যায় ও। ছেলেমেয়েগুলিকে কিছু বাংলা এবং কিছু গানও শিখিয়েছে সে, তাদের তার ভালোও লাগে খুব। নর্মদার ত কথাই নেই—নিজের বোনের মতই তিনি ভালোবাসেন ওকে। কিন্তু, এ সবে ইন্দ্রাণীর মন ভরে না। কাজগুলো ক'রে যায় যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। মন তার সর্বদাই কী একটা অজ্ঞাত ক্ষুধায় হু-হু করে।

রঘুবীরবাবু সেদিনকার সেই দুর্বলতার পর খুবই সতর্ক হয়েছেন। দেখা তিনি প্রায় রোজই করেন—নিজের বাড়িতে সহস্র কাজের ফাঁকে। নির্জনে

দেখা করার যে সমস্ত সুযোগ তিনি এড়িয়ে যান তা ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করে, সেজন্য সে কৃতজ্ঞ। রঘুবীরবাবু নিজের গাড়ি দিয়ে কাছাকাছি পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল সব দেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু সুব্রতর কোনো নিমন্ত্রণেই তিনি ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হন নি। তাঁর কাজের বিবরণটা সম্যক্ পাবার পর সুব্রতও সাহস করে নি বেশী পেড়াপীড়ি করতে।

এমনি ক'রেই দিন কাটছিল, সহসা একদিন সুব্রত রঘুবীরবাবুর কাছে কথাটা পাড়ল, 'এবার মনে করছি বাড়ি ফিরব রঘুবীরবাবু! ইন্দ্রাণীকে তো ছাড়তে হয়!'

যেন চম্‌কে ঘুম ভাঙল রঘুবীরবাবুর। তিনি কেমন একটা বিবর্ণ মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন 'সেকি? এরি মধ্যে! আপনি তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি।'

'সুস্থ নিশ্চয়ই হয়েছি—হয়তো কিছু মোটা হ'তে বাকি আছে। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে, দেশের জন্য মন টেনেছে এবার। তাছাড়া ইস্কুলের চাকরিটা হয়তো এখনও গেলে আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

রঘুবীরবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'অবিশ্যি দেশের জন্য যদি মন টেনে থাকে তাহ'লে কিছুই বলবার নেই, তবে ইস্কুল এদেশেও ছিল এবং মাস্টারির অভাব হ'ত না সুব্রতবাবু!'

সুব্রত ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললে, 'সে আমিও ভেবে দেখেছি। আপনি প্রথম থেকেই যে অনুগ্রহ করেছেন এবং যত রকমে সাহায্য করেছেন, তাতে আপনার আশ্রমেই আমার অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা যে হ'তে পারে সে ধারণা আমারও হয়েছে, কিন্তু—চিরকাল বাংলার বাইরে কাটানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

রঘুবীরবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে, যেন জোর ক'রেই একটু হেসে বললেন, 'কী আর বলব বলুন, তবে অমন চমৎকার মাস্টারনীটিকে নিয়ে যেতে চাইছেন এইতেই আমাদের আপত্তি। বাস্তবিক এই তিন মাসেই ইস্কুলটাকে কী করেছেন! আরও কিছুদিন থাকলে আমাদের উপকার হ'ত খুব!'

সুব্রত চুপ ক'রে রইল। রঘুবীরবাবু যেন একটা উত্তরের আশা ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লেন।······

সেদিন সন্ধ্যায় নর্মদার ওখানে ছিল ইন্দ্রাণীর নিমন্ত্রণ। এ ব্যাপার এর আগে দু'-একদিন হয়েছে—আহারের পর ঝি আর চাকর দিয়ে নর্মদা ওকে বাঙলোয় পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু, আজকে আহার শেষ ক'রে উঠে যাত্রার জন্য

প্রস্তুত হয়ে দেখলে যে, স্বয়ং রঘুবীরবাবু অপেক্ষা করছেন ওকে পৌঁছে দেবার জন্য।

সংবাদটা শুনে মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রাণীর বুকের কম্পন যেন দ্রুততর হয়ে উঠল, তারপরই শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'আপনি আর কষ্ট করবেন কেন, ঝিয়ের অসুবিধা থাকে আমি একাই যেতে পারব। এই তো মোটে রাত আটটা—'

ঈষৎ হেসে রঘুবীরবাবু বললেন, 'না, ঝিয়ের অসুবিধার জন্য নয়, আমারই একটু ওদিকে দরকার আছে, তাই—

ইন্দ্রাণী আর কোনো কথা বললে না। রাস্তায় নেমে খানিকটা নিঃশব্দে পথ হাঁটবার পর রঘুবীরবাবু হঠাৎ বললেন, 'আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, চলুন না কাছারির দিকটা ঘুরে যাই। দু'-একটা কথাও আছে আপনার সঙ্গে!'

উত্তর দেবার মত ইন্দ্রাণীর অবস্থা ছিল না, অকস্মাৎ যেন দেহের সমস্ত রক্ত ওর মুখে উঠে এক ঝলক আবীর ছড়িয়ে দিলে ওর সুন্দর গণ্ডে, তাও অন্ধকারে দেখা গেল না—শুধু নিঃশব্দে ও শালবনের পথটা ধরলে।

রঘুবীরবাবু কথাটা পাড়লেন, 'আপনার দাদা যে এবার বাড়ি ফিরতে চাইছেন! আপনার মত কী?'

ইন্দ্রাণীর বহুদিনের একটা তন্দ্রার ঘোর যেন চমক লেগে ভাঙল। তবু সে যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ-কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তাঁর যদি শরীর সুস্থ হয়ে থাকে তো তিনি ফিরবেন, আমার মত আর কী দরকার বলুন! তাঁর জন্যই তো আমার এখানে থাকা।"

'কিন্তু, শরীর কি তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে? আর কয়েকদিন থাকা কি উচিত ছিল না?'

'তা হয়তো ছিল, কিন্তু মন যদি তাঁর এখানে আর না বসে, তাহ'লে তো শরীরও ভালো থাকবে না। তাছাড়া কাজ ক'রেই যখন খেতে হবে তাঁকে, তখন আর বিদেশ-বাসের বিলাসে কী হবে বলুন!'

রঘুবীরবাবু একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'কিন্তু, তাঁর জীবিকার একটা ব্যবস্থা এখানেও তো হ'তে পারে!'

'তা হয়তো তিনি চান না—!' কণ্ঠস্বর তেমনি নির্লিপ্ত, তেমনি উদাসীন।

রঘুবীরবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় সহজভাবে বললেন, 'আপনাকে হারালে আমাদের স্কুলের বড় ক্ষতি হবে, সেই কথাটাই ভাবছি।'

'আরও উপযুক্ত লোক পাবেন বৈকি।...তাছাড়া, আমার এখানে স্থায়িত্ব কম জেনেই তো আমাকে নিয়েছিলেন।'

তার গলার আওয়াজে অপমানকর শৈত্য!

সহসা উত্তাপ এল রঘুবীরবাবুরই কণ্ঠে, তিনি যেন অকস্মাৎ ভেঙে প'ড়ে বললেন, 'কিন্তু কিছুতেই কি আর কিছুদিন আপনাকে ধ'রে রাখা যায় না?—অন্তত, অন্তত আর দু'মাস?'

তীক্ষ্ণ ছুরির মত ইন্দ্রাণীর কথাগুলো যেন অন্ধকারকে চিরে দিয়ে গেল, 'তাতে কী লাভ হ'ত বলতে পারেন রঘুবীরবাবু?'

'লাভ?' ভগ্নকণ্ঠে, আহতকণ্ঠে রঘুবীর বললেন, 'সব লাভের হিসাব কি মুখে দেওয়া যায় ইন্দ্রাণী?'

'ইন্দ্রাণী'!—আবার সেই ছোট্ট একটু শব্দ।

অকস্মাৎ যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী বললে, 'এখানে থাকাটা কি আপনার জন্য চান, না ইস্কুলের জন্য?'

রঘুবীরবাবু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমার জন্য চাই একথা বলবার অধিকার আমার যে নেই ইন্দ্রাণী। বলতে পারলে খুশী হতুম।'

অন্ধকারেই ইন্দ্রাণীর ওষ্ঠে একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। সে বললে, 'কিন্তু, তারপর? আরও দু'মাস থাকলে আপনার কী সুবিধা হ'ত?...এমনি কালে-ভদ্রে দেখা হ'ত—এই তো!'

রঘুবীরবাবু চুপ ক'রে থাকলেন। নিষ্ঠুর ইন্দ্রাণী ব্যঙ্গ ক'রে বললে, 'বড়জোর সৌজন্য ক'রে মধ্যে মধ্যে এমনি পৌঁছে দিয়ে যেতেন, কিংবা আমাদের দারিদ্র্য লাঘব করার জন্য নিঃশব্দে আড়াল থেকে কিছু সাহায্য করতেন। কিন্তু, আপনার সেই পরোপকার ও স্নেহের বিলাস চরিতার্থ ক'রে আমার কী লাভ হ'ত ভেবে দেখেছেন কি? আমার রক্তমাংসের দেহ রঘুবীরবাবু, আপনার মত পাথর নয়!'

রঘুবীরবাবু নতমুখে অভিযোগটা মাথা পেতে নিয়ে যেন চুপিচুপি জবাব দিলেন, 'আমারই অন্যায় ইন্দ্রাণী, আমারই অপরাধ!'

ইন্দ্রাণী পাগল হয়ে গেছে তখন, সে চাপা অথচ তীব্র গলায় বললে, 'দোহাই আপনার রঘুবীরবাবু, অন্তত একবার সৌজন্যটা থাক, সোজাসুজি বলুন আমায় ভালোবাসেন কি না!......'

রঘুবীরবাবু যেন কী একটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলেন। বললেন, 'সে কি এতদিন পরেও বলতে হবে ইন্দ্রাণী?'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু, তারপর? আর কিছুই কি বলবার নেই আপনার?'

'বলবার হয়তো অনেক কথাই আছে, কিন্তু করবার কিছু নেই। কোনো পথ ।মার কোনো দিকে খোলা নেই!'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু, কেন নেই জানতে পারি কি? আমাকে বিয়ে করুন। ত্ত-বিবাহও তো লোকে করে!'

রঘুবীরবাবু বললেন, 'নিজের যা যন্ত্রণা তা নিজেরই থাক, অকারণে নর্মদার বুক ভেঙে দিতে পারব না!'

'সৌভাগ্য নর্মদার! বিদেশিনী বাঙালী মেয়ের বুকে ভাঙে তো ভাঙুক— র্মদা সুখে থাক, শান্তিতে থাক!'

'শুধু তাও নয়, ইন্দ্রাণী! আমি এ দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোক, এখানকার নেতা আমি—কংগ্রেস বলতে, এদেশের যা কিছু জাতীয় অনুষ্ঠান বলতে, সবই মি। আমার দিকে তাকিয়ে আছে এ শহরের লোক—আমি যদি কোনো নাচার করি তাহ'লে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত লোকচক্ষে হেয় হয়ে যাবে।...না, সে ম্ভব নয় ইন্দ্রাণী! আমার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ব্যক্তিগত কামনার জন্য মি স্বদেশের ক্ষতি করতে পারব না। যে সমস্ত যুবকেরা আমার দিকে তাকিয়ে দের ভবিষ্যৎ গঠন করছে, তাদের আদর্শকে ছোট ক'রে দিতে পারব না।'

এই নিষ্ঠুর অপমানে ইন্দ্রাণীর সমস্ত দেহ-মন যেন অসাড় হয়ে গেল। জবাব বার, কথা কইবার, তিরস্কার করার কোনো ক্ষমতা কোথাও তার রইল না।

রঘুবীরবাবুই আবার ব'লে চললেন, 'জানি, আমার জীবনের বসন্তের দিক, নন্দের দিক, চিরকালের মত শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তবু আমার কর্তব্যেরই হবে ইন্দ্রাণী। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু আমার দর্শ, আমার দেশসেবার ব্রত, প্রাণের চেয়েও বড়। তোমার সামান্য কণ্ঠস্বরের ন্য আমি বাতাসে কান পেতে থাকি, তোমার পায়ের শব্দ আমার রক্তকে চঞ্চল রে তোলে—এ সবই সত্য কথা ইন্দ্রাণী, কিন্তু তবু, তবু আমার কিছুই করবার ই।'

ভগ্নকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললে, 'আমার জন্য আর কিছু করবার নেই তোমার, কোনো গ করতে পার না?'

'প্রাণ দিতে পারি ইন্দ্রাণী, সেইটাই সবচেয়ে সহজ!......'

বহুক্ষণ, যেন বহুযুগ নিঃশব্দে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্খলিতকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললে, 'আচ্ছা, নমস্কার।'

তারপর সেই অন্ধকার শালবনের মধ্য দিয়ে সে নিজের বাঙ্লোর পথ ধরলে। রঘুবীরবাবু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। সঙ্গে যাবার সাহস তাঁর হ'ল না। অনেকক্ষণ, বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে, শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যাও ইন্দ্রাণী, কালই যাও—আর অপরাধ বাড়াব না।'

পরের দিন সকালেই কুঞ্জবাবু এসে জানালেন, 'সুব্রতবাবুরা আজই চ'লে যেতে চান। ভাড়া ওঁরা এ মাসের পুরোই দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন……কিন্তু, আমি নিই নি।'

বাইরের দিক থেকে শূন্যদৃষ্টি ফিরিয়ে অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর রঘুবীরবাবু বললেন, 'ও, আজই চ'লে যাচ্ছেন। তা, বেশ তো!…না, আপনি ঠিকই করেছেন।'

কেরানী ঈশ্বরদয়াল এলেন কী কতকগুলো কাগজ সই করাতে, ক্লান্তভাবে তাঁকে বললেন, 'একটু পরে ঈশ্বরবাবু, একটু পরে।' তারপর কুঞ্জবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমার গাড়িটা ব্যবস্থা ক'রে দিন না, স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'সে কথাও আমি বলেছিলুম, কিন্তু তাঁরা বাসের টিকিট কেটে ফেলেছেন, রাজি হলেন না।'

'ও, আচ্ছা।'

কুঞ্জবাবু চ'লে যাওয়ার পর রঘুবীরবাবু কিছুক্ষণ কাগজপত্রে মন দেবার বৃথা চেষ্টা ক'রে উঠে পড়লেন। শীতের অলস রৌদ্র এসে পড়েছে ধূলিবিবর্ণ শাল-গাছের পাতায়, পথের বাতাস অসংখ্য গরুর গাড়ির চাকা থেকে উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় ভারী। পথে ঘুরতে ভালো লাগে না—তবু পথে-পথেই তিনি ঘুরলেন বহুক্ষণ ধ'রে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণে কালি—মুখ শুক্‌নো—এ রঘুবীরবাবুর সঙ্গে শহরের লোক পরিচিত নয়। তারা বিস্মিত হয়ে তাকাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে, তাদের দৃষ্টিতে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে তিনি বাগানের পথ ধ'রে একসময়ে এসে হাজির হলেন ইন্দ্রাণীদের বাঙ্লোতে। ওরা চ'লে গেছে, ঘরগুলো হা-হা করছে খালি—কতকগুলো কুঁচো কাগজপত্র এদিক ওদিকে ছড়ানো, দু-একটা ভাঙা-ফুটো পরিত্যক্ত জিনিস! এক মুহূর্তের বেশী সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না রঘুবীরবাবু, একরকম ছুটেই বেরিয়ে এলেন।

তখন এগারোটা, ট্রেনের আর মাত্র একঘণ্টা দেরি আছে। গাড়ি অফিস

ঘরের সামনেই তৈরি থাকে, তিনি অকস্মাৎ গাড়িতে উঠে ব'সে নিজেই চালাতে শুরু করলেন, বিদ্যুৎগতিতে। স্পীডোমিটারের কাঁটা ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ —শেষ পর্যন্ত ষাটে এসে পৌঁছল। দীর্ঘ পথ, তবু এই একঘণ্টার ভেতরে পৌঁছতেই হবে।

সুব্রত বোনকে কোনো প্রশ্নই করে নি, কিন্তু তার মুখ দেখে বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছিল কিছুটা, তাই তার মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা এবং আকস্মিক পলায়নের কোনো কারণই জানতে চায় নি। স্টেশনে এসে ইন্দ্রাণী শুষ্ক মুখে, আরক্ত চক্ষু মেলে বসেছিল ফেলে-আসা পথের দিকেই চেয়ে—বোধ হয় তার সমস্ত মন অপরিসীম ধিক্কার ও আত্মগ্লানির পরেও কোথায় ব'সে আশা করছিল যাত্রার আগে, অতি পরিচিত, শান্ত, সৌম্য একখানি মুখ! কিন্তু, মিনিটের পর মিনিটই শুধু কেটে গেল, না পেল তাঁর দেখা, না পারলে ইন্দ্রাণী নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে—যে, সে তাঁরই দেখা চায়!

সিগ্‌ন্যাল দিল। প্লাটফর্মের সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তবু ইন্দ্রাণীর মুখে চোখে যেন কোনো প্রাণ-লক্ষণ জাগল না। সুব্রত এসে পেছন থেকে সস্নেহ কণ্ঠে ডাকলে, 'ইন্দু, এবার যে উঠতে হবে দিদি!'

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইলে 'উঠতে হবে? গাড়ি এসেছে? এই যে—'

কিন্তু, উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর নজরে পড়ল দূর পথের বাঁকে ধুলোর ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করতে করতে ছুটে আসছে একটি পরিচিত গাড়ি। সুব্রত ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সে দিকে চেয়ে বললে, 'রঘুবীরবাবুর গাড়ি না?...আমি তাই ভাবছিলুম, ভদ্রলোক যাবার আগে একবার দেখা করতে এলেন না!...আমিও সময় পেলুম না—। বোধ হয় উনিও সকালে খুব ব্যস্ত ছিলেন, না?'

ইন্দ্রাণী জবাব দিল না। গাড়িও তখন এসে গেছে। মেয়ে-গাড়ি খালি দেখে সুব্রত তাড়াতাড়ি ওকে সেইখানেই তুলে দিলে, তারপর মালপত্র নিয়ে নিজে ছুটল স্থানের সন্ধানে। রঘুবীর যখন এসে পৌঁছলেন তখন সুব্রতর কোনো চিহ্ন নেই কোথাও, ইন্দ্রাণী শুধু তার গাড়িতে ব'সে আছে, ওধারের প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে।

রঘুবীরবাবু কাছে এসে দাঁড়াতেই সে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'সময় মোটে ছিল না ব'লেই দাদা দেখা ক'রে আসতে পারেন নি, তাঁকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। ...আর নর্মদাদিদিকে বলবেন, তাঁকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তাঁর দয়া, তাঁর স্নেহ চিরদিন মনে থাকবে—'

রঘুবীরবাবু ধরা গলায় বললেন, 'ইন্দ্রাণী, অপরাধের আমার মার্জনা নেই জানি। কিন্তু তবু, কিছু কি তোমাকে আমার দেওয়া সম্ভব নয়? কোনো উপকারে কি আমি আসতে পারি না?'

'না।' শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলে ইন্দ্রাণী।

'কিন্তু—' ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন রঘুবীরবাবু, 'আমার দিন কী নিয়ে কাটবে ইন্দ্রাণী, অন্তত কিছু আমাকে দিয়ে যাও। কোনো স্মৃতিচিহ্ন কি ভিক্ষা দিতে পার না?'

'না।'

আরও কিছু হয়তো রঘুবীরবাবু বলতেন, সেই সময়েই গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিল। সমস্ত আবেগ প্রাণপণ শক্তিতে দমন ক'রে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু, শেষ মুহূর্তেই একটা বিপর্যয় ঘটল। অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী গাড়ি থেকে নেমে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্লাটফর্মের ওপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ওঁকে। তারপর চুপিচুপি বললে, 'আমার প্রণামই দিয়ে গেলাম তোমাকে, আমার শেষ স্মৃতিচিহ্ন!'

তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। কোনোমতে সে আবার গাড়িতে উঠে পড়ল

## অভ্যাস

কলিকাতার উপকণ্ঠে এই আধাশহর মিউনিসিপ্যালিটির আয় যতই থাক—ব্যবস্থা ভালো করিবার উপায় নাই। জল তাহাকে লইতে হয় কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া—ফলে, যুদ্ধের হিড়িকে লোক যথেষ্ট বাড়িলেও জল বাড়ে নাই। বাড়িতে কল দিবার কোনো উপায় নাই, সুতরাং অধিকাংশ লোককেই রাস্তার কলের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, আর সেখানে দিন দিন বালতি ও ঘড়া যত বাড়িতেছে, জলের চাপ ততই যাইতেছে কমিয়া। এই উপলক্ষে ভোর হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালির অন্ত থাকে না।

ইহার মধ্যে মনোহরেরই চাহিদা সব চেয়ে বেশী। সে-ই সকলের চেয়ে বেশী বাড়িতে জল যোগায়, রাত চারটা না বাজিতে বাজিতে সে গোটা-কুড়ি-পঁচিশ

বালতি ও ঘড়া লইয়া আসিয়া মোড়ের কলটা দখল করিয়া বসে এবং সেই ঘড়া বালতির সংখ্যা বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেই থাকে। মোড়ের এই কলটা সর্বাপেক্ষা নিচু বলিয়া ইহাতেই একটু যা তোড়ে জল পড়ে, সুতরাং সকলেরই লোভ এই দিকে। অথচ, কাহারও ঘেঁষিবার উপায় নাই, দূর হইতে অপর কাহারও ঘড়া দেখিলেই সে জ্বলিয়া উঠে। 'আ মর্! এত কল রয়েছে চারদিকে, যেতে পার না। সকলকার দরকার এই কলটিতে। কেন, অন্য কলে কি জল পড়ে, আর এটাতে মধু! থাকো ব'সে, আমার এই সবগুলো না ভরতি হ'লে আর পাচ্ছ না!'

কেহ কেহ হয়তো মৃদু প্রতিবাদ জানাইতে যায়, 'তুমি একা অতগুলো নেবে, আর সবাই ব'সে থাকবে!'

আর রক্ষা থাকে না, মনোহর একেবারে ক্ষেপিয়া যায়, 'আমি ক'টায় এসেছি জানো? সেই রাত চারটেয়—তখন তোমার আদ্দেক রাত্তির! আমার যতগুলো দরকার ততগুলো এনেছি। কোম্পানির তো এমন নিয়ম নেই যে, কেউ এক বালতির বেশী জল নিতে পারবে না। তুমিই বা দু'-হাতে দুটো বালতি কেন এনেছ শুনি—'

হয়তো ইহারও জবাব দেওয়া চলিত, কিন্তু মনোহরকে কেহ ঘাঁটাইতে সাহস করে না। তাহার বিয়াল্লিশ ইঞ্চি চওড়া ছাতি, কঠিন ও পেশীবহুল বাহুর দিকে চাহিলে অনেকেরই মুখের কথা মুখে আটকাইয়া যায়। তাহার একটা পা খোঁড়া, কী একটা অপারেশানের ফলে ছোট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে তাহার গায়ের জোর তো কমেই নাই—ক্ষিপ্রগতিতে চলার অভ্যাসও তাহার প্রায় আগেকার মতই আছে। দুটো কেরোসিনের টিন বোঝাই জল বাঁকে চাপাইয়া সে এত দ্রুতগতিতে যাওয়া-আসা করিত যে, অনেক সুস্থদেহ তরুণও বোধ করি তাহার সহিত পাল্লা দিতে পারিত না।

এই মনোহরের ইতিহাস অতি বিচিত্র। প্রথম বয়সে ছিল গুণ্ডা, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয় চোরে। এমন কোনো চুরি জানা নাই, যাহা করিয়া সে জেলে না গিয়াছে। পকেটকাটা, বাক্সভাঙ্গা, ট্রেনে চুরি, সিঁধ—কিছুই বাদ নাই। জেলও পাঁচ সপ্তাহ হইতে শুরু করিয়া দেড় বৎসর পর্যন্ত অনেকবার অনেক রকমই খাটিয়াছে। কিন্তু, হঠাৎ প্রায় বৎসর-পাঁচেক হইতে সে একেবারে সাধুভাবে জীবন-যাপন শুরু করিয়াছে। যদিচ, জেলের ভয় তাহার কারণ নয়;

একবার জেল হইতে বাহির হইয়াই তাহার মায়ের অনুগ্রহ হয়। সেই সময়ে তাহার মুখে জল দিবার কোনো লোক ছিল না। সঙ্গীরা কঠিন রোগ দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। বাড়িতেও কেহ ছিল না—মা তো কবেই মারা গিয়াছিলেন! থাকার মধ্যে ছিলেন এক মাসিমা। মনোহর সুস্থ অবস্থায় কখনও তাঁহার খোঁজ লয় নাই। কিন্তু, তিনিই অসুখের খবর পাইয়া আসিয়া হাজির হইলেন, এবং সেবা করিয়া সুস্থ করিলেন। এই সময় কৃতজ্ঞতার এক দুর্বল মুহূর্তে, মনোহর মাসির হাঁটুতে হাত দিয়া শপথ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে জীবনে আর চুরি করিবে না।

কিন্তু, তাই বলিয়া অত তুচ্ছ কারণে মনোহর সত্যই চুরি ছাড়ে নাই। সুস্থ হইয়া উঠিবার পর যথারীতি একদিন সদলে বাহির হইয়াছিল—বড়লোকের বাড়িও একটা ভালোমত পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল ফিরিবার সময়ে। বাড়ির কোনো লোক কী একটা শব্দ পাইয়া জাগিয়া ওঠে, তখন তাড়াতাড়ি পলায়নের সময় পাঁচিল ডিঙ্গাইতে গিয়া মনোহর পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং ধরা পড়িয়া মারও খাইল প্রচুর। তাহার পর হাসপাতালে দীর্ঘদিন থাকিয়া পা অপারেশান করিয়া ভালো হইল বটে—কিন্তু, জন্মের মত স্বচ্ছন্দগতি হারাইতে হইল।

সেই শেষ! মাসির হাঁটু ধরিয়া শপথের সঙ্গে নিজের হাঁটু ভাঙ্গার একটা যোগাযোগ করিয়া লইয়া মনোহর সত্যই কাজটা ছাড়িয়া দেয়। দলের লোক কত সাধিয়াছে, কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, কিন্তু মনোহর অটল—আর সে কোনোমতেই পাপের পথে পা দিবে না। পরিশ্রম করিয়া যদি শুধু নুনভাত জোটে তো তাই অমৃত। আর না! অবশ্য তাহাতে যে মনোহরের খুব বেশী দুঃখ আছে তা নয়। জল তুলিয়া সে যা টাকা পায় তাহাতে তাহার নিজের খরচা চালাইয়াও দু'চার টাকা হাতে জমিয়াছে। আগে অত টাকা রোজগার করিত, কিন্তু থাকিত না একটি পয়সা। এখন নেশা নাই, কোনো বদ্‌খেয়াল নাই, একটি প্রাণী শুধু, খাইতে আর কত পয়সা লাগে?

কিন্তু, এখন এই দুঃখটাই হইয়াছে তাহার প্রবল। একা সে আর যেন থাকিতে পারে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর দু'পহরে গিয়া রাঁধিতে বসা কিংবা রাত্রে অন্ধকার ঘরে ফিরিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকা, দুইটাই সমান বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে। দুটি রাঁধা ভাত এবং একটু সেবার জন্য তাহার মন লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সে আফিং ধরিয়াছে বহুকাল, কিন্তু সে নেশাও তাহার বাসা বাঁধিবার নেশাকে দূর করিতে পারিতেছে না।

অবশ্য, বাসা সে যে যেমন-তেমন করিয়া বাঁধিতে পারে না তাহা নয়, বিস্তর যুবতী ঝি তাহারই আশেপাশে থাকে, উহাদের মধ্যে কাহারও সহিত ঘর করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত না, একটু চেষ্টা করিলেই হয়তো হইত—কিন্তু, অবৈধ কিছুর মধ্যেই তাহার আর যাইবার ইচ্ছা নাই। যে বাসার আশা তাহার শৈশবেই ঘুচিয়া গিয়াছে, যে জীবনকে সে নিজে ইচ্ছা করিয়া বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই জন্য তাহার সমস্ত প্রাণ তৃষার্ত, সমস্ত অন্তর লালায়িত। সে চায় একটি বালিকা বধূ, একান্তভাবে তাহার উপরই নির্ভরশীলা, পতিগতপ্রাণা একটি বধূ—আর ছোট্ট একটি নীড়। অন্য কিছুতে তাহার আসক্তি নাই। ইহারই অভাবে সমস্ত জীবন যেন দিন দিন বিস্বাদ, বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে।...

অথচ, বয়স যে তাহার হইয়াছে, তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই। ঠিক হিসাব সে রাখে নাই, তবে ঝাপসা ঝাপসা যতটা মনে আছে, চল্লিশ সে কবেই পার হইয়াছে। দেহ সুস্থ এবং সবল আছে, হয়তো এখনও অনেকদিনই থাকিবে, কিন্তু কন্যার বাপ কি সেটা হিসাব করিবে? তাছাডা, যে কুৎসিত ইতিহাস তাহার জীবনের সহিত জড়াইয়া আছে! জেলখাটা একবার নয়, বার বার, তাহার সহিত গুণ্ডামি, নেশা এসব তো আছেই—যে সব পাপ সে করে নাই কখনও, সেগুলির অপবাদও তাহার নামের সহিত যুক্ত হইয়াছে। দু'-একবার সে দরিদ্র পিতাদের কাছে ইঙ্গিতে কথাটা যে না পাড়িতে গিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু তাহারা আভাস-মাত্রে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

না, সে আশা আর কোথাও নাই!

অথচ, আশা যে নাই, একথাটাও সে মানিতে চায় না কিছুতেই। মধ্যে মধ্যে সে আপন মনেই প্রতিপক্ষ খাড়া করিয়া তর্ক করে। কত ভদ্রলোকের ছেলেই তো প্রথম বয়সে উচ্ছৃঙ্খল থাকে, কত কুৎসিত ব্যাধি ধরাইয়া বসে, তবু তাহারা ভদ্র হইতে চাহিলেই তাহাদের চারিদিক খোলা, কন্যাও পাওয়া যায়, বিবাহও হয়—তাহাদের বিবাহেও বাজনা-বাদ্য বাজে, সুন্দরী বধূও পাওয়া যায়। শুধু তাহার বেলাতেই কি ব্যাপারটা এত অসম্ভব? চুরি, চুরি করে না কে? বাবুরা যে অফিস হইতে গাদা গাদা কাগজ-পেন্সিল হইতে শুরু করিয়া টাকা পর্যন্ত আনে—সেগুলি কি তাহারা বলিয়া লইয়া আসে, সেটা কি চুরি নয়? তফাতের মধ্যে শুধু তো এই যে, সে জেল খাটিয়াছে, তাহারা খাটে নাই। আর তাই বা কি, ঐ তো ওপাড়ার বঙ্কু মজুমদার, ব্যাঙ্ক হইতে সত্তর হাজার টাকা

মারিয়া দু'-বৎসর জেল খাটিয়া আসিল—সে কথা কে মনে রাখিয়াছে? এখন দিব্যি সিগারেট ধরাইয়া সমাজে গিয়া বসে, বড় বড় কথা বলে, সম্ভ্রান্ত ঘরেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিয়াছে—শুধু মনোহরের বেলাতেই কি যত কিছু অসম্ভব?

কিন্তু, এসব তর্কে কোনো লাভ হয় না, পথ কোথাও পাওয়া যায় না, শুধু অন্তরটা আরও ক্ষতবিক্ষত হয় মাত্র।

অনেক ভাবিয়া একবার সে তাহার একমাত্র জীবিতা আত্মীয়া, তাহার মাসতুতো বোনের কাছে চিঠি লিখিয়াছিল। প্রায় কুড়ি দিন পরে বোন সে চিঠির জবাবে লিখিল, 'মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু কেউ তোমাকে দিতে চায় না। একটি মেয়ে আছে, তার বাপ একজনকে খুন ক'রে ফাঁসি গিয়েছে—মেয়ে এখন মামারবাড়ি থাকে। মামাটাও নেশাখোর, সে এখন দাঁও বুঝে পাঁচশ' টাকা পণ চায়।'

পাঁচশ' টাকা!

মনোহরের তালু পর্যন্ত শুকাইয়া যায়। টাকা তাহার জমিয়াছে বটে, কিন্তু সে দু-শ' টাকাও পুরা হইবে না। যত কষ্ট করিয়াই সে দিন কাটাক আরও তিনশ' টাকা জমিতে অন্তত দুইটি বৎসর সময় লাগিবে। ততদিনে বয়স যাইবে আরও বাড়িয়া, আর ঐ মেয়েটাই কি তখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে?

অথচ, একদিন ছিল যে, পাঁচশ' টাকা সে একঘণ্টার মধ্যেই উপার্জন করিয়াছে এবং খরচ করিবার সময় পাঁচমিনিটও ভাবে নাই। পৃথিবীতে সৎপথে চলাই কঠিন, মানুষ কুপথ হইতে সুপথে আসিতে চাহিলে মানুষই তাহাকে আসিতে দেয় না। একটা দুঃসহ, দুর্নিবার ক্রোধ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া ওঠে, হাতের পেশীগুলি নিস্‌পিস্ করিতে থাকে যেন—প্রাণপণ শক্তিতে সে নিজেকে শান্ত করিয়া রাখে।

না, অসৎপথে আর না। এ জীবন যদি এমনি নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই কাটিয়া যায়, চিরকাল যদি এই মরুভূমিতেই কাটাইতে হয়, তবুও না।

অবশ্য হাল সে ছাড়ে নাই একেবারে। সেদিনও ত্রৈলোক্য ঘরামীর কাছে কথাটা পড়িয়াছিল ইঙ্গিতে। ত্রৈলোক্য তাহার স্বজাতি নয়, তবে বৈষ্ণব। মনোহর বৈষ্ণব হইতে রাজি আছে, যদি তাহার বারো বছরের মেয়ে মালতীকে

পাওয়া যায়। একদিন মচ্ছবের খরচ, কন্যাকে রুপার চুড়ি ও ত্রৈলোক্যকে একশ'টি টাকা নগদ দিতে সে রাজি আছে।

ত্রৈলোক্য অবশ্য প্রথমটা লোভে পড়িয়াছিল, কিন্তু পরের দিন ভোরবেলা আসিয়া বলিয়া গেল, 'মালুর মা, বুঝলে মনোহর দা', কিছুতেই রাজি নয়। বলে, তার চেয়ে মেয়ের গলায় কলসী দে' গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব।'

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'মেয়েমানুষ জাতটাই অমনি, বুঝলে না মনোহর দা, ওদের নাই দিতে নেই—'

অর্থহীন একটা হাসি হাসিয়া ত্রৈলোক্য চলিয়া যায় নিজের কাজে। মনোহরের ইচ্ছা হয় জলসুদ্ধ ঘড়াটা পিছন হইতে বসাইয়া দেয় তাহার মাথায়।

সে অনেকক্ষণ গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিল। বালতিতে জল ভরিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তবু অন্য বালতি বসাইবার কথা তাহার মনে পড়িল না। ত্রৈলোক্য নিমরাজি হওয়াতে কাল হইতে সে অনেক আশাই করিয়াছিল মনে মনে, আজ সে সমস্ত যেন তাসের বাড়ির মতই ভূমিসাৎ হইয়া গেল। মালতী দেখিতে ভালো নয়, তবু—তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই কাল সে কত কী কল্পনা করিয়াছে—

সহসা পিছন হইতে কাহার মিষ্টকণ্ঠের হাসিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

'ওকি মনোহর, জল যে গড়িয়ে যাচ্ছে—কী ভাবছ ব'সে ব'সে? ঘুমোচ্ছ নাকি?'

অপ্রতিভ মনোহর তাড়াতাড়ি একটা ঘড়া বসাইয়া দিল। পিছনে কখন যে গীতা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে টের পায় নাই। গীতা ব্রাহ্মণদের মেয়ে, এই পাড়াতেই তাহার বাড়ি। বছর বারো-তেরোর ফুটফুটে মেয়ে—ভারি চঞ্চল। একমাত্র সে-ই এ কলে স্বচ্ছন্দে জল তুলিতে পায়, মনোহরের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়া গিয়াছে। শুধু যে সে জল তুলিবার অধিকার পাইয়াছে তাহাই নয়, অনেক সময় ভারী ঘড়া কি বালতি দেখিলে মনোহর স্বেচ্ছায় তাহার বাড়িতে পৌছাইয়া দিয়া আসে। তাছাড়া, টোপাকুল বা আমড়ার আব্দার তো আছেই—সে প্রায়ই মনোহরকে বিভিন্ন গাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া যোগাইতে হয়।

'কী ভাবছিলে মনোহর? বিয়ের কথা নাকি?'

আশ্চর্য! মনোহর চমকাইয়া ওঠে! মেয়েটা হাত গনিতে জানে নাকি? সে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, 'নাগো দিদিমণি, আমার আবার এই বুড়ো-বয়সে নাকি বিয়ের চিন্তে! আমার আর কি বিয়ের বয়স আছে?'

যেন একটু উৎসুক দৃষ্টিতেই মনোহর তাকায়। কিন্তু, যে উত্তরটির জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল সে উত্তর আর আসে না, গীতা অন্য কথায় চলিয়া যায়। বলে 'আমার নতুন হার গড়িয়ে এসেছে জানো মনোহরদা? এই যে—'

সে কলার লাগানো জামার মধ্য হইতে নূতন হারটা বাহির করিয়া দেখায়। আজকালকার হাল-ফ্যাশানের হার, চাকচিক্য যতটা, ওজন ততটা নয়। চোখে চোখে একটা হিসাব করিয়া লইয়া মনোহর বলে, 'তোমার বাবার অনেক পয়সা হয়েছে বল। তা দু'ভরির তো কম নয় হারটা—প্রায় পৌনে দু'শ-টাকার ধাক্কা।'

গীতা আশ্চর্য হইয়া বলে, 'কী ক'রে জানলে বল তো! ঠিক দু'-ভরিই আছে, দু'-ভরি এক আনা।...পয়সা হয়েছে না ছাই! বাবার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। জানো, অফিস থেকে আগে উপরি পেত, এখন আর পায় না। তবু করালে, কী করবে, আমার বিয়ে দিতে হবে তো! একখানা একখানা ক'রে না ক'রে রাখলে একসঙ্গে অত পাবে কোথায়? এই তাই অফিস থেকে ধার করেছে, মাসে মাসে তারা কেটে নেবে।'

পাকা গিন্নীর মতই কথাগুলি গীতা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল। মনোহর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথাগুলি যেন গিলিতেছিল—এখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বালতিটা বদলাইয়া দিল। এইটুকু মেয়ে, তাহারই এখন হইতে বিবাহের ভাবনা, তাহার তো তবু সারা জীবনই পড়িয়া আছে। কিন্তু, মনোহর—বয়স পঞ্চাশ পার হইতে চলিল, এখনও তাহার বিবাহের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। ফাঁসি-কাঠের আসামীর মেয়ে—সেও পাঁচশ' টাকা পণ চায়! আশ্চর্য! সে কি আরও হীন?

সেদিন মনোহর দুপুরবেলা আর রান্না করিল না। আনা-দুইয়ের মুড়ি আনিয়া খাইয়া শুইয়া পড়িল। ঝি ননীর মা পাশের ঘরে থাকে, সে হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো দাদা আঁধলে না?'

'না রে ননীর মা, শরীরটা ভালো নেই আজ!'

'উটি গড়ছি আমি, দু'-খানা চলবে নাকি?'

'না, থাক্—'

আসল কথা, আজ আর তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। এইভাবে চিরকাল কাটিয়া গেল সত্য কথা, কিন্তু তখনও সেটা চিরকালের ব্যবস্থা বলিয়া জানা যায় নাই বলিয়াই সহিয়াছিল। আজ সমস্ত আশা লোপ পাইবার পর

মনে হইতেছে যেন এই ক্ষুদ্র কুটিরের শূন্যতাই তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছে। অথচ, তাহার মনে পড়িল, আজ হইতে অনেক বৎসর আগে তাহার আঠারো বৎসর বয়সের সময় যখন সে চটকলের কাজে ঢোকে তখন কত সম্বন্ধই আসিত তাহার। চাল নাই, চুলা নাই, মা দাসীবৃত্তি করে, তাহা জানিয়াও কত মেয়ের বাপ হাঁটাহাঁটি করিয়াছে। আর আজ, আজ ইচ্ছা করিলেই সে দু'-শ টাকা বাহির করিতে পারে—সমস্তই সৎপথে উপার্জিত টাকা। মাত্র এই গত তিন বৎসরে জমিয়াছে। তাও সে তেমন কাজে মন দেয় না তাই, নহিলে আরও হয়তো জমিত।

ঘুরিয়া ফিরিয়া গীতার কথাতেই মন চলিয়া আসে। ঐটুকু মেয়ে হয়তো বারো বৎসরও পূর্ণ হয় নাই—ভদ্রঘরের হিসাবে বিবাহের বয়স আসিতে এখনও অন্তত চার-পাঁচ বৎসর দেরি, এখন হইতেই তাহার জন্য গহনা গড়ানো শুরু হইল। অত সুন্দর মেয়ে, হয়তো একপয়সাও কেহ লইবে না। এই তো কত বিবাহ সে দেখিল চোখের সামনেই—ঘর হইতে টাকা খরচ করিয়া বরপক্ষ সুন্দর মেয়ে লইয়া গেলেন। আর তাও—এত তাড়াই বা কিসের? এ শুধু গীতার বাপের সোনা জমানো—পাছে লোকের চোখ টাটায় সেই জন্য এখন হইতেই কন্যাদায়ের দোহাই পাড়া।

বেশ হারটি! মনোহরের চোখের সামনে কটকী-কাজ-করা হারের ছবিটা ভাসিয়া উঠিল। মন্দ নয়, টাকাও জমানো হয়, অথচ একটি সুন্দর জিনিসও কাছে থাকে। মজুরি কিছু যায় বটে, কিন্তু তেমনি সোনা ঘরে থাকে—সেটা তো কম কথা নয়! সে যদি প্রথম হইতে বুদ্ধির কাজ করিয়া ঐরকম দু'-একটা গহনা গড়াইয়া রাখিত তাহা হইলে আজ সোনার দামই বাড়িয়া তাহার পাঁচশ' টাকা জমিয়া যাইত। চাইকি সোনার গহনা দেখিলে কন্যার অভিভাবকরা পণের হিসাবটাও একটু নরম করিয়া ধরিত। এখনও বোধ হয় ঐরকম সোনার গহনা মেয়ে বা মেয়ের মায়ের চোখের সামনে ধরিলে রাজি করানো যায়। খুনী আসামীর মেয়েকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই, কিন্তু ত্রৈলোক্যর স্ত্রীকে অমনি একটি গহনা, নগদ দুই শত টাকা পণ যদি সে দেয় এবং বিবাহে আর একশ' টাকা ব্যয় করে, তাহা হইলে বোধ হয় আর সে আপত্তি করিবে না। কিন্তু; —উপায় কি! দুইশ' টাকার মধ্যে একশ' টাকা খরচের জন্য বাদ দিলে থাকে মাত্র একশ' টাকা, ছোট একখানা গহনাতেই শেষ হইয়া যাইবে—পণের টাকা আর থাকে না—

ভাবিতে ভাবিতে মনোহরের মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে আর শুইয়া

থাকিতে না পারিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গুপ্তস্থান হইতে টাকাগুলি বাহির করিয়া গনিতে বসিল। না, বাড়িবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। দুইশত টাকার উপর আর মাত্র এগারোটি টাকা জমিয়াছে। আগামী মাসের মাহিনা হইতে যদি সে কোনোমতে নুনভাত খাইয়াও বাকিটা রাখে, তাহা হইলে আর তেরো-চৌদ্দ টাকা জমিয়া সওয়া দুইশ' পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু, তারপর ?...

অকস্মাৎ তাহার মাথায় যেন রক্ত চড়িতে লাগিল, যে চিন্তা ছিল আবছায়া অবস্থায় মনের নিভৃততম প্রদেশে এখন তাহাই সবেগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ঐ গীতার হারটির দাম পৌনে দুইশ' টাকা প্রায়—দুইয়ে মিলাইলে কিছু কম চারশ', টাকা হয়—সে অনেক টাকা। ত্রৈলোক্যের মেয়ে মালতীকে পাইবার আশা তাহা হইলে বোধ হয় আর অসম্ভব হয় না।

না, না, চুরি আর সে করিবে না, কিছুতেই না।

সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল, টাকা কয়টা তুলিয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। না, এসব চিন্তাও খারাপ। বালতিতে রাখা জল হইতে খানিকটা লইয়া মাথায় থাব্ড়াইতে লাগিল এবং প্রায় অর্ধস্ফুট স্বরেই আপন মনে বলিতে লাগিল, না না, সে আমি পারবনা।

বেলা তখন অপরাহ্নের দিকে ঢলিয়াছে, গাছের ছায়া দেখিয়া বুঝিল কলের জল আসিবার আর দেরি নাই, বালতি টিন লইয়া হাজির হইতে হইতেই জল আসিয়া পড়িবে। সে আর দাঁড়াইল না।

সন্ধ্যার সময় ফিরিয়াও মনোহর রান্না চাপাইল না, প্রতিবেশিনীদের প্রশ্নের জবাবে শরীর খারাপের দোহাই দিল। কিন্তু, ঘুমও আসিল না কিছুতে—অনেকক্ষণ ঘরে শুইয়া থাকিবার পর গভীর রাত্রে উঠিয়া ত্রৈলোক্যদের বাড়িতে গিয়া হাঁক দিল, 'ওহে ঘরামী, বাড়ি আছ নাকি ?'

ত্রৈলোক্য একটু বিস্মিত হইল, বোধ হয় কিছু ভয়ও পাইল। ঘরের কপাটটা ধরিয়াই প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি মনোহরদা ? এত রাতে ?'

মনোহর শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, 'কেন আসতে কি নেই ? শোন, শোন, বাইরে এস।'

তাহার পর গলা নামাইয়া কহিল, 'গিন্নীকে যদি আর কিছু কবুল করি, রাজি হবে ?'

ত্রৈলোক্য কিছুক্ষণ শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল 'কিসের রাজি? বিয়ের ?…কী কবুল করবে ?'

'ধরো, তোমার গিন্নীকে যদি একটা সোনার কিছু গড়িয়ে দিই, ছোটখাটো গয়না। আমার বৌকে যা দেবার তা আমি দেবই। তাছাড়াও যদি ওটা দিই ?…'

ত্রৈলোক্যের দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। মনোহর টাকা জমাইয়াছে তাহা সে আগেই বুঝিয়াছিল, কিন্তু সে যে এত টাকা তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। সোনার গহনা! বিশেষ এই সময়ে!

সে একটু পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'দেখি ভাই ব'লে—তা কী গহনা বলব ?'

মনোহর চলিতে চলিতে বলিয়া গেল, 'সে যা হয় হবে—দেড় ভরিটাক্ আন্দাজ—যা হয়।'

ঘরে ফিরিয়া সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া মনোহর আলো জ্বালিল। কোমরে জড়ানো কোঁচার কাপড়ের খাঁজে তখনও গীতার হার ছড়াটা রহিয়াছে। সে একবার বাহির করিয়া আলোতে মেলিয়া ধরিল, সুন্দর নক্সা আর মীনা—দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, কিন্তু এ হারটি কাহাকেও দেওয়া চলিবে না। মনোহর অনেক দিনের দাগী চোর, এটা সে বেশ জানে যে, সোনা গালাইয়া ফেলিলেই চিহ্ন চলিয়া যায়।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। তারপর সাবধানে ঘরের কোণে ইঁদুরের তোলা মাটির স্তূপের মধ্যে হারটা পুঁতিয়া রাখিয়া আলোটা নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

শুইল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না—বহুক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিবার পর আবার বাহিরের দাওয়াও আসিয়া বসিল।

চুরি করিতে সে যায় নাই। ঈশ্বর জানেন সে কথা। সন্ধ্যার আবছায়ায় শখ যেবার গীতা জল ভরিতে আসে সে সময় জামার খাঁজ দিয়া সোনার নূতন হারটি চিক্‌চিক্ করিয়া তাহার রক্তে যেন কী এক আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তাও সে ঠিক চুরি করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার মন তখন বলিয়াছিল যে, সে শুধু পরখ করিতে চায় যে, অতদিনের অভ্যাসটা একবারে গিয়াছে কিনা। …তারপর, সে তো এক-মুহূর্তের ব্যাপার। গীতা বুঝিতেও পারে নাই। সন্দেহও করিতে পারিবে না। কিন্তু, হারটা যখন হাতে আসিয়া গেল তখন আর কোনো-

মতেই ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। তখন হইতে ব্যাপারটা গলার কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিতেছে।

মনোহর অস্থির হইয়া সামনের মাঠে ঘুরিতে লাগিল। সে পাগল হইয়া যাইবে নাকি? চুরি সে অন্তত পাঁচ-ছয়শ' বার করিয়াছে—এককালে পেশাই ছিল ঐ। কখনও তো সে অনুতপ্ত হয় নাই। কত ফুলের মত সুন্দর ছেলে-মেয়ের গলা হইতে সোনার হার খুলিয়া লইয়াছে। কত নিদ্রিতা কুলবধূর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছে—কৈ তখন তো এত দুশ্চিন্তা হয় নাই, বরং কেমন যেন একটা বিজয়গর্ব অনুভব করিয়াছে। আজ একি হইল!

ভাঙ্গা হাঁটুর কাছটা খচ্‌খচ্‌ করিতেছে। এ কি পাপের ফল? কে জানে? যে প্রতিজ্ঞা সে কখনও ভাঙ্গে নাই, এই দুই তিন বৎসরের সহস্র প্রলোভনেও না—সেই পণ ভাঙ্গিল কিসের জন্য সে? ত্রৈলোক্যের ঐ বুঁচী মেয়েটার জন্য? ঘর-সংসার? কিসের ঘর-সংসার, বয়স পঞ্চাশের কোঠায় গেল প্রায়, এই বয়সে একফোঁটা একটা মেয়েকে বিবাহ করিয়া কত দিনই বা সে ঘর করিবে—মিছিমিছি তাহার জন্য সহস্র রকমের ঝঞ্ঝাট এবং অসুবিধা। এ কী কুগ্রহ চাপিল তাহার মাথায়?

অথচ, অনুশোচনা করিয়া ফল নাই, তাহা সে জানে। চুরি করা যতটা, ফিরাইয়া দেওয়া ততটা সহজ নয়। গীতার হাসিহাসি মুখ মনে পড়িল। সে মুখের ম্লানিমা কল্পনা করাও যায় না। না, কাজটা সে অন্যায়ই করিয়াছে, কিন্তু উপায় কী!…বরং, যে জন্য অন্যায় করিয়াছে সেটাই পাক্ সে। একূল ওকূল দুই-ই নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

সে জোর করিয়া দাওয়ায় ফিরিয়া আসিয়া তামাক খাইতে বসিল। মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল বিবাহের পরের অবস্থা। তামাক নিজেকে সাজিতে হয় না। প্রতিদিন রান্নার যোগাড় করিতে হয় না। এমন কি বিছানাটাও হয়তো সে তখন ফরসাই পাইবে। মালতী নিজে ক্ষার কাচিয়া রৌদ্রে দিয়া—সুন্দর করিয়া রাখিবে!

না—ঠিকই করিয়াছে সে। গীতার আর কতটুকু ক্ষতি হইবে। বাবা একটা যখন গড়াইয়া দিয়াছে তখন আর একটাও দিবে। এই গহনাটির জন্য গীতার বিবাহ আটকাইবে না—বরং তাহার আটকাইবে। বিশেষত গীতার সময় আছে, মনোহরের নাই। সে তামাকটা শেষ করিয়া বেশ করিয়া মাথায় খানিকটা জল থাবড়াইয়া শুইতে গেল।

পরের দিন ভালো করিয়া ফরসা হইবার আগেই কলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্লান আলো, কিন্তু তাহাতেই গীতার মুখের অপরিসীম শুষ্কতা মনোহরের চোখ এড়াইল না। অন্যদিন হইলে মনোহর নিজেই প্রশ্ন করিত, 'কী হয়েছে রে গীতা?' কিন্তু, সেদিন কিছুতেই পারিল না, একবার মাত্র আড়ে চাহিয়াই আবার মাথা হেঁট করিয়া জল তুলিতে লাগিল।

গীতা নিজেই কথাটা পাড়িল, 'কাল আমার হারটা কোথায় হারিয়ে গেছে মনোহর!'

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ, যেন মনে হয় কিছু আগেই সে কাঁদিয়াছে।

মনোহর চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'সেকি—কোথা হারাল, কী ক'রে?'

'কী জানি! বিকেলেও গলায় ছিল জানি, একবার হাত দিয়ে দেখেছি। তারপর সন্ধ্যা থেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। নতুন হার, খুলে প'ড়ে যাবারও তো কথা নয়!

তারপর একটু থামিয়া কহিল, 'বাবা নতুন হার বারণ করেছিল পরতে—কেন যে মরতে পরলুম! আমিই বলেছিলুম পাঁচ-ছ' দিন অন্তত পরি, তারপর খুলে রাখব।…বাবা কী মারই মারলে, ছাখো না এখনও সব কাল্‌শিটে প'ড়ে আছে!'

সে তাহার সুগোল শুভ্র বাহুমূল মনোহরের চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। সত্যই, বোধ হয় পাখা কি বেতের ঘা মারা হইয়াছিল, সেই দাগে দাগে রক্ত জমিয়া কাল্‌শিটে পড়িয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটি হইয়া উঠিয়াছে লাল, চোখের কোলে কালি পড়িয়া গেছে। এখনও মনোহরের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, বাবা আবারও মারবে মনোহর, আমি আর সইতে পারছি না।…বাবা বলেছে খুঁজে দেখতে, কোথায় খুঁজব—বাড়ি গলি সব খুঁজেছি—'

মনোহর নতমুখে জলের ঘড়াটা বদলাইয়া দিয়া কহিল, 'কাল সাঁঝের বেলা জল নিয়ে যেতে এই পাশের নালির পাঁকের মধ্যে প'ড়ে যায় নি তো?'

গীতার মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'তা পড়তে পারে, না?, খুঁজে দেখব একবার, না হয় চান করব?'

মনোহর অন্যমনস্ক ভাবে গীতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া কহিল, 'না তোমাকে আর নর্দমা ঘাঁটতে হবে না গীতাদি, আমিই জলটা যোগানো হ'লে খুঁজে দেখব।'

জল যোগানো শেষ হইলে নিজের বাসারও জল রাখিয়া আসিয়া মনোহর নর্দমায় নামিল। দেখা গেল মনোহরের অনুমানই সত্য, সত্যই কোড়া কাটিয়া কী করিয়া হারটা পাঁকে পড়িয়া পুঁতিয়া গিয়াছিল, একটু খোঁজ করিতেই পাওয়া গেল।

গীতার বাবা মনোহরকে পাঁচটা টাকা বকশিশ দিলেন। গীতা চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'আমি তোমাকে পেট ভ'রে সন্দেশ খাওয়াব মনোহর—যা চাও তাই খাওয়াব।'

কিন্তু, মনোহর সন্দেশ খাওয়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না—কে জানে কেন, ইহার দিন পাঁচ-ছয় পরেই এখানকার সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া সে নৈহাটি চলিয়া গেল। এখন নাকি সেখানেই সে জল যোগায়।

## চৌর্যবৃত্তি

সে কালের লতপাতা-কাটা গালা-ভরা দুই গাছি রুলি, বোধ হয় একভরি সোনাও দুই গাছিতে ছিল না; তাও আবার দীর্ঘ ব্যবহারে তাহার ভিতর হইতে নানা স্থানে গালা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, সেই রুলি দু'গাছির দিকে চাহিয়াই দুর্গার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। রুলি দু'গাছি তাহার বিবাহের পূর্বেকার, তাহার কুমারী অবস্থার চিহ্ন; শুধু তাহাই নয়—এ রুলি তাহার মায়ের।

দুর্গার মা সতেরো বছর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার দিদিমা মেয়ের হাত একেবারে 'খালি' করিতে দেন নাই, রুলি দু'গাছি তাহার হাতেই ছিল। কিন্তু, দুর্গা যখন বড় হইল তখন আর তিনি হাতে গহনা রাখিতে রাজি হইলেন না, রুলি দু'গাছি স্যাকরা-বাড়ি পাঠাইয়া আর একবার পালিশ করাইয়া আনিয়া মেয়ের হাতে পরাইয়া দিলেন। দুর্গার বরাবরই একটু 'বাড়ন্ত' গড়ন। সুতরাং, তাহার হাতে মায়ের রুলি একেবারে চাপিয়া বসিল।

দুর্গা মামারবাড়িতেই মানুষ হইয়াছিল। মামারা ভাত দিয়াছিলেন, কিন্তু গহনা দিবার বা বিবাহ দিবার অবস্থা তাঁহাদের ছিল না। তাহার কাকারও প্রায় সেই অবস্থা, কিন্তু মেয়ের চৌদ্দ বছর বয়স হইতেই তিনি আর স্থির থাকিতে

পারিলেন না, মামাদের সম্পূর্ণ অমতে, নিজের অভিভাবকত্ব জাহির করিয়া তারাপদর সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিলেন এবং তাঁহার জাতি রক্ষা হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

তারাপদর বাড়ি আছে, সামান্য কিছু জমিও ছিল, তাছাড়া বৌবাজারের এক স্যাকরার দোকানে খাতা-লেখার কাজ করিত। সুতরাং, পাত্র হিসাবে সে ভালোই; এ অকাট্য যুক্তির কাছে মামাদের 'লেখাপড়া-জানে না' এ আপত্তি টিকিল না। যাহাই হউক—প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল যে, সত্যই কাকার দূরদর্শিতা আছে। কারণ, বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই তারাপদ চার-পাঁচখানা গহনা দিয়া তাহার গা সাজাইয়া দিল, সিল্কের শাড়িও অঙ্গে উঠিল। কিন্তু, সে সুখ দুর্গার ঐ এক বৎসরের বেশী টিকিল না, গর্ভে সন্তান আসার সঙ্গে সঙ্গে তারাপদর মনিবের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল, এবং আরও ন'মাস পরে, অর্থাৎ দুর্গা একটি মৃত সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে, দোকানই উঠিয়া গেল।

প্রথম প্রথম তারাপদ খুব খানিকটা ঘুরিল; কিন্তু, চাকরি তাহার কোথাও মিলিল না। লেখাপড়া সে বিশেষ জানিত না, তাহার উপর হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত খারাপ। যাঁহার কাছে সে কাজ করিত, তিনি উহাকে স্নেহ করিতেন বলিয়াই কোনোরকমে কাজ চালাইয়া লইতেন—অপরিচিত লোকেরা সে অসুবিধা কেন সহ্য করিবে? প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া সেই যে সে ঘরে আসিয়া বসিল আর তাহাকে কোথাও নড়ানো গেল না। আশাভঙ্গের গ্লানি তাহাকে একেবারে জড়, অমানুষ করিয়া ফেলিল। কথাবার্তা কওয়া, এমন কি পাড়ার রাস্তায় বাহির হওয়া পর্যন্ত সে ছাড়িয়া দিল, দুই বেলা খাওয়া এবং ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর সে কিছুই করিত না। মায়ের তিরস্কার, আত্মীয়-স্বজনদের অনুযোগ, স্ত্রীর চোখের জল কোনোটাই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

প্রথমেই টান পড়িল জমিতে, তারপর ভদ্রাসনেও টান পড়িতেছিল, কিন্তু তারাপদর মা কিছুতেই পাটা বাহির করিয়া দিলেন না এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্ত্রীও তাহা অনুমোদন করিল, নিঃশব্দে নিজের গলার হার বাহির করিয়া দিল।

সে আজ প্রায় বছর চারেকের কথা।

ইতিমধ্যে তাহারা দুর্দশার শেষ ধাপে আসিয়া পৌছিয়াছে। খাদ্যাভাবে স্ত্রী তিনটি সন্তানের কোনোটিকেই বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই, তাহার

নিজের চেহারাও কঙ্কালসার হইয়াছে। চালে বহুদিন পাতা বা খড় কিছুই পড়ে নাই। সুতরাং, বর্ষাকালে বসিয়া কাঁদা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। গহনা সবগুলিই গিয়াছে, সিল্কের কাপড়ও আর নাই, নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া যাহা কিছু বাসনপত্র ছিল সমস্তই আধা দামে বিক্রয় করিতে হইয়াছে, এখন সম্বল শুধু ঐ রুলি-জোড়াটি আর এই জরাজীর্ণ ভদ্রাসন।

দুর্গার মা মেয়ের সংসারে অনেক জোড়াতালি দিয়াছেন—নিজের হাতে বহুদিন ধরিয়া গোটা ষাটেক টাকা জমা ছিল তাহাও একে একে গনিয়া দিয়াছেন দাদাদের কাছে কাঁদাকাটা করিয়া টাকাটা সিকিটা সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে দিয়া গিয়াছেন, মেয়ের বাড়ির থোড়-মোচা-নারিকেল পাড়ায় ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও সংসার চলে না।

অবশেষে এইবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। দুর্গার এক বহু দূর-সম্পর্কের জ্যাঠা ভাগলপুরে চাকরি করিতেন, দুর্গার মা তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়া অনেক মিনতি করিয়াছিলেন, জামাইকে একটা যাহোক কিছু কাজ করিয়া দিবার জন্য, এতদিন পরে তিনি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তারাপদ যদি সেখানে যায় তো তিনি টাকা-পনেরোর একটি চাকরি করিয়া দিতে পারেন, এবং সে যদি তাঁহার বাসাতেই থাকে, তাহা হইলে কোনো খরচই তাহার লাগিবে না।

দুর্গার মা আনন্দে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া জামাইকে শুভ-সংবাদটি দিয়া কহিলেন, 'তাহ'লে কালই তুমি বেরিয়ে পড়, কাল দিন ভালো আছে। এদের জন্য ভাবনা নেই, আমি রইলুম, দেখতে পারব।'

জামাতা উদাসীনের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ওখানে যেতে গেলেও তো গাড়িভাড়া চাই; তাছাড়া দু'-একখানা কাপড়ও না হ'লেও চলবে না, প্রায় দশ টাকার ধাক্কা, কে দেবে অত টাকা? তাছাড়া, ঐ দূর বিদেশে সামান্য টাকার জন্যে যাওয়াও যায় না—'

প্রথমটা দুর্গার মায়ের মুখে কথা সরিল না। তাহার পর তিনি প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'মুখে আগুন তোমার!...লজ্জা করে না বলতে এ কথা? মাগ আর শাশুড়ীর ওপর বরাত দিয়ে ব'সে ব'সে খাচ্ছ, 'কড়ার কুটোটি' নাড়বার নাম নেই, না পয়সা দিয়ে না গতর দিয়ে উপকার—পুরুষ মানুষ হয়ে এমন ক'রে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে? অন্য লোক হ'লে মোট বয়ে, কিম্বা ভিক্ষে ক'রেও রোজগার করত। দুশোবার বললুম যে, বাজারে ব'সে আলু-পটল বিক্রি কর, তবু পেটটা

চলবে—'নাঃ, বামুনের ছেলে হয়ে আলু-পটল বেচব ?'···ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—গলায় দড়ি দিয়ে মরো, দড়ি-কলসী আমি ভিক্ষে ক'রে কিনে দিচ্ছি।'

তারাপদ মুখটা গোঁজ করিয়া কহিল, 'বেশ তো গাড়ি ভাড়া দিন না, আমি যাচ্ছি—'

দুর্গার মা কহিলেন, সেটাও কি আমাকে যোগাড় ক'রে দিতে হবে বাবা ? ...এইটুকুও ক'রে নিতে পার না ? কোথাও থেকে দশটা টাকা ধার করতে পার না ?'

তারাপদ কহিল, 'কে আমাকে ধার দেবে ? সে আমি পারব না।'

দুর্গা এতক্ষণ দোরের আড়াল হইতে নিঃশব্দে রাগে ফুলিতেছিল, এইবার সে বাহির হইয়া বলিল, 'টাকা আমি দেব মা—ওকে তৈরি হ'তে বল, আর তার আগে আমাকে একজোড়া লাল রুলি তুমি দাও, যেখান থেকে হোক্!'

মা মেয়ের হাতের সেই তোব্ড়াইয়া যাওয়া প্রাচীন রুলি-দু'গাছির দিকে চাহিয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তারাপদর মা-ও বারবার চোখ মুছিলেন, শুধু অবিচলিত ভাবে বসিয়া রহিল তারাপদ। দুর্গাও আর কথা কহিল না, নিঃশব্দে মাটির কলসীটা লইয়া খাবার জল তুলিতে চলিয়া গেল।

কিন্তু, উড়ে-পুকুরের নির্জন ঘাটে বসিয়া রুলি-দু'গাছির দিকে চাহিয়া তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। গহনা সে একে একে সবগুলিই গা হইতে খুলিয়া দিয়াছে, কোনোটির সময়েই তো এত কষ্ট হয় নাই! বিশেষ করিয়া স্বামী কর্মস্থানে যাইতেছে, হয়তো এতদিনে অভাব ঘুচিবে, ভবিষ্যতে আবার অলঙ্কার পরিবার আশাও হয়তো একেবারে দুরাশা নয়, তবে ? তবে এ চোখের জল তাহার কেন ?

কিন্তু, কিছুতেই সে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। বাল্যকালে সমবয়সী প্রায় সব মেয়ের গায়েই অলঙ্কার দেখিত, আর মনে মনে মায়ের হাতের রুলি দু'গাছিকে লুব্ধভাবে কামনা করিত; তখনও তাহার সংসারের কোনো জ্ঞানই হয় নাই, ভাবিত কী অন্যায় মায়ের, তাহাকে শুধু গায়ে রাখিয়া নিজে গহনা পরে—

তারপর যখন নূতন করিয়া পালিশ হইয়া ঐ রুলি তাহার হাতে উঠিল, তখনই বা তাহার কী উল্লাস! মনে আছে দুটি-রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই। প্রথম যৌবনের কত আশা-কামনার সূত্রপাত ঐ অলঙ্কারে, সে কথা আজও অন্তর্যামী বোধ হয় ভুলিতে পারেন নাই। কত গহনা গায়ে উঠিয়াছে, আবার সবই একে একে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া তাহার আত্মার সহিত নিবিড়

হইয়া কেহ নাই। তাহার স্বামী মানুষ নয়, তাহার যৌবন ব্যর্থ, তাহার দেহ অকালে জরাগ্রস্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা যেন আজ প্রথম সে নূতন করিয়া অনুভব করিল; রুলি-পরা হাত দুইটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এই অবস্থায় রায়েদের বিমলা কখন ঘাটে আসিয়াছে, দুর্গা টের পায় নাই। বিমলা দুর্গাদের অবস্থা সবই জানিত, তবুও সে প্রশ্ন করিল, 'কী হয়েছে রে দুগ্‌গা?'

দুর্গা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া কহিল, 'কিছু না,—আমার যেমন মরণ, এত-দিন পরে চাকরি হয়েছে, আনন্দেরই কথা, তবু বিদেশ যাবেন ব'লে পোড়া চোখে যেন জল আর আটকায় না!'

সংবাদটায় কি জানি কেন বিমলা যেন খুশী হইতে পারিল না। মুখ কালি করিয়াই কহিল, 'চাকরি হয়েছে? আহা বেশ! বেশ! কোথায় হ'ল রে?'

—'ভাগলপুর।'

দুর্গা তাড়াতাড়ি কলসীতে জল ভরিয়া লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল। বিমলাকে সে চিনিত, বৃথা এ সব কথা তাহার সহিত আলোচনা করিতে মন সরিল না।

রান্নাবাড়া সবই তাহাকে করিতে হয়, বসিয়া ভাবিবার অবকাশ নাই। কিন্তু, তবুও সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। রুলি দু'-গাছির দিকে সে চাহিতে পর্যন্ত পারিতেছিল না, চাহিলেই তাহার বুকের মধ্যে যেন মোচ্‌ড়াইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু, উপায়ই বা কী? টাকা পাইবার যে কোথাও কোনো আশা নাই সে কথাটা তাহার নিজের চেয়ে আর কেহ বেশী জানিত না, তবুও সে আর একবার পরিচিত সমস্ত স্থানগুলির কথা ভাবিতে লাগিল, কোথাও দশটা টাকা পাইবার কিছুমাত্র আশা আছে কিনা, কিন্তু বহুক্ষণ ভাবিয়াও এমন কোনো জায়গা সে কল্পনা করিতে পারিল না। বিমলার মা টাকা ধার দেন বটে, গহনা বাঁধা রাখিয়া। বিক্রি না করিয়া রুলি দু'গাছি বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু, সে ঋণ কি শোধ দেওয়া যাইবে?

তা না যাক্—তবুও তখনকার মত এই কথাটাই দুর্গার মনে ধরিল। স্বামী যদি মাসে দশটা টাকাও পাঠাইতে পারে, তাহা হইলেও হয়তো এককালে সে রুলি দুইটি উদ্ধার করিতে পারিবে।

স্বামী ও শাশুড়ীকে খাওয়াইয়া ভাত লইয়া সে বসিল বটে, কিন্তু কিছুই মুখে দিতে পারিল না। অতিকষ্টে শাশুড়ীকে লুকাইয়া ভাতগুলি পুকুরের পাড়ে ঢালিয়া দিয়া আসিল। তারপর ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া একসময় সে সকলের অলক্ষ্যে বিমলার মায়ের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিল।

বিমলাদের সদর দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল।

'মাসিমা কই গো—' বলিয়া উঠানে পা দিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, বাড়িতে কেহ নাই। তবুও সে উঠান পার হইয়া দালানে উঠিয়া আসিল, কিন্তু সব কয়টি ঘরই খালি। বিমলার বাবা অফিসে, ভাই স্কুলে এবং বিমলারও পাড়া বেড়ানো না হইলে চলে না—এ সবই জানিত, কিন্তু বিমলার মা তো কোথাও যান না, তিনি কোথায়?…একটু বিস্মিত ভাবে বিমলা আর একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে যাইবে এমন সময় সহসা কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। বিমলার মাথার বালিশের নিচে হইতে তাহার রিং-চাবির তোড়াটা অর্ধেকটা বাহির হইয়া আছে—

বিছানার ঠিক পাশেই লোহার সিন্দুক, তাহার উপরেই খুচরা খরচের হাত বাক্স। এই বাক্স সে বহুবার বিমলার মাকে খুলিতে দেখিয়াছে, চাবিটাও অনুমান করা কঠিন হইবে না।

দুর্গার বুক ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে লাগিল, মুহূর্তের মধ্যে সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিল। কিন্তু, সেই সঙ্গেই তাহার এতদিনের সমস্ত গহনার শোক বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। একবার সে নিজের ডান হাতটার দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্ষীণ, জীর্ণ সুবর্ণের সেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অলঙ্কারটিই অকস্মাৎ যেন সূর্যের দীপ্তিতে চোখ ঝল্‌সাইয়া দিল, মনে হইল উহার কারুকার্যের প্রতিটি রেখা তাহার প্রতিটি অস্থির সহিত জড়িত—এ যখন যাইবে তাহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া যাইবে! সে স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবিটি বাহির করিয়া লইল এবং সেই জড়, মোহাচ্ছন্ন অবস্থাতেই বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল—

কর্তা বোধ হয় কালই মাহিনা পাইয়াছিলেন, একটি তাড়া দশ টাকার নোট, বোধ হয় দশ-বারো খানা হইবে, সামনেই পড়িয়াছিল। বিমলা সেই গোছার মধ্য হইতে একটি নোট টানিয়া লইয়া আবার বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটি যথাসম্ভব পূর্বস্থানে রাখিয়া দিল। তারপর প্রায় ছুটিয়া উঠানে নামিয়া আসিয়া এক প্রকার আর্তস্বরে ডাকিল, 'মাসিমা'

এইবার সাড়া আসিল। ভিজা গামছায় সর্বাঙ্গ আবৃত করিতে করিতে বিমলার মা বাড়ি ঢুকিলেন, 'দুর্গা কখন এলি রে ?…আমি বাগানে গিয়েছিলুম। খেয়ে উঠতেই পেটটা কেমন ক'রে উঠল—'

প্রাণপণ চেষ্টায় দুর্গার গলার স্বর ফুটিল, সে যতদূর সম্ভব সহজকণ্ঠে কহিল, 'আমি এই আসছি মাসিমা, পাঁজিটা একবার দেখে দিতে হবে তোমায়, এর ভেতর পশ্চিম যাবার কবে দিন আছে—'

বিমলার মা কহিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিমি বলছিল বটে যে, তারাপদর নাকি পশ্চিমে চাকরি হয়েছে, তাই তুই ঘাটে ব'সে কাঁদছিলি! সেই জন্যে বুঝি তোর মুখ শুকনো ?…পাগলী আর কি! এই তো নাকের ডগে ভাগলপুর, তার জন্যে আবার এত ভাবনা, তাছাড়া আর দু'দিন ব'সে থাকলে যে উপোস ক'রে মরতে হ'ত—'

আরও কত কথা যে বিমলার মা বলিলেন এবং দিন দেখিয়াই বা কী স্থির করিয়া দিলেন দুর্গার কানে কিছুই পৌঁছিল না। সে চুরি করিয়াছে, সে চোর। ভদ্রসমাজে, ভদ্রলোকের বাড়িতে আর তাহার স্থান নাই, এই কথাটাই কে বার বার যেন তাহার কানে ঢাক পিটাইয়া বলিতেছিল। সে এ কী করিল, ইহার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়া মরিল না কেন ?

কিন্তু তবুও—

তবুও বিমলাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যখন নিজের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিল, তখন রুলি দুইটি হাত হইতে খুলিয়া পেট-কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিল। তারপর তারাপদর সামনে আসিয়া নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সহজকণ্ঠে কহিল 'ঐ নাও টাকা!'

শাশুড়ী দূরে বসিয়াছিলেন, কহিলেন, 'তোমার রুলি কি বিক্রি ক'রে দিলে বৌমা ?'

দুর্গা মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না, বাঁধা দিলুম।'

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া অতি সন্তর্পণে কাপড়ের মধ্য হইতে রুলি দুইটিকে বাহির করিয়া সস্নেহে সে দুটিকে চুমা খাইল, তারপর অন্যের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা তোরঙ্গ খুলিয়া ছেঁড়া কাপড়গুলির মধ্যে তলিয়া রাখিল।

# বন্ধুমিলন

এগারো বছর পরে যতীন দেশে ফিরিতেছে।

এগারো বছর আগে এমনিই এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়া তাহাকে এলাহাবাদ যাত্রা করিতে হইয়াছিল, তাহার পর এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আর এলাহাবাদের বাহিরে আসার সুবিধা হয় নাই। এতদিন পরে আজ সে ছুটি পাইয়াছে, আজ সে স্বাধীন, আজ সে মুক্ত—

তাহার বাবা ছিলেন মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী, তাই যেদিন তিনি মারা গেলেন, সেদিন আর তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। মামা এলাহাবাদে সামান্য চাকরি করিতেন, তিনি লিখিলেন যে, সেখানে গেলে কোনোরকমে বোন ও ভাগিনেয়কে পালন করিতে পারেন, কিন্তু টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করার মত অবস্থা তাঁহার নয়। সুতরাং, ষোল-সতেরো বছরের কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া তাহার মায়ের চোখ মুছিতে মুছিতে এলাহাবাদে যাওয়া ছাড়া উপায় রহিল না।

সেদিন যতীন চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের কিশোর, কলিকাতার সমস্ত ছাপই তাহার মনের মধ্যে স্পষ্ট পড়িবার বয়স। কিন্তু, সেই বিদায়ের দিনে কলিকাতার ইন্দ্রজাল তাহাকে পীড়া দেয় নাই, দিয়াছিল তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন্দুর সহিত বিচ্ছেদ। ইন্দু তাহাদের পাশের বাড়ির ছেলে, এবং বাড়িওয়ালার ছেলেও বটে। উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অবসরে এই দুইটি কিশোরের মনের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পরিমাণ কোনো পক্ষের অভিভাবকই কল্পনা করিতে পারেন নাই।

এলাহাবাদের স্কুল ও কলেজ জীবনের মধ্যে, সেখানকার সুখদুঃখ, খেলাধূলার মধ্যে, সেখানকার সহপাঠী, পরিচিতের মধ্যে কলিকাতার স্মৃতি বিবর্ণ হইতে হইতে আজ একেবারে ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট হইয়া গেছে। কিন্তু, যাহা কিছুতেই মিলাইয়া যায় নাই, সে হইতেছে ঐ ইন্দুর স্মৃতি। বিদায়ের দিনের অশ্রুজল গভীর বেদনারূপে বুকের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে, কারণে-অকারণে খচ্‌খচ্‌ করিয়া উঠে।

সমস্ত আকাশটা মেঘে একেবারে ছাইয়া আছে। তাহারই ঘোলাটে আলোয় নিচের বাঁশঝাড়, পানাপুকুর, কলাবাগান যেন অত্যন্ত শীতল, অত্যন্ত শান্তিদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে। বাহির হইতে যে ভিজা বাতাস হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা যেন ঐ সুনিবিড় শান্তিই বহন করিয়া আনিতেছে—

যতীন একবার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। বহুদিন পশ্চিমের প্রখর রৌদ্র-দগ্ধ মাঠের মধ্যে দিন কাটাইয়া বাংলাদেশে ফিরিবার সময় রেলপথের দু'ধারের শ্যামলতা বড়ই আনন্দ দেয়। কিন্তু, এই অপরূপ শোভাও আজ তাহাকে যেন আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, এগারো বছর আগেকার সেই প্রায় ভুলিয়া যাওয়া জীবনের স্মৃতি আজ তাহাকে উন্মনা, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

স্কুলের ফেরত বাড়ি আসিয়া দুইখানা রুটি খাইয়াই সে ছুটিত ইন্দুদের বাড়ির দিকে। মনে আছে, সে সময় কেহ কোনো কাজের কথা বলিলে তাহার কী পর্যন্ত রাগ হইত। দুইজনে সকালে এক জায়গায় পড়িতে বসিত, হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হইত হয়তো, কিন্তু অভিভাবকদের শত তিরস্কারেও কখনও এ অবস্থার অন্যথা হয় নাই। আহারের পর দুইজনের স্কুলে যাওয়া; একজনের দেরি হইলে অপরেরও নিশ্চয় দেরি হইবে, একথা লইয়া হেড্‌পণ্ডিত কত তিরস্কার করিয়াছেন। খেলা—সেও একসঙ্গে, শুধু ঘুমের সময়টা দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইত। তাও যাইবার আগে বছরখানেক ধরিয়া মাসের অর্ধেক দিন তাহারা একসঙ্গে শুইত। পালাক্রমে একজন অপরের হাতে মাথা রাখিয়া পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইত। সেদিনের স্মৃতি মনে জাগিয়া আজও মনের মধ্যে হু-হু করিতে থাকে। তারপর সেই বিদায়ের দিন! উঃ—ইন্দুর সে কী কান্না! তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া যতীন নিজেও কত কাঁদিয়াছিল—

বাল্যকালের সমস্ত স্মৃতি বায়োস্কোপের মত যেন পর-পর মনের উপর দিয়া দ্রুত ভাসিয়া গেল। এগারো বছরের সমস্ত বেদনা আজ যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। যতীন অসহিষ্ণুভাবে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইল। বোম্বে মেল আজ দুইঘণ্টা লেট্, তাও যেভাবে চলিতেছে পথে সেটা পুরাইয়া লইবার কোনো সম্ভাবনা নাই!

দরিদ্র মামা সংসার খরচ যোগাইয়া আবার ভাগিনেয়কে কলিকাতায় পড়াইতে যাইবার টাকা দিবেন, ইহা সম্ভব নয়, সে আশাও করে নাই। সে শুধু প্রতিটি মুহূর্ত দিন গনিত, কবে সে উপায়ক্ষম হইবে, আবার কলিকাতায় আসিতে পাইবে! আজ এতদিন পরে সেই সময় আসিয়াছে, ছ'মাস চাকরি করিয়া সে কয়টি টাকা জমাইয়াছে, সেই টাকা লইয়াই আজ কলিকাতায় আসিতেছে—বন্ধু-মিলনের উদ্দেশ্যে!

ইন্দু তাহাকে বরাবর চিঠি দিত; সে-ও নিয়মিত জবাব দিয়াছে। আজকাল চিঠির সংখ্যা খুবই কমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক। দুইজনেরই মাথায় সংসারের ঝঞ্ঝাট আসিয়া পড়িয়াছে, সময় কৈ?...যতীনের প্রথম দিককার চিঠিগুলির কথা মনে পড়িয়া হাসি পাইল, সে কেবলই আবেগ আর উচ্ছ্বাস। ইন্দুর চিঠি সে একখানিও হারায় নাই, সমস্তই জমানো আছে—

ইন্দুর বাবা কতকগুলি বাজে স্পেকুলেশানে অনেক টাকা লোকসান দিয়াছিলেন। সুতরাং, ইন্দুকে আই-এ পাস করিয়াই চাকুরিতে ঢুকিতে হয়। মার্চেণ্ট অফিস, মাহিনাও বেশী নয়, ছুটি-ছাটাও নাই, কাজেই ইন্দুরও এলাহাবাদ আসা ঘটিয়া উঠে নাই।...সহসা মনে পড়িল, গত বৎসর শ্রাবণ মাসে ইন্দু বিবাহ করিয়াছে। ইন্দুর বিবাহেও যতীন যাইতে পারিবে না, সেজন্য ইন্দুর বিলাপের অবধি ছিল না, দীর্ঘ আটপৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিতে তাহার বিবাহের বর্ণনা ও বিলাপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।...কিন্তু, ইন্দুর আবার বিবাহ, সেই ইন্দু। ...তাহার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। বৌটি কেমন হইয়াছে, কে জানে!

ঐ-তো বেলুড় পার হইল! যাক্—বাঁচা গিয়াছে, বেলুড়ের পর লিলুয়া, তারপরই হাওড়া।... কিন্তু, এধারেও একটা বাজে—

ইন্দুকে সে চিঠিতে কোনো কথা জানায় নাই, একেবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আশ্চর্য করিয়া দিবে। সেই বিশেষ ক্ষণটির কথা মনে হইয়া বুক যেন একসঙ্গে অপরিসীম আনন্দে ও সুনিবিড় ব্যথায় মোচড়াইয়া উঠিল। এই মধ্যের সময়টাকে যদি সে কোনোরকমে হাতে করিয়া সরাইয়া দিতে পারিত! এ যে কী অসহ্য যন্ত্রণা!

যাক্—ঐ হাওড়া।

যতীন তাহার স্যুটকেশ ও বিছানাটা নিজেই টানিয়া লইয়া গাড়ির প্রবেশ-পথে গিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি থামিলেই নামিয়া পড়িতে হইবে—

তারপর কুলি। কুলির জন্য অপেক্ষা করিতে তাহার সবুর সহিতেছিল না। কে একজন সহযাত্রী বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—'দাদা কি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বেন নাকি?'

আর একজন জবাব দিল, 'শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে বোধ হয়?'

কিন্তু, যতীনের ইহাতেও রাগ হইল না, শুধু হাসিল একটু। ইহারা খালি শ্বশুরবাড়িই জানে! এগারো বছর আগে দুইটি কিশোর যে অপরূপ বেদনা-বন্ধনের মধ্য দিয়া মধুর সম্পর্ক পাতাইয়াছিল, তাহার সহিত কি দুইটি অপরিচিত মানুষের মন্ত্রপড়া সম্পর্কের তুলনা হয়?

কলিকাতায় তাহার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি খুঁজিবার সময় নাই। প্রথমেই যে হোটেলের গাইড্ আসিল, তাঁহার সহিত একখানা ট্যাক্সিতে উঠিয়া হোটেলের উদ্দেশ্যে চলিল। ট্যাক্সির ভাড়াটা বাজে খরচা—কিন্তু, তা' হোক!...সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল তাহার হোটেলে-ওঠা লইয়া ইন্দু কত গঞ্জনা দিবে. তাহার পর জোর করিয়া বিছানা-বাক্স টানিয়া লইয়া যাইবে তাহার বাড়িতে—

হোটেলে ভাত প্রস্তুতই ছিল, শুধু স্নান করিলেই হয়। সে বাথরুমে জল ঠিক করিতে বলিয়া, তেলের শিশি ও সাবান বাহির করিয়া লইল। এতদিন পরে তাহার বন্ধুমিলনের দিন আসিয়াছে, আজ কি আর এমনি ঝোড়ো কাকের মত যাওয়া যায়? মাথায় যা কয়লা জমিয়াছে—বোধ হয় ওজন করিলে একপোয়ার বেশী হইবে!

ভালো করিয়া স্নান করা, অথচ অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই বিপরীত ব্যাপারের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বোধ হয় একটু বেশী দেরি হইয়া গেল। শুধু কি স্নান করা, ভালো করিয়া মাথা আঁচড়ানো, ফরসা কাপড়-জামা বাক্স খুলিয়া বাহির করা—হাঙ্গামা কত! ফলে, খাইতে বসিয়া বাসী ভাত কিছুতেই যেন গলা দিয়া নামিল না। মিনিট তিনেক বৃথা চেষ্টা করিয়া একগ্লাস আরও জল খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল।

এইবার ইন্দুর অফিস!

বাড়িফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব। সুতরাং, সে হোটেল হইতে বাহির হইয়া ডালহাউসীর বাসে চাপিয়া বসিল। হোটেলের গাইড্ বলিয়া দিয়াছিল, ডালহাউসী-স্কোয়ারে নামিয়া বার্মাশেলের অফিস জিজ্ঞাসা করিলেই লোকে দেখাইয়া দিবে, লালদীঘির সামনেই।

অফিসে পৌঁছিতে কিছুই কষ্ট হইল না। লিফ্‌ট্ ব্যাপারটির সহিত

পরিচয় না থাকায় একরকম ছুটিয়াই সিঁড়ি কয়টি পার হইয়া ত্রিতলে পৌঁছিল। কিন্তু, প্রবেশপথের মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল যেন মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রাণপণে নিজেকে সামলাইয়া সে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে অফিসে ঢুকিল।

ক্যাশঘরই প্রথম। একটি ছোকরাবাবু কহিলেন—'ইন্দুবাবু?…ঐ যে!' সত্যই-তো! ঐ-তো ইন্দু, ঠিক তেমনিটিই আছে যেন।

সে ভুলিয়া গেল এটা অফিস, কাউণ্টারে ঝুঁকিয়া ডাকিল—'খোকন এই!'

ইন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল। এক মুহূর্ত একটা অপরিচয়ের শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়াই লাফাইয়া উঠিল।

'—যতীন! তুই!'

কিন্তু, ঐ অপরিচয়ের একটি মুহূর্তই যেন যতীনের বুকে কাঁটার মত বিঁধিল। তাহার তো চিনিয়া লইতে একটুও দেরি হয় নাই!

ইন্দু ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া যতীনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'যা বড়-বড় গোঁফ উঠেছে তোর, ঢ্যাঙাও তো কম হোসনি; চিনব কী ক'রে বল্! যা হোক, খুব সময়ে এসে পড়েছিস, আর একটু পরে এলে আর দেখা পেতিস না। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি কিনা!…যাক্—চল্ নেমে যাই।'

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, 'আমায় আগে চিঠি দিস্ নি কেন?…কোথায় উঠেছিস?'

যতীন যেন কিছুতেই কথা কহিতে পারিতেছিল না, অতি সংক্ষেপে শুধু কহিল, 'ক্যালকাটা হোটেলে—'

—'হোটেলে? কেন? আমাদের বাড়ি উঠলি না কেন? তাছাড়া এখানে তো তোর পিসির বাড়ি আছে কোথায়—'

যতীনের একটা হাত ধরিয়া একরকম টানিয়া লইয়াই ইন্দু শিয়ালদার রাস্তা ধরিল। কহিল, আজ বড় অসময়ে এসে পড়লি কিন্তু, একটু আগে জানালে না হয় আজ আর ব্যবস্থা করতুম না, কিন্তু বলা-কওয়া হয়ে গেছে, এখন না গেলে বড় খারাপ দেখায়।'

যতীন প্রশ্ন করিল, 'কোথায়?'

ইন্দু একটু ঢোক গিলিয়া কহিল, 'শ্বশুরবাড়ি।…বৌ পোয়াতি কিনা, ছ'মাস; শরীরটা ভালো নেই, তার ওপর এক হপ্তা যদি না যাই, তাহ'লেই নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ। গত শনিবার যেতে পারি নি, শ্বশুরমশাই কাল ফোন

ক'রে জানালেন যে, বৌ ভয়ানক কান্নাকাটি করছে, একবার যাওয়া দরকার কাজেই, আজ যাবার কথা ব'লে দিলুম।'

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, 'এই গড়ে'য়—যাকে বলে গড়িয়া। বেলেঘাটা স্টেশন থেকে ট্রেনে যেতে হয়। কাছেই···মাইরি, বিয়ে ক'রে যে কী ঝঞ্ঝাটেই পড়েছি, নিজের বাপের বাড়ি তাই যেতে চায় না। যদি রাত ন'টার বেশি দেরি হ'ল কোনোদিন, অমনি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।'

বলিতে বলিতে পত্নী-গর্বে ইন্দুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যতীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একবার চোখ নামাইয়া লইল। যে সব কথা সারা রাত ধরিয়া বুকের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়াছে আজ তাহারা কোথায়? চেষ্টা করিয়া সে কোনোমতে প্রশ্ন করিল, 'তোমার বাড়ির সব ভালো তো?'

ইন্দু জবাব দিল, 'মায়ের শরীর তো জানিসই, ভালো নয়, আর ভালো হবেও না। বউ এসে মায়েরই সুবিধে হয়েছিল, খাটতে পারে খুব! এই বাপের বাড়ি গিয়েই মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে—'

ততক্ষণে তাহারা বৌবাজারের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইন্দু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'একমিনিট দাঁড়া, আমি আসছি।' পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া বৌবাজারের ফুলের দোকান হইতে একটা বেলফুলের মালা কিনিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল।···কৈফিয়তের সুরে কহিল, 'খোঁপায় মালা দেবার শখ হয়েছে, আমায় গতবার থেকে বলছে—'

আরও কিছুদূরে গিয়া, একটা লোক কালোজাম বিক্রয় করিতেছিল, সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইল,—'ওহে, এক কুড়ি কালোজাম দাও তো ভালো দেখে। উঁহু—ওটা নয়, ওটা পচা, এইধার থেকে দাও না—'

পয়সা গনিতে গনিতে কহিল, 'ভারি অরুচি হয়েছে, খালি খাবার মধ্যে কালোজাম, কোষো প্যায়রা আর জিবেগজা—'

যতীন এতক্ষণে গলাটা সাফ করিয়া লইয়া কহিল, 'কবে ফিরবি, শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'—কবে মানে? বিলক্ষণ? কাল এসে অফিস করতে হবে না?···কাল অফিস থেকে বেরিয়ে সটান যাব তোর কাছে, তোকে নিয়ে ঘুরব খানিকটা, তারপর যাব সিনেমা—!'

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কথার স্রোত ঘুরিয়া আবার বৌ-এর কাছে আসিয়া পৌঁছিল

—'বৌ তোকে দেখবার জন্য উৎসুক। তোর গল্প প্রায়ই করি কিনা। তোর চিঠি এলে তাকে পড়ানো চাইই—'

যতীন সহসা উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'আমার চিঠি তাকে দেখাস নাকি ?'

ইন্দু যেন বিজয়-হাস্যে কহিল, 'নইলে কি ছাড়ে ? প্রথমেই পড়বে, আবার শুধু কি তাই, কী জবাব দেব তা পর্যন্ত তার দেখা চাই !'

সেই সব চিঠি! যতীনের বিশ্বাস ছিল, যে সব চিঠি কেবলমাত্র তাহাদের দুইজনের, তাহাতে আর কাহারও কোনো অধিকার নাই—তাহাদের সহিত কাহারও পরিচয় নাই। ঐখানে দুই বন্ধু স্বতন্ত্রভাবে নীড় বাঁধিয়াছে—

পেয়ারা আর জিবেগজা ততক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে। শিয়ালদার মোড় পার হইতে হইতে ইন্দু কহিল, 'কাল বিকেলে আর কোনো এন্‌গেজমেণ্ট রাখিস নি তো ?'

যতীন সংক্ষেপে শুধু কহিল, 'আমি এখানে এসেছি তা কেউ এখনও জানে না, দেখাও করি নি কারুর সঙ্গে।'

—'তাহ'লে দেখাটেখাগুলো বরং বিকেলে আর কাল সকালে সেরে ফেলিস —বিকেলে তোর সঙ্গে শুধু একটু ঘুরব।'

এই পর্যন্ত বলিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'বউ অবিশ্যি ছাড়তে চাইবে না, কান্নাকাটি করবে,—বলে কি জানিস ? সিক্‌-রিপোর্ট কর না একদিন !··· চাকরি যেন অতই সোজা, সে যাই হোক্—কাল আমায় ফিরতেই হবে। থাকিস তুই তাহ'লে, বুঝেছিস্ ?'

স্টেশনের কাছে আসিয়াই ঘড়ি দেখিয়া ইন্দু চমকিয়া উঠিল, 'ইস্—মোটে চারমিনিট সময় আছে যে! দাঁড়া, টিকিট ক'রে আনি। গল্প করতে করতে—'

ছুটিয়া একখানা টিকিট করিয়া আনিয়াই কহিল, 'চললুম তাহ'লে, বুঝলি ?··· এরপর আবার সেই দেড়ঘণ্টা পরে—'

একবার যতীনের বাহুমূলটা টিপিয়া দিয়া ছুটিয়া ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যতীন বহুক্ষণ, বোধ হয় একঘণ্টা, সেই প্লাটফর্মের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর তেমনই নিঃশব্দে, একটি দীর্ঘশ্বাস মাত্র ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল কলিকাতার জনারণ্যের মধ্যে। অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া হোটেলে যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি দশটা বাজে। এগারো বৎসর যে অনেকখানি সময়, এই সত্যটা উপলব্ধি করিতে তাহার এতখানি সময় লাগিল।

# অভিসারিকা

মাসটা ফাল্গুন, দোলের আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম দোল দেখিতে। দোলের ভিড় শুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও অসহ্য হয় নাই। সেই ফাঁকে আমরা ঘুরিয়া বৃন্দাবনটা দেখিয়া লইতেছি।

বঙ্কুবিহারীর মন্দিরে সেদিন একটু বেলা থাকিতেই গিয়া পড়িয়াছি। তখনও দর্শনের বহু বিলম্ব, কিন্তু আমাদের মত আরও কয়েকদল যাত্রী ইতিপূর্বে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে এবং বিস্তৃত মর্মর-চত্বর জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা দুটি বাঙালী যাত্রিনীর দিকে চোখ পড়িয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। একটির বয়স বছর-পঞ্চাশের কাছাকাছি, আর একটির বয়স বছর আঠারো-উনিশের বেশী হইবে না। বিস্ময় এই তরুণীটিকে দেখিয়াই। কোথায় এ-মুখ নিশ্চয়ই দেখিয়াছি, প্রথমেই এই কথা মনে পড়িল। মহিলা দুইজনেরই বিধবার বেশ। অর্ধমলিন বস্ত্র এবং রুক্ষ চুলে একটা নিবিড় বৈরাগ্যের আভাস। কিন্তু, তবুও তরুণীটির দিকে চাহিলে চোখ যেন ফেরানো যায় না, এমনি আশ্চর্য তাহার মুখ!

বহুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া আছি, বোধ হয় সৌজন্যের সীমাও ছাড়াইয়া গিয়া থাকিব; সহসা প্রবীণাটি চোখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং বেশ অনুভব করিলাম তাঁহারও চোখে রীতিমত সংশয়ের দৃষ্টি। যাহাই হউক—একটু পরে তিনিই কথা কহিলেন, 'কে, বাবা রমেশ? চিনতে পার?'

সত্যই তো।

আরে, এ যে চন্দ্রদার বৌ ললিতা আর তাহার মা। তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিলাম, 'মাঐমা আপনি এখানে কতদিন? এ কী চেহারা হয়েছে আপনাদের?'

ললিতার মা অতিশয় ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'আর বাবা চেহারা! এখন বঙ্কুবিহারী পায়ে ঠাঁই দিলেই বাঁচি!'

আরও কী হয়তো তিনি বলিলেন, কিংবা বলেন নাই, কিন্তু আমার সেদিকে আর কান ছিল না, আমি শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে ললিতাকে দেখিতেছিলাম। এই কি সেই ললিতা?

চন্দ্রদা যেদিন বিবাহ করিয়া ফিরিলেন, সেদিনের কথাটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। চন্দ্রদাই আমাদের গ্রামে প্রথম এম-এ পাস করেন, রূপবান, চরিত্রবান ও উচ্চশিক্ষিত ছেলে বলিয়া, বলা বাহুল্য, বিবাহের উপযুক্ত কুমারী কন্যার পিতারা বাড়ির মাটি রাখেন নাই। ছেলের তিনকুলে কেহই না, অবস্থাও সচ্ছল নয়, কিন্তু তবুও এটুকু আজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, পাত্র হিসাবে তাঁহার তুলনা ছিল না। প্রথম প্রথম চন্দ্রদা বিবাহে সম্মতি নাই। শেষকালে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, 'তুই যদি মেয়ে পছন্দ করিস তো আমি রাজি আছি—'

আমি তাঁহার সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিয়াছিলাম। বহু ধনীর কন্যা অগ্রাহ্য করিয়া দরিদ্রা বিধবার একমাত্র কন্যা ললিতাকে পছন্দ করিলাম এবং চন্দ্রদাও একটি পয়সা না লইয়া ললিতাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন।

ললিতা যথার্থই সুন্দরী ছিল, দুর্গা-প্রতিমার মত রঙ, মেঘের মত একমাথা কালো চুল এবং হরিণের মতই চঞ্চল ও আয়ত তাহার চোখ। সে চোখের দিকে দৃষ্টি পড়িলে সহজে চোখ ফেরানো যাইত না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাহার ঠোঁট-দুটি; তাহার পরিপূর্ণ রক্তিম সরস ওষ্ঠাধরের দিকে চাহিলে বোধ করি বৃদ্ধেরও বুক দুলিয়া উঠিত, শিশুরও মনে চাঞ্চল্য আসিত। মনে আছে প্রথম দিন সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল ললিতাকে দেখিবার জন্যে। এমন কি বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ও মিনিট-পাঁচেক একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন।

আমিই বিবাহের ঘটক বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, ললিতা দিনই আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল। লোকজনের ফাঁকে ঘোমটা সরাইয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'একটু ঠাণ্ডা জল দেবেন আমাকে?'

আমি জবাব দিয়াছিলাম, 'দেবেন' বললে দেব না। আমি না আপনার দেওর?'

অন্য মেয়ে হইলে হয়তো অন্য কিছু বলিত। কিন্তু, ললিতা ছিল অত্যন্ত চতুর এবং সপ্রতিভ। সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিয়াছিল, 'একটু জল দাও না ঠাকুরপো!'

সেইদিন হইতেই ললিতার সঙ্গে বেশ একটু আলাপ জমিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রদার সহিত দু'-তিনবার তাঁহার শ্বশুরবাড়িতেও গিয়াছিলাম। কিন্তু, সহসা দেখা দিল চরম দুঃসময়, ললিতার সর্বনাশ!

গান্ধীজীর দাণ্ডী অভিযান শুরু হইল। দলে দলে যুবকরা ঝাঁপাইয়া পড়িল সেই আন্দোলনে, চন্দ্রদাও বাদ গেলেন না। কী একটা কারণে তাঁহাকে

ধরা হইল এবং বৎসর-খানেকের জন্য কারাবাসে পাঠানো হইল। চন্দ্রদা তাঁহার পিসিমা ও ললিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার হাতেই দিয়া গেলেন, বলিলেন, 'ক'টা দিন আর ; দেখতে দেখতে কেটে যাবে—'

সে ক'টা দিনও তাঁহার কাটিল না। একটা অসুখের কানাঘুষা শুনিতে পাইলাম। বহু চেষ্টা করিয়াও ভালোরকম সংবাদ পাওয়া গেল না। অবশেষে যখন সংবাদ পাওয়া গেল, তখন জানা গেল যে, সেই সংবাদই তাঁহার জীবনে শেষ! রাজযক্ষ্মা রোগে জেলের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—

উঃ, সেদিনের কথাটা কোনোদিন ভুলিতে পারিব না। পিসিমা 'বাবারে' বলিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িলেন, কিন্তু ললিতার চোখে জল আসিল না। তখন তাহার মাত্র সতেরো বছর বয়স, পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছলতা সর্বদেহে, দৃষ্টিতে তাহার বিদ্যুৎ; সে স্থির অপলক নেত্রে সেই দৃষ্টি মেলিয়া একদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, এমন কি যখন আমরাই পুকুর-ঘাটে লইয়া গিয়া তাহার হাত হইতে লৌহবলয় খুলিয়া সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া দিলাম তখনও সে একটি কথা কহিল না। স্থির বজ্রের মত তাহার সাংঘাতিক স্তব্ধতায় আমরা সকলে ভীত হইয়া পড়িলাম, যাহাতে চোখে জল আসে সেজন্য দুই-একটি সান্ত্বনার কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। সে তেমনই স্থির হইয়া রহিল।

তাহার পর পিসিমা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন সে তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। বৎসর খানেক পরে তাঁহারও শ্রাদ্ধ নিজ হাতে শেষ করিয়া বাড়িটুকু বিক্রি করিয়া সে নিজের মায়ের কাছে চলিয়া গেল। এই এক বৎসর কাল আমারও যাওয়া-আসা ছিল, কিন্তু বারোটি মাসের মধ্যে বোধ হয় বারোটি কথাও সে আমার সহিত বলে নাই। চিরকালের মত তাহার কণ্ঠ যেন নীরব হইয়া গিয়াছিল। তাহার চটুল যৌবন এক নিমেষের মধ্যে যেন কালের শাসনে পাষাণে পরিণত হইয়া গেল!

সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহাদের আর খবর পাই নাই। বহুদিন আগে যেদিন ললিতাকে গরুর গাড়িতে তুলিয়া দিই তাহার পর আবার এই প্রথম সাক্ষাৎ! কিন্তু, আর তাহাকে চেনা যায় না। তাহার সে রূপের আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই, চোখের সে দাহন বোধ করি একেবারেই নিভিয়া গিয়াছে; বুঝিতেই পারা যায় না যে, এই বিধবা মেয়েটিকে দেখিয়া একদিন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল!

অনেকক্ষণ পরে সংবিৎ পাইতে শুনিলাম ললিতার মা বলিতেছেন, 'যেও না বাবা একদিন আমাদের ওখানে; গোপীনাথের ঘেরায় কুসুম গোসাঁই-এর কুঞ্জ, জিগ্যেস করলেই ব'লে দেবে। তোমরা কোথায় আছ?'

ঠিকানাটি বলিলাম। তাহার পর প্রশ্ন করিলাম, 'কতদিন আছেন এখানে?'

একটু যেন বিস্মিত হইয়াই ললিতার মা জবাব দিলেন, 'বললুম তো এই দু' বছর হ'ল সেখানকার যা কিছু ছিল সব বিক্রি ক'রে আর ললিতার যৎসামান্য যা ছিল সব জড়িয়ে মোট দুটি হাজার টাকা আমাদের ওখানকার জমিদারের হাতে দিয়ে এসেছি। তিনিই মাসে পনেরোটি ক'রে টাকা পাঠান—কোনো রকমে গোবিন্দর কৃপায় চ'লে যায়—'

এই সময় সহসা বঙ্কুবিহারীর দর্শন খুলিল। যাত্রীরা সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আমরাও উঠিয়া দর্শনের আশায় ভিড়ের মধ্যে ঢুকিলাম। শুধু লক্ষ্য করিলাম, যে ললিতা এতক্ষণ অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে একেবারে পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া একটি কথা পর্যন্ত বলে নাই, সেই ললিতাই সহসা যেন প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল, সকলের আগে সে-ই অগ্রসর হইল দর্শনের জন্য। যেন কোন রামচন্দ্রের স্পর্শে অহল্যা পাষাণ হইতে প্রাণ পাইল।

ইহার পর তিন-চার দিন আর সময় পাই নাই। হঠাৎ একদিন অবসর মিলিল। সেদিন বাড়িতে কেহই ছিল না, সকলে গিয়াছিল রাধাকুঞ্জে, আমিই কেবল যাই নাই। ললিতার কথা মনে হইতেই ভাবিলাম যে, একবার দেখা করিয়া আসা উচিত, কারণ দোল চুকিয়া গেলেই বাড়ি ফিরিবার তাড়া পড়িবে, আর হয়তো অবসরই পাইব না। সুতরাং, জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে কানাইয়ের দোকান হইতে কিছু পেঁড়া ও রাবড়ি কিনিয়া লইলাম। পনেরো টাকায় যাহাদের সারা মাস চালাইতে হয়—তাহাদের আহার্যের কথাটা কল্পনাই করিতে পারি।

কুসুম গোসাঁই-এর কুঞ্জ খুঁজিয়া পাইতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। বাড়ির দোরে পা দিবার পূর্বেই এক অভাবনীয় দৃশ্যে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ললিতা একা বাড়ি হইতে বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহার সে বিধবার সাজ আর নাই, সে রীতিমত প্রসাধন করিয়াছে। চওড়া লালপেড়ে দেশী শাড়ি পরিয়াছে, জরির কাজ-করা ব্লাউজ, হাতে দুইগাছি বহুদিনকার সোনার চুড়ি চিক্-চিক্

করিতেছে, মাথায় যত্ন করিয়া খোঁপা বাঁধা ; এমন কি মুখে পাউডারের চিহ্ন পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে !

ললিতা কিন্তু আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। কহিল, 'ঠাকুরপো, দেবে ভাই একটু এগিয়ে, ভয়ে মরছিলুম একা কী ক'রে যাব—'

কোনোমতে একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম, 'কোথায় যাব ?'

সে বেশ সহজ স্বরেই জবাব দিল, 'গোবিন্দ-মন্দিরে।'

তাহার পর গলার স্বর নামাইয়া কহিল, 'ধরা কি দেয় সহজে, দিতে চায় না। দুটিরাত কেঁদেছি, আর জানিয়েছি যে, এমন বসন্তকাল, গাছে গাছে ফুল ফুটে উঠল, আকাশে চাঁদের আলো ধরে না, দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে, এমন সময় তোমাকে নইলে বাঁচব কী ক'রে ? শুধু তোমাকে দেখে তো প্রাণের আশা মেটে না, আমি চাই তোমার আলিঙ্গন, ঠিক তেমনি ক'রে বুকে তুমি চেপে ধরবে, যেমন সে ধরত—'

দুটি ফোঁটা জল তাহার ডাগর আঁখি ছাপাইয়া গড়াইয়া পড়িল। আঁচলের প্রান্তে সে চোখ মুছিয়া কহিল, 'শেষকালে কাল রাত্রে তাঁর দয়া হ'ল, ভোরবেলা স্বপ্নে বললেন, আজ এসো সন্ধ্যাবেলা, আবার আমি বনে বনে তোমায় নিয়ে কেলি করব, আবার বৃন্দাবন সত্য হয়ে উঠবে। তাইতো চলেছি, ঠাকুরপো, সত্যি ক'রে বলবে ভাই, কেমন সেজেছি ? পারব কি তার মন ভোলাতে ?'

এ যে মাথাখারাপ !

সমস্ত জিনিসটা চোখের সামনে পরিষ্কার হইয়া গেল। উন্মাদ অবস্থায় বেশভূষা করিয়া চলিয়াছে গোবিন্দ-মন্দিরে কিংবা আর কোথায় কে জানে !

মনে মনে বুঝিলাম ইহাকে ধরিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু, কী উপায়ে ?

প্রশ্ন করিলাম, 'মা কোথায় বৌদি, আঁবুইমা !'

ছেলেবেলাকার মত মাথা দোলাইয়া জবাব দিল, 'মা নেই।—কথা শুনতে গেছে, বল না ভাই ঠাকুরপো, কেমন দেখাচ্ছে ?'

তাহার আগেকার রূপ আর নাই সত্য, যৌবনও বহুদিনের অযথা কৃচ্ছ্রসাধনে ক্লিষ্ট, তবুও আজ তাহাকে চেনা যায়, আজ বহুদিন পরে সেই বিদ্যুতের স্ফুরণ আবার তাহার চোখে দেখা যাইতেছে, আজও তাহার দিকে চাহিলে চোখ ফেরানো কঠিন ! কহিলাম, 'বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে—'

সে কহিল, 'এসো তাহ'লে আমায় এগিয়ে দেবে, সন্ধ্যার তো আর বেশী দেরি নেই, শেষকালে হয়তো দেরি দেখলে অভিমান করবে !'

আমি বিপন্ন হইয়া কহিলাম, 'এ দুটো রেখে আসি ভেতরে, একটু দাঁড়ান। তারপর নিয়ে যাচ্ছি।'

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সমস্ত বাড়িটাই খালি, প্রায় সব ঘরেই একটি করিয়া তালা লাগানো। বুঝিলাম, সকলেই কথা শুনিতে গিয়াছে। তবু একবার জোরে ডাকিলাম, 'আঁবুইমা!' কিন্তু, কোনো জবাব না পাইয়া একটা ঘরের সামনে মিষ্টান্নগুলি নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি বৌদি নাই! এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও তাহার চিহ্ন-মাত্র নাই।

চিৎকার করিয়া ডাকিলাম, 'বৌদি, ললিতা—'

তাহার সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু ইতিমধ্যে ছুটিতে ছুটিতে আঁবুইমা আসিয়া পড়িলেন।

'কী হয়েছে বাবা রমেশ?'

সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'বৌদির মাথায় কি কোনো—'

তিনি ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন, 'আজ এই ক'বছরই তো চলেছে বাবা, সেই যে বিধবা হবার পর গুম্‌রে গুম্‌রে থাকত, তাই থেকেই এ রোগের সূত্রপাত হ'ল। এমনি বেশ থাকে, কিছু বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে হঠাৎ আবার দেখা দেয়। বিশেষ ক'রে এই দোল-পূর্ণিমাটায় কিছুতেই ভালো থাকে না, ঐদিনেই ওর ফুলশয্যা হয়েছিল যে বাবা রমেশ!'

চোখের জল মুছিয়া পুনশ্চ তিনি কহিলেন, 'মা হয়ে সন্তানের মৃত্যু-কামনা কোনো অবস্থাতেই নাকি করতে পারে না; আমি কিন্তু অহরহ গোবিন্দকে জানাচ্ছি যে, ওকে তিনি নিন্। কার কাছে এ অবস্থায় রেখে যাব বাবা, কে দেখবে? ওকে রেখে গেলে মরেও শান্তি পাব না যে!'

তিনি গোবিন্দ-মন্দিরের পথ ধরিলেন, কহিলেন, 'যাই বাবা, দেখিগে কোথায় গেল—'

বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে বসিলাম। কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। এইমাত্র যে শোকাবহ পরিণাম চোখে দেখিয়া আসিলাম, তাহারই চিন্তা যেন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কতক্ষণ এই অবস্থায় বসিয়াছিলাম তাহাও মনে নাই, চমক ভাঙিল বাহিরের দরজা খোলার শব্দে। কে আসিল উঠিয়া দেখিতে যাইব এমন সময় ঘরের দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল ললিতা। তাহার পরনে তখনও সেই বেশভূষা, শুধু কাপড়-চোপড় কিছু আলু-থালু, মাথার কবরীও যেন শিথিল।

চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, 'একি বৌদি!'

সে কহিল, 'তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি ঠাকুরপো, তুমি আমাকে বাঁচাও—! আমাকে সকলে মিলে এমন ক'রে ঠকাচ্ছে, আমি বাঁচব কী ক'রে? ...তোমার দাদা যাবার দিন ব'লে গেলেন, ক'টা দিন—যাব আর আসব, কিন্তু আর এলেন না। সকলে বললে গোবিন্দকে ভালোবাসতে চেষ্টা কর, মনে শান্তি আসবে। গোবিন্দকে তো ভালোবাসলুম ভাই, যে ভালোবাসা তোমার দাদাকে কোনোদিন দিইনি—সেই ভালোবাসা তাঁকে দিলুম, তিনিও আজ ঠকালেন। খুঁজলুম, কত কাঁদলুম—পাষাণ-দেবতা একচুল নড়লেন না; আমি তাহ'লে কার কাছে যাই বল তো?'

আমি ব্যাকুল হইয়া কী একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু সে তাহার অবসর দিল না, সহসা ছুটিয়া আসিয়া আমার কোলে বসিয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল, 'আমি জানি তুমিও একদিন আমাকে ভালোবাসতে—এখনও কি চেষ্টা করলে পার না? চোখ নামিও না, তাকিয়ে দেখ, এখনও আমার রূপ আছে, এখনও যৌবনও যায় নি।'

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম, 'বৌদি, বৌদি, একি করছেন? এ কী বলছেন?'

সে কহিল, 'তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাব? আমার দিন কী ক'রে কাটছে তার খবর রাখছ? কেন তোমরা আমাকে এমন ক'রে সকলে ঠকাচ্ছ, কী অপরাধ করেছি আমি? আমি যে আর থাকতে পারছি না, কাকে ভালোবাসব আমি, কে আমার সে ভালোবাসার মান রাখবে?'

ক্রমশ কথা যেন তাহার শিথিল হইয়া আসিল। একটু পরে অজ্ঞান হইয়া আমারই বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল। তাহাকে কোনোমতে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া দুটি চোখ জলে ভরিয়া আসিল, মনে মনে ভগবানকে কহিলাম, ভগবান এ কী তোমার শাস্তি! যাহার সব গিয়াছে, তাহাকে এই চাঁদের আলোর মধ্যে, এই হাসি-গান-ফুলের গন্ধের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ কেন? এ পৃথিবীর সব ভোগ হইতেই যদি সে বঞ্চিত হইল তো এখনও এ পৃথিবীর রূপের ভাণ্ডার তাহার চোখের সামনে খোলা কেন?

খানিকটা অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। বর্তমানের এই বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া বহুদিন আগেকার এমনিই এক বসন্ত-রজনীর কথা মনে পড়িল,

যেদিন জগতের সমস্ত সুখ তাহার সামনে পরিপূর্ণ পাত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিলেন আঁবুইমা; তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে, কহিলেন, 'বাবা রমেশ, তাকে দেখেছ কি?'

নীরবে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলাম। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'যাক্—আর ভয় নেই; যখনই হয়—খানিকটা পরে অজ্ঞান হয়ে পড়লেই ভালো হয়ে যায়!'

দুইজনে মিলিয়া মাথায় জলের ছাট্ দিয়া বাতাস করিতে করিতে একটু পরেই সে চোখ মেলিল। উঠিয়া বসিয়া খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিল, তারপর নিজের বেশ-ভূষার দিকে চাহিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল।

আঁবুইমা কহিলেন, 'চল মা, বাড়ি যাই!'

সে নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মায়ের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। দৃষ্টিতে সেই নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ভাব—মুখে সুকঠিন বৈরাগ্য! একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল না পর্যন্ত!

## মহাকালের নিশ্বাস

পারুলের সহিত হরিপদর পরিচয় পথে পথে। একই রাস্তা হইতে আসে তাহারা, একই পথে ফিরিতে হয়। পারুল আসে যাদবপুর হইতে, আর হরিপদ থাকে—গড়িয়াহাট রোড্ যেখানে যাদবপুরের দিকে মোড ফিরিয়াছে—সেইখানে, তাহার দাদার দোকানে। দোকান সামান্যই, একই চালার নিচে দুই তিনটি ছোট ছোট চা-পান-বিড়ি-বিস্কুট-কলা-মুড়কির দোকান—তাহারই একটির মালিক হরিপদর দাদা কার্তিক। এইটুকু দোকান হইতে দুইটি প্রাণীর সব খরচ চালানো এমনিতেই দুষ্কর, তাহার উপর পঁয়ত্রিশ টাকা মণে চাল কেনা যায় না—সুতরাং, যত কাজই থাক, হরিপদকে প্রত্যহ বালিগঞ্জে কণ্ট্রোলের দোকানে গিয়া দাঁড়াইতে হয় ভোর হইতে। ফেরে কোনোদিন দশটায়, কোনোদিন বা বেলা বারোটা-একটায়।

এই ফিরিবার পথেই একদিন পারুল যাচিয়া হরিপদর সহিত আলাপ

করিল। সেদিনও বেলা একটু বেশী হইয়াছে, গড়িয়াহাট রোডের উত্তপ্ত পিচগলা পথ জনহীন, ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে সেই দিনের আলোতেই। হরিপদ একটু হন্‌হন্ করিয়াই হাঁটিতেছিল, দাদা জানে যে, চাল পাওয়া তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তবু গজ্-গজ্ করিবেই সে। তাছাড়া, কাজও অনেক জমিয়া থাকে, সেগুলি তাহাকেই করিতে হইবে তো, সুতরাং চাল পাওয়া মাত্র সে জোরে পা হাঁকাইতে শুরু করিয়াছে, যত তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়।

পারুল পথের ধারে একটা গাছতলায় বসিয়াছিল, হরিপদকে ডাকিয়া কহিল, 'একটু দাঁড়াও না, আমি তোমার সঙ্গে যাব—'

বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া হরিপদ ফিরিয়া দেখিল, বছর তেরো-চোদ্দ কি পনেরোর একটি রোগা মেয়ে, বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ঈষৎ রুক্ষ সুরেই জবাব দিল, 'আমার সাথে যেয়ে আর তোমার কি চারটে হাত বেরোবে? পথ তো খোলাই রয়েছে!'

পারুলও রীতিমত ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, 'আহা কি কথার ছিরি গো! পথ যে খোলা রয়েছে তা যেন আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।… ঐ দোতলা বাড়িতে যে পাঞ্জাবী সিপাইগুলো থাকে, আমাকে দেখতে পেলে বড্ড ঠাট্টা-তামাসা করে, কেমন ক'রে তাকায় যেন। আমার বড্ড ভয় করে একলা যেতে।'

অগত্যা হরিপদকে গতি একটু কমাইতে হইল, নহিলে পারুল তাহার সহিত চলিতে পারে না। চলিতে চলিতেই সে কহিল, 'কত তো মেয়েলোক আসে, তাদের সঙ্গে যেতে পার নি!'

'তাই তো আসি, আজ যে সব্বাই আগে চাল নিয়ে চ'লে গেছে, আমি প'ড়ে গেছি সকলের শেষে—'

এই হইল আলাপের সূত্রপাত। সে আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হইল তিনচার দিন পরে। সে-ও এমনি ফিরিবার পথে, দুপুরবেলাতেই। হরিপদ চাল লইয়া একাই ফিরিতেছিল, সহসা—পথটা যেখানে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া একটা গোল দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহারাই কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, একটা গাছতলায় হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া পারুল একদৃষ্টে কী দেখিতেছে। সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া দূর হইতে প্রশ্ন করিল, 'কী দেখছ গা খুকী?'

তাহার কণ্ঠস্বরে পারুল সোজা হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই হরিপদ দেখিল তাহার দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার এ কান্নার কারণও জানা গেল আর একটু কাছে আসিতেই। একটি কঙ্কালাবশিষ্ট স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই একটি বৎসর-খানেকের শিশু তখনও তাহার স্তন্যপান করিতেছে, আর একটি বছর আড়াইয়ের মেয়ে দূরে বসিয়া আপন মনে খেলা করিতেছে।

হরিপদ যেন হতাশ হইল, কহিল, 'এই!...আমি বলি আরও কী! মেয়ে-লোকটা না খেয়ে মরে গেছে। এখন অমন হামেশাই হচ্ছে।'

পারুলের সে দিকে কান ছিল না। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'এদের কী হবে?'

বেশ নিশ্চিন্ত স্বরেই হরিপদ জবাব দিল, 'কী আর হবে! ওরাই কি বাঁচবে নাকি?...আজ, নয় কাল।'

'ওদের, ওদের কেউ নিয়ে যাবে না?—'

'কে নিয়ে যাবে! নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না, আবার ঐ পাপ কে জড়াবে? ...তুমিই নিয়ে যাও না খুকী—মানুষ করবে।'

বোধ করি এই প্রশ্নটাই বহুক্ষণ যাবৎ পারুলকে পীড়া দিতেছিল, সে বিদ্রূপটা বুঝিতেও পারিল না। বেশ সহজ ভাবেই জবাব দিল, 'আমিও তাই ভাবছিলুম। কিন্তু, বাবা বড্ড রাগারাগি করবে। মোটে তেইশ টাকা মাইনে পায়—একবেলা খেয়ে থাকি আমরা। মা তো কিছু করতে পারে না!...না, সে বাবা রাখতেও দেবে না—'

হরিপদ কহিল, 'তবে আর দয়াতে কাজ নেই, চ'লে এস।'

প্রায় শিহরিয়া উঠিয়া পারুল কহিল, 'ওরা অমনি প'ড়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ তা থাকবে বৈকি!...কে আর নেবে?'

আরও একটু ইতস্তত করিয়া পারুল কহিল, 'তুমি নিয়ে যেতে পার না?'

'হ্যাঁ—তাই না! তাহ'লে আমার দাদা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে!...এস, এস, তুমি চ'লে এস, আমাদেরই কবে ঐ দশা হয় তার নেই ঠিক—আমরা আবার দয়া করব—'

অগত্যা ফিরিতে হইল। কিন্তু, পারুলের কান্না থামিল না, সে সমস্ত পথটাই চোখ মুছিতে মুছিতে এবং ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিল। হরিপদর সহিত আর কথা কহিল না, কিংবা অন্য কোনো বৃথা বিলাপও করিল না, শুধু তাহার কান্না দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, তাহার বুকটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—

পরের দিন রাত থাকিতেই, হরিপদ সবে উঠিয়া কণ্ট্রোলের দোকানে যাইবে বলিয়া তৈয়ারি হইতেছে, তাহাদের দোকান-ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, পারুল।

'আরে, তুমি ডাকছ? আমি বলি এত ভোরে কে ঘা দেয় দোরে—'

'আজকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে কিনা, সব্বাই চ'লে গেছে আগেই—। একা আমার সেখান দিয়ে যেতে ভয় করবে, তাই—'

'বেশ তো, চল—'

হরিপদ কাঁধে গামছাটা ফেলিয়া দাদার পিছন হইতে গোটা দুই বিড়ি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এইবার তাহাদের আলাপ দ্রুত জমিয়া উঠিল। পারুলদের যাদবপুরে বহুকালের বাস, খাজনার জমিতে নিজেদের ঘরও আছে। আগে তাহার বাবা কোন্ কারখানায় কাজ করিত, সেখানে বেশী মাহিনা ছিল, তাছাড়া তাহার মা-ও অবসর সময়ে ঠোঙা তৈয়ারি করিয়া, দু'পয়সা রোজগার করিত—অবস্থা ছিল সচ্ছলই। সহসা আগের কারখানাটি উঠিয়া গেল, বাবারও উপার্জন কমিল, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, মা পড়িল শয্যাশায়ী হইয়া; তাহার উপর এই দিনকাল—বাবার সামান্য উপার্জনে কিছুতেই চলে না। ষোলসের চাল আর তেইশটি টাকা বেতন এই মাত্র ভরসা। সে, তাহার তিনটি ভাইবোন এবং বাবা-মা, একবেলাও তাহাতে চলে না। ছোট ভাইবোনগুলি অনাহারে এমন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, আর চেনা যায় না। বাবা তো সকালে না খাইয়াই অফিসে চলিয়া যায়। পারুল অত বেলায় গিয়া রান্না করে, ভাইবোনদের খাওয়ায়,আর বাবার ভাত জল দিয়া রাখে। সন্ধ্যা হইতেই ছোট ভাইবোনদের ঘুম পাড়াইতে হয়, নয়তো তাহারা বাবার ভাত খাইবার সময় এমন বায়না করে! একেবারে ছোট যেটি, সেটিকে রাত্রে তুলিয়া আমানি খাওয়ানো হয়—ইত্যাদি!

হরিপদরও ইতিহাস বিশেষ সুবিধার নয়। দেশ তাহার মেদিনীপুর জেলায়, জমি-জমা বলিতে গেলে কিছুই নাই, জন-খাটিয়া খাইত। দেশ ছাড়িয়া ইতিপূর্বে কখনও বাহির হয় নাই। দাদা যখন দোকান দিতে এখানে আসে তখন সে বিদ্রূপই করিয়াছিল। কিন্তু, এবারের ঝড়ে যখন বাড়ি-ঘর সব ভূমিসাৎ হইল তখন আর দেশে থাকা চলিল না। খাইবে কী, মজুরি দিবে কে? বৌ আর একটি মেয়ে মাত্র তাহার সংসারে—কিন্তু, তবুও খরচা তো কম নয়। অগত্যা তাহাদের লইয়া পদব্রজেই একদা দেশ ছাড়িতে হইয়াছিল। করঙ্গলিতে তাহার

শ্বশুরের কাছে তাহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া সে দাদার কাছে চলিয়া আসে কাজকর্মের চেষ্টায়। দাদার অবস্থাও বিশেষ সচ্ছল নয়, সুতরাং সে ভাইকে দেখিয়া খুশী হয় নাই। দাদার সংসার নাই সত্য কথা, বহুদিন আগে সে সব বালাই তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে, তবু তাহার সামান্য কিছু নেশাভাঙ্ আছে—সেই সব খরচই চলে না এই সামান্য দোকান হইতে। নিতান্ত ভাই বলিয়া ঠেলিতে পারে নাই, আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু, ভূতের মত খাটাইয়া লয়। এখানে আসিয়া পর্যন্ত হরিপদর এমন অবসরই হইল না যে, কাজের চেষ্টা করে। সারাদিন দোকানে খাটিতে হয়, আর সকালটা তো কাটে এই একসের চালের জন্য।

পারুলের দৃষ্টি সমবেদনায় ছল্‌ছল্ করিয়া উঠে 'আহা, কতদিন তোমার মেয়েকে দেখ নি, না? মন কেমন করে খুব?…কতবড় হবে সে এখন?'

'তা হবে' হরিপদ জবাব দেয় শেষ কথাটারই, 'ছ'সাত বছরের কম নয়।'

'আর ছেলেপুলে হয় নি?'

'হয়েছিল দুটো'—হরিপদ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'দুটোই বেটাছেলে। মোদ্দা বাঁচাতে পারলুম না। একটা আঁতুড়েই গেল, আর একটা এক বছরের হয়ে।'

ততক্ষণে তাহারা লাইনের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষের লাইন, একধারে পুরুষ আর একধারে স্ত্রীলোক। মেয়েছেলেই বেশী—ছেলেমেয়ে লইয়া রাস্তায়, ফুটপাথে সব সারি সারি বসিয়াছে, ছেঁড়া ময়লা ফালি জড়ানো, প্রায় উলঙ্গ প্রেতমূর্তির মত বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছে। পুরুষদের লাইনে বৃদ্ধ আর শিশুর দলই বেশী, তাহাদেরও ঐ অবস্থা। যোয়ান যাহারা তাহারাও অনশনে আর অর্ধাশনে শীর্ণ, কুব্জ হইয়া গিয়াছে—বৃদ্ধের সহিত বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেদিকে চাহিলে সবটা জড়াইয়া যেন মনে হয় সমগ্র বাংলাদেশের আত্মা নগ্ন-বীভৎস মূর্তিতে লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া শুধু বলিতেছে, 'ম্যয় ভুখা হুঁ!'…

পারুল তাড়াতাড়ি একবার লাইন দুইটির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, 'তোমাদের লাইন এখনও ছোট আছে। যদি আগে হয়ে যায় তো দাঁড়িও একটু, ঐখানটায়।'

তাহার পর ছুটিয়া গিয়া নিজেদের লাইনে বসিয়া পড়ে।

সত্যই সেদিন হরিপদ আগে চাল পাইয়া যায়। পারুলদের লাইন ছিল

মস্ত বড়, পারুল পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই চাল গেল ফুরাইয়া। বেলাও হইল অত, চালও মিলিল না। পারুল শুষ্ক মুখে নিঃশব্দে হরিপদর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'চাল পেলে না মোটে? তবে কী হবে?'

'বাবার অফিসের দরুন ছুটি এখনও প'ড়ে আছে, কিন্তু কাল তাহ'লে আর একদানাও থাকবে না। কাল আরও রাত থাকতে আসতে হবে।'

হরিপদ একটুখানি ইতস্তত করিয়া কহিল, 'ভারী রাতে আসতে ভয় করবে না? বাড়ি জানা থাকলে আমিই না হয় ডেকে নিতুম—'

পারুল আশ্বাসের সুরে কহিল, 'তার দরকার হবে না। আগে যদি উঠতে পারি, পাড়ার কাউকে ডেকে নেব। সবাই তো আগে আসতে চায়—'

দু'জনে নীরবে পথ চলিতে লাগিল। ভিড়টা ছাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে পড়িয়া পারুল কহিল, 'বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে, টিউব-কলটা চালাবে একটু, জল খেয়ে নেব?'

হরিপদ একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল। ক্রমাগত অনাহারে মুখ এতই শুকাইয়া গিয়াছে যে, নূতন করিয়া কোনো শুষ্কতা চোখে পড়ে না। সে কহিল, 'একেবারে খালি পেটেই জলটা খাবে—?'

পারুল হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'তুমি তো আচ্ছা মজার লোক! আমি যেন তোমার কুটুম্ব। শুধু-পেটে জল খাব না তো কোথায় কী পাব?'

হরিপদ কহিল, 'একটা ডবল-পয়সা আছে আমার কাছে, বাতাসা কিনে নেব?'

'না না, বাতাসা চাইনে। তুমি এমনি জল চালাও, আমার আর আগেকার মত যখন-তখন ক্ষিদেও পায় না।'

হরিপদ টিউব-ওয়েল পাম্প করিতে লাগিল, পারুল আকণ্ঠ জল পান করিয়া 'আঃ' বলিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'শরীরটা ঠাণ্ডা হ'ল! এইবার চল। তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে হবে। বেলা হ'ল ঢের।'

কিন্তু, তাড়াতাড়ি তবু হয় না। কে একটা কঙ্কালসার শিশুকে গাছতলায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—বয়স কত চেহারা দেখিয়া অনুমান করা শক্ত, তবে এক বৎসরের বেশী নয় কিছুতেই।

পারুল আগেকার মত ছুটিয়া কাছে গেল না, তবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, অসহায় আর্তদৃষ্টি মেলিয়া হরিপদের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'এখনও বেঁচে আছে যে!'

হরিপদ শুধু কহিল, 'হ্যাঁ তাইতো আছে দেখছি।'

'তবে? ওর মা ফেলে রেখে চ'লে গেছে?—কাছেই কোথাও গেছে, না? ফিরে আসবে বোধ হয় এখনই, কী বল?'

তাহাকে আঘাত দিবার ইচ্ছা হরিপদর ছিল না, তবু কথাগুলি নিজের অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া যায়, 'ফিরেই যে আসবে তার ঠিক কী, হয়তো ফেলে দিয়েই গেছে। চোখের সামনে ছেলে মরার চেয়ে ফেলে দিয়ে যাওয়া ভালো—যা হয় চোখের আড়ালে হোক।'

শিহরিয়া উঠিয়া পারুল কহিল, 'তাই ব'লে জেনেশুনে, নিজের পেটের ছেলে—জ্যান্ত অবস্থায়?'

'জ্যান্ত কি আর থাকবে! ও আর কতক্ষণ। এমনি না মরে, শ্যাল-কুকুরে খাবে।'

ছেলেটার কান্না মানুষের আওয়াজে আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু, সে কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ যে মনে হয় পাখির বাচ্চা কাঁদিতেছে। পারুল দুই-পা গিয়াও আবার ফিরিয়া আসিল। হরিপদকে কহিল, 'আমার কাছে চালের পয়সা আছে, তা' থেকে দু'পয়সা যদি দিই, একটু দুধ এনে খাওয়াতে পার?'

হরিপদ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, কহিল, 'লাভ কী তাতে? ছেলেটাকে তো আর তুমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারছ না, বারোমাস পুষতেও পারবে না। খামকা দুটো পয়সাই তোমার যাবে। দু'ঘণ্টা আগে মরত, না হয় দু'ঘণ্টা পরে মরবে, এই তো!'

'তা বটে।' পারুল দাঁতে দাঁত চাপিয়া চলিতে শুরু করিল। ছেলেটার চিঁ-চিঁ কান্না যেন বহুদূর পর্যন্ত তাহার পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া চলিল।

দুপুরবেলা পথের ধারে ধারে হাঁড়ি চড়িয়াছে। রাশি-রাশি বুনো কচুর শাক কেহ সিদ্ধ করিতে চাপাইয়াছে, কেহ হাঁড়িতে জল চাপাইয়া ভাঙ্গা বঁটির সাহায্যে খোসা ছাড়াইতেছে। অন্য কোনো খাদ্য নাই। কিন্তু, তাহারই জন্য লুব্ধ বুভুক্ষুর দল দূরে অপেক্ষা করিতেছে—তাহাদের কোটরগত চক্ষু হইতে স্তিমিত অথচ একাগ্রদৃষ্টি স্থির হইয়া আছে সেই কচু-সিদ্ধগুলির দিকে।

চলিতে চলিতে পারুল কহিল, 'মাঠে আমাদের কচু-শাক সাবাড় হয়ে গেল এদের জন্যে। বাবা তো বকাবকি করে দেখতে পেলে, কিন্তু আমি কিছু বলি না। ঐগুলো খেয়ে ওদের জীবন-ধারণ হয় তো হোক।'

পারুল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল কহিল, 'আরে, আমার বৌদি যে!'

হরিপদ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'বৌদি?'

'আমার খুড়তুতো দাদার বৌ। ঐ যে শিরীষ গাছে ঠেস দিয়ে ব'সে আছে—'

হরিপদ চাহিয়া দেখিল কুড়ি-একুশ বছরের একটি মেয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শতছিন্ন বস্ত্রে দেহের অধিকাংশই অনাবৃত, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। অনাহারে আর ক্লান্তিতে কোনো মতে কাপড়টা জড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পারুল বলিল, 'এসেছে ঐ দলের সঙ্গে। আজ ওরও বোধ হয় কচু ভরসা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি কথা ব'লে আসি।'

হরিপদ তাহার একটা হাত ধরিয়া বাধা দিয়া কহিল, 'থাক—লজ্জা পাবে।'

পারুল কথাটা বুঝিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সেদিক হইতে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

হরিপদদের দোকানের কাছাকাছি একটা গাছতলায় ততক্ষণে ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। হরিপদ একটু দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া দেখিল, একটি মেয়েছেলের ভিরমি লাগিয়াছে, তাহারই—দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া অসহায়ভাবে কাঁদিতেছে, আর সবচেয়ে ছোট যেটি, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মাকে লাথি কিল—যথেচ্ছ মারিয়া চলিয়াছে।

'ও কিছু নয়' বলিয়া, হরিপদ পারুলকে লইয়া আগাইয়া গেল।

পরের দিন ভোরবেলা পারুল আসিয়া দেখিল হরিপদ তখনই প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। অন্ধকারেই ঠাওর করিয়া কাছে আসিতে হরিপদ কহিল, 'দেখো, ওধারে একটা মড়া আছে—'

'মড়া?' পারুল শিহরিয়া উঠিয়া হরিপদর একেবারে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সত্যিই, সে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, হরিপদদের দোকানের পাশে একটা কী পড়িয়া আছে। 'এখানে মড়া কোথা থেকে এল?'

'ও একটা মেয়েছেলে, কাল সন্ধ্যার দিকে এসে পড়ল ঐখানে। তারপর ঘণ্টা দুই বোধ হয় খাবি খেয়েছিল—ব্যস্ ফক্কা!'

'কী হয়েছিল?'

'হয়েছিল? আচ্ছা মজার লোক তো তুমি। হবে আবার কী—না খেয়ে

মারা গেল। ওতো আজকাল হামেশাই হচ্ছে, নতুন আর কী! রেলে ইস্টিশানে, পথে-ঘাটে—দুদো দুদো লোক মরছে। কেন, তুমি কি দেখ নি?'

কিসের যেন একটা অব্যক্ত ভয়ে পারুলের দেহ হিম হইয়া গিয়াছিল। সে শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল, 'তা মেয়েছেলেটাকে তোমরা বাঁচাবার চেষ্টা করলে না? কিছু দুধ-টুধ—'

হরিপদ হাসিয়া কহিল, 'তবে আর ছেলেমানুষ বলেছে কেন।...ও যখন এসে পড়েছে তখন কি আর ওর কিছু খাবার ক্ষমতা আছে মনে কর!...কিছু দিতে গেলে সেইটেই নষ্ট হ'ত। দেখবে ওর চেহারাটা?'

সে ফস্ করিয়া একটি দেশলাই জ্বালিল। চেহারা দেখিয়া বোঝা যায় না পুরুষ কি স্ত্রীলোক, এমনি শুকাইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের কোনো লক্ষণই নাই, শুধু জট-পাকানো বড় চুল ছাড়া। অতিশয় শুষ্ক পাতলা একটা চামড়া মাত্র অস্থি-র উপর জড়াইয়া আছে। আর সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার মত তাহার পেট—এতই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় সেখানটা শূন্য, কিছু নাই। পিঠের চামড়া আর পেটের চামড়া এক হইয়া গিয়াছে, মধ্যে যেন হাড় পর্যন্ত নাই।...

সেদিকে কয়েক মুহূর্ত মাত্র চাহিয়াই পারুলের মাথা ঘুরিতে লাগিল, ভাগ্যক্রমে কাঠিটাও তখন নিভিয়া গিয়াছে। হরিপদ পোড়া কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'চল, ওসব আর দেখে না। দেখলেই মনখারাপ।...কী ক'রে যে ঐ অবস্থায় ও হাঁটছিল এই আশ্চয্যি হচ্ছি। অভ্যেসে শুধু হাঁটছিল যেন—এল, পড়ল, দু'ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে—ব্যস্, অক্কা!'

পারুল ভাবিতেছিল স্ত্রীলোকটির কথা। হয়তো তাহাদেরই মত গৃহস্থ ছিল সে—স্বামী, পুত্র, কন্যা, ঘর-দ্বার, সবই ছিল। কত পাল-পার্বণে পূজা-অর্চনা করিয়াছে এককালে। আজ সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পথের ধারে পড়িয়া অনাহারে মারা গেল। আত্মীয়স্বজনও হয়তো সব এই ভাবেই গিয়াছে, কিংবা আজও আছে, কেহ জানিতেও পারিল না যে, এইখানে ইহার জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল। হয়তো কল্যকার সেই বধূটির মতই ইহারও কিছু সম্ভ্রম-বোধ ছিল—তাই ভিক্ষা করিবার কৌশলটা আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

দু'জনে নিঃশব্দে পথ চলিতেছিল। পারুলের দলের লোক উহাকে হরিপদর সঙ্গে গল্প করিতে দেখিয়া আগেই চলিয়া গিয়াছিল। সহসা পথের পাশে কী একটা শব্দ শুনিয়া দু'জনেই সচকিত হইয়া উঠিল। একটুখানি ঠাওর করিয়া

দেখিল, একটা ডাস্ট্‌বিনের পাশে দুটি-তিনটি নরনারী তখনই বসিয়া জঞ্জালের গাদা ঘাঁটিতেছে, যদি আগের দিনের গৃহস্থদের ভুক্তাবশিষ্ট কিছু জঞ্জালের মধ্যে পড়িয়া থাকে এই আশায়। বেলা হইলে আরও ভাগীদার জুটিবে, সেইজন্য রাত থাকিতেই তাহারা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কাজ সারিতেছে। বোধ হয় বিশেষ কিছু ছিল না, একজন চিবানো ডাঁটার ছিব্‌ড়াগুলিই ক্ষুধার জ্বালায় পুনরায় চুষিতেছে, যদি কিছু রস তখনও তাহাতে থাকে!

পারুল আর দেখিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আর একজন কেউ থাকত তো তাকে কণ্ট্রোল পাঠিয়ে আমি ঘরে ব'সে থাকতুম। আমি একলা হ'লে আসতুমও না—ঘরে প'ড়েই ঐ মেয়েছেলেটার মত না হয় শুকিয়ে ম'রে যেতুম একদিন।'

হরিপদ জবাব দিল না। সে দুর্ভিক্ষের মধ্য হইতেই আসিয়াছে, সে জানে এসব ব্যাপারে বিচলিত হইবার কিছু নাই।

কিন্তু, অত ভোরে আসা সত্ত্বেও, সেদিন পারুল চাল পাইল না। কারণটা কিছু বোঝা গেল না। কেহ বলিল, দোকানদারই কাল চাল কম পাইয়াছিল, কেহ বলিল, বদমাইশি। চাল আছে ঘরে, পিছন হইতে চড়া দামে বেচিবে।

হরিপদ তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কী হবে তাহ'লে তোমাদের?'

ম্লান হাসিয়া পারুল জবাব দিল, 'উপোস। আমাদের জন্যে ভাবি না। বাবা কারখানা থেকে এলে কী দেব তাই ভাবছি। আর বাচ্চা ভাইটা, খোকা, যা চেঁচায়—উঃ। এমনিতেই পাগল ক'রে দেয়।'

হরিপদর হাতে নিজের চালের ঠোঙাটা তাহাকে যেন বিঁধিতে লাগিল। চালটা তাহার নিজের হইলে সে এখনই পারুলকে দিয়া নিজে উপবাস করিত, কিন্তু, দাদার ক্রুদ্ধ মুখ স্মরণ করিয়া তাহার সাহসে কুলাইল না। সে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'তা ছ'-আনা পয়সা তো আছে তোমার কাছে, তাইতেই যা হয় কিনে নিলে না কেন দোকান থেকে—'

পারুল সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ওরে বাবা, সে আমি পারব না। সে বাবা বড্ড রাগারাগি করবে। আর একদিন আমি নিয়েছিলুম ঐ রকম, যা ঠেঙ্গানি দিয়েছিল।'

আবার কিছুক্ষণ দু'জনে নিঃশব্দে চলিল। হরিপদ ইতিমধ্যে দোকান হইতে দুই-একটি করিয়া পয়সা সরাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল সুদূর ভবিষ্যতে যখন

স্ত্রী-কন্যার কাছে যাইবার সময় আসিবে, তখন স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ি, ও কন্যার জন্য একটা জামা লইয়া যাইবে। তাহারই দরুন আনা-বারো পয়সা তাহার ট্যাঁকে গোঁজা ছিল। সেটা সে কিছুতেই কোনো কারণে খরচ করিবে না, এই ছিল তাহার সঙ্কল্প।

কিন্তু, আর একবার পারুলের শুষ্ক ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুতেই সে সঙ্কল্প বজায় রাখিতে পারিল না। আরও কয়েক পা গিয়া সে ফিরিল। কহিল, 'চল দেখি—'

'কোথায় ?' বিস্মিত হইয়া পারুল প্রশ্ন করিল।

'চল না—বাজারেই যাব।'

পারুল তখন বুঝিতে পারে নাই কথাটা, একটু বিস্মিত ভাবেই তাহার অনুসরণ করিল। বাজারের মধ্যে একটা হিন্দুস্থানীর দোকানে গিয়া হরিপদ চালের দর করিল। সে লোকটা বলিল, 'চৌদ্দ আনা সের।'

'কৈ, দেখি তোমার পয়সাগুলো—'

তাহার পর একরকম জোর করিয়াই পারুলের আঁচল হইতে পয়সাগুলো খুলিয়া লইয়া নিজের ট্যাঁকের পয়সা হইতে আট আনা যোগ করিয়া দোকানদারের হাতে দিল, 'দাও একসের চাল।'

ফিরিবার পথে পারুল ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'এ কী করলে, তুমি পয়সা কোথা থেকে পেলে ? দাদা রাগ করবে না ?'···

উপর্যুপরি প্রশ্নের পর হরিপদ শুধু বলিল, 'ওটা দাদার নয়। ওটা আমি জমিয়ে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম দেশে যাবার সময় বৌয়ের জন্য একটা শাড়ি নিয়ে যাব—'

'তবে ?' পারুল আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিল, 'দেখ দিকি বাপু কী অন্যায়—'

বাধা দিয়া হরিপদ জবাব দিল, 'অন্যায় আর কী। চার-পাঁচ টাকার কমে তো আর একটা কাপড় হবে না। সে টাকা হয় তো আট আনার জন্যে আটকাবে না।'

কথাটা আর বেশী দূর গেল না। একটা চালবোঝাই গরুর গাড়ি বোধ হয় সেই পথে গিয়াছে, তাহারই কোনো বস্তার সূক্ষ্মতম ফুটা হইতে দুই-একটি দানা পড়িতে পড়িতে গিয়াছে। কতকগুলি কঙ্কালসার নর-নারী সেই চালগুলিই পথ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে এবং তাহা লইয়া বিবাদও শুরু হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই—। সে দিকে চাহিয়া দুইজনেই যেন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হইয়া গেল।···ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে রৌদ্র, রাস্তা প্রায় জনহীন। দূরে গৃহস্থ

বাড়ির দরজায় দরজায় বুভুক্ষু নর-নারী চিৎকার করিতেছে, 'মাগো, ওমা, একটু ফ্যান দে মা', 'বাচ্চাটা মরে যায় মা', 'এক মুঠো ভাত দে মা—'

খানিকটা চুপ করিয়া পারুল কহিল, 'এত সব লোক উপোস ক'রে রয়েছে, মরছে কত লোক—একদিন না হয় আমরাও উপোস করতুম।'

ক্লান্ত সুরে হরিপদ জবাব দিল, 'তাই যদি হয় তাহ'লে আমার বৌয়ের একটা কাপড়ই কি এত বড় হ'ল। তুমি আর বোক নি বাপু, চুপ কর।'

পরের দিন পারুল হরিপদকে আর ডাকে নাই, দলবলের সঙ্গেই হন্‌হন্‌ করিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। হরিপদ অথচ তাহার ভরসাতেই বসিয়া আছে সে পারুলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কাছে আসিয়া বলিল, 'ডাকলে না যে বড় আজ, ও খুকী!'

এতদিন পরে আজ তাহাকে পুনরায় খুকী বলিতে শুনিয়া পারুলের হাসি পাইল। তবু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, 'তোমাকে দেখতে পাই নি, ভাবলুম তুমি চ'লে গিয়েছ—'

সেদিন আলাপ আর জমিল না। কে জানে কেন, পারুল কিছুতেই তাহার সঙ্গীদের দল ছাড়িল না। হরিপদ ব্যাপারটা বুঝিল না, তবে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল যে, ফিরিবার পথে একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু, ফিরিবার পথে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও পারুলের দেখা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সে নির্লজ্জের মত মেয়েদের লাইনটা ভালো করিয়া দেখিয়া আসিল—কোথাও পারুল নাই। যেন বাতাসে উবিয়া গিয়াছে। সে হতাশ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মাথায় করিয়া একাই ফিরিল। পারুল রাগ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, কেন যে রাগ করিয়াছে তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও ধারণা করিতে পারিল না।

দোকানে ফিরিয়া দেখিল তাহার নামে একখানি চিঠি আসিয়াছে। তাহার শ্বশুর লিখিয়াছেন। তাঁহার অবস্থাও খুব খারাপ হইয়াছে, একবেলা আহারও সেখানে জুটিতেছে না। সকলকারই চেহারা যৎপরোনাস্তি খারাপ হইয়া গিয়াছে—এমন কি তাহার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিলে হরিপদ চিনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই সব কারণে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, সিংভূম জেলায় কোন জমিদার খোরাকি ও সামান্য বেতন দিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই নাকি কাজে লাগাইতেছে—সেইখানেই তাঁহারা কিছুদিনের জন্য খাটিতে যাইবেন। অতএব,

হরিপদ যেন অবিলম্বে তাহার স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া আসে। নহিলে, সেও যদি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই চলিয়া যাইতে পারেন, ইত্যাদি—

চিঠি পাইয়া হরিপদ বসিয়া পড়িল। তাহার শ্বশুর-মহাশয়রা সম্পন্ন গৃহী—এমন কি আর একটু লেখাপড়ার চর্চা থাকিলে তাঁহাদের ভদ্রলোকই বলা চলিত। জমি-জমা, গরু-বাছুর, বাগান-পুকুর—অভাব কিছুরই ছিল না। তাঁহারা যে কতখানি অভাব ও দৈহিক কষ্টে ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া আজ বিদেশে 'জন' খাটিতে যাইতেছেন তাহা অনুভব করিয়া হরিপদ স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার বৌ আর মেয়ে অন্তত দুইবেলা দুইমুঠা পাইবে—এ ভরসা তাহার খুবই ছিল। কিন্তু—

দাদা পরামর্শ দিল যে, সে যদি অত দূর বিদেশে স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া যাইতে রাজি না থাকে তো তাহাদের লইয়া চলিয়া আসুক এখানে। অনেক গৃহস্থ-বাড়িতে তাহার চেনাশুনা আছে, সে বলিয়া দিলে বৌমার কাজের অভাব হইবে না। সে তাহাদের লইয়া আসুক।

দাদা যে তাহাকে হাতছাড়া করিতে চাহে না, তাহা হরিপদ বুঝিল। এইখানে চিরকাল পেটভাতে খাটার প্রস্তাবটা তাহার মনে লাগিল না বটে, কিন্তু মুখেও কিছু জানাইল না। দাদা যদি গাড়িভাড়াটা দেয় তো দিক্। স্থির হইল আগামী পরশু দিনই দাদা টাকা যোগাড় করিয়া দিবে।

পরের দিন ভোরবেলা পারুলকে আবার দেখা গেল। 'তোমরা এগোও গো' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া হরিপদর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোরের সামান্য আলোতেই হরিপদ দেখিল পারুল যেন হাঁপাইতেছে, তাহার মুখও শুষ্ক।

'কাল কী হয়েছিল? কত খুঁজলুম।'

'কালও এখানে চাল পাই নি যে, তাই ওদিকে যে আর একটা কণ্ট্রোলের দোকান আছে, সেইখানে গিছ্‌লাম।'

'তারপর, চাল পেলে?'

'না।' বলিয়া পারুল হাসিল।

'তাহ'লে কালও কি উপোসে কাটল?'

'কাটল বৈকি! চাল কোথায়? বাবার চাল পেতে সেই কাল। আজও

অদৃষ্টে হয়তো হরিমটর আছে।—অবিশ্যি বাবা ব'লে দিয়েছে চাল না পেলে ছাতু নিয়ে যেতে। আধসের ছাতু ছ'-আনায় হবে তো?'...

একথা-সেকথার পর হরিপদ কহিল, 'আর বোধ হয় দেখা হবে না আমাদের।'

চমকিয়া উঠিয়া পারুল কহিল, 'কেন?'

হরিপদ সব খুলিয়া বলিল। পারুলের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, তা ব'লে সব্বাই সেই অত দূরে চ'লে যাবে? দেশভুঁই ছেড়ে?'

'কী করব, তবু সেখানে গেলে খেতে পাব তো। নইলে এমনি ক'রে একদিন মরতে হবে সবাইকে।'

পারুল আর কথা কহিল না, শুধু অনেকক্ষণ পরে একবার প্রশ্ন করিল, 'কাল কখন যাবে?'

হরিপদ জবাব দিল 'দশটায় গাড়ি—।'

পরের দিন হরিপদর আর কণ্ট্রোলে যাইবার কথা ছিল না, তবু সে ভোর-বেলা উঠিয়া বসিয়াছিল। পারুল যে আজ অন্তত একবার শেষ দেখা দিতে আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। তাছাড়া, এইতো তাহার পথ।

একটু পরেই পারুলকে দেখা গেল, তিন-চারটি স্ত্রীলোকের সহিত আসিতেছে। সহসা একসময়ে দলছাড়া হইয়া হরিপদর কাছে আসিয়া আঁচলের মধ্য হইতে একখানা ধোয়া শাড়ি বাহির করিয়া তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই শাড়িখানা তোমার বৌকে দিও, আমার নাম ক'রে ব'লো আমি দিয়েছি। গত বছর পূজোয় বাবা কিনে দিয়েছিল, আমি তিনদিন না চারদিন পরেছি, তারপর কাচা, বাক্সে তোলা ছিল।'

বলিয়াই সে আবার ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হরিপদ তাহাকে জোর করিয়া আটকাইয়া কহিল, 'কাপড় তো নিয়ে এলে, তারপর, বাবাকে কী বলবে?...এ তুমি নিয়ে যাও, মিছিমিছি—'

'না না, বাবা জানতে পারবে না। বাবার অত কাপড়-জামার হিসেব থাকে না।'

সে জোর করিয়া হাতটাকে ছাড়াইয়া লইয়া এক দৌড়ে আবার নিজের দলকে ধরিয়া ফেলিল।

শাড়িখানা হরিপদর কোলেই পড়িয়া রহিল।*

* এই গল্পের রচনাকাল শ্রাবণ—১৩৫০

মির্জাপুর স্ট্রীট এবং তাহার কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে মেসের সংখ্যা বড় কম নয়। কোনোটা ছাত্রের, কোনোটা কেরানীর, কোনোটা ছাত্র-মাস্টার-কেরানী-দের মিলিত আশ্রয়। তাহার কোনোটা 'লজ', কোনোটা 'ক্লাব', কোনোটা বা নাম-গোত্র-হীন। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলার লোকই এই সব বাসাগুলিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহারা আসে, কিছুদিন থাকে, আবার কোথায় মিলাইয়া যায় জনসমুদ্রে বুদ্বুদের মতই—কেহ খবরও রাখে না। দশ, পনেরো, কুড়ি বৎসর পরে, হয়তো কোনো সুদূর মফঃস্বলে বা দৈবাৎ কলিকাতারই কোনো রাস্তায় দেখা হইয়া গেল একপক্ষ হয়তো চিনতেই পারে না, অপরপক্ষ মনে করাইয়া দেয়, 'কী, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন না? সেই যে সেই গোপাল মল্লিক লেনের সেই মেসে—ষোল নম্বর ঘর?' অন্যপক্ষ তখন বিস্মৃতির অপার সলিলে ক্ষীণ তটরেখা দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে বলেন, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, নগেনবাবু না? না, না, রাখালবাবু, ঠিক! কী করছেন আজকাল—' ইত্যাদি।

কিন্তু এইখানেও, জীবনের স্রোত যেখানে সবচেয়ে তীব্র সেখানেও, বিরাট প্রস্তরখণ্ডের মতই আমাদের ব্রজেনদা চিরস্থায়ী হইয়া বসিয়া আছেন আজ আটত্রিশ বৎসর। মেস যে ইতিমধ্যে বদল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু এই পাড়া ছাড়েন নাই কখনও···এবং সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও দেশে কিংবা বিদেশে যান নাই; তাঁহার জীবন মির্জাপুর স্ট্রীট এবং ক্লাইভ স্ট্রীট ইহার মধ্যেই ছিল সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। দেশে তাঁহার ভাইপোরা ছিল, তাহাদের তিনি মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাইতেন জানি, তাহারা দেখা করিতেও আসিত। কিন্তু তাহাদের কোনো অনুরোধে বা কোনোও ক্রিয়া-কলাপেই তিনি দেশে যাইতে রাজি হন নাই। এখানটায় তাঁহার কোনো একটা ব্যথা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদেশেও তিনি যে কেন যাইতেন না সেটা কোনোমতেই অনুমান করিতে পারিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলেও একটু হাসিয়া বলিতেন, 'কী দরকার ভাই টানা-হেঁচ্ড়াতে, সারা পৃথিবী তো আর দেখতে

পারব না, সে সঙ্গতিও নাই, শুধু শুধু একটা দুটো জায়গা দেখবার জন্য কতকগুলো টাকা খরচ আর হাঙ্গামা ক'রে লাভ কী? বেশ আছি!'

ব্রজেনদার এই অদ্ভুত মেস-প্রীতির কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানিত—এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করিত। এই অঞ্চলের মেসে যাহারা থাকে তাহারা এ-বাসা ও-বাসা আনাগোনাও করে, পরস্পরের খবরও রাখে খানিকটা। ব্রজেনদাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্নও সহ্য করিতে হয় বড় কম নয়। কিন্তু, তিনি যেমন এ সব অযথা কৌতূহলে বিরক্তও হন না, তেমনি কিছুতেই আসল কথাটা ভাঙেন না। কেবল একদিন আমাদের সুনীলের কাছে কী একটা দুর্বল মুহূর্তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'কী দেখতে ঘুরে বেড়াব—বল্ দেখি ভাই? তোরা ছেলেমানুষ, তোদের মনে আশা আছে, চোখে আছে রঙ—ওসব দেখার মানে হয়। আমার চোখে এখন কাশীর ঘাট আর ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড় সব সমান। বাঁচারই আর কোনো মূল্য নেই আমার কাছে—নেহাত আত্মহত্যা করা কাপুরুষতা ব'লেই করি নি। বাঁচতে হবে ব'লেই চাকরি করি, জীবনধারণ করতে গেলে টাকা চাই ব'লে তাই। সুখ আর কিছু নেই।'

ব্রজেনদা অথচ, যতদূর আমরা জানি, চাকরি ভালোই করিতেন। মাহিনা ঠিক কত পাইতেন না জানিলেও, শ'দুই-এর কাছাকাছি যে তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। মেসে একমাত্র তিনিই একটা গোটা ঘর লইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার তামাক সাজিবার জন্য ও সন্ধ্যাবেলা গা-হাত-পা টিপিবার জন্য একটা চাকরের অর্ধেক খরচা তিনি বহন করিতেন। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত শীর্ণ, সমস্ত দেহটা যেন দড়ি-পাকানো। রোগার উপর লম্বা বলিয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকিতেন সর্বদাই, তাহার উপর হাঁটুর কাছটা ছিল ঈষৎ বাঁকা, সেজন্য জীবন্ত একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত দেখাইত তাঁহাকে। কিন্তু, দেহে তাঁহার শ্রী-সৌষ্ঠব না থাক, হাসিটি ছিল ভারি মিষ্ট—একটি মাত্র দাঁত সামনের দিকে অবশিষ্ট ছিল, সেইটি বাহির করিয়া তিনি যখন মুখ টিপিয়া হাসিতেন, তখন মনে হইত যেন আমাদের সকলের জন্যই মানুষটির অন্তরে স্নেহ ভরা আছে।

এ হেন শান্ত সৌম্য নির্বিরোধী মানুষটি আমাদের একটা তুচ্ছ তামাশার ব্যাপার লইয়া কেন যে অত চটিয়া গেলেন তাহা আমাদের কাছে আজও অনেকটা দুর্জ্ঞেয় হইয়া আছে।

কথাটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি—

আমাদের এ মেসটাতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনেকগুলি, তাহার মধ্যে ডাক্তারি-ইস্কুলের ছাত্রও কয়েকটি ছিল; সেই সূত্রেই আর একটি ডাক্তারি-ছাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শঙ্কর একদিন আমাদের মেসে আসিয়া উঠিল। অবশ্য ইহা এমন কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়, মেসে লোক আসা-যাওয়া করেই, নূতন লোক আসিলে আমরা একদফা পরিচয় করিয়া লইয়াই দলে টানিয়া লই, তারপর আর মাথা ঘামাই না, চলিয়া যাইবার সময়ও কাহারও বিরহে অস্থির হইয়া উঠিবার কারণ ঘটে না। কিন্তু, শঙ্কর আসিতে আমরা যে তাহাকে লইয়া একটু বেশী রকম মাতামাতি করিয়াছিলাম, তাহার কারণ ছিল। প্রথম কথা, ছেলেটি অতিশয় সুদর্শন; দ্বিতীয় কথা, সে যেমন মিষ্টভাষী তেমনি আমুদে—মানুষের প্রিয় হইবার সব কয়টি গুণই তাহার আছে। সুতরাং, তাহার সহিত একটু বিশেষভাবে মিশিবার, কাছে পাইবার ইচ্ছা আমাদের সকলেরই হইয়াছিল।

এই ভাবেই চলিতেছে, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, আমরা ছাড়াও আর একটি প্রাণী শঙ্কর সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে এবং সে কৌতূহল কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে। সে প্রাণীটি আর কেহ নয় সামনের বাড়ির গৌরী।

আমাদের মেসটা মির্জাপুর স্ট্রীটের উপরেই। চওড়া রাস্তা বলিয়াই হউক বা বয়স্ক লোক বেশী আছে বলিয়াই হউক, মেসের সামনের বাড়ির লোকরা যতটা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, গৌরীর বাবা তত হন নাই—বস্তুত তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কোনো প্রকার সচেতন ছিলাম না। গৌরী মেয়েটি একেবারেই কিশোরী, এবং এমন কিছু স্বরূপাও নয়, তবে শ্রীময়ী বলা যায়। সেজন্যই বোধ হয় আমাদের বাসার ছাত্র কয়টি কখনও ওদিকে মন দেয় নাই। সহসা আমিই একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, গৌরী আজকাল সকাল-সন্ধ্যায় নানা অজুহাতে ছাদে আসে এবং শঙ্করের গলার আওয়াজ যে দিক হইতে পাওয়া যায় সেই দিকেই চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। খুবই প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হয়, ধরা পড়িয়া গেল।

ব্যস্—খবরটা শুনিবার অপেক্ষা, সমস্ত মেসে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল এবং সে ঠাট্টা-তামাশার কলধ্বনি রাস্তা পার হইয়া ছাদের উপর মেয়েটির কানেও প্রবেশ করিয়া তাহাকে রাঙাইয়া তুলিল। ফল হইল এই যে, ত্রিশ-বত্রিশ জোড়া চক্ষু তাহার গোপন দৃষ্টি-অভিসার লক্ষ্য করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বেচারী ছাদের আশাই ছাড়িয়া দিল।

সে ছাড়িল বটে, কিন্তু তাহাকে ছাড়িলে আমাদের চলে কী করিয়া?

আমরা সবাই যেন তাহার এই ভীরু প্রণয় উপলক্ষ্য করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এখন আর এত সহজে ছাড়িতে রাজি হইলাম না। উপেনদার এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ, তিনি একদিন রাস্তা পার হইয়া ও-বাড়ি গিয়া গৌরীর বাবার সহিত আলাপ করিলেন এবং লাফাইতে লাফাইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, গৌরীরা শঙ্করদেরই পাল্‌টি ঘর, সুতরাং প্রণয়লীলা যদি একটু অগ্রসর হয় তাহা হইলেও বিয়োগান্ত ব্যাপারের সম্ভাবনা নাই।

শঙ্করের প্রথম দিকটায় খুব উৎসাহ ছিল না, কিন্তু আমরা এমন ভাবেই তাহার কানের কাছে গুঞ্জন শুরু করিলাম যে, ক্রমশ তাহার চোখেও স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিল, দৃষ্টি হইয়া আসিল রঙীন। আমাদের সহানুভূতি আছে বুঝিয়াই হউক, বা সে নিজেই থাকিতে পারিতেছিল না বলিয়াই হউক, গৌরীও আবার ছাদে দেখা দিল। ক্রমশ আমাদের দূতীয়ালিতে পত্র-ব্যবহার শুরু হইল, অল্প লেখাপড়া-জানা মেয়ের কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে অপটু প্রেম-নিবেদন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের মাতামাতির শেষ রহিল না। শোনা গেল শঙ্কর চিঠিগুলি দিনে বুকপকেটে রাখে এবং রাত্রে বিছানায় লইয়া শোয়। ইতিমধ্যে একদিন শঙ্করের সহিত আমাদের কয়েকজনের ও-বাড়িতে নিমন্ত্রণও হইল। সেই উপলক্ষ্যে সিঁড়ির মুখে আব্‌ছায়ায় গৌরীর সঙ্গে কী করিয়া শঙ্করের দেখা হইয়াছিল এবং পান লইবার সময় শঙ্কর গৌরীর কোমল উষ্ণ হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে অনুভব করিয়াছিল, সে সব তুচ্ছ কথা। মোটের উপর ব্যাপারটা খুব জমিয়া উঠিল, এখন শুধু পরিণতিটাকে মধুরতম করিয়া তুলিবার অপেক্ষা মাত্র।

কিন্তু, আমরা যখন এই বাইশ বছরের তরুণ এবং পনেরো-ষোল বছরের কিশোরীটির প্রণয়লীলার মাধুর্যে তন্ময় হইয়াছিলাম, তখন যে ব্রজেনদার অন্তরে এত বিদ্বেষ জমা হইতেছিল তাহা কল্পনাও করি নাই। হঠাৎ একদিন তিনি আমাকেই ডাকিয়া অত্যন্ত বকাবকি শুরু করিলেন, 'এ সব কী শুনছি? এটা ভদ্রলোকের মেস, এমন বেলেল্লাগিরি করলে তো আমরা আর থাকতে পারি নে। …এসব কী শুরু করেছ তোমরা?'

আমার বিস্ময়ের শেষ রহিল না। ব্রজেনদা এমনিতেই অত্যন্ত নির্বিরোধী, স্বভাবতই মিষ্ট। তিনি যে সামান্য ব্যাপারে এমন রূঢ় কথা বলিবেন তাহা কখনও আশা করি নাই। স্তম্ভিত ভাবটা কাটিলে কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা

করিলাম, 'বেলেল্লাগিরি তো কিছু হয় নি দাদা, শঙ্কর ছেলেটি ভালো, এবং ওদের পাল্‌টি-ঘরও বটে, যদি ভদ্রলোকের কন্যাদায় উদ্ধার হয়—'

ব্রজেনদা খিঁচাইয়া উঠিলেন একেবারে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসব ঢের জানা আছে। ভদ্রলোকের কন্যাদায়ের জন্মে তো ঘুম হচ্ছে না। এই পাড়াতেই ঢের আইবুড়ো মেয়ে আছে, কৈ তাদের জন্য তো চেষ্টা করছ না! যাও, যাও, ওসব বাজে কথা বলতে এসো না। তাদের গরজ থাকে তারা ওর বাপের কাছে ঘটক পাঠাক—তোমাদের কী?'

ব্রজেনদার মাথায় একটা বড় রকমের গোলমাল হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া তখনকার মত আর ঘাঁটাইলাম না, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম। মেসসুদ্ধ সকলেই ব্রজেনদার এই আকস্মিক উষ্মায় বিস্মিত হইল—কিন্তু, বহু আলোচনাতেও কারণটা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা একটু সতর্ক হইলাম। তাঁহাকে ভয় করিবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু, আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম বলিয়া অকারণে তাঁহাকে ব্যথা দিতে চাহিলাম না।

যদিচ, কথাটা একেবারে চাপিয়া রাখা গেল না কিছুতেই। আমরা তখন উৎসাহ আর আনন্দের তরঙ্গে নাচিতেছি—হাসির বন্যা বহিতেছে তখন অকারণেই। সুতরাং, কানাঘুষা, হাসিঠাট্টার টুক্‌রা ব্রজেনদার ঘরেও পৌছিয়া তাঁহার মনের মেঘকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহারই মধ্যে উপেনদার আগ্রহ ও চেষ্টায় একদিন দুপুরবেলায় ছোটবোনের সঙ্গে গৌরীকে মেসে লইয়া আসা হইল এবং শঙ্করের সহিত দেখা করাইয়া দু'-একটা কথাবার্তারও সুযোগ দেওয়া হইল। তখন মেস খালিই ছিল প্রায়, আমরা দু'-তিনটি লোক ছাড়া কথাটা কাহারও জানিবার কথা নয়, তবু কী করিয়া সেই দিনই ব্রজেনদার কানে উঠিল জানি না, পরের দিন ভোরে ব্রজেনদা ম্যানেজারের কাছে মেস ছাড়িবার নোটিশ দিলেন।

আমি, উপেনদা প্রভৃতি অপরাধীরা ব্রজেনদার ঘরে গিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হইয়া গেছে জানাইলাম—কিন্তু, ব্রজেনদা অটল। সেই শীর্ণ, মধুর স্বভাবের মানুষটির মধ্যে এত জেদ আছে তাহা আগে জানিতাম না। তিনি নূতন বাসা খুঁজিয়া ঠিক করিলেন এবং শঙ্করের বিবাহের ঠিক আগের দিনটিতে সেখানে চলিয়া গেলেন। যদিও সে বাসা আমাদের ঠিক একখানা বাড়ি পরেই!

দীর্ঘদিন পরে এইভাবে ব্রজেনদাকে হারানোতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইলাম, কিন্তু ব্যাপারটা লইয়া বেশীক্ষণ মাথা ঘামাইবার অবসর হইল না; শঙ্করদের বিবাহের উৎসবে ব্রজেনদা একেবারেই হারাইয়া গেলেন।

ইহার পর পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শঙ্কর ডাক্তারি পাস করিয়া দেশে গিয়া বসিয়াছে, গৌরীরও দু'-তিনটি ছেলেমেয়ে হইয়াছে—এ সব সংবাদ পাই লোক-পরম্পরায়। কদাচিৎ শঙ্কর ঔষধ কিনিতে আসিলে দেখা করে, এই পর্যন্ত। আমাদের এই একঘেয়ে জীবনস্রোতের সহিত তাহাদের জীবনের ধারা বহুদিনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ পুরাতন বন্ধুদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে কথাটা উঠিলে তবে মনে পড়ে—নহিলে একরকম যেন ভুলিয়াই গিয়াছি। একদা যে কথাটা লইয়া অত মাতামাতি করিয়াছিলাম আজ তাহা দূরতম স্মৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে।

ব্রজেনদা সেই বাসাতেই আছেন। আমরা মধ্যে মধ্যে খবর লইতে যাই, তিনিও আসেন এক-আধ দিন। শরীরটা তাঁহার ইদানীং খুবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমরা সকলেই কিছু বেশী দিনের ছুটি লইয়া পশ্চিম যাইতে বলি, কিন্তু তাঁহার সেই এককথা—'কী আর হবে অত যত্ন ক'রে দেহটাকে বাঁচিয়ে—যা যাচ্ছে তাকে যেতে দাও!'

সহসা আশ্বিনের কাছাকাছি একদিন ও-মেসের চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—ব্রজেনদার অবস্থা খারাপ, আমাকে ডাকিতেছেন। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম। তাঁহার বিছানার পাশে যাঁহারা বসিয়াছিলেন ব্রজেনদার ইঙ্গিতে সকলেই বাহিরে চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম আমার সহিত কিছু গোপনীয় কথা আছে।

ঘর খালি হইলে ইশারাতে আমাকে আরও কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিলেন, 'আমার এই বালিশের তলায় চাবি আছে, নিয়ে ঐ বাক্সটা খোল্ ভাই। ওপরে আমারই কাপড়-জামা আছে, সেগুলো তুললে দেখতে পাবি খানকতক শাড়ি—সেইগুলো বার ক'রে আন্—'

শাড়ি! ব্রজেনদার বাক্সে! বিস্ময়ের অবধি রহিল না—কিন্তু, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও মায়া হইল, এই ক'টা কথা বলিয়াই তিনি হাঁপাইতেছেন।

বাক্স খুলিয়া উপরের শার্ট ধুতিগুলি সরাইতে বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। ছ'সাতখানা শাড়ি, সবগুলিই মূল্যবান এবং নূতন—এখনও তাহাতে দোকানের লেবেল আঁটা রহিয়াছে। ঢাকাই, সিল্ক, মাদ্রাজী—নানাবর্ণের, নানা উপাদানের।

কতকটা মূঢ়ের মতই শাড়িগুলি হাতে করিয়া আবার তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়া গিয়াছে ততক্ষণে, তিনি অতি কষ্টে কহিলেন, 'আমার আর বেশী দেরি নেই ভাই, বুড়োর একটা শেষ অনুরোধ রাখতে হবে। কিন্তু, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিস্ নি আমাকে, আমি বলতে পারব না।'

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া কহিলাম, 'বলুন দাদা—নিশ্চয়ই রাখব।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রজেনদা কহিলেন, 'সেই গৌরীকে মনে আছে তোর? সেই যার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে হ'ল?…তাকে এই শাড়িগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে। ঠিকানা তো তোরা জানিস!…বছর বছর পূজোর সময়ে তার জন্যেই এগুলো কিনেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দিতে পারি নি। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়েছে—যদি কিছু মনে করে। এখন আর লজ্জা কি, বুড়োমানুষ তায় মরে যাব—তবু কি সে নেবে না এগুলো? দিস্ ভাই যেমন ক'রে হোক তার কাছে পৌঁছে—কেমন?'

ব্রজেনদা চুপ করিলেন। ততক্ষণে তাঁহার শ্বাসকষ্ট শুরু হইয়াছে, তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সকলকে ডাকিলাম। তাঁহার ভাইপোরাও দেশ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া কাপডগুলির দিকে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে ব্রজেনদা মারা গেলেন।

## চোর

রতন উদ্বিগ্ন হয়ে কপাটটা ধ'রে দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারেই। আটটা বেজে গেছে, হারাণের ফেরবার সময় হয়ে এল—এখনও যদি গোপাল এসে পড়ে তাহ'লে হয়। এর পর এলেও তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। এমন কি গোপালকে সে ডেকে পাঠিয়েছে এ কথাও যদি হারাণের কানে যায় তাহ'লে আর রক্ষা থাকবে না। রতনের অদৃষ্টে প্রহার তো আছেই, ছেলেটাও বাদ যাবে না।

কিন্তু, গোপালই বা আসে না কেন? পাশের কলাঝাড়টা একটু ন'ড়ে

উঠতে রতন সাগ্রহে তাকাল সেদিকে, একবার চুপিচুপি প্রশ্নও করল, 'কে রে, গোপাল এলি ?' কিন্তু, তারপরই বুঝতে পারল যে, ওখানে যে নড়ছে সে গোপাল নয়—কুকুর। একটা ছোট দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সে চুপ ক'রে গেল। অন্ধকারে হঠাৎ বোঝাও যায় না মানুষ না কুকুর—অথচ আলো জ্বালাবারও সাহস নেই, এ তবু অন্ধকার আছে, দূর থেকে হারাণকে আসতে দেখলে চুপিচুপি গোপালকে সরিয়ে দিতে পারবে—আলো জ্বালা থাকলে ওর পক্ষে হারাণকে অন্ধকারে আসতে দেখা যেমন অসুবিধা, হারাণের তেমনি সুবিধা ওদের দেখা। রতন আজকাল তেল বাঁচাবার জন্যে রান্নাবান্না সেরে প্রায়ই আলো নিবিয়ে ব'সে থাকে, হারাণের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

পাশের বাড়ির কাদের ঘড়িতে ঠং ক'রে সাড়ে আটটা বাজল। আটটায় হারাণের ছুটি হয়েছে—আর বড়জোর দশ মিনিট, তার মধ্যে সে এসে পড়বেই। অথচ, গোপালকে আজ একবার না দেখে সে বাঁচবে কেমন ক'রে। আহা বেচারা! সকালে নাকি সর্ষের তেলের কণ্ট্রোলে গিয়ে খাড়া রোদে আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল, তারপর কী একটা গোলমাল বাধে দোকানদারের সঙ্গে, ফলে সে পুলিশ ডাকে। যারা জোয়ান তারা সবাই ঠিক সময়ে পালিয়েছে, পুলিশ আর দোকানদারের হাতে এলোপাথাড়ি মার খেয়েছে বুড়ো আর ছোট ছেলেরা। তাদের মধ্যে নাকি গোপালও ছিল। সেই কথা শুনে পর্যন্ত ওর বুকের মধ্যে হু হু করছে, ওর কত আদরের গোপাল। কখনো একটা চড়া কথা তাকে কেউ বলে নি।

তখনই সে পাশের বাড়ির ঝি নন্দরানীকে দিয়ে গোপালকে খবর পাঠিয়েছিল সন্ধ্যের পর একবার চুপিচুপি আসবার জন্য। গোপাল নাকি বলেছে যে, তিনদিন তারা কেরোসিন তেল পায় নি, সারা রাত অন্ধকারে কাটাচ্ছে। আজ বিকেলে সে যাবে কেরোসিনের কণ্ট্রোলে দাঁড়াতে। তেল পেলেই সে চ'লে যাবে মায়ের কাছে, যদি দেরি হয়ে যায় তাহ'লে তেলের বোতল হাতে ক'রেই না হয় যাবে। কিন্তু, এখনও তো এল না, তেল কি এখনও পায় নি সে ? না পেলেই বা এত রাত পর্যন্ত কী করছে, সন্ধ্যের পরও কি দোকানদার তেল দেয় ? মনে তো হয় না।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন কান পেতে দাঁড়াল। কে যেন আসছে বটে, কিন্তু সে গোপাল নয়। তার পায়ের আওয়াজ রতন চেনে—ভালো ক'রেই চেনে। কুড়িটা লোকের পায়ের শব্দের মধ্য থেকে সে চিনে নিতে পারে। কে জানে আবার এবেলা কিছু হ'ল কিনা—ঐটুকু ছেলে তার। বেশী মার খেলে

মরেই যাবে। একে খেতে পায় না ভালো ক'রে—শরীরে কী আছে!……ওর ইচ্ছে করতে লাগল যে, ও ছুটে চ'লে যায় ছেলের কাছে—এই তো এপাড়া-ওপাড়া, এমন কী দূর, অথচ যাবার কোনো উপায় নেই। হাত-পা বাঁধা, আর সে বেড়ী সে-ই ইচ্ছা ক'রে পরেছে।

তপ্ত অশ্রুতে রতনের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। এ কী শাস্তি! এর চেয়ে মরতে পারল না কেন? মরতে পারে নি শুধু ওই গোপালের মুখ চেয়েই, গোপালের আর খুকীর। এক এক সময়ে অনুতাপে ওর মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে, ভগবান জানেন কথাটা সত্যিই!

উঁচু জাতের মেয়ে নয় বটে সে, কিন্তু, ছোট কাজ কোনোদিন করে নি। বাপ ওর চাকরি করত কী একটা কারখানায়, এক মেয়ে ব'লে রতনকে কখনও কষ্টের মুখ দেখতে দেয় নি। রীতিমত ভদ্রলোকের মতই বাস করেছে তারা, সেই ভাবেই মানুষ হয়েছে। এমন কি বছর দু'-তিন স্কুলেও গিয়েছিল। তারপর বিয়ে হ'ল বেশ ঘটা ক'রেই। ওর স্বামী জীবন কোন্ এক ছাপাখানায় কাজ করত—জমাদারের কাজ। বড় প্রেস, মাইনে পেত ভালোই। তার বিশেষ কেউ ছিল না। বুড়ো মা ওদের বিয়ের বছর-দুইয়ের মধ্যেই মরে গিয়েছিল। সুতরাং দু'টি লোকের সংসার ওদের রাজার হালেই চলত। পাকাবাড়িতে দোতলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত ওরা, রবিবারে রবিবারে বায়স্কোপ দেখত। রতন ইচ্ছামত কাপড়ওলা ডেকে শাড়ি কিনত—তার জন্য জীবন কোনোদিন কিছু বলে নি। তারপর গোপাল হ'ল—খুকী হ'ল। সে যেন এক স্বপ্নে দেখা দিন—সংসার চলেছিল একটানা সুখের স্রোতে, আনন্দের পালে ভর ক'রে। গোপাল হবার পর বাবা মারা গেলেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নি। জীবন শাশুড়ীকে সসম্মানে নিয়ে এসে বাড়িতে রেখেছিল, বলেছিল 'আমার মা নেই, আপনিই আমার মা হয়ে থাকুন!'

সত্যি—জীবনের মত স্বামী পাওয়া কত সৌভাগ্যের কথা। লেখাপড়া সে বেশী শেখে নি। কিন্তু, কখনও একটা খারাপ গালাগাল দিতে কেউ শোনে নি তাকে। বিড়ি ছাড়া কোনো নেশা করত না—কখনও হয়তো বিশ্বকর্মা পুজো বা অমনি কোনো উপলক্ষ্যে একটু-আধটু মদ খেত, কিন্তু মাতাল সে কোনোদিন হয় নি।

তবে নাকি ভগবানের চোখে মানুষের সুখ বড় খারাপ লাগে—তাই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল—তিনদিনের জ্বরে হঠাৎ জীবন গেল মারা। সেবা করতে

দিলে না, চিকিৎসা করতে দিলে না—যমরাজা একেবারে টেনে নিলে। উঃ—সেদিনের কথা ভাবা যায় না। এ কথা কোনোদিন কল্পনাও করে নি কেউ, এতটুকু প্রস্তুত ছিল না ওরা। যাদের দিন কাটছিল সুখে ও বিলাসে, পরের দুঃখে যারা বড়লোকের মতই 'আহা' বলত, হঠাৎ তারা হয়ে পড়ল অসহায় নিঃসম্বল। স্বর্গ থেকে খ'সে এসে পড়ল যেন অকূল পাথারে! জীবন রোজগার করত ভালো বটে, কিন্তু রাখতে কিছুই পারে নি। এত শীঘ্র যে মরবে তা সে ভাবে নি কোনোদিন। একটা পাঁচশ টাকার ইনসিওরেন্স ছিল, আর অফিস থেকে পাওয়া গিয়েছিল শ'-তিনেক টাকা, এ ছাড়া ওর আর মায়ের হাল্‌কা দু'-একটা গয়না। এই সম্বল ক'রেই ওরা গিয়ে উঠল একটা মাটির ঘরে। তখন পাঁচ-বছরের ছেলে গোপাল আর তিনবছরের মেয়ে খুকী—ওদের মানুষ ক'রে তুলতে হবে এটা জানে। কিন্তু, কেমন ক'রে তা জানে না। কাজকর্ম কিছুই জানত না, করতে গেলে ঝিয়ের কাজ করতে হয়, কিন্তু তাতে মন সরে না কিছুতেই। সে যদি বা রাজি হয়, মা কান্নাকাটি করেন। রতন আকাশ-পাতাল ভাবে, কোথাও কোনো পথ, একটু আলো দেখতে পায় না।

তবু দিন কাটছিল একরকম ক'রে। কিন্তু, তখন যুদ্ধ বেধে গেছে, একটু একটু ক'রে দর বাড়তে শুরু করেছে সব জিনিসের। নিজেরা একবার খায়, আধপেটা খায়, একদিন অন্তর উপোস করে—কিন্তু, ছেলেদের তো কিছু দিতে হবে মুখে! তাও কুলোয় না কোনোমতে। একটার পর একটা জিনিস যায়। শেষে বাসন-কোসন শাড়ি-জামা পর্যন্ত বিক্রি করে। তাও যখন শেষ হয়ে এল, তখন ধরলে চাকরি—বাসনমাজার কাজ। অনভ্যস্ত হাত পদে পদে ভুল করে, সামান্য তিরস্কারে চোখে জল আসে—তবু করতে হয়। কিন্তু, তাতেই বা কী হয়? এক জায়গায় আট টাকা, এক জায়গায় ছ'টাকা, ঠিকে চাকরি এই দুটো করতেই তার দিন কেটে যায়। অথচ, তাতে চারটি প্রাণীর একবেলাও চলে না। হাত-পা হাজায় পচে ওঠে, প্রতিদিনের গায়ের ব্যথা মরবার আগেই রাত পুইয়ে যায়, আবার যেতে হয় কাজে। দেহ বয় না, তবু যেতে হয়—নইলে বুড়ো মা আর বাচ্চা দুটো মরে যে!

এই সময়ে—এ জীবন যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন একই সঙ্গে এল মন্বন্তর আর হারাণ। হারাণ ড্রাইভারের চাকরি করত, মিলিটারি চাকরি নিয়ে সরবরাহ-বিভাগে কাজ পেয়েছিল। ওর বন্ধুত্ব ছিল জীবনের সঙ্গে, সেই সূত্রে সামান্য আলাপ ছিল—সাহায্য করবার নাম ক'রে এই সময়ে যাওয়া-আসা বাড়িয়ে দিলে

সে। সাহায্য সে যা করত তাতে বিশেষ কিছু হ'ত না, তবু সেটুকুও ছাড়া যায় না, তখন এমন অবস্থা। তাই ওর মতলব ভালো নয় বুঝেও রতন ওকে 'এসো না' বলতে পারে নি। সেই দুর্বলতারই সুযোগ নিলে হারাণ। প্রস্তাব করলে যে, যদি রতন তার সঙ্গে গিয়ে আলাদা বাস করে তাহ'লে ওর ছেলেমেয়ে এবং মাকে বাঁচাবার মত নিয়মিত মাসিক সাহায্য সে করবে। কিন্তু, ছেলেমেয়েকে রেখে যেতে হবে মায়ের কাছেই—ওদের নিয়ে হারাণ ঘর করতে পারবে না।

ঈশ্বর জানেন, তবু রতন রাজি হয় নি প্রথমে। কিন্তু, চাল যখন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় উঠল, ক্যান্টিনের খিচুড়ি খেয়ে ছেলেমেয়ে দুটোরই পেট ছেড়ে দিলে, মায়ের চেহারা অনাহারে হয়ে উঠল কঙ্কালসার—তখন আর রাজি না হয়ে পারল না। হারাণ চুরি ক'রে চাল-ডাল-ঘি-চিনি এমন কি সিগারেট পর্যন্ত আনে, তার হাতে তখন বিস্তর পয়সা। সে বুড়ীকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা ক'রে দিত রাজি হ'ল—উপরন্তু, কিছু চাল-ডাল। কিন্তু, ঐ এককথা—সে বা ছেলেমেয়ে যেন ওদের ছায়া না মাড়ায়!

'তাই হ'ল। ওদের পাড়া থেকে অনেক দূরে, এই শহরতলীর প্রান্তে ছোট বাড়ি ভাড়া ক'রে ওকে তুললে হারাণ। দেবতার জায়গায় বসাতে হ'ল বানরকে। অপমানে, ঘৃণায় ওর মরে যেতে ইচ্ছা হ'ল। তবু যে মরতে পারল না—সে ঐ গোপালদেরই মুখ চেয়ে। কিন্তু, ওদের স্নেহে যে ওদের এমন একান্তভাবে ত্যাগ করতে হবে তা কি ও স্বপ্নেও ভেবেছিল! হারাণ যে এমন নির্মম হবে তা আগে কিছুতেই বোঝা যায় নি—যেমন জানা যায় নি যে ও মদ খায়, সুযোগ পেলে গাঁজা খায়। জীবন রতনকে কোনোদিন একটা গালাগালি দেয় নি—হারাণের হাতে মার খেতে হ'ল ওকে। তার ওপর সত্যি সত্যিই কোনোদিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেয় না। ছ'মাস তাদের না দেখতে পেয়ে পাগলের মত হয়ে ও হারাণের পায়ে পর্যন্ত ধরেছিল, তাতেও হারাণের মন গলে নি। শেষে রতন যখন ভয় দেখালে যে, সে ওকে ফেলে ছেলেমেয়ের কাছেই ফিরে যাবে—না হয় ওদের হাত ধ'রে পথে পথে ভিক্ষা করবে, তখন হারাণও হঠাৎ ওর গায়ে হাত দিয়ে শপথ করলে যে, তা যদি রতন করে তাহ'লে হারাণও যেখান থেকে হোক ওদের খুঁজে বার ক'রে ওর সামনে গোপালকে আর খুকীকে কেটে দু'খানা ক'রে ফেলবে। তাতে যদি ফাঁসি হয় তো হোক!

কথাটা মনে পড়লে আজও ওর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। এই ক'মাস হারাণের সঙ্গে ঘর ক'রে ওকে চিনতে পেরেছিল ভালো ক'রেই। হারাণের অসাধ্য কিছুই নেই, তার প্রাণের মায়া কম। চুরি-ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোনোটাই তার কাছে এমন কিছু একটা ভয়ঙ্কর কাজ নয়। রতনের প্রতি তার টানটা যত আন্তরিক তত আন্তরিক ঐ শিশু দুটোর প্রতি বিদ্বেষ। তার কেবলই মনে হ'ত যে, ওরাই রতনের মনকে তার কাছ থেকে চুরি ক'রে রেখেছে—নইলে, সে ভালোবাসতে পারত হয়তো হারাণকেও।

শেষে একদিন গোপালই এল ওর কাছে, গোপনে। আট-ন'-বছরের ছেলে মাকে হারিয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে—সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছে মায়ের ঠিকানা—কেউ বলে নি। শেষে এতদিন পরে কী ক'রে খুঁজে পেয়েছে সে।...তাকে জড়িয়ে ধ'রে রতন সেদিন যত কেঁদেছিল পৃথিবীতে সৃষ্টির পর থেকে কোনো নারী বোধ হয় সন্তানের জন্য অত কাঁদে নি।

কিন্তু, সেদিন ছিল হারাণের সকালবেলা ডিউটি। দুপুরবেলা সে এমন হঠাৎ এসে পড়ল যে, রতন কোনোরকম প্রস্তুত থাকবার সুযোগ পেলে না। চোরের মার খেতে হ'ল গোপালকে—ঐটুকু বালককে প্রায় আধমরা ক'রে রাস্তায় বার ক'রে দিয়ে ব'লে দিলে, 'খবরদার! এর পর যদি কোনোদিন আসবার চেষ্টা করিস তো বাকি প্রাণটুকুও শেষ ক'রে দেব। সাবধান!'

পাড়ায় যারা থাকত তারা পরে 'ছি ছি' করলে। কিন্তু, তখন কেউ ঐ দুধের বালককে বাঁচাতে এগিয়ে এল না।

কিন্তু, তবু গোপালের আসা বন্ধ করতে পারে নি। সে লুকিয়ে লুকিয়ে আসত। নন্দরানীর কুটুম থাকে গোপালদের পাড়ায়, তাকে দিয়েই খবরাখবর চলত দু'জনের। সুযোগ সুবিধা পেলে অন্ধকারে লুকিয়ে আসত গোপাল, দু'-পাঁচ মিনিট থেকে চ'লে যেত। ঘন ঘন আসা সম্ভব হ'ত না—যদি পাড়ার লোক কেউ টের পেয়ে হারাণকে ব'লে দেয় এই ছিল ভয়। এমনি তো সন্দেহ ক'রেই মধ্যে মধ্যে মারধোর করে হারাণ।

তারপর এল ওর অগ্নি-পরীক্ষা। নন্দারানীর মারফত-ই খবর পাওয়া গেল খুকীর অসুখ—টাইফয়েড। বোধ হয় বাঁচবে না। নন্দরানীকে দিয়েই লুকিয়ে কয়েকটি টাকা পাঠিয়ে দিলে, শেষ পর্যন্ত একটা ছোট গয়নাও—কিন্তু, তবু দেখতে যাবার অনুমতি পেলে না। হারাণের সেই এক গোঁ—এককথা, 'তোর সামনেই

তাহ'লে তোর ছেলেকে দু'খানা ক'রে কেটে থুয়ে আসব। মা কালীর দিব্যি, গুরুর দিব্যি তোকে ব'লে রাখলাম।'

এরপরে আর সাহসে কুলোয় নি। মেয়ে মরে গেল, তাও দেখা হ'ল না শেষবারের মত। ঘরের মেঝেতে মাথা কুটে আছড়ে কেঁদেছিল রতন, গলায় দড়ি দিয়ে এ ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবন শেষ করতেও গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি ঐ গোপালের মুখ চেয়েই। ছেলেটা হয় তো না খেয়ে মরে যাবে, রতন মলে কি আর হারাণ ওদের দেখবে? কখনই না! হয়তো—এক এক সময় মনে হয়—হারাণকে খুন ক'রে ও যদি গলায় দড়ি দেয় তাহ'লে এ পাপের, এ অনাচারের, এ নিষ্ঠুরতার কিছু শোধ নেওয়া হয়। কতদিন ঘুমন্ত হারাণের মুখের দিকে চেয়ে এ কথা ভেবেছে সে—দুটো কারণে পারে নি। প্রথমত গোপাল আর মা, তারা কী খাবে এই চিন্তাটা মনে এসেছে, দ্বিতীয় কারণটা লজ্জার। কিন্তু, তবু অস্বীকার করা যায় না—হারাণকে খুন করতে ওর হাত উঠবে না। হারাণ সব ছেড়েছে, বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন সব, ওর জন্যই তাতে তো সন্দহ নেই। ওর জন্যই আজ পর্যন্ত সে রতনের মায়ের কাছে প্রতি মাসে ত্রিশটি টাকা পৌছে দেয়। সে ভালোবাসার কথাটা মনে মনে মেনে না নিয়ে পারে না রতন—অন্যায় হয়তো করেছে সে, তবু—সে তো রতনেরই জন্য।

মস্‌মস্‌ ক'রে সামনের রাস্তাটায় জুতোর শব্দ উঠল। হারাণ ফিরছে। রতন তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে। চোখে জল দেখলেই কারণটা বুঝতে বাকি থাকবে না হারাণের—আর তা হ'লেই বকাবকি, গালাগাল শুরু হবে। আজকাল হারাণের অন্য সন্দেহও বেড়েছে, ওর কেবলই ভয় আর কেউ রতনকে হাতছাড়া ক'রে নেবে। সেজন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয়—

হারাণের গলা শোনা গেল বাইরে থেকে, 'আ মরণ, আলো জ্বালে নি কেন? আলো জ্বাল্‌।'

তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা জ্বালে রতন। একটা ছোট চিনির বস্তা ধপাস্‌ ক'রে মেঝেতে ফেলে হারাণ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। তারপর বললে, 'চোখে জল কেন?—কান্না হচ্ছিল বুঝি? কার মুখে খবর এসে পৌছল? পাড়ার দূতগুলি জুটেছে ভালো!'

'কী খবর?' আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে রতন।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে মুখটা ভালো ক'রে দেখা যায় না। তাই বিস্ফারিত নেত্রে সন্দিগ্ধভাবে হারাণ চায় ওর মুখের দিকে। সবটা অভিনয় কিনা বুঝতে পারে না।

রতন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল এবার, 'ওগো তোমার ছু'টি পায়ে পড়ি, কার কী হয়েছে বলো।······তুমি মানুষ, না, কী গো? গোপালের কি অসুখ করেছে?'

রতন সত্যি-সত্যিই ওর পায়ে ধরতে গেল। হারাণ আস্তে আস্তে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে কঠিন-কণ্ঠে শুধু বললে, 'হুঁ!'

তারপর ধীরে-সুস্থে পোশাক ছেড়ে কলতলার দিকে চ'লে গেল, যাবার সময় উঠোন থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'চা কর্।'

রতন চোখের জল মুছে উঠে বসল। আজ মদের গন্ধ নেই মুখে, কোথা থেকে শুধু গাঁজা খেয়ে এসেছে—আজ কিছুতেই ওকে নরম করা যাবে না তা সে জানত। তবু, খবর ওর চাই-ই আজ গোপালের, আজ ওকে মেরে ফেললেও নড়বে না। এমন ক'রে বেঁচে লাভ নেই, যা হয় হবে।

কলতলা থেকে স্নান ক'রে ভিজে মাথাতেই ঘরে এসে দাঁড়াল হারাণ।

'কৈ—উঠলি না? জল চাপিয়েছিস চায়ের?'

'না। তুমি আজ গোপালের খবর না দিলে আমি কিছুতেই উঠব না।'

'হুঁ।' দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে হারাণ, 'মরণ-বাড় বেড়েছে তোর, বুঝেছি। চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘা-কতক না দিলে চৈতন্য হবে না!'

অকস্মাৎ নিরীহ রতনের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখ, বারবার মরণের ভয় দেখিও না। মরতে আমিও জানি—শুধু গোপালের জন্যই তো আমার বেঁচে থাকা—সেই গোপালই যদি যায় তাহ'লে কিসের ভয় আমার! মরতেও পারি, মারতেও পারি—আমি নড়ব না এখান থেকে, কী করবে কর—'

সে মুখের চেহারা হারাণের অপরিচিত। কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে সে বললে, 'আ মুখে আগুন তোমার, গোপালের কী হয়েছে, কী? গোপালের কথা কে বলেছে? বুড়ী হঠাৎ দাওয়া থেকে প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। আমি বলি সেই খবর পেয়েই—তাহ'লে ও কান্নাটা কিসের হচ্ছিল?'

আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে হারাণ। ম্লান আলোতে ওর মুখটা দেখবার চেষ্টা করে।

কিন্তু, রতন আর দাঁড়াল না। চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল। মায়ের পা ভেঙেছে শুনে সে যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, অর্থাৎ গোপালের কিছু হয় নি এইটিই যে তার কাছে সেই মুহূর্তে বড় হয়ে উঠেছিল, এজন্য সে লজ্জিত। বেচারী মা, তার জন্য কত লাঞ্ছনাই সইছে, এমন বিপদে কে যে মুখে একটু জল দেয় তার লোক নেই। গোপালই বা কী খাবে কে জানে, কে রেঁধে দেবে তাকে।

সজ্জিত অন্নব্যঞ্জনের দিকে চেয়ে রতনের দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল আসে। প্রতিদিনই তার মুখের ভিতর গিয়ে সুখাদ্য সব বিষিয়ে ওঠে এমনি ক'রে—বুভুক্ষু সন্তানের মলিন মুখ যখন মনে পড়ে।

অনেক রাত্রে কী একটা শব্দ পেয়ে রতনের ঘুম ভেঙে যায়। সে জেগেই ছিল বহুক্ষণ, রাত বারোটারও পর বোধ হয় তার তন্দ্রা এসেছে। কী একটা যেন ধ্পাস্ ক'রে পড়ল।

কিন্তু, তার আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্যে শব্দটা ভালো ক'রে পৌঁছবার আগেই একটা হৈ হৈ উঠল পাশের বাড়ি থেকে 'চোর! চোর!' সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের বাড়ি,—এধারে নন্দদের বাড়ি থেকেও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল—'চোর—চোর! হারাণদা! হারাণ! চোর এসেছে, চোর!'

হারাণ এক লাফে বিছানা থেকে নেমেই দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। 'কী হয়েছে হে ফকির?'—হাঁক দেয় হারাণ।

'চোর এসেছে হারাণদা, তোমাদের বাড়িতেই উঠছিল পাঁচিল বেয়ে। ঐ যে মোহনলাল ধরেছে ওকে—এস এস বাইরে এস।'

পাগলের মত বেরিয়ে যাচ্ছিল রতন—এক ধাক্কায় তাকে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে হারাণ দোরে শেকল তুলে দিলে। ব্যাপারটা সেও আগেই অনুমান করেছিল, বোধ হয় রতনেরও আগে—

পাঁচ-ছ'জনের জটলার মধ্যে গোপাল দাঁড়িয়েছিল শুষ্কমুখে। চড়, লাথি গুঁতা ইতিমধ্যেই পড়েছে তার ওপর—কিন্তু সে কাঁদে নি, একটা কথাও উচ্চারণ করে নি, মায়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে নি। সে যে মায়ের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিল, দিদিমার অবস্থা খারাপ দাঁড়িয়েছে এ খবরটা যেমন ক'রে হোক মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই সে যে পাগলের মত এমন কাজ করতে গিয়েছিল—অপটু হাত-পা শেষ পর্যন্ত ঠিক পাঁচিল বেয়ে উঠতে পারে নি, হঠাৎ ফসকে প'ড়ে

গিয়েছে, এ সব একটি কথাও সে বললে না, শুধু হারাণকে দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

হারাণের মুখে চোখে একটা ক্রুর এবং হিংস্র আনন্দ ফুটে উঠেছিল, সে গলার স্বরে ব্যঙ্গ টেনে এনে বললে, 'এই যে, এই বয়সেই এ সব রপ্ত হয়েছে—বা, বেশ, বেশ! হবে না, কী ঝাড়!'

ফকির অবাক্ হয়ে বললে, 'একে চেনো নাকি হারাণদা?'

হারাণ ঢোঁক গিলে বললে, 'ওর বাপকে চিনতুম। যেমন বাপ তেমনি বেটা! দাও না দু'চার ঘা, দাঁড়িয়ে আছ কেন সব? মারই ওর ওষুধ!'

সে নিজেও দিলে একটা চড়, মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল গোপাল, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

তারপর শুরু হ'ল আর এক দফা কিল-চড়-লাথি। হারাণ আর মারে নি, সে কান পেতে শুনছিল বদ্ধদ্বারের মধ্য থেকে রতনের কান্না—আর দোরে মাথা খোঁড়ার শব্দ!

গোপাল যখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে এসেছে—ভিড়ের মধ্য থেকে কে বললে, 'ওকে অত মেরো না হে, একেবারে বাচ্চা! ...বরং পুলিশে দাও—'

কিন্তু, কী ভেবে হারাণ বললে, 'থাক থাক পুলিশে দিতে হবে না।—দাও, এমনি দু'চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও—'

ইতিমধ্যে নন্দরানী বেরিয়ে এসেছিল, সে ভিড় ঠেলে এই সময় এগিয়ে এসে বললে, 'ওমা—এ যে গোপাল, রতনদিদির ছেলে! আহা বাছারে, বুঝি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল লুকিয়ে—প'ড়ে গেছে। বাছা আমার, ষাট ষাট!'

উগ্র হিংস্রতায় হারাণের মুখচোখ বীভৎস হয়ে উঠল। সে মুখ ভেঙিয়ে বললে, 'হ্যাঁ দুপুর-রাতে পাঁচিল ডিঙিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল! চোরের ঝাড়! খেতে দিই কিনা, তাই আমারই চুরি ক'রে শোধ দিচ্ছিল।' কিন্তু, সংবাদটা শোনবার পর সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, হারাণ কোথাও থেকে কোনো অনুমোদন পেলে না—আর সেটা সে সকলকার হঠাৎ-থমথমে ভাবে নিজেও বুঝতে পারলে।

চেঁচিয়ে উঠল শুধু নন্দরানী, 'থামো থামো! তুমি মুখ নেড়ো নি বাপু, তুমি যা পিশেচ, এ পাড়ার কে না জানে তোমাকে! দুধের ছেলেটাকে দেখা করতে দাও না মায়ের সঙ্গে, মেয়ে মরে গেল তা একবার দেখতে দিলে না!...

রতন দিদিমণি ভালোমানুষ তাই, পড়তে আমাদের মত মেয়ের পাল্লায় তো নাক কেটে ছেড়ে দিতুম।'

কী জানি কেন, হারাণ আর আস্ফালন করলে না—বরং চারপাশের নিঃশব্দ তিরস্কার থেকে আত্মগোপন করবার জন্য বাড়ির ভেতর ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে

## উপার্জন

যদিও ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল এবং স্টেশন-মাস্টার জানিয়ে দিলেন যে,কাল সকালের আগে আর কলকাতায় যাবার গাড়ি নেই, তবু হরকুমার একটা তৃপ্তির নিশ্বাসই ফেললে। যাক্‌গে ট্রেন—অত ছুটোছুটির তার দরকারই বা কী? না হয় একটা দিন গেলই।

হরকুমার স্টেশনের বাইরে এসে বেশ প্রসন্ন মুখেই চারদিক তাকালে। আজ তার সবই ভালো লাগছে। সত্যিই, আর তার কোথাও কোনো তাড়া নেই—তার কাজ একরকম শেষ হয়েছে, পুরস্কারও সে পেয়েছে মোটা। একসময় ছিল, যখন তার উদ্বেগ দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না এমন ক'রে গাড়ি ফেল হ'লে, কিন্তু আজ সে নিশ্চিন্ত। মাটি তৈরি করা, বীজবপন থেকে শুরু ক'রে বৃক্ষপালন পর্যন্ত তার সব কাজ সারা হয়ে গেছে, এমন কি ফল-সুদ্ধ তার গৃহজাত হয়েছে, বাকি আছে শুধু ভোগ—তাতে তাড়া কী? ধীরে সুস্থে করলেই হবে।

অবশ্য কাজ যে করবার নেই তা নয়, অনেক টাকাকে কি আর আরও অনেক করা যায় না! খুবই যায়, কিন্তু সে ইচ্ছে তার আদৌ নেই। ওর মনে মনে বরাবরই সম্পদের একটা সীমারেখা টানা ছিল, কল্পনার সে সীমাকে বাস্তব যখন ছাড়িয়ে গেছে তখন আর দরকার কী! এই যুদ্ধ যখন বাধল তখন সবাই বলাবলি করেছিল যে, বাতাসে টাকা উড়বে এবার, যে ধ'রে নিতে পারবে সেই বড়লোক। কথাটা তখন বুঝতে পারে নি হরকুমার। ওর ছোট্ট মুদিখানার দোকানে ব'সে তামাক খেতে খেতে পাঁচজনকে ডেকে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করত। ইস্কুল ছেড়ে ও চাকরি করতে যায় নি—চাকরি যত মোটাই হোক, আয় যে তার সীমাবদ্ধ, তা হরকুমার জানত। তাই

ছোটভাইকে নিয়ে কলকাতার শহরতলীতে ও অল্প বয়সেই মুদিখানার দোকান খুলেছিল। পাড়ার লোকে বলাবলি করত, 'বামুনের ঘরের গরু—মুদিখানার দোকান খুলে ভদ্রলোকের মুখ ডোবালে'—কিন্তু, তাতে শুধু সে হাসত, কখনও তাতে নি।

যাই হোক—ক্রমশ ব্যাপারটা সে বুঝল। যথাসর্বস্ব খুইয়ে সে পাগলের মত দাঁতমাজা বুরুশ, লেখবার কালি, কাঠের বোতাম এই সব কিনে ঘর বোঝাই করলে—তাতে আয় বাড়ল, কিন্তু সে-ও এমন কিছু নয়। মিলিটারি কন্‌ট্রাক্টের জন্য ছুটোছুটি ক'রে সামান্য যে সব উচ্ছিষ্ট ওর অদৃষ্টে জুটতে লাগল তাতেও পেট ভরে না—যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, লাভ সে পরিমাণ মেলে না। যাদের টাকার জোর আছে তারা চুপ ক'রে ব'সে থেকে এর চেয়ে ঢের বেশী লাভ করে—এই ব্যাপারেই। হরকুমার সবই দেখত, সবই বুঝত—অথচ কিছুই করতে পারত না, শুধু হাত কামড়াত। টাকা তার ঘরে আসছে বটে, কিন্তু এত ধীরে যে, টাকা কোনো কাজে লাগে না।

তারপর একসময় ভাগ্যলক্ষ্মী হঠাৎ মুখ তুলে চাইলেন—এল পঞ্চাশের মন্বন্তর। তার আভাস পেয়েই হরকুমার ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—না হয় সব যাবে, আবার সেই মুদির দোকান ভরসা করবে। অবশ্য তা আর করতে হ'ল না। বারো টাকার চাল যখন চল্লিশ টাকায় বিক্রি হ'ল তখনও হরকুমার ছাড়ে নি, অল্প লাভে বিচলিত হবার লোক সে নয়। গোপনে ষাট পঁয়ষট্টি, এমন কি সত্তর টাকাতেও বিক্রি করেছে সে চাল। চাল আর লোহা—হঠাৎ যেন হাজার হাজার টাকা সেধে ঘরে আসতে লাগল, না চাইতেই। শুধু তাই নয়, সেই টাকারই পথ ধ'রে বোধ হয়, কন্‌ট্রাক্ট আসতে শুরু হ'ল মোটা মোটা। ধলভূমগড়ে বাঁশ আর গৌহাটিতে খড়, পার্বতীপুরে রেলের লাইন পাতা—কোনো কন্‌ট্রাক্টেই পিছ-পা হয় না হরকুমার। একটা মানুষ দশটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্য কন্‌ট্রাক্টররা কুলি পায় না, অথচ ওর কাজে লোকের অভাব নেই। তার কারণ ও বরাবরই জানে যে, বেশী লোভ করা ঠিক নয়। টাকা যেমন সে পেয়েছে, লোকজনকেও দিয়েছে দু'হাতে। সাহেবরা ঠিকাদার হিসাবে তাকেই পছন্দ করতেন বেশী, তার কারণ অসম্ভব শব্দ তার অভিধানে ছিল না। তাঁদের সে প্রীতির সুযোগও হরকুমার কম নেয় নি। একই খড় কাগজে কলমে পুরিয়ে দিয়ে দু'বার সরবরাহ করা হয়েছে,

একটা দেওয়াল-গাঁথার মজুরি তিনবার বিল করা হয়েছে। তাতে সে নিজে খুশী ছিল, ওপরওয়ালাদের খুশী ক'রে দিয়েছিল—ষাট টাকা দিয়ে হুইস্কির বোতল কিনে সাহেবদের ঘর বোঝাই ক'রে দিয়েছে সে।

এইখানেই কিন্তু চুপ ক'রে থাকে নি হরকুমার। টাকা যেমন ঘরে এসেছে, তেমনিই খাটিয়েছে সে। বড় জমি একসঙ্গে কিনে ছোট ছোট প্লটে বিক্রি করেছে। ঠিকাদারির দৌলতে মাল-মসলা যোগাড় ক'রে সে ছোট বাড়িও তৈরি করেছিল খানকতক, সব ক'টাই মোটা লাভে বিক্রি হয়ে গেছে। কাগজ, ছাপাখানা থেকে শুরু ক'রে ওষুধ পর্যন্ত, কালোবাজারে কোনো ব্যবসাটাই তার ফাঁক যায় নি। তার ফলে আজ সে দশ-বারো লক্ষ নগদ টাকা, কলকাতা ও শহরতলীতে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা জমি এবং খান-আষ্টেক-দশ ভাড়াটে বাড়ির মালিক। দু'তিন বছরেই এই অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য ওর হাতে এসেছে। এছাড়া খুব বড় একটা চলতি ছাপাখানা কিনেছে সে, তার সঙ্গে একটা পেটেণ্ট ওষুধের কারবার। বড় বড় কয়েকটা কোম্পানিতে শেয়ারও কিনে রেখেছে—আর ছুটোছুটি করবার তার দরকার নেই। মুদির দোকানটা সে ছোটভাইকে দিয়ে দিয়েছে, তাকে একখানা বাড়িও ক'রে দিয়েছে। মায়ের পেটের ভাইকে সে দেখে নি এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। ব্যস্—এইবার তার ছুটি।

বাইরে তার যা কিছু ছিল সব আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়েছে, বাকি ছিল এখানকার দেনা-পাওনা মেটানো—আজ তাও শেষ ক'রে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সব চুকিয়ে দিয়েও সাতাশ-শ' টাকা নগদ এবং একখানা ষোল হাজার টাকার চেক পকেটে ক'রে ফিরছে সে।

এইবার সে চায় জীবনটা একটু উপভোগ করতে। দার্জিলিঙে, মিহিজামে আর পুরীতেও একখানা ক'রে বাড়ি আছে তার। সে একমাস ক'রে কলকাতায় আর একমাস ক'রে এই সব জায়গায় কাটাবে—এই তার কল্পনা। যে দুটো ব্যবসা হাতে রইল তাতে বেশি কিছু করতে হবে না, মধ্যে মধ্যে এসে দেখে গেলেই হবে। পুরানো কর্মচারী আছে, সবাই বেশ বিশ্বাসী আর পাকা। তাছাড়া বাঙালী কেরানীরা পুকুরচুরি করতে সাহস পায় না তাও সে জানে।

হরকুমার আর একবার উজ্জ্বল চোখে চারদিকে তাকালে। সারাজীবন ছুটোছুটি করা আর ভূতের ব্যাগার খাটা মূর্খের কাজ। পয়সা যদি ভোগ করাই না গেল তো রোজগার ক'রে লাভ কী? সে থামতে জানে, থেমেওছে।

এইবার সমস্ত রকমে উপভোগ করবে সে এই হঠাৎ-পাওয়া সম্পদ। নাই বা হ'ল সে বিড়লার মত বড়লোক। অত পয়সা কী কাজে লাগত তার? বড়জোর খবরের কাগজে নাম ছাপাবার জন্য কিছু দান করতে পারত—এইতো। অপরের ভোগের জন্য নিজে সারাজীবন খেটে যাওয়ার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না হরকুমার, নিতান্ত আহাম্মকি ব'লে বোধ হয়। ভারতবর্ষটা ভ্রমণ করবে সে —সপরিবারে নয়, মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সে পছন্দ করে না—একা ফার্স্ট ক্লাসে চ'ড়ে—সঙ্গে শুধু একটা ছোকরা চাকর থাকবে। বিভিন্ন প্রদেশের জলহাওয়া, খাবার এবং স্ত্রীলোক সবই সে পরখ ক'রে দেখতে চায়। সঙ্গে বেশী লোক থাকলে অসুবিধা। এতে তার বড়জোর হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হবে, হিসেব ক'রে দেখেছে সে। বিলেতে যাবার ইচ্ছে নেই—সেখানে নাকি বারোমাসই বর্ষা হয়, তাছাড়া যত পয়সাই তার হোক না কেন সমস্ত পৃথিবীটা দেখা কারুর পক্ষেই যখন সম্ভব নয়, তখন সে চেষ্টা না করাই ভালো। যারা সারা-জীবন পয়সাই রোজগার ক'রে যায় তারাও তো পৃথিবী ঘোরবার সময় পায় না। সুতরাং, তাতেই বা সুবিধা কী? কখনও যদি আমেরিকা বা জাপান, কি ঐ রকম দেশে, যাবার ইচ্ছে হয় তো সে চ'লেই যেতে পারবে, সে টাকা তার আছে।

ট্রেন চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়াটে গাড়িগুলো একে একে স'রে পড়তে শুরু করেছিল। আবার সেই রাত দশটায় ট্রেন আসবে কলকাতা থেকে, তখন গাড়ির দরকার। শেষ একখানা গাড়ি হরকুমারের মুখ চেয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, আর থাকতে না পেরে তার গাড়োয়ান হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বাবু, গাড়ি চাই নাকি?'

'গাড়ি? ন্-না! গাডি চাই না।'

গড়ি চ'ড়ে সে আর কোথায় যাবে? কোথাও পৌঁছবার যখন তাড়া নেই, তখন মিছিমিছি গাড়ি চেপে লাভ কী? কোথাও রাতটা কাটাতে হবে এই তো? তা তার জন্যও বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। এ শহরের ডাকবাংলো, হোটেল সবই ওর পরিচিত—তবে ওর সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নেই, এই যা বিপদ। হোটেল কি ডাকবাংলোয় থাকতে হ'লে একটা বিছানা চাই। পূজার পর, এখন প্রথম শীতের সময়—বাইরে হিমে প'ড়ে থাকাটা খুব আরাম-দায়ক নয়।

অবশ্য, হরকুমারের ওষ্ঠের প্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, যে সব স্থানে গেলে বিছানার জন্য ভাবতে হয় না—সে সব বাড়ি তো রয়েছেই! সেই

বিশেষ পল্লীটা যে এই শহরের কোথায়, তাও হরকুমারের জানা ছিল। বছরখানেক আগে এক পাঞ্জাবী ঠিকাদারের সঙ্গে তাকে আসতে হয়েছিল, যদিও সে বেশীক্ষণ থাকে নি। তখন একটা রাত কোথাও বৃথা কাটাবার কথা হরকুমার ভাবতে পারত না।

আজ গেলে মন্দ হয় কি? আজই তো সে সম্পূর্ণ ছুটি পেলে তার জীবনযুদ্ধ থেকে, এই তো উপযুক্ত দিন। অতঃপর যদি জীবনটা উপভোগ করতেই হয় তো আজ থেকেই শুরু করা যাক না—

হরকুমার একটু ন'ড়ে চ'ড়ে উঠল। গাড়িটা চ'লে গেছে বটে, তবে গাড়ির দরকারও ছিল না—পল্লীটা এমন কিছু দূরে নয়। সে স্টেশন-এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে বাঁদিকের রাস্তাটা ধরলে। এই ভালো, একটা ডেরায় পৌঁছে তাদের দিয়েও হোটেল থেকে কিছু খাবার আনানো চলবে। লুচি কিংবা পরোটা আর মাংস—

এখানে নিজে কখনও আসে নি বটে, তবে ঠকবার লোক সে নয়, কোথায় খবর নিতে হয় তা জানে। গলিতে ঢোকবার মুখেই যে চালাটায় চায়ের আর পানের দোকান, সেইখানে পান-সিগারেট কেনবার অছিলায় দাঁড়িয়ে খবর নিলে সে। ভালো মেয়েমানুষ? হ্যাঁ, আছে বৈকি! চেহারা যদি চান তো সুশীলা, একেবারে কাঁচা সোনার রঙ্—তবে মানুষ ভালো হচ্ছে আমাদের চাঁদু, ও এ পথে নতুন, বেশী দিন আসে নি, বেশ মেয়ে!

রূপে লোভ নেই হরকুমারের, রাতটা কাটাতে হবে কোথাও, মানুষটাই ভালো হওয়া দরকার। একটু সেবা, দুটো মিষ্টি কথা—ব্যস্! সে সিগারেটটা দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিয়ে (দেশলাই বাঁচাবার অভ্যাস এখনও যায় নি তার) মুখ তুলে প্রশ্ন করলে, 'তাহ'লে চাঁদুর বাড়িটা কোন্ দিকে হ'ল ভাই?'

'ঐ যে সোজা গিয়ে ডান-হাতি, টিনের বাড়ি টিনেরই দেওয়াল দেখছেন—হ্যাঁ, ঐটে—'

তা চাঁদু মানুষটা সত্যিই ভালো। খুশী না হয়ে পারলে না হরকুমার। ঘরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদু ওর জুতাটা খুলে নিলে, কোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখলে পেরেকে, তারপর ফরসা তোয়ালে ভিজিয়ে মুখ-হাত-পা মুছিয়ে দিয়ে একটা মোটা তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে ব'লে গেল, 'আরাম ক'রে বসুন—তামাক খান তো? তামাক সেজে আনি।' চাঁদুকে মোটে ব'লে দিতেই হ'ল না যে, সারাদিন

ঘোরাঘুরির পর একটু বিশ্রাম করতেই এসেছে, কেমন ক'রে যেন চাঁদু নিজেই বুঝতে পারলে। ওর ঘরের আসবাবগুলোও ভালো, এ রকম মফঃস্বল শহরে হরকুমার মোটেই এত পরিচ্ছন্ন ঘর ও পরিষ্কার শয্যা আশা করে নি। পান'ওলাটা মিছে কথা বলে নি, ভালো সন্ধানই দিয়েছে সে।

তামাক সেজে এনে দিয়ে চাঁদু প্রশ্ন করলে, 'চা খাবেন? চা করব?'

'চা? হরকুমার ওর শ্যামবর্ণের সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'চা অবশ্য আমি একটু আগেই খেয়েছি, তবু খেতে বাধা নেই, কর একটু। তবে—'

তবেটা যে কী, তা হরকুমার ভাঙ্‌লে না। আসলে ও কিছু খেতে চায়। কিন্তু, এ সব ক্ষেত্রে তার আগে টাকা বার ক'রে দিয়েই খাবার ফরমাশ করা উচিত ব'লে সে চেপে গেল। একেবারে রাত্রের খাবার আনতে দেবে সে—বারবার খাবার আনালে চাঁদু কী মনে করবে।

চাঁদুও 'তবে'র পিছনে কী আছে প্রশ্ন করলে না। ওর ফিরতে একটু দেরিই হ'ল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে চা আর চারটি চিঁড়ে ভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকল চাঁদু। একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'ঘরে স্টোভ থাকলে কী হবে—কেরোসিন নেই তো! গুল জ্বেলে তবে চা করতে হ'ল। এখানে আর যারা আছে, হোটেল থেকে চা আনিয়ে দেয়, আমার সে ভালো লাগে না। হোটেলে যা ছিরির চা!'

ওর আন্তরিকতা এবং যত্নে মুগ্ধ না হয়ে পারল না হরকুমার। বহুদিনের কর্মক্লান্ত দেহ ওর, সত্যকথা বলতে কি, একটু গৃহসুখই চাইছিল। বেশ্যাবাড়ি এসে সেটা ঠিক বেশ্যাবাড়ির মত না দেখালে অনেকে হতাশ হয়। কিন্তু, হরকুমার সে দলের নয়, এখানে এসে হঠাৎ পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পেয়ে সে খুবই খুশী হয়ে উঠল।

আরাম ক'রে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললে, 'আঃ!…কেরোসিন পাচ্ছ না বুঝি মোটেই? আচ্ছা, মনে ক'রে দিও যাবার সময়। এখনকার কেরোসিনের এজেন্ট যে, সে আমার আলাপী লোক, তাকে একখানা চিঠি দিয়ে যাব'খন, তোমার অন্তত কেরোসিনের অভাব থাকবে না।'

ও যে এই শ্রেণীর যত্নে খুশী হয়েছে তা বুঝতে পেরে চাঁদুরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাছে এসে ব'সে হরকুমারের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে একসময় বললে, 'খাবার কি হোটেল থেকে আনাব, না নিজে করব?…করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। তবে যদি আমার হাতে খেতে না চান তাহ'লে হোটেল থেকে আনাতে হবে—'

'না না, সে কী কথা।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হরকুমার, 'সে কী কথা! আমরা কোথায় না খাচ্ছি যে, তোমার হাতে খাব না। তা নয়, তবে তোমার কষ্ট হবে ব'লেই—'

'আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না।' গলায় জোর দিয়ে বললে চাঁদু, 'এই তো সবে সন্ধ্যে, একটু মাংস আনিয়ে নিই। পরোটা আর মাংস সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যেই হয়ে যাবে। উনুনে আঁচ দিই, কেমন?'

আলস্য ও আরামে জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে হরকুমার, 'দাও। মোদ্দা একেবারে আমাকে একা ফেলে রেখে দিও না, মধ্যে মধ্যে কাছে এসে বোস—বসবে তো? এই নাও—'

সে শার্টের পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল চাদুর সামনে। তারপর বাকি চা-টুকু এক চুমুকে পান ক'রে নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পিঠটা ছড়িয়ে আবার ও একটা আরামের শব্দ ক'রে উঠল, 'আঃ—!'

চাঁদুকে আরও কাছে টেনে এনে হরকুমার বললে, 'সারারাতই দেখছি গল্প ক'রে কেটে যাবে।...রাত ওধারে তিনটে বেজে গিয়েছে।...বেশ লোক কিন্তু তুমি। মাইরি! খুব ভালো লাগছে তোমাকে, তোমার কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। যেভাবে তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে রাত কেটে গেল, মনে হচ্ছে যেন আমার বিয়ে-করা পরিবার, নতুন বৌ। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এমনি কাটত বৌয়ের সঙ্গেও—সে কতকালের কথা, কিন্তু, এখনও বেশ মনে আছে আমার, চোখ বুজলেই চোখের সামনে দেখতে পাই।'

চাদু ওর আলিঙ্গনের মধ্যেই যেন শিউরে উঠল। কতকালের কথা বটে, তবে তারও অমনি সব কথাই মনে আছে! চোখ বুজলে এখনও সে সব দেখতে পায়। তার বর কোন্ স্যাকরার দোকানে কাজ করত, আয় সামান্য, দেখতেও এমন কিছু ভালো ছিল না, তবু চাঁদু তাকে সেদিন সত্যিই ভালোবেসেছিল। তার সে বরের সঙ্গে সেদিন সে স্বর্গের দেবতাকেও বদল করতে রাজি ছিল না।...মনে আছে, সেও এমনি ক'রে সারারাত গল্প ক'রে কাটিয়ে দিত এক-একদিন, আবার ভোরের দিকে চাঁদুকেই দুষত, বলত, 'বলি এ কাণ্ডটা কী করলে বল তো? কাল দোকানে গিয়ে কাজ করতে হবে না?—কাজ করব, না ঢুলব?' কিন্তু, তার মুখ দেখলে মনে হ'ত সে মোটেই বিরক্ত হয় নি, বরং

খুশীই হয়েছে।...আজ তার কথা মনে হ'লে লজ্জায় অপমানে ওর যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ ওর চমক ভাঙল একসময়। শুনতে পেলে হরকুমার বলছে, 'তোমাদের কি এই অঞ্চলেই বাড়ি? এইখানেই আছ বরাবর?'

'ওমা ছি!' গলায় জোর দিয়ে বলে চাঁদু, 'বাড়ি আমাদের হুগলী জেলায় ছিল। যখন আর উপায় রইল না, এই পথেই পা দিতে হ'ল, তখন এখানে পালিয়ে এলুম। অনেক দূর, দেশের লোক কেউ জানতে পারলে না। নিজের দেশে থেকে কি কেউ এ কাজ করতে পারে?...'

হ্যাঁ, সেদিনের কথা চাঁদুর মনে আছে বৈকি! ওর বর যখন মারা গেল তখনও শ্বশুরবাড়ি ছাড়ে নি, পরের বাড়ি কাজ ক'রে, ধান ভেনে ও বুড়ী শাশুড়ীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জিনিস-পত্রের দাম যখন চড়তে শুরু হ'ল তখন আর সেই সামান্য আয়ে কুলোত না, তবু চাঁদু হাল ছাড়ে নি—একবেলা খেয়ে, একদিন অন্তর খেয়েও চালাচ্ছিল। জমিজমা বিশেষ কিছু ছিল না কখনই— যেটুকু ছিল অক্ষয়ের অসুখের সময়ে বাঁধা পড়েছিল সব। সেটাও বিক্রি ক'রে দিলে, কিন্তু তবু সে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে কতক্ষণ আর সে ক'টা টাকা? তারপর এল পঞ্চাশ সাল—চাল কোথাও নেই—একমুঠো টাকার বদলে দু'-মুঠো চাল এই হিসেবে বিক্রি হ'তে শুরু হ'ল। অত টাকা গতর খাটিয়ে মেলে না, ভিক্ষে ক'রে একঘটি ফ্যানও পাওয়া যায় না। ঘটি-বাটি-কাপড়—যা যেখানে ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল, তারপর আরম্ভ হ'ল নিরম্বু উপবাস। হয়তো নিজে সেদিন সে উপবাস ক'রে মরতেও পারত, কিন্তু বুড়ী শাশুড়ীর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে নি সে। শুধু সেই জন্যই ও প্রথম এ পথে পা বাড়ায়—এইটুকু ওর সান্ত্বনা। হয়তো ঈশ্বর ওর এই পাপ ক্ষমা করতেও পারেন। গ্রামের হিন্দুস্থানী দোকানদার গোপনে ওকে সের পাঁচেক চাল দিয়েছিল, তার বদলে নিয়েছিল ওর ইজ্জত—

আর একবার শিউরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'অমন শিউরে উঠছ কেন বল তো বারবার? শীত করছে?'

'না অমনি—' অপ্রতিভ জবাব দিলে চাঁদু।

হরকুমার বললে, 'না, তোমার কাছে এসে বড় খুশী হয়েছি। সম্ভব হ'লে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম, কিন্তু দেশে-ঘাটে আর এসব করতে চাই না। আমার বউও বড় দজ্জাল। যদি কখনও বাইরে বেরুই তখন তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব—আচ্ছা সে পরের কথা।'

তাড়াতাড়ি সামলে নিলে হরকুমার। আবেগের মাথায় কিছু ব'লে ফেলা ঠিক নয়, ওতে ঠকতে হয়। নানা অভিজ্ঞতা সে চায়—ঘরের স্ত্রী তো নয় যে, একজনকে নিয়েই জীবন কাটাতে হবে।

চাঁদু হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আপনি কী করেন?"

'আমি?' হেসে বললে হরকুমার 'আমি করতুম আগে ব্যবসা, আজ থেকে ছেড়ে দিয়েছি। আর কিছুই করব না।'

'তবে?'

'মানে, তবে চলবে কিসে? এইতো জানতে চাইছ? চলবে—তার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি। অনেক টাকা করেছি এই যুদ্ধের বাজারে, বুঝেছ? অনেক টাকা! আর কিছু রোজগার না করলেও চলবে। দিন যদি ভালো ভাবে চ'লেই যায়, বেশী খেটে লাভ আছে কিছু? তুমি কী বলো!'

'তা-তো বটেই' চাঁদু উত্তর দিলে, 'এত টাকা কিসে কিসে করলেন?'

'এই সব নানা রকম ব্যবসা। তবে বেশী টাকা পেয়েছি গত বছরের আগের বছর চাল বেচে।'

চাল! আবার সব অপ্রিয় কথা মনে প'ড়ে যায় চাঁদুর। চাল! আগে যা সামান্য জিনিস মনে হ'ত। তারাও কত চাল ভিক্ষে দিয়েছে,—মুঠো—মুঠো! গরিবের সংসার, কিন্তু কেউ ফিরে যায় নি কোনোদিন ওদের দোর থেকে। চাল ভাত—এ-যে আবার দিতে কষ্ট হয় তা-ই জানা ছিল না। অথচ, সেই চালের জন্য কী না করতে হ'ল! চাঁদুর বাবা, মা, ভাইরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতা যাচ্ছিল, কতক পথে মারা গেল, কতক কলকাতা পৌঁছে। মরবার আগে শেষ দেখা পর্যন্ত হ'ল না—হয়তো তাদের দেহগুলোরও সদ্‌গতি হয় নি, কোথায় খানায় প'ড়ে পচেছে, নয়তো ডোমে কুড়িয়ে ফেলে দিয়েছে!

সে মরতে পারে নি—বড় যন্ত্রণা! তাকে ইজ্জত দিতে হয়েছিল, নিজের জন্য যত না হোক্—বুড়ী শাশুড়ীর মুখ চেয়ে আর থাকতে পারে নি। অক্ষয় যে মরবার সময় ওর হাতেই বুড়ো মায়ের ভার দিয়ে গিয়েছিল!···কিন্তু, অত ক'রেও শাশুড়ীকে বাঁচাতে পারে নি সে। চাল যখন এসে পৌঁছল, তখন দীর্ঘ উপবাসে হজম করার শক্তি চ'লে গিয়েছে তার, ভাত খেতে পারল না। শাশুড়ী ম'রে পড়েছিল ঘরে, দু'দিন সৎকার করার লোক পাওয়া যায় নি, সেই হিন্দুস্থানীটাই লোক ঠিক ক'রে দেয় তার পরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চাঁদুর মাথা যেন গরম হয়ে ওঠে। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল।

'কী হ'ল?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে হরকুমার।

'কিছু না। মাথাটা কেমন করছে, একটু জল দিয়ে আসি।'

হিন্দুস্থানীটাই ওকে রেখে দিতে চেয়েছিল। চাল টাকা সব দেবে ভরসা দিয়েছিল, কিন্তু সে প্রবৃত্তি ওর হয় নি। শাশুড়াকেই যখন বাঁচাতে পারলে না, তখন স্বামীর ভিটেতে ব'সে পাপ আর সে করতে পারবে না। গ্রামের আর একটি মেয়ে এখানে চ'লে এসেছিল, এই শহরের নামটা সে জানত। তাই একদিন চ'লে এল এখানেই। পাপ যদি করতেই হয় সোজাসুজি করাই ভালো।

মাথায় জল দিয়ে এসে বসতেই হরকুমার প্রশ্ন করলে, 'এমন ঠাণ্ডার দিনে মাথায় জল দিয়ে এলে? শরীর কি খারাপ নাকি?'

'না—ও আমার মধ্যে মধ্যে হয়'।

'না, না, ও ভালো কথা নয়। ভালো ক'রে চিকিৎসা করিয়ো।' কণ্ঠে সস্নেহ উদ্বেগ ফুটে ওঠে হরকুমারের। 'টাকা তো এখন ভালো রোজগার হবারই কথা তোমার। আর তা' না হ'লেও ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়ে যাব'খন—বুঝেছ, ভালো ক'রে ডাক্তার দেখিয়ো।...না, তোমার ওপর বড় খুশী হয়েছি, বড় ভালো মেয়ে তুমি।'

চাঁদু আর শুলো না। ওর কাছ ঘেঁষে ব'সে প্রশ্ন করলে, 'চালের ব্যবসাতে এত লাভ কী ক'রে করলেন?'

হরকুমারের মুখে একটা তৃপ্তি আর গর্বের হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, 'চালের দাম যে চড়বে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। বারো টাকায় চাল কিনে রেখেছিলুম, সেই চাল বিক্রি করেছি পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর টাকা পর্যন্ত। চল্লিশ টাকায় কিনে ষাট টাকায় বেচেছি। তা-ও হয়েছে! মোদ্দা, টাকা যে সে সময় কী ক'রে এসেছে তা ভাবলে আজও অবাক লাগে!'

আবার একটা শিহরণ। একটা শৈত্য যেন চাঁদুর সর্বাঙ্গে বয়ে গেল! যেন এরাই, হয়তো বা এই লোকটাই তার মা, বাবা, ভাই, শাশুড়ী সকলের মৃত্যুর জন্য দায়ী—শত শত গ্রামবাসী, তার অসংখ্য আত্মীয়-কুটুম্ব! কী কষ্ট পেয়েই না মরেছে তারা, বাপ-মায়ের মৃত্যু সে চোখে দেখে নি বটে, কিন্তু আরও বহু লোককে সে শুকিয়ে মরতে দেখেছে। এখনও যখন একা থাকে সে, মনে হয়

ঠিক একা সে নেই, তার আশেপাশে সেই সব কঙ্কালগুলো চলাফেরা করছে, ভাত খেতে বসলে মনে হয় যেন তারা পাতের কাছে ঘিরে এসে বসেছে! তাদের অতি ক্ষীণ নিশ্বাসের শব্দসুদ্ধ সে সময় যেন শুনতে পায়!……সেই সব শীর্ণ, প্রেতের মত শীর্ণ মূর্তি! একটা পাত্‌লা চামড়া ছাড়া পেটের কাছটায় কিছু যাদের ছিল না, চোখ যাদের খুঁজে পাওয়া যেত না! শেষ মুহূর্তে যাদের মুখে খাদ্য দিলেও যারা খেতে পারে নি—শুধু খেতে পারছে না এই যন্ত্রণায় আকুলি-বিকুলি ক'রে যারা মরেছে!

হয়তো হরকুমারের শেষের দিকে একটু তন্দ্রাই এসেছিল, হঠাৎ একসময়ে সে উঠে ব'সে বললে, 'এই যে দিব্যি ফরসা হয়েছে। আমি যাই, সাড়ে সাতটায় ট্রেন, এটা ফেল করলে চলবে না।…একটু চা চাপাতে পার?'

'দিচ্ছি আমি চা ক'রে—আপনি মুখে হাতে জল দেবেন তো? বাইরের দাওয়ায় জল গাড়ু সব আছে।'

কেমন যেন শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর চাঁদুর। কিন্তু, হরকুমারের সেদিকে কান ছিল না। অত লক্ষ্য করবার কথাও নয় তার। সে হাত-মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।

চা খেয়ে, জামা-জুতো পরা শেষ ক'রে হরকুমার পকেট থেকে নোটের গোছা বার করলে,'এই নাও, কৃপণতা করব না, পুরো দু'শ টাকাই তোমায় দিয়ে গেলুম। কেমন খুশী তো?'

যেন এক পা পিছিয়ে গিয়ে চাঁদু বললে, 'ও টাকাটা আপনি রাখুন। টাকা আমার দরকার নেই—'

একটু বিস্মিত হ'ল, অসন্তুষ্টও হ'ল হরকুমার। বিরক্ত কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললে, 'কি, এ টাকাও পছন্দ হ'ল না? এত টাকা আর কেউ দিত একসঙ্গে? এখানে তো এক টাকা আট আনা রেট। আচ্ছা, আরও পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, কাল অত যত্ন করেছ, আমিও তোমাকে খুশী করব এই প্রতিজ্ঞা—'

'না না, টাকায় আমার দরকার নেই—আপনি যান, যান বলছি—'

সহসা যেন চিৎকার ক'রে উঠল চাঁদু, তারপর পাগলের মত, ওর হাত থেকে নোটের গোছাটা টেনে নিয়ে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে, বেরিয়ে যান বলছি!'

হরকুমার যেন একটু ভয় পেয়েই এক লাফে নিচে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

কে জানে পাগল কিনা, কী ক'রে বসবে তার ঠিক কি! সে আর দাঁড়াল না—সোজা স্টেশনের পথই ধরলে। শুধু যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে দেখলে চাঁদু তখনও সেই নোটের টুক্‌রোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে আরও ছোট ছোট করে ছিঁড়ছে!

## প্রেমের কাহিনী

শিবদাসবাবু ঘাড় গুঁজে একমনে লিখে যাচ্ছিলেন। অনেকদিন পরে উৎসাহ এসেছে তাঁর গল্প-লেখায়—নতুন ক'রে তাঁর পুরাতন প্রেরণাকে যেন ফিরে পেয়েছেন। তাই কলম চলছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ছোট ছোট সুসংবদ্ধ অক্ষর-সমষ্টিতে ভ'রে উঠেছে। আজ আর তাঁর কোনো দিকে মন নেই।

এ যেন সত্যিই এক অভিনব ব্যাপার। শিবদাসবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। কথা-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি আজ শরৎচন্দ্রের খ্যাতিকে অতিক্রম না করুক, তাঁর কাছাকাছি পৌঁছেচে। এ কথা, এমন কি নিন্দুকেও স্বীকার করবে। তাঁর একটি ছোটগল্প আজ শতাধিক মুদ্রা খরচ করলেও পাওয়া যায় না—তাঁর উপন্যাসের চাহিদা সব চেয়ে বেশী। তিন মাসের বেশী সময় লাগে না একটি সংস্করণের এগারো শ' কপি ফুরোতে।

কিন্তু, খ্যাতি তাঁর যত বেড়ে উঠেছে, যশের শিখরচূড়া ধীরে ধীরে যেমন অভ্রংলিহ হয়ে উঠেছে, তেমনিই তাঁর সমস্ত উৎসাহ কমে এসেছে সাহিত্য-রচনায়। আজকাল আর লেখায় তিনি সে রকম আনন্দ পান না, যেমন পেতেন আজ থেকে পনেরো বছর আগে, তাঁর প্রথম যৌবনের দিনে। যশ আর অর্থ যতই অযাচিত এবং অবারিতভাবে পেয়েছেন, ততই তাঁর মনে হয়েছে তাঁর অন্তরের সে কবি, শিল্পী উপবাসী থাকছেন, অন্তর্যামী ক্লান্ত, ক্লিষ্ট হয়ে উঠছেন। অথচ, উপায়ও নেই—খ্যাতি ও অর্থের নেশা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে বৃহত্তর খ্যাতি ও অধিকতর অর্থের দিকে। সে অবিশ্রাম গতি থেকে অব্যাহতি পান নি। সার্থকতার সেই কষ্টকর তপস্যা থেকে ছুটি নেওয়া আর তাঁর সম্ভব হয় নি।

অথচ, তাঁর আত্মার আনন্দের এ সমাধি তিনি নিজে হাতেই খনন করেছেন। একদিন কুক্ষণেই, যখন তাঁর অনেকগুলি ভালো ভালো গল্প ( তিনি জানেন, এখনও তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস সেই গল্পগুলিই ভালো। মানব-মনের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনার ওপর তাদের ভিত্তি, তাদের মূল্য এই সমস্ত লেখার চেয়ে কম তা তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন ) ছাপা হবার পরও দেশবাসীর কাছ থেকে স্বীকৃতি পান নি তখন এই সস্তা হাততালির পথে পা বাড়িয়েছিলেন, দেশের ও দেশবাসীর সমস্যাকে করেছিলেন তাঁর কথা-সাহিত্য-রচনার বিষয়বস্তু। জনসাধারণের স্বদেশপ্রীতির সুযোগ নিয়ে দু'চারটে গরম কথা লিখে আসর জমানো, এতে তাঁর মন কোনোদিনই সায় দেয় নি, এর ভেতরে যে একটা বড় রকমের ফাঁকি রইল, একদিন যখন দেশবাসীর মনে এ উত্তাপ আর থাকবে না, তখন সে ফাঁকি ধরা পড়বেই, আজ যাকে গগনচুম্বী প্রাসাদ ব'লে মনে হচ্ছে তা যে একদিন তাসের বাড়ির মতই ভেঙ্গে পড়বে তা তিনি জানতেন এবং সেদিন প্রতিশোধ-বাসনাই তাঁর মনে উগ্র হয়ে উঠেছিল—যে সম্পাদকের দল তাঁর ভালো ভালো রচনাগুলি ছেপে খুবই অনুগ্রহ করলেন এই ভাব দেখাতেন, তাঁরাই একদিন ভিক্ষার্থী হয়ে তাঁর দোরে গিয়ে দাঁড়াবেন—কল্পনায় এ দৃশ্য তাঁর মনে নেশার সৃষ্টি করেছিল বোধ হয়, তাই তিনি সেদিন অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবতে পারেন নি। জেনেশুনেই সহজ এবং মূল্যহীন সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তারপর আর ফিরে আসা তাঁর সম্ভব হয় নি। যশের এমনিই মাদকতা, অর্থের এমনই লোভ যে, সেই হাততালির দিকে কান পেতেই একটির পর একটি রচনা শেষ করেছেন তিনি—চিরস্থায়ী কিছুতে হাত দিতে তাঁর সাহসেই কুলোয় নি। এমন অনেকবার হয়েছে, কোনো কোনো রচনায় হয়তো গরম কথা কিছু লেখেন নি, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের নরনারীকে তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা করেছেন, তাদের মানসিক দ্বন্দ্বকেই করেছেন রচনার উপজীব্য—অমনি দেখেছেন প্রকাশকদের মুখে অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠেছে, সম্পাদকের দল আড়ালে বলাবলি করেছেন, 'শিবদাসবাবু এবার ফাঁকি দিচ্ছেন।'

একথা তাঁকে এরকম ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই শুনতে হয়েছে—তা তিনি যত যত্ন ক'রেই লিখুন না কেন!

হয়তো তাঁর আধুনিক রচনাকে যতটা মূল্যহীন তিনি মনে করেছেন ততটা নয়—হয়তো এতেও চিরন্তনত্ব কিছু রইল, অমর না হোক দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবে

তাঁর খ্যাতি এসব রচনাতেও—কিন্তু, মন তাঁর কিছুতেই বোঝে না যেন, মনে হয় মানুষের শাশ্বত ব্যথা-বেদনার কথা থাকছে না এতে, চিরকালীন মানব-মন একে সাহিত্য ব'লে কোনোদিনই স্বীকার করবে না।

তাই আজ বহুদিন পরে মনের মত বিষয়বস্তু পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে তাঁর। ইদানীং লেখার কথা মনে হ'লেই যে বিরক্তি ও ক্লান্তি অনুভব করতেন তার যেন আজ কোনো চিহ্নই নেই। কোনো সম্পাদককেই তিন-চারটে তারিখ না ফিরিয়ে তিনি আজকাল লিখতে বসেন না, সাহিত্য-রচনা এমনিই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। অথচ, আজই একটি কাগজের মালিকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে এখনই তিনি সেই গল্প লিখতে বসেছেন—এ যেন নিজের কাছেও এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! তার কারণও অবশ্য আছে—বহুদিন পরে এই মালিক নিজে থেকে অনুরোধ করেছেন, 'মশাই, আপনি যে এককালে রোমান্টিক গল্প লিখতেন তা যেন সবাই ভুলে গেছে। আর একটা লিখুন না বেশ জুত ক'রে। আপনারও একটু মুখ বদলানো হবে, পাঠকদেরও চমক লাগিয়ে দিতে পারব।'

বলা বাহুল্য শিবদাসবাবু তৎক্ষণাৎ রাজি হয়েছেন। এ লেখার জন্য টাকা না দিতে চাইলেও বোধ হয় তিনি এমনি উৎসাহভরে লিখতে বসতেন। বাড়ি এসে কারও সঙ্গে কথা কন নি বিশেষ, এক পেয়ালা চা খেয়েই কাগজ-কলম নিয়ে ব'সে গেছেন। মধ্যে একবার এগারোটা নাগাদ খেতে গিয়েছিলেন, সেই যা মিনিট দশেক ছেদ পড়েছে, তারপরই আবার বসেছেন—আর এখন রাত সাড়ে বারোটা। এর ভেতর কোনো কথা তাঁর মনে ছিল না, কোনো দিকে তাকান নি পর্যন্ত। এমন কি সিগারেট খেতেও যেন ভুলে গেছেন। খাবার সময় স্ত্রী কী সব বলেছিলেন, তাঁর একটা বর্ণও তার মাথায় ঢোকে নি এতই মশ্‌গুল হয়ে আছেন তিনি নিজের গল্পে। অনেক দিন পরে হ'লেও উৎসাহে ও উত্তেজনায় গল্পের কাঠামো তাঁর মাথায় এসেছে রাস্তায় আসতে আসতেই। শুধু তাই নয়—আগেকার দিনে প্রণয়মূলক গল্পের যে একটি প্রকাশভঙ্গি ছিল তাঁর নিজস্ব, এতদিনের অব্যবহারেও তা তিনি একেবারে ভুলে যান নি, রচনাশৈলীর সেই বিশিষ্ট কৌশলটি আজও তেমনি আয়ত্ত আছে, আর তাতেই তাঁর আনন্দ এত বেশী।

শিবদাসবাবু পাতা উল্টে দেখলেন, বড় প্যাডের সাতখানা স্লিপ এরই মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। ছোট ছোট অক্ষর তাঁর—ছাপালে অনেকটা দাঁড়াবে। আজকাল সাধারণত এতটা লিখতে তিন দিন সময় লাগে। এখনও হয়তো

চমক ভাঙত না—একেবারে গল্প শেষ ক'রেই থামতেন তিনি, যদি না নিচে থেকে একটা চেঁচামেচির শব্দ কানে আসত। গৃহিণী চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকাবকি করছেন বোধ হয়—এখনও তাঁর সংসারের পাট মেটে নি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি আবার কাগজের ওপর ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু, আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ এই ছেদটা প'ড়ে কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, মনের মধ্যে ঠিক সে আবহাওয়াটি আর ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না কিছুতে। এতক্ষণ লেখবার পর এই প্রথম তাঁর মনে হচ্ছে যে, বড় অসময়ে এই কাহিনী লেখবার ডাক পড়েছে তাঁর জীবনে যখন আর কোথাও কোনো রোমান্স নেই—সবটা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে, তখন গল্পের মধ্যে ভাষার মার-প্যাঁচে ব'সে ব'সে সেই জিনিস ফেনানো—এ যেন নিতান্তই অদৃষ্টের পরিহাস! বরং তার চেয়েও বেশী—

অথচ, একদিন তাঁর জীবনে সত্যই রোমান্স ছিল, অক্ষরগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলেন শিবদাসবাবু, জীবনে সত্যি সত্যিই ছিল রঙ। প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলিতে তিনি তাঁর কল্পনামতই জীবন-সঙ্গিনী পেয়েছিলেন—কবির ভাষায় বলতে হয় তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মানসীকে। তখন তিনি গল্প লিখতে বসলে রমা তাঁর পায়ের কাছে ব'সে তন্দ্রারক্ত চক্ষু ওঁর মুখের ওপর মেলে জেগে ব'সে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে প্রেমবিহ্বল মুগ্ধদৃষ্টির দিকে চেয়ে গল্প যেন আপনিই আসত ওঁর কলমের ডগায়। মনে আছে, এক-একদিন যখন শুয়ে শুয়ে লেখবার ইচ্ছে হ'ত তাঁর, তিনি রমাকে বলতেন পেছন থেকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে—তার পরিপূর্ণ কৈশোরের উত্তাপ আবেগের অগ্নিসঞ্চার করত তাঁর অনুভূতি ও কল্পনার সমস্ত সত্তায়। তখন প্রতিদিন একটি ক'রে গল্প লিখেও তাই তিনি ক্লান্ত হন নি—কিংবা, কল্পনার উৎস আজকের মত এমন নিঃশেষ হয়ে গেছে ব'লে বোধ হয় নি।

অথচ, সেই রমাই আজ—

অকস্মাৎ দোর ঠেলে বেশ একটু উত্তেজিতভাবে গৃহিণী প্রবেশ করলেন। সেদিনের সে রূপ বা লাবণ্যের স্মৃতিটুকু দেহ থেকে একেবারে যায় নি বটে, কিন্তু এই মেদময়ীর মধ্যে রমাকে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন বৈকি! বয়স বেশী না হ'লেও মেদ-বাহুল্য তাঁকে এনে দিয়েছে অকালবার্ধক্য—চামড়া ইতিমধ্যেই যেন হয়ে এসেছে লোল, বাতের জন্য ডান পা-টা খুঁড়িয়ে চলতে হয়! শীতকালের

রাত্রে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ব'লে শুতে পারেন না মোটেই, ব'সে ব'সে ঘুমোন। একদিন তিনি নগদ মূল্যের লোভে সাহিত্য থেকে জোর ক'রে রোমান্স বাদ দিয়েছিলেন, সেই জন্যই কি বিধাতা জীবন থেকেও তা এমনি ক'রে মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে নিলেন ?

গৃহিণী বললেন, 'কেমন বলি নি যে, ঐ নতুন চাকরটা আস্ত চোর ? তুমি তো একেবারে বিপিন বলতে অজ্ঞান ! তুমি ওকে খুঁজে এনেছ কিনা, তাই চুরি করলেও কিছু বলবার জো নেই—যা করুক না কেন ও বাপের ঠাকুর !'

হতভম্ব শিবদাসবাবু কলমটা বন্ধ ক'রে রেখে প্রশ্ন করলেন, 'বলি হ'ল কী ? ব্যাপারখানা কী খুলে বল—'

'ব্যাপার আবার কী ! ভাঁড়ারঘর আর ওদের ঘরের মধ্যে পার্টিশানটা ছাদ অবধি ক'রে দাও কতদিন ধ'রে বলছি, তা তোমার তো চৈতন্য হয় না। আমার ক'দিন ধ'রেই সন্দেহ হচ্ছে যে, চালডাল সব যেন তাড়াতাড়ি কমছে—আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি !'

মনটা গল্প থেকে এতক্ষণে সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। শিবদাসবাবু উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসলেন, 'কী রকম ?'

'মাথা ধরেছে ব'লে সকাল ক'রে শুয়ে পড়েছিলুম, ব্যাটা ভেবেছে মা আর নিচে নামবে না। তাই বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই পার্টিশান ডিঙিয়ে নেমেছিল ভাঁড়ারে, কিন্তু বুদ্ধির এমন দোষ, নিজের ঘরের দোরটায় আর খিল দেয় নি। হাজার হোক ভগবান আছেন তো ! ব্যস্—নবীনকে ভাঁড়ারের চাবি খুলতে ব'লে আমি ওর দোর খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালুম—আর যাবে কোথায় ! বমাল-সুদ্ধ ধরা প'ড়ে গেল।'

'তারপর ? কী করলে ?'

'পুলিশে দেব ব'লেই ঠিক করেছিলুম, বড্ড কান্নাকাটি করতে লাগল। উঠোনে নাকখৎ দেওয়ালুম, জুতো মাথায় ক'রে কান ধ'রে উঠবোস করলে—তারপর ছেড়ে দিয়েছি। মরুক গে—কী আর হবে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ ক'রে।'

'তবু ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। আবার কার সর্বনাশ করবে তার ঠিক কী !'

'তা অবশ্য বটে।' ওপাশের সোফাটায় ব'সে প'ড়ে বাতের পা-টায় হাত বুলোতে বুলোতে গৃহিণী বললেন, 'তবে শিক্ষাও ওর হয়েছে খুব। লজ্জা থাকে তো আর এ-কাজ করবে না।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, দ্যাখো আর একটা কথা—

তোমার তো আজকাল দেখা পাওয়াই যায় না। আমার যখনই সময় হয় তখনই দেখি তুমি ব্যস্ত।······আমি একবার হরি স্যাকরাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

শিবদাসবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। একটু বিপন্ন কণ্ঠেই বললেন, 'কেন গো?'

'আমার সেই বারোমেসে হারছড়াটা কোঁড়া কেটে প'ড়ে আছে এতকাল, ভাবছি সেইটে ভেঙ্গে আর তার সঙ্গে কিছু সোনা দিয়ে একছড়া কানপাশা নেকলেস গড়াব। দিদি, দিদির মেয়ে লতু সবাই ওড়া গড়িয়েছে, বেশ নতুন ডিজাইন, আর এমন কিছু বেশীও পড়বে না। তাছাড়া হরি স্যাকরাকে আরও একটু দরকার আছে—আমাদের লীলুর চুড়িগুলো ক্ষয়ে একেবারে নরুনের মত পাতলা হয়ে গেছে, ওরও আটগাছা চুড়ি গড়াতে দেব। হ'লও তো ওগুলো কম দিন নয়—'

ভয়ে ভয়ে শিবদাসবাবু বললেন, 'কিন্তু সোনার দর কি জানো? গিনিসোনা নব্বুই টাকা ভরি।'

ঝঙ্কার দিয়ে গৃহিণী ব'লে উঠলেন, 'মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে! এখন থেকে একখানা একখানা ক'রে গড়িয়ে না রাখলে চলবে কেন। তখন সব একসঙ্গে পারবে? তাছাড়া মেয়ে বড় হয়েছে, লোকের সামনে বেরোতে হয়—অন্তত ক'গাছা চুড়িও না থাকলে চলবে কেন?'

তা বটে! অকাট্য যুক্তির সামনে শিবদাসবাবুকে চুপ ক'রে থাকতেই হ'ল। বেতো পায়ে কাপড়ের আঁচলটা টেনে বেঁধে যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত ক'রে তাঁর স্ত্রী আবারও বললেন, 'ছাখো, আমি বাপু তোমার পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছি এখন। জানিয়ে রাখলাম, আবার যেন হৈ-হৈ ক'রো না কে নিলে ব'লে।'

'পঞ্চাশ টাকা? কেন গো—অত টাকা কী হবে?'

'দিদিরা ধরেছে থিয়েটার দেখাতে হবে ওদের—হিসেব ক'রে দেখলুম যে সবসুদ্ধ চোদ্দজন। তিন টাকার টিকিট কাটতে দিয়েছি, এখানেই তো বিয়াল্লিশ টাকা। তাছাড়া ট্যাক্সিভাড়া আছে। তবু, আসবার গাড়িভাড়াটা আমি দিদির ওপরেই চাপিয়েছি।'

শিবদাসবাবু চুপ ক'রেই রইলেন। তিনি মনে মনে তখন হিসেব ক'রে দেখছিলেন যে, গত তিন দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে রমার আর কথাবার্তা হয় নি। বলতে গেলে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে, এইটুকুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্ভাষণ।

হঠাৎ কানে গেল পত্নী ব'লে চলেছেন, 'খোকা বলছে পুজোর সময় দিল্লী

আগ্রা বেড়াতে যাবে, ওর একটা স্যুট চাই—আমি অবিশ্যি কথা দিই নি, বলেছি তোমাকে জিগ্যেস ক'রে বলব—'

'অত খরচ প্রশ্রয় দিও না, বুঝলে? আমার শরীর আজকাল মোটেই ভালো থাকছে না—কবে চোখ বুজব তখন চোখে অন্ধকার দেখবে সব। আর চোখ না বুজলেও যদি একবছর, দু'বছর প'ড়েই থাকি, তখন দেখবে কে? যতক্ষণ লিখব ততক্ষণ তো? তাছাড়া বাঙালীর ছেলে, বেড়াতে গেলেই সাহেবী পোশাক পরতে হবে তার মানে কী? আর আমি পরি খদ্দর, ছেলে পরবে সাহেবী পোশাক, বাঃ! লোকে বলবে কী?'

'অবিশ্যি'—গৃহিণীর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অপরাধীর মত শোনায়, 'অবিশ্যি সে ব'লেই দিয়েছিল যে, আজকাল একরকম খদ্দরের ছিট পাওয়া যায়, করলে তারই স্যুট করাবে কিংবা তসরের—তা তাকে বারণ ক'রে দিলেই হবে। তুমি যখন পছন্দ কর না, সত্যিই তো—কাপড়জামা তো কত গণ্ডাই রয়েছে। কী সব শখ তাও বুঝি না। না বললেই আবার ছেলেমেয়েদের মুখ ভার হয়ে যায়, হয়তো বাবু দু'দিন বাড়িতে খাবেনই না!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বোধ হয় এ পক্ষ থেকে কিছু উত্তরের অপেক্ষাই করলেন, তারপর প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে বললেন, 'না, ঘুম পেয়েছে উঠি এখন —তুমি লেখো। আজ যে বড় এত রাত পর্যন্ত লিখছ? খুব জরুরী তাগাদা আছে বুঝি?

শিবদাসবাবু সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'হুঁ'।

গৃহিণী বেরিয়ে গেলে তিনি আবার লেখা কাগজগুলো তুলে নিলেন। কী লিখেছেন ছাইভস্ম—এখন পড়তে গিয়ে যেন কিছুই মাথায় যায় না। আসলে তিনি ভাবছিলেন রমার কথাই, শরীর খারাপ যাচ্ছে আজকাল, কবে কী হয় কিছুই বলা যায় না—এমন কথা শুনেও তার তরফ থেকে আজ কোনো উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না! অর্থাৎ, কথাটা তার কান পর্যন্ত পৌঁছেই ফিরে এসেছে, প্রাণে পৌঁছয় নি। স্বামীর সম্বন্ধে একটুকু চিন্তারও অবসর নেই তার আজকাল! অথচ—

থাক্ গে, অথচ কী ছিল একদিন তা ভেবে আর দরকার নেই। সে আবেগ-বিহ্বল প্রথম যৌবন তাঁরা অনেকদিন পেছনে ফেলে এসেছেন। সে বয়স আর কারুরই নেই, তাঁরও না, রমারও না। এখন তিনি ব্যস্ত তাঁর কাজ

নিয়ে, আর তাঁর স্ত্রী ব্যস্ত তাঁর ছেলেপুলে সংসার নিয়ে। এখন ওসব উদ্বেগ আশা করাই ভুল।

শিবদাসবাবু জোর ক'রে কলম খুলে লিখতে বসলেন। এতটা যখন লিখেছেন—তখন আর একটু চেষ্টা ক'রে এটা আজ শেষ ক'রেই ফেলবেন। অনেকদিন পরে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটলে একটা আত্মতৃপ্তিরও কারণ থাকবে, বুঝতে পারবেন তিনি যে, একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি তাঁর সৃজনী-শক্তি।

কথাটা ভাবলেন কিংবা নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে নতুন ক'রে উৎসাহ আনবার চেষ্টা করলেন—সে সম্বন্ধে যেটুকু সংশয় মনে জাগতে পারত তাকে দমন ক'রে খস্‌খস্‌ ক'রে লিখে চললেন কয়েক লাইন। লিখছেন কলকাতা শহরের এক দরিদ্র কেরানী-দম্পতির গল্প। ছোট একটা ঘর ভাড়া ক'রে থাকে তারা, সামান্য আয়ে সংসার চালাতে হয়, তার ওপর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে—তাদের রোগ, নানা অশান্তি; তবু ওদের অন্তরের সেই অনির্বাণ শিখাটি আজও কেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, প্রীতি ও নির্ভরতা এই দুঃখের সংসারের কেমন শান্তির কারণ হয়ে আছে—এইটিই হ'ল তাঁর গল্পের প্রতিপাদ্য। লোকটি প্রথম যৌবনে এই মেয়েটির প্রেমে পড়ে। মেয়েটি ছিল গরিব—তার ওপর কোনো পক্ষেরই মা-বাবার মত ছিল না এ বিয়েতে। তবু সেদিন সে যে ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে ক'রে স্বেচ্ছায় পৈতৃক সম্পত্তির অংশ ছেড়ে এসে এই দারিদ্র্য ও অভাবকে বরণ ক'রে নিয়ে ভুল করে নি, পার্থিব সমস্ত দৈন্য যে দূর করতে পেরেছে তাদের অন্তরের সম্পদ—এইটিই জোর ক'রে দেখাতে চান শিবদাসবাবু। এটা তাঁর বহুদিনের বিশ্বাস, আজ সেই বিশ্বাসকে যেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চান। হয়তো কথাটা পুরানো, তবু লিপি-কৌশলে ও ঘটনা-বিস্তারে গল্পটি সাহিত্য-পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে সে ভরসা তাঁর আছে। বলার ভঙ্গিতে পুরানো কথাই তো নতুন হয়!

কিন্তু—

লিখতে লিখতে কেমন যেন একটা দুর্বলতা বোধ করেন শিবদাসবাবু—বিশ্বাসের অভাব, নিজের প্রতিপাদ্য সত্যে আস্থার অভাব। যা লিখেছেন এর মধ্যে কিছু সত্য কী আছে? জীবনে কি সত্যিই এমন হয়? যাকে তাঁরা অনির্বাণ শিখা ব'লে এসেছেন, তার কোনো অস্তিত্ব কি সত্যসত্যই আছে? না কি তাঁরা—অর্থাৎ, কবি ও সাহিত্যিকরা এতকাল ঠকিয়েই এসেছেন লোককে? লোকে যা চায়, যা ঘটলে তারা খুশী হ'ত—সেই অবাস্তব কল্পনাকে সত্য ব'লে

চালিয়ে এতদিন ধ'রে পসার জমিয়ে রেখেছেন।

কলম রেখে শিবদাসবাবু জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। যেটা জোর ক'রে বলতে চান সেটার পেছনে তাঁর বিশ্বাসের জোর নেই। কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে। সত্য ব'লে মেনে নিতে পারলে তিনি খুশী হতেন—সব মানুষই বোধ হয় খুশী হয়—কিন্তু, মনে মনে পিছনে ফেলে আসা জীবনটার ওপর যতদূর দৃষ্টি চলে চোখ বুলিয়ে এর কোনো সমর্থনই কোথাও খুঁজে পেলেন না। যতগুলি ভালোবাসার ইতিহাস তাঁর জানা আছে কেউই অনির্বাণ শিখা নয়—এমন কি দীর্ঘস্থায়ীও নয় তাদের অস্তিত্ব। মানুষ ভালোবাসে একমাত্র নিজেকেই, অপরের চিত্ত জয় করার মধ্যে একটা যে অপরিসীম আত্মতৃপ্তি আছে তারই নেশায় সে ছোটে।……

বাইরে শহরের সঙ্কীর্ণ গলির ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায়, তারই দিকে চেয়ে চেয়ে শিবদাসবাবু নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগলেন। হ্যাঁ, ভালোবাসা তাঁর জীবনেও এসেছিল বৈকি! একবার নয় বহুবার—আর সে বাল্যকাল থেকেই। তিনি জাতশিল্পী, কল্পনা ও ভাবপ্রবণ মন তাঁর—রোমান্সকে অবলম্বন না ক'রে থাকতে পারতেন না। মনে আছে যখন মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়স, তখনই তাঁর খেলার সাথী একটি সমবয়সী মেয়েকে তিনি ভালোবেসে-ছিলেন। অন্তত তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল সেদিন—সেই মেয়েটি, রেণু তার নাম—সে জানালায় তাঁরই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একথাটা ভাবতে সেদিন খুবই ভালো লাগত। তারপর তার যখন বিয়ে হয়ে গেল—কী কান্নাটাই না কেঁদে-ছিলেন তিনি। তখন তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন, তবু মনে হয়েছিল বুক সেদিন ভেঙ্গে যাবে ঐ মেয়েটির অভাবে। কেঁদেছিল রেণুও—বিয়ের আগের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তা-ও মনে আছে। তারপর কোথায় কী! পরবর্তী জীবনে দেখা হ'লে তাঁরা পরস্পরকে এ নিয়ে কত ঠাট্টা করেছেন।

তারপর প্রথম যৌবনে এল প্রচণ্ডতর ধাক্কা। তখন তাঁরা মধুপুরে গেছেন বেড়াতে। এম-এ পরীক্ষা দেবার পর দীর্ঘ অবকাশ—কোনো কাজ নেই, মায়েরও শরীর খারাপ; সুতরাং স্থির হয়েছিল চার-পাঁচ মাস থাকবেন তাঁরা ওখানেই। সেখানে পাশের বাড়ির লতিকা আসত তাঁর কবিতা ও গল্প শুনতে। বলতে গেলে সে-ই তাঁর প্রথম পাঠিকা—তখনও পর্যন্ত কোনো বড় কাগজে তিনি ভরসা ক'রে লেখা পাঠাতে পারেন নি। সুশ্রী কিশোরীর মুগ্ধদৃষ্টি সেদিন তাঁকে পাগল

ক'রে দিয়েছিল, মনে হয়েছিল একে জীবনসঙ্গিনী না করতে পারলে জীবনের কোনো অর্থ নেই।

সেদিন অনেক উঞ্ছবৃত্তিই ধরেছিলেন তিনি—আজও মনে হ'লে লজ্জা করে। পূর্ণবয়স্ক যুবক তিনি—সারাদিন ব'সে ব'সে ভাবতেন কেমন ক'রে লতুর ঐ আঙুলের ডগাগুলি স্পর্শ করবেন। কী ক'রে তার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটবে, এই চিন্তাতে সেদিন সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটত। কত ছল, কত ফন্দি—এমন কি, বলা যায় কত তপস্যাও—করেছিলেন তিনি দিনের পর দিন, শুধু বারবার তার দেখা পাবার জন্য। সে সময়ে জীবনের আর কোনো সার্থকতাই ছিল না। চোখের সামনে লতুকে পাওয়া ছাড়া। যশ, অর্থ, সম্মান, সাহিত্য-সৃষ্টি সবই অর্থহীন ব'লে মনে হ'ত। সেদিনকার সে আবেগ, সে বেদনার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল একথা স্বয়ং ভগবান বললেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন ক'রে ছিল ঐ এক অনুভূতি, সমস্ত মনে ছিল ঐ এক চিন্তা।

তবু তিনি পান নি লতিকাকে। তারা ব্রাহ্ম, তাতে হয়তো শিবদাসবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাদের ছিল। বিশেষত তিনি তখন বেকার, দেশের জমি-জায়গার মাঝারি আয়, এই ছিল তাঁদের একমাত্র ভরসা। ব্যবসা বা চাকরি না ক'রে সাহিত্য-চর্চা করবেন তখন স্থির ক'রে ফেলেছিলেন ব'লে আর কোনো চেষ্টাও করেন নি। সে আশা ছেড়ে হয়তো লতিকার জন্য তিনি সরকারী অফিসে উমেদার হয়েও দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য লতুর বাবা অপেক্ষা করতে রাজি হন নি, বরং ব্যাপারটা জটিলতর হ'তে পারে এই আশঙ্কা ক'রে তাড়াতাড়ি মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এক সদ্য-চাকরি-পাওয়া সাব-ডেপুটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

সেদিনের কথা মনে হ'লে আজ হাসি পায় বটে। কিন্তু, তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সে বেদনাটা সেদিন বেজেছিল মর্মান্তিক। অত বয়সেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে বাধে নি। প্রতি রাত্রে চোখের জলে তাঁর গোটা পরিধেয় কাপড়খানা ভিজে উঠেছে—বহুদিন ধ'রে। আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন বার-দুই, রুগ্ণ মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধে নিরস্ত হয়েছিলেন। আরও কত কী নাটকীয় চিন্তা প্রতিদিন মাথায় আসত—কত রকমে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করতেন সর্বদা। লতিকা যাতে চিরদিন তাঁরই জন্যে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল ফেলে—এর জন্য পরিকল্পনার সেদিন অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ?

সেদিন যে লতিকা তাঁর ঘাড়ে চাপে নি, এজন্য আজ তিনি কৃতজ্ঞ। মনে হয়, কী বেঁচেই গিয়েছেন তিনি। আজ এই দীর্ঘ-জীবনের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝতে পেরেছেন যে, আর যাই হোক লতিকাকে নিয়ে তিনি সুখী হ'তে পারতেন না। তার স্বভাবের বহু দোষ, যা সেদিন চোখে পড়ে নি, আজ মনে মনে মিলিয়ে শিউরে ওঠেন—বার বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান সেদিন লতুর বাবা রাজি হন নি ব'লে।

তারপর এল রমা। খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ে সে, তিনি যখন দেখেন, তখন তার মাত্র ষোল বৎসর বয়স। দেখাত আরও কম। তবু তার রূপ, বালিকাসুলভ লাবণ্য ও সৌকুমার্য সেদিন তাঁকে মুগ্ধ ও দিশাহারা করেছিল, আর সব কথা ভুলে গিয়ে নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই বারই তাঁর সত্যকারের সার্থকতাকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন। ঐ মুকুলিকা কিশোরীর অন্তরের মাধুর্য-শতদলকে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলতে পারাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হবে।

আর বাস্তবিক রমাকে বিয়ে করার পর কয়েকটা বছর কেটেছে যেন দীর্ঘ এক সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তাকে নিয়ে তিনি সেদিন সুখীই হয়েছিলেন। প্রেম বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা তিনি আজও জানেন না, কিন্তু একজনের জন্য অপরের আকর্ষণ, আকুলতা ও আবেগ—এই যদি তার মোটামুটি অর্থ হয়, তাহ'লে তা তাঁদের ছিল। কবির ভাষায় তাঁর 'জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী' সেদিন তিনি সত্যই পান করতে পেরেছিলেন। জীবন সেদিন তাঁর ধন্য, সার্থক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু, আজ তা কোথায় গেল? সে প্রেমের কিছু মাত্র অবশিষ্ট আছে কী?

তিনিও আছেন, রমাও আছে। অথচ, সে আকুলতার তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য, প্রথমকার উচ্ছ্বাস পরিণত জীবনে আশা করা মূর্খতা—তা তিনি করেনও না। আজ যদি তিনি আশা করেন যে, তাঁর ফেরবার সময়ের বহু আগে থেকে গৃহিণী রমা কিশোরী রমার মত বাতায়ন-পথে অপেক্ষা করবে, কিংবা আগেকার মত তাঁর লেখার সময়ে আরক্ত চোখে শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকবে, তাহ'লে নিজের কাছেই তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে পড়বেন।

তা তিনি করেনও না। কিন্তু, তবু সে অনির্বাণ শিখার কোনো আলো কি থাকা সম্ভব নয়? পরিণত প্রেমের ফলে পরস্পরের যে গভীর ঐক্য ও সহানুভূতি থাকা উচিত, তাই-বা কোথায় আজ? গৃহিণী তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী প্রভৃতি

নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে, স্বামীর খোঁজ নেবার সময়ও পান না। বছরে ক'দিন দেখা হয় তাঁদের সে কথাটা হিসাব ক'রে দেখবার মত। তিনিও আছেন তাঁর লেখা আর বাইরের জগৎ নিয়ে। তাঁর দুধ, তাঁর চা, তাঁর খাবার আসে চাকরের মারফত। রমার টাকার দরকার হ'লে ছেলেমেয়েকে দিয়ে চেয়ে পাঠায়, কিংবা পকেট থেকে বার ক'রে নেয়। ওঁর কাজ সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার—কী লেখা লিখছেন তিনি আজকাল, তা সে জানেও না। বর্তমান কালের বইগুলোও সে পড়ে নি। তিনিও ওর খবর রাখেন না, অসুখ করলে ছেলেরা যায় ডাক্তার ডাকতে—খুব বেশী কিছু হয়েছে খবর পেলে তবে তিনি খবর নিতে যান। কিন্তু, আগেকার সে উদ্বেগের সামান্য অংশও আছে কী? বরং লেখার সময় বা বিশেষ প্রয়োজনে যখন বাইরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এসব খবর পেলে একটু বিরক্ত হন। আর রমাও—অসুখ করেছে ব'লে ডেকে না পাঠালে সে নিজে থেকে কোনোদিন খবর নেয় না। এমন কি, চাকরকে দিয়ে 'শরীর খারাপ হয়েছে, খাব না' ব'লে পাঠালে চাকরকে কিংবা কোনো ছেলেমেয়েকে দিয়েই প্রশ্ন ক'রে পাঠায় কী খাবেন তিনি। সাগু কি বার্লি খাবার নির্দেশ শুনলে তবে নিজে খবর নিতে আসে কী হয়েছে!

এই তো আজও—কিছু আগে তিনি নিজেই বললেন, যেচে সেধে—ভিক্ষুকের মত যে, তাঁর শরীর খারাপ, এমন কি যে-কোনো সময়েই মারা যেতে পারেন, কিন্তু কথাটা সে ভালো ক'রে শুনল না পর্যন্ত। সে সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, একটা উল্লেখ পর্যন্ত করল না পরের কথায়। তিনি আর তাঁর কর্মক্ষেত্র, রমা আর তার কর্মক্ষেত্র থেকে এতই দূরে চ'লে গিয়েছে যে, দুটোর মধ্যে কোনো যোগসূত্রই আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়! তবু তো তাঁর অভাবের সংসার নয়—প্রতিদিনের অন্ন-সংস্থানের জন্য, কিংবা ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রে তোলার জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। অপ্রীতি ও অসন্তোষ যে কারণে জন্মে, মনের মধ্যকার আনন্দরসধারা যে কারণে শুকিয়ে যায়, সেরকম কোনো কারণই নেই তাঁদের জীবনে। তিনি পেয়েছেন যশ ও সার্থকতা, তাঁর স্ত্রী পেয়েছে প্রাচুর্য ও সম্পদ—বিলাসের, স্বাচ্ছন্দ্যের অজস্র উপকরণ। সেখানেই যখন এতটা দূরত্ব, এতটা ব্যবধান রচিত হ'তে পেরেছে, তখন কি তিনি আশা করেন যে, গরিব কেরানীর সংসারে, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার জন্য ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণে লড়াই করতে হয়—অভাব, অনটন ও অসন্তোষ যেখানে পুঞ্জীভূত, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই মন এবং মস্তিষ্ক যেখানে অসংখ্য দুশ্চিন্তায়

পীড়িত ও ক্লিষ্ট—সেখানে প্রথম যৌবনের ভালোবাসার কোনো চিহ্ন থাকবে?...

অত্যন্ত গ্লানি ও অপ্রীতিকর চিন্তায় শিবদাসবাবু যেন শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি জানালার ধার থেকে ফিরে এসে আবার বসলেন তাঁর গদি-আঁটা চেয়ারে। লেখা-পাতাগুলো তুলে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন, যদি তা থেকে মনে কোনো বল পান—এই ভরসায়।

হ্যাঁ, পড়তে মিষ্টি লাগে তাতে সন্দেহ নেই। জীবনে যদি এমনটা ঘটত তাহ'লে সবাই খুশী হ'ত, কিন্তু মন এটা বিশ্বাস করতে চায় না। ভেতর থেকে কোনো জোর, কোনো প্রেরণা যেন আর তিনি পাচ্ছেন না।

তবে কি মানুষের জীবনে এই অন্ধকারময় দিকগুলোই সত্য? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অবিচার, অভাব, অনটন ঈর্ষা, কুটিলতা, ব্যর্থতা! যা আজ তাঁর এবং তাঁর সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিকদের রচনার বেসাতি হয়ে উঠেছে—এইগুলোই শাশ্বত, অনাদি এবং অনন্ত। জীবনে এইগুলোই শুধু চিরস্থায়ী?

অনেকক্ষণ ধ'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন শিবদাসবাবু। তাই বা মানতে পারেন কৈ? তাঁর সমস্ত অন্তর একথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যা কুশ্রী, যা নিতান্ত গ্লানিকর, মানুষের জীবনে তা-ই সত্য হয়ে থাকবে? যেটুকু আলো, যেটুকু আনন্দ সে পেলে তার কোনো মূল্য নেই? কারুর জীবনেই তা সত্য হয়ে থাকবে না? আজ এতদিন পরে, এই কথাই কি তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে?

রমা? তাঁর রমা—তাঁকে আর ভালোবাসে না? আজ কি তাহ'লে এইটাই সত্য হয়ে উঠেছে যে, তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে আর কোনো মাধুর্যের অস্তিত্ব নেই?

তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে এলেন শিবদাসবাবু। শুধু তাঁর মুখ দেখে তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারত রমা—এমন কি কখন তিনি তাকে দেখতে চাইবেন, কখন সুন্দরী কিশোরী স্ত্রীর উপস্থিতি তাঁকে আনন্দ দেবে এটা পর্যন্ত বুঝতে পেরে গুরুজনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে নানা কৌশলে এবং ছুতোয় সে কাছে এসে দাঁড়াত, কিংবা সামনে দিয়ে চ'লে যেত। সংসারের সহস্র কাজের মধ্যে একটা চোখ এবং একটা কান যেন তার পাতা থাকত স্বামীর দিকেই। সেই রমা—তাঁর প্রিয়তমা, তাঁর আদরিণী স্ত্রী—এরই মধ্যে, জীবিত অবস্থাতেই তাঁর জীবন থেকে একেবারে বাইরে চ'লে গিয়েছে? তাই কি সম্ভব?

অকস্মাৎ এতদিন পরে বহুদিনের ভুলে যাওয়া আবেগ ও আকুলতায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন শিবদাসবাবু। এই তো মনে হয়েছিল যে, তিনিও বুঝি সম্পূর্ণ

ভুলে গিয়েছেন রমার অস্তিত্ব, কিন্তু আজ এতদিন পরেও তো তিনি তেমনি আকুলতা, তেমনি বেদনা অনুভব করছেন ওর জন্য। তাহ'লে বোধ হয় যায় না—কিছুই যায় না নষ্ট হয়ে, অনির্বাণ শিখা ঠিকই জলে, তবে হয়তো কখনও তা জলে লোক-চক্ষুর অন্তরালে!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের স্মৃতি সব যেন ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল তাঁর মাথার মধ্যে। মনে হ'ল যেন তিনি বহুকাল উপবাসী আছেন—তৃষ্ণায় তাঁর বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। একবার রমাকে কাছে পাবার জন্য, তার দুটো মিষ্টি কথার জন্য তাঁর সমস্ত মন একাগ্র হয়ে উঠল, বুকের কাছে যেন তিনি একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করতে লাগলেন।

একবার তিনি যাবেন নাকি রমার কাছে? এই তো পাশের ঘরই—মধ্যেকার ঐ দোরটা ভেজানোই আছে—কেউ জানতেও পারবে না। দোষ কি? স্বামীর যদি স্ত্রীকে প্রয়োজন হয়—তাতে লজ্জার কি কারণ থাকতে পারে?

ইচ্ছার তীব্রতা ও একাগ্রতায় পা যেন টলছে তাঁর, তবু তিনি উঠলেন, কোনোমতে পা টেনে টেনে গিয়ে মধ্যেকার দরজাটা খুলে ফেললেন। অনেকদিন বন্ধ থাকার ফলে মাকড়সার ঝুল ও ধুলোয় তা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না তাঁর। ঘরে নীল আলো জলছিল, তাতেই স্পষ্ট দেখা গেল ঐ তো শুয়ে আছে রমা, এক পাশে তার নাতনী লেখা, আর এক পাশে ছেলে বন্টু।

দোর খোলার সময় বোধ হয় একটু বেশীই শব্দ হয়েছিল—গৃহিণী চমকে উঠলেন, 'কে! কে ওখানে?'

'আমি রমা, আমি!' কম্পিতকণ্ঠে কোনোমতে বললেন শিবদাসবাবু।

'তুমি? কেন গো? কী হয়েছে? চোর এসেছে নাকি?' ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন তিনি।

'না না চোর নয়। তুমি ভয় পেয়ো না। বলছিলুম—আজ তুমি আমার কাছে একটু থাকবে? শরীরটা আমার যেন মোটেই ভালো লাগছে না।'

গৃহিণী নেমে একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন—'কী ব্যাপার বল তো? জ্বর হয়েছে নাকি? কৈ দেখি।'

'না—জ্বর নয়।' অপ্রতিভভাবেই বললেন শিবদাসবাবু।

'মাথা ঘুরছে?'

'না না, তাও নয়। এমনিই। থাকো না একটু কাছে!' কেমন যেন ভিক্ষার সুর তাঁর কণ্ঠে।

'তাইতো! লেখাটার যে আবার বড্ড জ্বর! ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা অন্তরই। ও-তো আর কারুর কাছে থাকবে না—বরং এক কাজ করি, মোহিতকে ডেকে দিই, কাছে এসে শুক্—'

মোহিত তাঁদের বড় ছেলে। বিরক্তি ও হতাশায় শিবদাসবাবুর মুখ কালো হয়ে উঠল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'না না, তাদের আর বিরক্ত করতে হবে না। আচ্ছা, তুমি শোও—আমি একাই থাকব'খন।'

'তুমি রাগ করছ, কিন্তু কী ক'রে যাই বল দিকি। মেয়েটাকে নিয়ে গেলেও তোমাকে বিরক্ত করবে!' অপরাধীর মতই দীন ভঙ্গি তাঁর, দেখলেও মায়া হয়। আবারও বললেন, 'আচ্ছা—এই দোরটাই খোলা থাক না, আমার তো নাতনীর জন্যে আর রোগের জ্বালায় ভালো ক'রে ঘুমই হয় না, একটু ডাকলেই ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিছু কষ্ট হ'লে কিংবা কিছু দরকার হ'লেই ডেকো—কেমন?'

'তাই হবে—তুমি শোও!' শিবদাসবাবু নিজের ঘরের দিকে ফেরেন।

'তুমি রাগ করলে, হ্যাঁ গো?'

'না না, তুমি শোও।'

ফিরে আসবার সময় দোরটা ভেজিয়েই দিলেন তিনি। ও পক্ষ থেকেও সে সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ এল না।

আরও অনেকক্ষণ জানালার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার পর শিবদাসবাবু ফিরে এসে তাঁর রাইটিং ডেস্কের সামনে বসলেন। এতক্ষণের পরিশ্রমের ফল ক্ষুদি-ক্ষুদি লেখা এই সাতটা পৃষ্ঠা কাগজ তাঁকে যেন বিদ্রূপ করছে, অন্তত সেদিকে চেয়ে তাই মনে হ'ল। সে পরিহাস সহ্য করতে না পেরে তিনি কাগজগুলো গোছা ক'রে হাতে তুলে নিলেন। এখনই ছিঁড়ে ফেলা যাক। এতক্ষণ বৃথাই সময় নষ্ট করেছেন তিনি—যে উপন্যাসখানা লিখছেন 'আসন্ন বিপ্লবের ভূমিকা' ব'লে, তারই দুটো পরিচ্ছেদ এই সময়ে লেখা হ'তে পারত।

কিন্তু, ছিঁড়তে গিয়েও চোখ তাঁর অজ্ঞাতেই শব্দগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে যায়। না, রচনা তাঁর ভালোই হয়েছে—হয়তো অবাস্তব, অসম্ভব—তবু পড়তে ভালো লাগে। এমন কি বিশ্বাসও হয়।

থাক না—এমনটা যদি বাস্তব জীবনে সত্য না-ই হয়—না হয় সাহিত্যেই সত্য

হয়ে থাক। মানুষের মন জীবনের মধ্যে যদি কোথাও কোনো সান্ত্বনা বা আশ্বাস খুঁজে না পায়—রইল তবে তার জন্য তা সাহিত্যের মধ্যেই। চারিদিকের এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার মধ্যে এইটুকুই থাক্ উজ্জ্বল ও শাশ্বত হয়ে। প্রেম হয়তো বিশ্বে মৃত্যুহীন নয়—তাতে ক্ষতি কী? সাহিত্যেই তা অমর হয়ে থাকুক।

কাগজগুলো সযত্নে ডেস্কের মধ্যে তুলে রেখে শিবদাসবাবু উঠে পড়লেন। আলোটা নিভিয়ে দিতে হবে এখন—অনেক রাত হয়েছে।

## মুসাফির

সমস্ত ট্রেনটার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় বার দুই ঘুরিয়া আসিলাম, কোথাও এতটুকু স্থান মিলিল না। ভিতরে জায়গা আছে কি না তাহা বুঝিবারও উপায় নাই, দরজার কাছে যাঁহারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের অনুগ্রহে। যুদ্ধের সময় বলিয়াই বোধ হয়, অসামরিক ভদ্রলোকদেরও মেজাজ যেন মিলিটারি হইয়া গিয়াছে! তাঁহাদের কাছে ঘেঁষে কাহার সাধ্য!

তবু উঠিতে হইল। ঘণ্টা ও গার্ডের হুইশিলে ট্রেন যখন ছাড়িয়া দিয়াছে তখন একরকম মরীয়া হইয়াই একটা বড় দরবারী কামরায় (তখন দেখিবারও অবসর ছিল না—সামনে যে গাড়ি পাইলাম তাহাতেই) জানালা দিয়া হাতের ছোট স্যুটকেসটা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া দ্বাররক্ষীদের নিশ্চিন্ত অসতর্কতার অবসরে পা দুইটা ভিতরে ঢুকাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, দরজার সামনে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা মুহূর্তে সজাগ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, তখন আর উপায় কী? চলন্ত ট্রেন হইতে সে অবস্থায় আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ স্থির-মস্তিষ্কেই আমাকে হত্যা করা। তবু তাঁহারা খানিকটা অসহযোগ করিতে ছাড়িলেন না—আমি তেমনি হাতল ধরিয়া দেহের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটা বাহিরে রাখিয়া ঝুলিতে লাগিলাম, তাঁহারাও তেমনি স্থাণুবৎ অচল হইয়া পথ রুখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবটা এই যে, যেমন চালাকি করিয়া ভিতরে ঢুকিতে গিয়াছিলে তেমনি মরো এখন—যোদ্ধা আমরা এক ইঞ্চিও নড়িব না। আমরা যে আগেই বলিয়াছিলাম ভিতরে স্থান নাই, সে কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করিতে দিব না।

আমিও চট করিয়া তাঁহাদের ঘাঁটাইলাম না। মোগলসরাই-এর বিরাট ইয়ার্ড তখনও শেষ হয় নাই। গাড়ি মন্থর গতিতে লাইনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঝাঁকানি খাইতে খাইতে পার হইতেছে, সুতরাং মাথাটা লইয়াই বিপদ—অসংখ্য সিগনালপোস্টের কোনটাতে কখন যে লাগিয়া যায় ঠিক নাই। তবু ঝুলিয়াই রহিলাম আরও মিনিট দশেক। তারপর আর একবার, কর্তাদের অন্যমনস্কতার অবসরে শিথিল মাংসপেশীর সুযোগ লইয়া আর একটা প্রকাণ্ড ধাক্কায় ভিতরে চলিয়া গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন আন্তর্জাতিক গালাগালির ঝড় বহিয়া গেল। অর্থাৎ, দরজা আটকাইয়া যাঁহারা খাড়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙালী ছাত্রশ্রেণীর যুবক, কাবুলীওয়ালা, সিন্ধী মুসলমান, বিহারী এবং শিখ—সব জাতিরই প্রতিনিধি ছিল নিশ্চয়। কাহাকে নাকি এই ভিতর-প্রবেশের অজুহাতে লাথি মারিয়াছি, কাহাকে ধাক্কা লাগাইয়াছি, আমি অভদ্র, অন্ধ, ইতর—এই সব। আমি এই অভিযোগ ও গালাগালির একটিও জবাব দিলাম না, কারণ তখন আমার অনধিকার-প্রবেশের জন্য শুধু ইঁহারা নন গাড়িসুদ্ধ সকলেরই বৈরিভাব, আর দারোয়ানগুলির তো কথাই নাই। একটা মারামারির ভূমিকার জন্য যেন সকলেই তখন প্রস্তুত। এসব ক্ষেত্রে আসল মারামারি কদাচিৎ হয়, সেকথা জানা থাকে বলিয়াই ভিড়ের মধ্যে আস্তিন গুটাইয়া বিক্রম দেখানো সহজ।

আমি বরং অস্ফুটকণ্ঠে একটা ক্ষমা প্রার্থনার চেষ্টা করিয়া একটা পা একজনের বাক্স এবং আর একটা পা অপর একজনের হোল্ডঅলের উপর দিয়া কোনোমতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। বড় গাড়ির একটা সুবিধা এই যে, ভিড় যতই হউক একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গাড়িতে স্থান এমনিই ছিল। বেঞ্চিগুলিতে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা যথেষ্ট জায়গা জুড়িয়াই বসিয়াছেন—আরাম করিয়া বসিতেও ঠিক অতটা জায়গা লাগে না। আসল কথা হয়তো শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া ঠুলিয়া ইহারই ফাঁকে রাত্রে একটু কোমরটা সোজা করা যাইবে, এ আশা তাঁহাদের সকলকারই ছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই, এক এক দলের একজন বা দুইজন দুইটি বেঞ্চির মধ্যেকার প্রবেশপথটুকু জোড়া করিয়া ট্রাঙ্ক বা বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া আছেন। অর্থাৎ, এতই স্থানাভাব যে, তাঁহাদের আর বেঞ্চে বসিবারও ঠাঁই মিলে নাই। আর সব চেয়ে ভিড় সামনা-সামনি দুইটি দরজার মাঝের জায়গাটুকুতে। বোধ হয় মাঝপথে আমার মত যত অভাজন উঠিয়াছে, সকলেই এই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে আশ্রয় লইতে বাধ্য

হইয়াছে। ফলে মালে আর মানুষে ঠাসাঠাসি—তিল ধরিবারও কোথাও উপায় নাই।

আমি ইতিমধ্যেই একবার সবটায় চোখ বুলাইয়া লইয়াছিলাম। অপেক্ষাকৃত ছোট বেঞ্চিগুলির দিকটায় দুইটি বাঙালী পরিবার স্থান লইয়াছেন। একটির সহিত কী করিয়া একজোড়া মাদ্রাজী স্ত্রী-পুরুষও ঢুকিয়া গিয়াছেন। আর বড় বেঞ্চিগুলিতে বোধ হয় ভারতবর্ষীয় এমন কোনো প্রদেশের লোক নাই যাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। শিখ, মারোয়াড়ী, ওড়িয়া, সিন্ধী, সাঁওতাল—মায় কাবুলীওয়ালা, বেলুচী পর্যন্ত। মারোয়াড়ীরা যেখানে বসে মালপত্রে একটা পাঁচিল তুলিয়া মধ্যে অনেকটা স্থান জোড়া করিয়া রাখে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হয়তো ঝগড়াঝাঁটি করিয়া তাহার মধ্যে একটুখানি জোর করিয়া দখল করা যাইত। কিন্তু, তাহাদের আনুষঙ্গিক হিসাবে জল, ফলের খোসা, ছেলেমেয়েদের কুকার্যের বোঝা এবং পুরী-তরকারির ছড়াছড়িটা কল্পনানেত্রে দেখিয়া লইয়া সে কাজে আর প্রবৃত্তি হইল না। কোনোমতে স্যুটকেসটা উদ্ধার করিয়া, মানুষ ঠেলিয়া, মাল মাড়াইয়া, বহুলোককে ধাক্কা দিয়া একরকম মরীয়া ভাবেই একসময়ে বাঙালীদের কাছে আসিয়া পৌছিলাম এবং একজোড়া বেঞ্চের প্রবেশপথে প্রায় ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় দাঁড়াইয়া সবিনয়ে বলিলাম, 'বেঞ্চে এখনও ভেতরের জায়গা আছে, আপনারা একজনও যদি ওখানে চ'লে যান তাহ'লে আমি একটু এখানে ঠাঁই পাই। যদি একটু দাঁড়াবারও স্থান পেতুম তাহ'লে আর আপনাদের বলতুম না, দেখছেন তো কিরকম তে-শূন্যে আছি!'

সঙ্গে সঙ্গে দু'টি বাঙালী তরুণই রুখিয়া উঠিলেন। একজন কহিলেন, 'ভেতরের জায়গা আছে! কী বলছেন মশাই, আপনি কি কানা নাকি? দেখছেন, এমনিতেই ওঁরা কী কষ্ট ক'রে ব'সে আছেন—মহিলা আর শিশু, ওঁদের তো একটু বেশী জায়গা দিতেই হবে।...জায়গা বেশী থাকলে আমাদের এইভাবে ব'সে থাকার দরকার কী বলুন?'

আর একজন কহিলেন 'দাঁড়াবার যে জায়গা নেই তা-তো ওঠবার সময়ই আপনাকে বলা হয়েছিল। জেনে-শুনেও উঠলেন কেন?'

অগত্যা চোখে আঙুল দিতে হইল। কণ্ঠস্বর একটু কঠিন করিয়া কহিলাম, 'কানা নয় ব'লেই তো জায়গা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা পথ জোড়া ক'রে আছেন ব'লে তাই, আর ঠিক অপরিচিতা মহিলাদের পাশে গিয়ে বসবার ইচ্ছে নেই ব'লেই—নইলে ব'সে দেখিয়ে দিতুম যে জায়গা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুবকটি মুখ চোখ লাল করিয়া উঠিলেন, ‘মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই। মেয়েদের ঘাড়ের উপর বসবেন আপনি, এত বড় স্পর্ধা?’

দুই-একজন ইতিমধ্যেই একটা হাতাহাতির গন্ধ পাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। আমিও কণ্ঠস্বর আর এক পরদা চড়াইলাম—কহিলাম, ‘বসবার ইচ্ছে নেই সেই কথাই বলেছি মশাই; কালা না হ’লে আপনিই সে কথা শুনতে পেতেন। মুখ যদি সামলাতে হয় তো আপনিই সামলান।’

মোড়ের ট্রাঙ্কের দ্বিতীয় তরুণ অধিবাসীটি তো প্রায় দাঁড়াইয়াই উঠিয়াছেন। কহিলেন, ‘খুব যে লম্বা লম্বা কথা বলছেন মশাই—কী করবেন তাই শুনি? আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেট এলেন নাকি—না পুলিশ-সাহেব, মেজাজ তো খুব দেখছি।’

জবাব দিলাম, ‘মেজাজ যে কার তা এঁরা সবাই দেখেছেন। সে কথা থাক্—লম্বা লম্বা কথা তো বলতে চাই নি। খুবই ছোট কথায় কাজ সারতে চেয়েছিলুম। আর কী করব শুনতে চান? যদি অনুমতি করেন তো আপনাকে ভেতরে এক জায়গায় বসিয়ে দেখিয়ে দিই যে, মহিলাদের বিরক্ত না ক’রেও বসবার স্থান ক’রে নেওয়া যায়। এতগুলো লোক এখানে দাঁড়াতে পর্যন্ত পাচ্ছে না ভালো ক’রে, আর আপনারা শোবার জায়গা আগলাচ্ছেন, এটা তো ঠিক কথা নয়।’

একজন বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, ‘শোবার কেন, ফুটবল খেলবার বলুন।’

আঙুল দেখাইয়া আরও কঠিনভাবে বলিতে হইল, ‘শিশু তো আপনাদের মধ্যে একটি, সে শুয়েই আছে। মহিলাদের মধ্যে একজন বেশ খানিকটা পা ছড়িয়েই বসেছেন, আর দু’জনও ওধারের বেঞ্চে পা তুলে আরাম ক’রে ব’সে আছেন। ওঁদেরও আমি জায়গা ছাড়তে বলছি না, শুধু বলছি—ঐ যে দু’টি মহিলার মধ্যে খানিকটা জায়গায় একটা তোয়ালে আর একখানা বই প’ড়ে আছে, ওটাও কি তুলে নেওয়া যায় না? ওখানে তো আপনাদের একজন অনায়াসে বসতে পারেন।’

পিছনের দিক হইতে আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, ‘মহিলাদের দিকে অমন ক’রে আঙুল না দেখিয়ে কি বলা চলত না?’

বললাম, ‘তা হয়তো চলত—কিন্তু, এঁদের যে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে এঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কী করি বলুন?’

এবারে মহিলাদেরই লজ্জা হইল; এ পাশের দু’টি তরুণী মহিলা অনেকখানি

করিয়া সরিয়া গিয়া একজন নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, 'এই ছোড়দা, এখানে এসে বোস না—সত্যিই তো জায়গা থাকতে মিছিমিছি ভদ্রলোককে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?'

তবে ছোড়দা ছাড়িবার পাত্র নন। কহিলেন, 'তোদের অসুবিধা হবে না?'

'না, না। বলছি যখন হবে না, তখন অত মাথাব্যথা কেন তোমাদের?'

অগত্যা প্রথমোক্ত তরুণটি উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহাদের ট্রাঙ্কের উপরই চাপিয়া বসিলাম। ফলে যুদ্ধটা ভালো করিয়া বাধিবার আগেই যেন বন্ধ হইয়া গেল। ওপাশে যাঁহারা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা আবার মাথা গুটাইয়া লইয়া নিজেদের সুখ-দুঃখের আলোচনায় ফিরিয়া গেলেন। মধ্যপথে যাঁহারা এখনও কষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহারা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বার্থপর বাঙালীর (অর্থাৎ আমার) দিকে একবার ঈর্ষাতুর নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র!

গাড়ি হু হু করিয়া ছুটিয়াছে। চারিদিক হইতে কথা কহিবার একটা গুঞ্জন শোনা গেলেও আমার পাশে গভীর শান্তি। দুই-একবার মহিলাদের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে যে কথা হইয়াছে তাহাতেই ইঁহাদের পরিচয়ের মোটামুটি আভাস পাইয়াছি। দু'টি তরুণীই বিবাহিতা—একটি ভাজ, অপরটি ননদ। ননদের শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল—তারপর সেখান হইতে এটোয়াতে চেঞ্জে। এটোয়াতে বড়ভাই ও ভাজ থাকেন, এখন ভাজ ননদকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিতে চলিয়াছেন, সঙ্গে ঐ ছেলেটি—দেবর, উদ্দেশ্য শ্বশুরবাড়ি একবার ঘুরিয়া যাওয়া। আমার পাশে যে যুবকটি বসিয়া আছেন, বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁহার মা, তরুণীটি বোধহয় স্ত্রী। তীর্থ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইয়া আগ্রা পৌছিয়াছিলেন, সেখান হইতেই ফিরিতেছেন। দিল্লী যাওয়া হইল না বলিয়া তরুণীটির এবং কুরুক্ষেত্রে স্নান করা হইল না বলিয়া বৃদ্ধার ক্ষোভের সীমা নাই। খুব সম্ভব সহযাত্রী তরুণটির অফিসের ছুটি ফুরাইয়াছে বলিয়াই চলিয়া আসিতে হইল—সেইজন্য সে-ই নীরব।

চুপ করিয়াই বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি, সহসা, ওপাশ হইতে একটি বিহারী সহযাত্রী বলিয়া উঠিল, 'বাবুজী, ম্যাচিস্ হ্যায়?'

চমক ভাঙ্গিয়া দেখি প্রশ্নটা আমাকেই করা হইতেছে। তাড়াতাড়ি দিয়াশলাইটা বাহির করিয়া দিলাম। ধূমপানের মজাই এই যে, একজনকে করিতে

দেখিলেই অপরের সে ইচ্ছা প্রবল হয়। সুতরাং, এইবার নিজেও সিগারেটের একটুখানি বাহির করিয়া পাশের তরুণটির সামনে ধরিলাম, 'চলবে?'

বোধ হয় মুহূর্ত তিন চার ভদ্রলোক ইতস্তত করিলেন, তারপরই মধুর হাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া একটা টানিয়া লইলেন। বেঞ্চের ভিতরের তরুণটিকেও অনুরোধ করিলাম। তিনি সবিনয়ে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, 'থ্যাঙ্কস্, আমি খাই না।'

আমাদের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। আমি দিয়াশলাই জ্বালাইয়া আমার সহযাত্রীটির মুখে ধরিলাম; তিনি সিগারেটটা ধরাইয়া লইয়া কহিলেন, 'এ সিগারেট কি এখান থেকে কিনলেন?'

জবাব দিলাম, 'না, এ আমার কলকাতাতে কেনা।'

যেন তাঁহারই একটা কিছু জয়লাভ হইল—সগর্বে কহিলেন, 'তাই বলুন, টাটকা মাল এখানে পাওয়াই যায় না। যা কিনি—সবই যেন পান্তাভাত।'

তারপর আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কতদূর যাবেন?'

'হাওড়া—আপনি?'

'আমিও তাই। আপনি কি কাশী থেকে আসছেন?'

উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল এসেছি, আবার আজই যাচ্ছি।'

'কাজে এসেছিলেন বুঝি?'

'না—ঠিক কাজে নয়, একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলুম।'

ইহার পর দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম—ইঁহাদের গতিবিধি এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অনুমানই ঠিক। ইঁহাদের সঙ্গের আর একটি মহিলার পরিচয় আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন শুনিলাম, ইঁহাদেরই গ্রামে তাঁহার বাড়ি, একসঙ্গে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। সাঁতরাগাছিতে ইঁহাদের সকলকার বাড়ি।

এটোয়া-ফেরত যুবকটির সহিত একটু একটু করিয়া আলাপ হইল। ছেলেটির নাম বাদল। বি-এ পাস করিয়া কোনো একটা ফার্মে চাকরি করে, সন্ধ্যায় আইনও পড়ে। তাহাদের পৈতৃক বাড়ি ভবানীপুরে। ছেলেটির দেখিলাম, বৌদি অন্তপ্রাণ। বৌদি যে এটোয়াতে পড়িয়া থাকেন, তা তাহার মোটেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু, দাদাকেই বা অত মোটা মাহিনার কাজ ছাড়িতে বলে কেমন করিয়া?

বাদল ছেলেটি বড় সরল। সে পরিচয়টা একটু জমিয়া উঠিতেই গড় গড়

করিয়া তাহার যত কিছু প্রাণের কথা বলিয়া চলিল, 'কী বললেন, আপনার বাড়ি ঢাকুরে? বৌদিদির বাপের বাড়ি তো ঐখানেই, একটা স্টেশন পরে—যাদবপুরে। বৌদি খুব ভালো গান গাইতে পারতেন সেকালে—জানেন? আমার ঐ ছোট-বোনটি—ওতো ডাক্‌সাইটে গাইয়ে। অনেকগুলো রেকর্ড আছে ওর। কী যে বাবা ওর এক বিয়ে দিলেন সেই ধাধ্‌ধাড়া গোবিন্দপুরে—বাগনান থেকে নেমে তিন মাইল যেতে হয়—সেখানে গিয়ে না রইল গানের চর্চা আর না রইল স্বাস্থ্য। দেখুন না, ম্যালেরিয়া ধ'রে একেবারে তো মরতে বসেছিল।'

আবার একটু পরেই শুরু করিল, 'আইন পড়ছি বটে, জানেন ওকালতি করবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই। চাকরি তো নয়ই—'

প্রশ্ন করিলাম, 'তবে কী করতে চান?'

'সে শুনলে আপনারা হাসবেন। আমার ইচ্ছা ভালো লোক পেলে ম্যাজিক শিখি। একেবারে কাঁচা-পয়সা মশাই, যাকে বলে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে খাওয়া। স্রেফ্‌ লোক ঠকিয়ে পয়সা নেওয়া, মজা নয়? তাছাড়া কত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো যায় পরের পয়সায়—বেশ প্রফেশন, না দাদা? ঐ দেখুন না, পি. সি. সরকার কী পয়সাটাই না কামাচ্ছে। কী খাটুনি? কিচ্ছু না।'

সাঁতরাগাছির ভদ্রলোকের নাম কেদার। কেদারবাবু বাদলের চেয়ে বোধ হয় বছর তিন-চারেকের বড়ই হইবেন, কিংবা আর একটু বেশী। তিনি কী একটা সরকারী চাকুরি করেন। মাত্র বছর তিনেক হইল ঢুকিয়াছেন, সেই জন্যই বেশী দিন ছুটি লইতে সাহস করেন না। ছুটি লইলে কর্তারা মনে করেন, ফাঁকি-বাজ—চাকরিতে উন্নতি হয় না। তাঁহার আশা সাব-অর্ডিনেট এ্যাকাউন্টস সার্ভিস পাস করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন, সেখান হইতে অফিসার। দেশ-বিদেশ বেড়ানোর শখ বিশেষ নাই। ভালোও লাগে না, দলে পড়িয়া আসা।

পাশের বেঞ্চের মাদ্রাজী ভদ্রলোকও একরকম গায়ে পড়িয়াই আলাপ করিলেন। তিনি কী একটা মিলিটারি কনট্রাক্টের আশায় দিল্লী গিয়াছিলেন। অমনি বেড়ানোও হইবে এই জন্য তাঁহার স্ত্রী সঙ্গ ছাড়েন নাই।

কথায় কথায় এই যে ট্রেনে এত ভিড়, এ সম্বন্ধে সরকারের ঔদাসীন্য—ইহার উপরে ছোটখাটো একটি বক্তৃতাও করিলেন। আমরা নির্জীব, আমরা আমাদের অধিকার দাবি করিতে পারি না, সেই জন্যই এত কষ্ট পাই—এই তাঁহার মত। খবরের কাগজে একখানা চিঠি লিখিতেও আমাদের গায়ে জ্বর আসে, তা দাবি করিব কী। ইত্যাদি—

ইতিমধ্যে সাসারাম প্রভৃতি আরও গোটা দুই স্টেশন ছাড়াইয়া গেল। ওপাশে একটি মাড়োয়াড়ীর সহিত একটি সিন্ধী ভদ্রলোকের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে একটা আলোচনা জমিয়া উঠিয়াছে। ধর্মের গন্ধ পাইয়া অনেকেই সেদিকে ঝুঁকিয়াছেন। একটি শিখ একটা উর্দু সংবাদপত্র হইতে একজন কাবুলীওয়ালাকে কী একটা সংবাদ পড়িয়া শোনাইতেছেন এবং সংবাদের মর্মার্থটা বোঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। একেবারে ঐ ধারের ওড়িয়া-দম্পতিটির সহিত একজন শিখের দারুণ একটা কলহ বাধিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছে। মধ্যেকার স্টেশনে কয়েকজন যাত্রী উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দ্বাররক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় উঠিতে পারে নাই। সে জন্য যেন কতকটা খুশীই আছি—কিছু পূর্বেকার নিজের অবস্থা অবশ্য এখন আর মনে থাকা সম্ভব নয়।

বাদলদের সহিত আলাপটা ইহার মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। বাদলের বৌদি ও বোনের সহিত কথাবার্তা চলিয়াছে। বৌদি মেয়েটি সত্যই অসাধারণ—ছোট দেবর ও ননদটির সম্বন্ধে স্নেহের ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। বয়স বেশী নয়, সঙ্গের ঐ তিন বছরের ছেলেটিই তাঁহার প্রথম সন্তান। তবু ইহারই মধ্যে তিনি দেবর ও ননদের জননীর স্থান পূর্ণ করিয়া বসিয়াছেন। স্নেহ ও করুণার অপূর্ব অঞ্জনে তাঁহার সুশ্রী মুখ যেন অসাধারণ সুন্দর দেখাইতেছিল। বৌদি ইতিমধ্যেই কোথায় কোন্ স্টেশনে চা সংগ্রহ করিয়া ফ্লাস্কে রাখিয়া দিয়াছিলেন—এখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে গ্লাসে ও কাপে করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। দুই টুক্‌রা জেলি-মাখানো রুটি ও এককাপ চা আমার কাছেও আসিয়া পৌঁছিল।

চায়ের পর্ব শেষ হইলে একরকম মরীয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিলাম, 'বৌদি, প্রশ্রয় পেয়ে সাহস বেড়ে গেছে। যদি দেওরের কথাটা আস্পদ্দা ব'লে মনে না করেন তো একখানা গান শুনিয়ে দিন।'

তিনি লজ্জিত স্মিতমুখে কহিলেন,'ঐ পাগলাটার কথা আপনি বিশ্বাস করলেন, ঠাকুরপো! গান গাইতে জানেন আমার এই ননদটি—অশোকা সেন, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

আমি মাথা-টাথা চুলকাইয়া বলিলাম, 'ওঁর গান তো শুনবই—মোদ্দা আপনাকেও ছাড়ছি না।'

আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। উৎসাহ দেখিলাম বাদলেরই বেশী।

সে একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া অবশেষে বৌদিকে রাজি করাইল। বৌদি একখানি গান গাহিলেন—রবীন্দ্রনাথের গান। মোটের উপর গলা ভালোই, হয় তো সুরে একটু-আধটু ভুল থাকিতে পারে। এবার অশোকার পালা, কিন্তু তাহাকে অনুরোধ করিতে গিয়া থামিয়া গেলাম। সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় সান্ধ্য প্রার্থনা করিতেছে তখন। দুই চক্ষু নিমীলিত, ওষ্ঠ দুইটি সামান্য একটু নড়িতেছে, হাত দুইটি বুকের আঁচলের মধ্যে। বৌদি আমাকে চুপিচুপি বলিলেন, 'ও এখন ভগবানের নাম করছে ভাই—মিনিট কতক না গেলে কিছু বলা যাবে না। জপ করা এখনই শেষ হবে, কিন্তু জপ করার পরও দশ বারো মিনিট ও ভালো ক'রে কথা কইতে পারে না।'

বিস্মিত হইয়া মেয়েটির দিকে ভালো করিয়া চাহিলাম। খুবই অল্প বয়স, কুড়ি বাইশের বেশী হইবে না। রোগশীর্ণ মুখের পাণ্ডুরতা একেবারে নষ্ট না হইলেও মেয়েটি যে সুশ্রী তাহা বুঝা যায়, কিন্তু তবু কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে মুখে অসাধারণত্ব কিছুই খুজিয়া পাই নাই। অথচ, এখন এমন একটি ভক্তি-তদ্গত ভাব মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে যে, সেদিকে চাহিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। আমার আশেপাশে যাঁহারা ছিলেন—কেদারবাবু প্রভৃতি—তাহারাও দেখিলাম সসম্ভ্রমে চাহিয়া আছেন। এই যে প্রার্থনা ঐ সুন্দর ওষ্ঠ দুইটিকে কম্পিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বাহির হইয়া আসিতেছে—উহা হয় তো পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালীর অনুমোদিত প্রার্থনা নয়, বীজমন্ত্রও নয়—তবু তাহার আন্তরিকতা ও ভক্তিতে যে সেটি সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে চাহিলে সে সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকে না।

বৌদি চুপিচুপি বলিলেন, 'অমনি ওর ছেলেবেলা থেকেই। কেউ কীর্তন গাইতে এলে তিন বছরের মেয়ে ছুটে তার সঙ্গে বেরিয়ে যেত। পাঁচ ছ বছর বয়সেই তিন-চার দিন রামকমলের কীর্তন শুনতে গিয়ে ভাব-সমাধি হয়েছিল। ······কী কষ্টে যে বাবা ওর বিয়ে দিয়েছেন। কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না—শেষে এইখানে এদের বাড়িতে ঠাকুর আছেন—এই সব ব'লে তবে রাজি করানো হ'ল। সাধ ক'রে কি আর ঐ ম্যালেরিয়ার দেশে দিয়েছি? এখনকার দিনে ওর মনের মত ধার্মিক বাড়ি কোথায় পাব বলুন?'

প্রশ্ন করিলাম, 'স্বামীটি কেমন?'

'সে এমনি সাধারণ ছেলে, তবে ওর ও-সব নিয়ে কখনো ঠাট্টা-তামাশা করে না। তাতে ক'রে কোনো অশান্তি নেই ওদের মধ্যে—এই অবধি বলতে পারি।'

ঠাট্টা-তামাশা করা যে সম্ভব নয় তা মেয়েটির দিকে চাহিলেই বোঝা যায়। একটু পরে অশোকা এদিকে ফিরিয়া আমাদের সকলের দৃষ্টিই শ্রদ্ধায় তাহার দিকে স্থির হইয়া আছে দেখিয়া, যেন কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িল। বৌদি বলিলেন, 'এঁরা তোর গান শুনবেন ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছেন।'

অশোকা আরও লজ্জিত বোধ করিল। তবে বেশীক্ষণ পীড়াপীড়িও করিতে হইল না। রবীন্দ্রনাথেরই একটা গান ধরিল। গলা খুবই মিষ্ট—তবে ঝিম: চলন্ত গাড়িতে একটু অসুবিধা হইবার কথা। যেটা ধরিল সেটা বেহাগ সুরের গান—সন্ধ্যার সময়ে হয়তো বেহাগ ধরা উচিত হয় নাই, তবুও সবটা জড়াইয় একটি ভক্তিনম্র চিত্তের আকুল প্রার্থনা হিসাবে সে সময়ে আমাদের সকলকেই গভীরভাবে অভিভূত করিল। আজ এতদিন পরেও যখনই চোখ বুজিয়া কথাটা ভাবিতে চেষ্টা করি, গানের দুই-একটি কলি সেই আন্তরিক আকুলতাসুদ্ধ যেন কানের কাছে বাজিয়া ওঠে—

'রুদ্ধদ্বারের বাহিরে একেলা আমি,
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী,
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো!
অন্তরে মোর সঙ্গীত দাও আনি—
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী!
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো!'

আমাদের গানের পর্ব বোধ হয় পাশের মাদ্রাজী ভদ্রলোকটির ভালো লাগে নাই। আমরা যখন সুরের সেই বিহ্বল করা আঘাতে ভিতরে বাহিরে থম থম করিতেছি, সেই সুযোগে তিনি পকেট হইতে একজোড়া তাস বাহির করিয় কহিলেন, 'আসুন না, একটু তাস খেলা যাক্।'

প্রথমটা বিরক্ত হইয়াই উঠিলাম, কিন্তু তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া নরম হইতে হইল। তাহার উপর বেচারী বাদল ছেলেমানুষ, তাহার বোধ হয় এত ভারী আবহাওয়া সহ্য হয় না—সেও ঝুঁকিয়া পড়িল, 'খেলুন না, মন্দ কি।'

আমি, বাদল, কেদারবাবু ও সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি বাক্সটিকে টেবিল করিয়া বসিলাম। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে বেঞ্চিতেই প্রমোশন পাইয়াছি। চলিল কিছুক্ষণ তাসখেলা। আমার ঠিক তাসখেলায় মন ছিল না, তাহার উপর বাদল বসিয়াছিল আমার সঙ্গে—সে একেবারে কাঁচা খেলোয়াড়, সুতরাং আমরাই

হারিতে লাগিলাম! তাহাতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকের বিজয়গর্বের সহিত আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। চট করিয়া খেলা ছাড়িতেও পারিলাম না।

অশোকা অন্ধকারে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে সুদূরাগত বংশীধ্বনির মত তাহার সুরের গুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে কানে। বৌদি কেদারবাবুর মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। তাঁহার বাপের বাড়ির গল্প, এটোয়ার গল্প, শ্বশুরবাড়ির গল্প। তাহারও দুই-একটি কথা শুনিতে পাইতেছি। ওধারে একটি মারাঠী মহিলা বার-দুই বমি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহার বিব্রত স্বামীর মুখে শুনিলাম, ট্রেনে উঠিলেই নাকি এই রকম হয়। গাড়িসুদ্ধ লোক নানা উপদেশ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি পাঞ্জাবী মহিলা দেখিলাম কোনোরূপ সঙ্কোচ না করিয়া ভিড় ঠেলিয়া কাছে গিয়া বসিলেন এবং মূর্চ্ছিতা মহিলাটির মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলেন। মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটি, যেন তাঁহারই একটা দায়িত্ব কাটিয়া গেল—এই সুরে বলিয়া উঠিলেন, 'জয় রামজী কি!'

এই সব ছোটখাটো নাটকের মধ্য দিয়া আমাদের তাসখেলা কিন্তু ঠিকই চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে গাড়ির সবাই একরকম করিয়া বসিয়াছে। পথের মাঝখানে ও দরজার ধারে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহ বা সেইখানেই মালের উপর জায়গা করিয়া লইয়াছেন, কেহ বা বেঞ্চির মধ্যেকার ফাঁকগুলি ভরাইয়াছেন। মজার কথা এই যে, ঘণ্টা-তিনেক পূর্বে যাঁহারা অপরে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়াও প্রাণপণে নিজেদের আশেপাশে স্থান জোড়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে সেইসব লোককেই ডাকিয়া কাছে বসাইয়াছেন। ওড়িয়া ভদ্রলোকটি স্থান দখল করার জন্য একজন শিখের সহিত তখন দারুণ বিবাদ বাধাইয়াছিলেন। এখন আবার তাহার সহিতই তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে চেঁচামেচি হইয়া গেল। অর্থাৎ, তিনি যত বার শিখ ভদ্রলোকটিকে আরাম করিয়া বসার জন্য অনুরোধ করেন, শিখটি ততই যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া বসে।

আশ্চর্য, এইটুকুর মধ্যে কত নাটকই দেখিলাম। এই এত হৃদ্যতা—অথচ স্টেশনে স্টেশনে যখনই নূতন মানুষ ওঠে তখনই কী অপ্রীতিকর চেঁচামেচি না শুরু হয়!…মানুষের সারাজীবনটাই বুঝি এই—নবাগতকে কিছুতে কোনো ক্ষেত্রে স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, তাহাকে নিজেকেই করিয়া লইতে হয়। কিন্তু, একবার সেই নবাগত পুরাতন হইয়া গেলে অনায়াসে কেমন

করিয়া পুরাতনের সঙ্গে মিশিয়া উত্তরকালের নবাগতকে কোণ-ঠাসা করিবার চেষ্টা করে।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কলগুঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। সবাই ঢুলিতেছে, কেহ বা উহারই মধ্যে কোমরটা হেলাইয়া পা ছড়াইবার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। আমাদের সঙ্গের মহিলাগুলির গল্প-গুজবও কখন থামিয়া গিয়াছে। অবশেষে একেবারে গয়া স্টেশনে গাড়ি আসিতে আমরা তাস বন্ধ করিলাম। দুই-একজন নামিয়া গেলেন—আবার দুই-চারিজন উঠিলেনও। আবার একটা অপ্রীতিকর কোলাহলের সৃষ্টি হইল, তবে এবারে বেশী নয়। নবাগতদের সহিত ঠিক আগের প্রীতির সম্পর্ক আর গড়িয়া ওঠা সম্ভব হইল না, কারণ রাত্রি তখন গভীর হইয়াছে। অধিকাংশ লোকই তন্দ্রাতুর, কেহ বা রসদ অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

আমিও তাস ফেলিয়া খাবার কিনিবার চেষ্টায় এদিক ওদিক তাকাইতেছিলাম। বৌদি ব্যাপারটা বুঝিয়া চট্‌ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'ছিঃ ভাই ঠাকুরপো, আমাদের সঙ্গে বিস্তর খাবার আছে। আর তা না থাকলেও—যা আছে তাই সবাই ভাগ ক'রে খেতুম, না হয় একটু ক'রে কমই পড়ত!'

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। করিবার অসুবিধাও ছিল, দরজার কাছে একটা ঠেলাঠেলি মারামারি চলিয়াছেই। নবাগতরা তখনও ভালো করিয়া ভিতরে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্য দিয়া খাবার সংগ্রহ করাও কঠিন। ধারের বেঞ্চে মহিলারা বসিয়া আছেন, সেখানেও সুবিধা ছিল না।

কেদারবাবুরাও খাবার বাহির করিলেন। বৌদি সঙ্গে সঙ্গে রুল জারি করিলেন যে, দুইবাড়ির খাবার মিলাইয়া আমরা সবাই খাইব। সকলেই তাহাতে রাজি—এ যেন কতকটা বন-ভোজনের আনন্দ। কেদারবাবুর মা ও সঙ্গের প্রৌঢ়া মহিলাটি কিছু খাইবেন না। শুধু তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ও আমরা কয়জন। হাতে হাতে পাতা দিয়া বৌদি নিপুণতার সহিত সব খাবার সমান ভাগ করিয়া দিলেন। লুচি, ডালপুরী, ভাজা, আলুর তরকারি, পেঁড়া, মিঠাই কত কি! আমি এসব ব্যাপারে বরাবরই অপটু, অতগুলো খাবার পাতাসুদ্ধ হাতে রাখিয়া খাওয়ার অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া বৌদি সহসা পাতাটা আমার হাত হইতে টানিয়া লইলেন। তারপর যতক্ষণ ধরিয়া আমি খাইলাম, তিনি

হাতে করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি টেবিলের মত তাঁহার হাতের উপর হইতে খাবার লইয়া খাইতে লাগিলাম। এধারে অশোকা বেচারী দুই হাতে দুইটা জলের গ্লাস লইয়া বসিয়া। নিচে রাখিবার স্থান নাই। আমাদের প্রয়োজনমত তাহার হাত হইতেই লইতে হইবে।

খাইতে খাইতে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলাম, 'বৌদি, প্রশ্রয় যা দিলেন আর ছাড়ছি না। এর পর এটোয়ায় গিয়ে উৎপাত ক'রে আসব।'

স্মিত-প্রসন্নমুখে বৌদি কহিলেন, 'যাবেন বৈকি ভাই। তার আগে কলকাতায় তো ক'দিন আছি, একদিন নিশ্চয় আসবেন। আসবেন তো?'

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই'।

অশোকা কহিল, 'একদিন আমার ওখানেও যেতে হবে।'

'সে আর বলতে হবে কেন ভাই, আমি বাদলের কাছ থেকে সব ঠিকানা লিখে নেব। আমারটাও দিয়ে দেব, কেমন? একদিন সবাই চ'লে আসবেন।'

আহারাদির পর কিন্তু আর গল্প তেমন জমিল না। কেদারবাবু ও বাদল টানাটানি করিয়া উপর হইতে বাক্স-বিছানা নামাইয়া দুইটি বেঞ্চির ফাঁক ভরাট করিয়া লইয়া তাহাতেই নিজেরা একটু একটু কাত হইল—ইতিমধ্যে উপরের বাঙ্কে একটু হেলান দিয়া বসিবার মত স্থান হইয়াছে দেখিয়া আমি সেখানেই উঠিয়া গেলাম। আরাম চাই না—তবু চোখটা আর না বুজিয়া যেন পারা যাইতেছে না!···

সকাল হইল। আটটা কত মিনিটে তুফান এক্সপ্রেস হাওড়া পৌছিবে। এই সময়টা যেন আর কাটে না। রাত্রে কাহারও সুনিদ্রা হয় নাই, যেমন তেমন করিয়া শোওয়ার জন্য সকলকারই মনের ভাবটা এই যে, বাকি সময়টা হাতে করিয়া সরাইয়া দিতে পারিলে ভালো হয়। মেয়েরা বিরসমুখে বসিয়া—পুরুষেরা বিরক্ত।

গল্প আর কিছুতেই যেন জমে না। এপাশে ওপাশে গত রাত্রির অন্তরঙ্গতার সুর ধরিয়া দু'টি-একটা কথা ওঠে, কিন্তু বেশীদূর যায় না—মধ্যপথেই থামিয়া যায়। ওপাশের মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটি আর একবার বেদান্তের কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ হইতে কিছুমাত্র সাড়া মিলিল না। কথা যা ওঠে তা ঐ গাড়িকে কেন্দ্র করিয়াই। কেহ হয়তো প্রশ্ন করে আর

কত মাইল আছে, আর একজন উত্তর দেয়। কেহ বা মন্তব্য করে গাড়ি অস্বাভাবিক আস্তে যাইতেছে, কেহ ঘড়ি দেখিয়া মিলাইতে বসে লেট হইবে কিনা।

এই কথাটাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কাল হইতে কত লোক উঠিল, কত নামিল। কত শত্রুতা কত অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হইল, কত আক্রোশ শুভবুদ্ধির উৎকণ্ঠায় মিশিয়া গেল। কিন্তু, আবার যেমন গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলাম সকলে যেন পুনরায় সেই পূর্বেকার দূরত্বে সরিয়া গেল—কোথা হইতে কী করিয়া যে এই ব্যবধান রচিত হইল তাহা বোঝাও গেল না। দু'দণ্ডের মুসাফিরির সহিত জীবনের মুসাফিরি বোধ করি একই সূত্রে গাঁথা। আসলে সবাই পর, সকলে নিজের লক্ষ্য আর গন্তব্য লইয়াই ব্যস্ত, সকলে নিজের স্বার্থটির বৃত্তেই অহরহ ঘুরপাক্ খাইতেছে।

অবশেষে বেলুড় আসিয়া পড়িল। সাজ-সাজ বাঁধ-বাঁধ রব চারিদিকে। আমি নামিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলাম। একমুহূর্তও না দেরি হয়। কেদারবাবু মালপত্র মিলাইতে লাগিলেন। বৌদি ছড়ানো জিনিসপত্র অশোকা ও বাদলের সহিত হিসাব করিয়া গুছাইতে ব্যস্ত।

সব জিনিস সামলাইবার আগেই এক সময়ে হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে গাড়ি প্রবেশ করিল। তখন শুধু নামিবার চেষ্টা—'কুলি' 'কুলি' করিয়া প্রাণপণে ডাকাডাকি। সারাপথ যাহার সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতায় কাটিল, নিজের মাল না লইয়া সামনের কোনো কুলি তাহার মাল নামাইলে মহা রাগারাগি—বিরক্তি।

আমিও সেই সব ঠেলাঠেলি গণ্ডগোলের মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাঁক পাইয়া নামিয়া পড়িলাম। সঙ্গে মালের বিশেষ হাঙ্গামা নাই—শুধু স্যুটকেশ, সুতরাং কুলির শরণাপন্ন না হইলেও চলিবে। নামিবার সময়ে মাথার মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে আগে ছিল—সেটা হইতেছে কতক্ষণে এই ভিড় ঠেলিয়া স্টেশন হইতে বাহির হইতে পারিব। তাই আর কোনো কথা মনে পড়ে নাই। অনেকটা চলিয়া আসিবার পর খেয়াল হইল, ঐ যা! বাদলদের তো বলিয়া আসা হইল না! শুধু তাই নয়—উহাদের ঠিকানাগুলিও লওয়া হয় নাই।

মনে মনে লজ্জা বোধ করিলাম। কিন্তু, সে ভিড়ে আবার ফিরিয়া যাওয়া মুস্কিল। মনকে প্রবোধ দিলাম, এটোয়ার ঠিকানাটা তো মনে আছে, বৌদির স্বামীর নামও জানি। এটোয়াতে চিঠি দিলেই চলিবে।

কিন্তু, আর তাঁহাকে কোনোদিনই চিঠি দেওয়া হয় নাই। রাস্তাঘাটেও বাদলদের সহিত দেখা হয় নাই কোনোদিন। এখন হয়তো আর দেখিলেও চিনিতে পারিব না।

## জীবনের মূল্য

অজয় স্টেশনের বাইরে এসে একবার ক্লান্তভাবে তাকাল চারদিকে। দীর্ঘ তিন বৎসর পরে ছাড়া পেয়েছে সে—আবার স্বাধীনভাবে পৃথিবীর আলো দেখছে। তার চেয়েও বড় কথা, তার প্রিয় শহর কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়াতে পেরেছে—তবু কোথাও ওর মনের মধ্যে যেন উৎসাহ নেই।

এর মধ্যে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। জার্মানী যুদ্ধে হেরেছে, জাপানও তাই—যে প্রচণ্ড শক্তি-দু'টি রণ-সজ্জার দম্ভে সারা পৃথিবী জয়ে নেমেছিল তারা আপাত-দুর্বল প্রতিপক্ষের বৃহত্তর রণ-সজ্জা ও অস্ত্র-সম্ভারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অকস্মাৎ যে আলো পৃথিবীর দুই প্রান্তে উল্কার মত জ্বলে উঠেছিল তা বহু লোক ক্ষয় ক'রে, অনেক রাজ্যের উত্থান-পতন ভাঙ্গা-গড়ার কারণ হয়ে, বহু শতাব্দীর জন্য পৃথিবীর ইতিহাস পাল্‌টে দিয়ে আবার নিভে গিয়েছে। তার সঙ্গে আরও অনেক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা অমনি জ্বলে উঠেছিল—তারাও আজ ম্রিয়মাণ। আবার, যে সব ঘটনা কখনও পৃথিবীতে ঘটবে ব'লে কেউ আশা করে নি, এ যুদ্ধে তাও সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষের বুকের ওপরও এ যুদ্ধ অনেক ছাপ রেখে গেল বৈকি! অনেক আঘাত তাকে সইতে হ'ল যা ভোলা বহু শত বৎসরের মধ্যে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ! যদিও অজয় তাতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারে নি—সংবাদপত্র মারফত যেটুকু জানা সম্ভব—তাও সব সংবাদপত্র তাদের হাতে আসত না—আর দৈবাৎ বাইরে থেকে ঠিকরে-আসা গুজব, এরই ভেতর তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল-সীমাবদ্ধ। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি রাজনৈতিক খবরগুলো পেয়েছে সে। নেতারা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁদের সিমলায় ডাকা হয়েছে আপস মীমাংসার জন্য (অজয় বরাবরই জানত এ চেষ্টার ফল কী হবে) এবং সে প্রচেষ্টা, সে আশা ব্যর্থ হয়েছে—সব খবরই পৌছেচে তার কাছে। ওদিক পূর্ব সীমান্তে

ভারতের এক লাঞ্ছিত, দেশবাসী কর্তৃক দণ্ডিত, জননেতা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছিট্‌কে গিয়ে প'ড়ে অসম্ভবকে সম্ভব করবার যে প্রয়াস করেছেন ব'লে নানা রকম গুজব শোনা গিয়েছিল, এখন নাকি তাও সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তাই নিয়ে আসমুদ্র-হিমাচল সারা ভারতে অভূতপূর্ব এক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক দিনের ঘুম-থেকে-জেগে-ওঠা বৃদ্ধ জাতির প্রাণ অজ্ঞাত এক আবেগের স্পন্দনে থরথর ক'রে কাঁপছে। এমন কি তারই জের কলকাতার এক রাজপথে মাত্র দু'তিন দিন আগে কী অঘটন ঘটিয়ে গেল, কী উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে গেল—তাও অজয় শুনেছে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে।

তবুও যেন ওর কিছুতেই উৎসাহ নেই। ওর প্রাণের ঘুম কোনো আঘাতেই যেন ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এই যে চারদিকে অসংখ্য মানুষ, ওরই দেশবাসী কী একটা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, চাপা একটা উৎসাহ ওদের চোখেমুখে, ওর প্রকৃত মূল্য কী অজয় তা জানে। নেতারা শিগ্‌গিরই বাংলায় আসছেন; অনেকদিন পরে কলকাতায় আবার রানীতিক জীবনের সাড়া পড়বে, শুরু হবে নতুন ঘটনা-প্রবাহ, কিছুদিন চারদিকে হৈ-চৈ হবে, কতকগুলি লোক নিজেদের আবেগের প্রেরণায় ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো নতুন কোনো কল্পনার স্রোতে, অসম্ভবের নেশায় উঠবে মেতে, তারপর আবার যে তিমির সেই তিমির। যে মরণ-শৈত্য জাতির মেরুদণ্ড বেয়ে নেমেছে তা আর তাকে বোধ হয় কোনোদিন পরিত্যাগ করবে না।······যে ট্রেনে আসছিল ও, তারই কামরায় দু'টি ছোকরা বলাবলি করছিল যে, এর ভেতরে একদিন ডুব মারতে হবে অফিস থেকে। নেহেরু যেদিন আসবেন সেদিন স্টেশনে এসে তাঁকে দেখতে তো বেলা হবেই—সেদিন আর অফিসে যাওয়া সম্ভব হবে না—তার চেয়ে সেদিন বরং আগে থাকতেই দুটো সিনেমার-টিকিট কাটা যাবে, তিনটে আর ছটার শো।···জননেতার দর্শন ও সিনেমা দেখা দুটোই তাদের কাছে সমান—শুধু একটু বৈচিত্র্য, শুধু একটা উত্তেজনা······ঐ যে ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লেই 'জয় হিন্দ্‌' ব'লে অভিনন্দন জানাচ্ছে, মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য যাদের আগ্রহ আর উৎসাহের শেষ নেই—তাদের প্রত্যেকের হাতেই বিদেশী সিগারেট, মুখে বিদেশী স্নো কিংবা ক্রীম। প্রত্যেকেরই পরনে পাতলা মিলের-ধুতি আর ছিটের জামা। এরা দিন রাতের অর্ধেক সময় বোধ হয় বৃথা অপব্যয় করে, তবু দশ মিনিটও কেউ চরকা কাটে না।

অকস্মাৎ অজয় যেন চমকে উঠল। এসব কী ভাবছে সে? এ কি কোনো ব্যক্তিগত বেদনার কারণ তার মনে জাতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাগাচ্ছে! তবে কি সে নিজে যেটুকু দেশের কাজ করেছে তার জন্য অনুতপ্ত? সেটা কি তবে সময়ের অপব্যয়ই হয়েছে?

না-না-না, আপন মনেই ব'লে উঠল অজয়, ছি! এসব কথা ভাবাও পাপ। সে যা করেছে তা যত সামান্যই হোক্ তার মূল্য একদিন তার দেশ নিশ্চয়ই পাবে। যেটুকু স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হয়েছে, তার জন্য সে অন্তত অনুতপ্ত নয়।

অনুতাপ? না—এমন কি কোনো অনুযোগও নেই তার। সে যে কাজ করেছে তার দায়িত্ব কতটা তা জেনেই করেছে। আশা যার ছিল না কোনোদিন, তার আশাভঙ্গের ব্যথা অনুভব করার কথা নয়। এই মুমূর্ষু দেশে নিজেরা বেঁচে থাকাটাই সমস্যা—সেখানে প্রতিবেশীর স্ত্রী বা তার বুড়ী মার কী হ'ল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে, এমন আশা করাটাই তো মূর্খতা।

মা! মার কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের গলার কাছে কী যেন শক্ত-মত একটা ঠেলে উঠল। বড় দুর্বল আর অসহায় ওর মা। বার্ধক্যে আর শোকে কেমন যেন অথর্ব হয়ে পড়েছেন—এতটুকু পরিশ্রমে এলিয়ে পড়েন, ক্ষিদে পেলে ছেলে-মানুষের মত কাঁদেন। স্বামী ও পাঁচটি সন্তানের শোক সহ্য করেছেন তিনি পর-পর, বয়সও প্রায় সত্তর হ'ল। এখনও যে বেঁচে আছেন, এইটেই আশ্চর্য। তার ওপর তাঁর ষষ্ঠ এবং শেষ সন্তান অজয়, তাকেই বা কতটুকু তিনি কাছে পেয়েছেন! সে শোক বোধ হয় তাঁর আরও বেশী।

একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস অনেক চেষ্টায় সামলে নিলে অজয়। মা কি ওর বেঁচে আছেন আর? আশা করতেও ভয় করে যেন। ত্রিশ সালের আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় সেই যে ও রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তারপর আর ঘর-সংসার আত্মীয়-স্বজন কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ পায় নি। সংসার ছোট তার—মা, স্ত্রী, একটি মেয়ে এবং একটি বাপ-মা-মরা ভাগ্নী—তবে তাদেরও তো খরচা আছে। জমি-জমা ছিল সামান্যই—তাতে কোনোমতে গ্রাসাচ্ছাদন চালানও দুষ্কর। এতদিন যে কী ক'রে চলেছে তাও অজয়ের কাছে একটা মস্ত বিস্ময়। জেলে এলেই ওর এই কথাগুলো মনে পড়ে, মনে পড়ে বাড়িতে যখন দ্বিতীয় পুরুষ নেই, তখন এতগুলি প্রাণীর

ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাই তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। মনে মনে সংকল্প করে প্রত্যেক বারই যে, এবার বেরিয়ে ও উপার্জনের দিকেই মন দেবে, কিন্তু বেরোলে আর সে সংকল্পকে কাজে পরিণত করবার অবসর পায় না! একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাছাড়া বাইরে থাকে বা কতটুকু—হয় জেল না হয় অন্তরীণ, এই তো ওর অধিকাংশ সময়ের ইতিহাস।

অবশ্য একত্রিশ সালে শেষবার ছাড়া পেয়ে ও সত্যি সত্যিই উপার্জনে মন দিয়েছিল। উপায়ও ছিল না না-দিয়ে, কারণ, যেটুকু জমিজমা ছিল তা ইতিমধ্যেই বেচতে হয়েছিল ওদের—তখন বাইরে থেকে কিছু না এলে উপবাস করতে হ'ত। অবশ্য সরকারী চাকরি ও নেয় নি, স্থানীয় স্কুলের নিচু ক্লাসের শিক্ষক, এই হ'ল ওর পদবী। মাইনে তদনুপাতেই কম—তবু তাতেই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটত।

তারপর এল বিয়াল্লিশ সালের অগাস্ট মাস। চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠল! সে আগুনে অজয় ঝাঁপিয়ে পড়ে নি—পড়বার উপায়ও ছিল না,—কিন্তু, তাতেও অব্যাহতি পেলে না ও, নানা কারণে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ পড়ল অনেক বারের দাগী, মার্কামারা দেশসেবকের ওপর, অজয়কে আবার গিয়ে ঢুকতে হ'ল কারাপ্রাচীরের মধ্যে।

এবারে সে কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না—সেইজন্যই বোধ হয় ছিল নিশ্চিন্ত, এত বড় বিপদের কোনোরকম আভাস পর্যন্ত পায় নি বেচারী! তাই অকস্মাৎ যেদিন সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাকে, সেদিন কোনোরকম নির্দেশই ও দিতে পারে নি, শুধু বিদায়ের পূর্ব-মুহূর্তে স্ত্রীর হাত ধ'রে বলেছিল, 'তুমি রইলে, এই আমার সব চেয়ে বড় ভরসা মিনু। কোনো উপায়, কোনো ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলাম না, ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না, তবু জানি তুমি যেমন করেই হোক্ এদের বাঁচিয়ে রাখবে। অন্তত মাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো মিনু—ফিরে এসে যেন দেখতে পাই।'

একথা ওর স্ত্রীকে বলবার সেদিন কোনো অধিকার ওর ছিল না, এমন দাবি করাও হয়তো অপরাধ, তবু ভরসা সেদিন ও সত্যই করেছিল।

ওর স্ত্রী, ওর মিনু, মিনতি—অদ্ভুত, আশ্চর্য মেয়ে। বিয়ে করেছিল অজয় মিনুকে না দেখেই— হঠাৎ একটা বড় কাজের ফাঁকে; নিতান্ত কয়েক ঘণ্টার নোটিশে। বিয়ে করা যে ওর পক্ষে অন্যায় তা অজয় ভালো করেই জানত, কিন্তু ওর মা সব ঠিক ক'রে যখন ওকে ধ'রে বসলেন, কান্নাকাটি করতে লাগলেন, তখন

শোকার্ত মাকে ও না বলতে পারে নি কিছুতেই। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে—অপরাধীর মতই পিছিয়ে গিয়ে বসেছিল।

কিন্তু, আজ আর একথা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই—আজ ও গর্বের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করতে পারে যে, মায়ের কথা শুনে সেদিন ও ভালোই করেছিল। মিনু তাকে অনুতপ্ত হবার এতটুকু অবসর দেয় নি কখনও। শুধু যে সে রূপসী, তার স্বভাব মিষ্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাই নয়—সে কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যও অজয়ের কাজে বাধা দেয় নি, একবারও ঘরের মধ্যে, সংসারের মধ্যে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করে নি। বরং গৃহস্থালির শত অভাব-অভিযোগ, জীবন-যাত্রার সহস্র রকমের বিড়ম্বনা থেকে প্রাণপণেই অজয়কে আড়াল ক'রে রাখত। ওদের দারিদ্র্যের নগ্ন চেহারাটা তাকে একদিনও দেখতে দেয় নি। কী ক'রে যে সে সংসার চালাত আজও ভেবে পায় না অজয়। ওর মনে হ'ত মিনু জাদু জানে, আজও তাই মনে হয়।

তবু সমস্ত শক্তিরই একটা সীমা আছে। ও জেলে যাবার পর যে সব ঘটনা ঘটল তাতে কোনো আশা রাখাই বিড়ম্বনা। ঝড়, জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ। ঈশ্বর ও মানুষের সমস্ত শক্তি যেন নিয়োজিত হয়েছিল তাদের পরীক্ষা করবার জন্যই। দেশে খাদ্য নেই—বস্ত্র নেই, একান্ত যা প্রয়োজন জীবন-যাত্রার পক্ষে—তারও মূল্য চারগুণ, পাঁচগুণ এমন কি কোথাও কোথাও আরও বেশী উঠে গেল। দুর্ভিক্ষের সময় চাল ছাড়া অন্য সব জিনিসের যে দাম ছিল দুর্ভিক্ষের পরও কিছু মাত্র কমল না, বরং বেড়ে গেল।

জেল থেকে এ সব খবরই পেত অজয়। শুনত আর শিউরে উঠত। তার কোনো সঙ্গতি নেই—তার পরিবারের লোককে বাঁচিয়ে রাখা বোধ হয় জাদু-বিদ্যারও অসাধ্য কাজ। বাড়ির খবর সে পেত না—পাবার চেষ্টাও করত না। দেখা করতে তাদের বলবে সে কোন্ লজ্জায়? গাড়িভাড়া দেবে কে? তাছাড়া দেখা হ'লে বলবেই বা কী? কোন্ মুখে সে তাদের দিকে চাইবে?

বহুদিন আবেদন-নিবেদনের পর সামান্য একটা ভাতা তার সংসারের জন্য মঞ্জুর হয়েছিল বটে, কিন্তু সে টাকায় একটা লোকও একমাস খেতে পায় না। তবুও যখন সে টাকা মঞ্জুর হ'ল তখন দুর্ভিক্ষ পার হয়েও এক বছর প্রায় কেটে গেছে। হয়তো তখন আর কেউই বেঁচে নেই। টাকা পাওয়াটাই বোধ হয় তখন সব চেয়ে পরিহাসের ব্যাপার।

অজয় দ্রুতগতিতে স্টেশন পেরিয়ে নেমে এল রাস্তায়। কিছুতেই ভাববে না সে। সব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে মস্তিষ্ককে শান্ত এবং সুস্থ রাখবে। পৃথিবীর সব ভারই তো কিছু তার ওপর নেই। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল মন্বন্তরে, না হয়, তার মা, তার স্ত্রীও তাদের সেই অসংখ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে?—

রাস্তায় প'ড়ে জনতার উত্তেজনার ঢেউ তার প্রাণেও আঘাত করল। সে যেন জোর ক'রে—এক ঝাঁকানিতে মন থেকে সব অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে দিলে। মহাত্মাজী আসছেন বাংলাদেশে, নতুন ক'রে আবার তাদের জাতীয় জীবন শুরু করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাববার অবসর নেই—

কোথায় যাবে—তা সে ইতিপূর্বে ভাবে নি। কলকাতায় তার বন্ধুবান্ধব সহকর্মী হয়তো দু'চার জন এখনও আছে। খোঁজ করলে দেখা মিলতে পারে কিন্তু, তাদের কারুর কাছেই যেতে ইচ্ছা করল না। মনে মনে সকলকার মুখগুলো একবার ভেবে নিয়ে সে সোজা হাওড়া স্টেশনের পথই ধরলে! দেশেই যাবে সে, শুধু যে সেটা তার কর্তব্য তাই নয়—সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানোই প্রয়োজন। যা কিছু চরম অপ্রিয় তা সে জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। যদিই কোনো অবিশ্বাস্য উপায়ে তারা এখনও বেঁচে থাকে, অবশ্য এটা যে সম্ভব নয় তা সে জানে, তবে যদি একজনও বেঁচে থাকে, তাহ'লেও তার কর্তব্য হবে আবার তার ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়া। আর যদি আশঙ্কাই সত্য হয়? তাই বা মন্দ কী! শান্ত মনে, কোনো পিছটান্ না রেখে আবার সে দেশের পূজায় নিজেকে সঁপে দেবে নিঃশেষে, নির্মমভাবে।

ট্রেন থেকে যখন আবার নামল অজয়, তখন সবে ভোর হচ্ছে। আগের দিন কিছুই খাওয়া হয় নি, দেহ ক্লান্ত। মনও—যতই সে কোনো কথা না ভাববার চেষ্টা করুক, অস্পষ্টভাবে সমস্ত চরম সম্ভাবনাগুলো ভেবে ভেবে অবসন্ন। তবু নামতে হয়। কাউকে প্রশ্ন করবারও সাহস নেই—সোজা বাড়ির দিকে যাবারও না। যদি সেখানকার কোনো চিহ্নই না থাকে? কিন্তু খবর নেওয়া আরও অসম্ভব। কারুর সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হ'লে, প্রশ্ন না ক'রে যদি সংবাদটার আভাস পাওয়া যায় তাহ'লেই ভালো, সে যে প্রস্তুত নেই দুঃসংবাদ শোনবার জন্য, এটা সে কিছুতেই জানাতে পারবে না, তার চেয়ে বড় লজ্জা যেন আর কিছুই নেই।

গ্রামেরও চেহারা পাল্টে গেছে বৈকি!

বিয়াল্লিশ সালে কিছু আগুনে পুড়েছে, কিছু ঝড়ে গেছে নষ্ট হয়ে তারপর। সবই নতুন। ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট—যেদিকে দৃষ্টি যায় পরিচিত কিছুই নেই।

মন্দ নয়! আপন মনেই হেসে উঠল অজয়। বিকৃত উন্মাদের হাসি। মন্দ নয়. নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করবার সূচনাটা ভালোই।

স্টেশনের বাইরেই কার বিরাট বাড়ি উঠেছে। দোতলা বাড়ি, তিনতলা উঠছে। এত পয়সা কার হ'ল কে জানে? গ্রামে দুটিমাত্র পাকা বাড়ি ছিল, তাও একতলা। যেখানে আগে একটা খাবার-মনোহারী-চায়ের মিলিত দোকান ছিল, এখনও সেখানে তা আছে, তবে চালাটা আরও বড়, নতুন। পাশে আর একটা ঐ দোকান হয়েছে, কিন্তু সবাই অপরিচিত। পুরানো দোকানদারও কেউ নেই।

চায়ের দোকানটা পেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল অজয়। চা খাওয়ার যে খুব ইচ্ছা আছে তা নয়—যদি সংবাদটা পাওয়া যায় এই আশা তার। তা ছাড়া পা কাঁপছে দুর্বলতায় থর্‌থর্ ক'রে। কিছু একটা পেটে পড়া দরকার—

দোকানদার একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলে, 'শুধু চা?'

'হ্যাঁ।' ক্লান্ত বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে অজয়। তার বেশী কিছু খাবার মত পয়সা ওর নেই।

চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলে, 'এ বাড়িটা কার ভাই?'

হঠাৎ যেন কণ্ঠস্বরে চিনতে পারলে দোকানদারের ছোকরা চাকরটা। কাছে এসে ঠাওর ক'রে চেয়ে বললে, 'কে, অজয়দা?'

এবার অজয়ও চিনতে পারলে। তারই বাল্যবন্ধু শশাঙ্কর ভাই মৃগু বা মৃগাঙ্ক। জাতে ওরা কলু—তবে চায়ের দোকানে চাকরি করবার মত অবস্থা ওদের কখনই ছিল না। বিস্মিত হ'ল সে—কিন্তু, প্রশ্ন করলে না। যে দিন চ'লে গেছে তারপর আর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই মূর্খতা। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে অজয় সহজকণ্ঠেই বললে, 'তোর দাদা?'

'মারা গেছে।' মৃগাঙ্কর চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠল। সে-ও আর কোনো কথা বললে না। কিসে মারা গেছে, এসব প্রশ্ন যে অনাবশ্যক তা ঐ ছেলেটাও জানে।

খানিকটা পরে মৃগু বললে, 'বাড়িটা কার জিগ্যেস করছিলেন না? ও একজন পাঞ্জাবীর। ঐ যে ওখানে বড় এরোড্রোম হয়েছে, তাইতে সব কন্ট্রাক্ট নিয়ে বিস্তর পয়সা করেছে ও। জায়গাটা নাকি ওর খুব পছন্দ, তাই এখানেই বাড়ি করলে। ওরা সবাই থাকে এখানে—।'

সংবাদটা এতই স্বাভাবিক এবং সাধারণ যে, এ-সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনাই চলে না। অজয়ের সেদিকে মনও ছিল না। চায়ের খালি কাপটা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে হঠাৎ একসময়ে মরীয়া হয়ে অজয় প্রশ্ন করে ফেললে, 'আমাদের বাড়ির খবর কিছু জান নাকি মৃণ্ড !'

প্রস্তুত আছেই তো চরম দুঃসংবাদের জন্য। তবু বুক একটু কাঁপে বৈকি।

মৃণ্ড সহজকণ্ঠেই বললে, 'আপনি কি ওদের খবর পান নি? ভালোই আছে শুনেছি।'

ভালোই আছে! বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে একটু সময় লাগল অজয়ের। ভালোই আছে কী ক'রে? একি সম্ভব? ছেলেটা হয়তো খবরই রাখে না, আন্দাজে ব'লে দিলে কথাটা। এ সময়ে সকলেই নিজেদের দুর্ভাগ্যে কিংবা সৌভাগ্যে ব্যস্ত—কারুরই জীবন-যাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক নয়, এখন প্রতিবেশীর খবর জানতে চাওয়াই ভুল।

নতুন ক'রে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হ'ল না অজয়ের। সে পয়সা দিয়ে উঠে পড়ল। মৃণ্ড ওর সঙ্গে খানিকটা বেরিয়ে এসে কী যেন বলতে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারলে না—ফিরে গেল। হয়তো সে তার নিজের পরিবারিক সংবাদই কিছু দিতে চেয়েছিল, কে জানে!…

এগিয়ে যেতে যেতে দু'-একজন পরিচিত লোকের সঙ্গেই দেখা হ'ল। আলতাফ আলি আর চন্দ্র জানা, কতকগুলি কন্ট্রোলের দোকান পেয়েছে—বেশ চাকচিক্য ওদের। তবে যাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের অনেক লোকই নেই। কেউ মরেছে, কেউ দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামছাড়া হয়েছে, কেউ বা যুদ্ধে চাকরি নিয়েছে। দু'চারজন তখনও জেলে।

কিন্তু, যাদের খবরের জন্য মন ওর একাগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, তাদের খবর কেউ দিলে না। সবাই বোধ হয় ধ'রে নিয়েছে যে, ওর বাড়ির খবর ও জানেই। চন্দ্র জানাই শুধু শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করলে, 'বাড়ির খবর টবর পেয়েছ ওখানে তো?'

'না না!…ওরা বেঁচে আছে কি?' মরীয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলে অজয়।

'বিলক্ষণ! বেঁচে থাকবে না কেন। সবাই বেঁচে আছে!'

'কী ক'রে বাঁচল চন্দ্রকাকা। কিছুই তো ছিল না!'

'তা বটে।' চন্দ্র ম্লান হাসি হাসলেন। 'যা দিন গেল। কে কার খবর নেয় তার ঠিক নেই। ঝড়ে অবশ্য আমাদের এ অঞ্চলটায় বিশেষ ক্ষতি করতে পা

নি. কিন্তু দুর্ভিক্ষে শেষ ক'রে দিয়ে গেছে।...তবু তোমাকে তো সবাই স্নেহ করত —কেউ কেউ দেখাশুনো করেছেন বৈকি! বিশেষ, বৌমা আমার খুব শক্ত মেয়ে। তিনি যে কোথা থেকে কোথা থেকে কী যোগাড় করেছেন তা আমরা সব জানিও না। তবে ঐ পাঞ্জাবী কন্‌ট্রাক্টরটা—ও খুব করেছে তোমাদের।'

'পাঞ্জাবী কন্‌ট্রাক্টরটা?......কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমাদের কোনো পরিচয়ই ছিল না কাকা!'

'মানুষটা বাবা খুব ভালো। এমনি পরোপকারী তো আছেই, তাছাড়া তোমার মাকে ও মা বলেছে কিনা। বৌমা ওর স্ত্রীকে ধরেছিলেন কিছু সাহায্যের জন্য, সেই সূত্রেই আলাপ হয়। ও আবার বৌমার কাছে বাংলা শিখছে। মাইনের নাম ক'রে ও কিছু কিছু দেয়—

সব কথা অজয়ের কানেও গেল না। সংবাদটা একেবারে উদ্‌ভ্রান্তকর, অবিশ্বাস্য। জেলে ব'সে ব'সে ও যত কথাই কল্পনা করুক না কেন—এ ছিল ওর সুদূর স্বপ্নেরও বাইরে। মিনতি, মিনু—সত্যিই তাহ'লে অসম্ভব সম্ভব করেছে। বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু ওর মাকে নয়—সবাইকেই।

অজয় এবার দ্রুত বাড়ির পথ ধরলে। এতক্ষণ যেটা ছিল আশঙ্কা এবার সেটা হয়েছে আশা। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আশা—তার মধ্যে কোথাও কোনো সংশয়, কোনো ভয় নেই। সত্যিই তো মিনু যা মেয়ে, সে কিছু পারবে না এমন সন্দেহ করাই তো মূর্খতা!......

বাড়ির দোরের কাছে আসতেই যার সঙ্গে ওর দেখা হ'ল সে ওর মেয়ে 'খুকী' —ঠিক চিনতে না পেরে সভয়ে বাড়ির মধ্যে পালিয়ে গেল। ভাগ্নী রমা কিন্তু ভুল করে নি—প্রণাম ক'রে উঠে কেঁদে ফেললে! রমা বেশ বড় হয়ে উঠেছে—। ওদের গায়ে কোনো আভরণ নেই, খুব মোটা একখানা শাড়ি প'রে আছে, তবে ময়লা ছেঁড়া নয়। অর্থাৎ, অভাব আছে, দৈন্য নেই।

'মা কোথায় রে, রমা?'

'ঐ যে—'

রমা ছুটে গিয়ে সংবাদটা দিলে দিদিমাকে। মা চোখে আর একেবারেই দেখতে পান না। বোধ হয় অবিরল কেঁদে কেঁদেই দৃষ্টিটা একেবারে গেছে। রমার মুখে খবরটা পেয়ে প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না। তারপর উঠে ওকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কেঁদে-কেটে অস্থির। পাগলের মত কী যে বলতে লাগলেন

তা কেউই বুঝল না। এ সবই অজয় জানত……বিচলিত সেও হ'ল, তবে নিশ্চিন্ত হবার আনন্দটাই তার বেশী।

কিন্তু, মিনু কৈ?

সবচেয়ে প্রয়োজন যে তাকেই—অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা ও প্রেম তার পায়ে উজাড় হয়ে পড়বার প্রতীক্ষা করছে!

মা-ই একটু শান্ত হয়ে ডাকলেন 'বৌমা!'

অজয়ের তৃষিত দৃষ্টি দ্বারপথে একাগ্র হয়ে চেয়ে রইল! একটু পরেই মিনু বেরিয়ে এল। সামান্য একটু ঘোমটা কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল নয়, বরং কেমন যেন একটা কঠিন ঔদাসীন্য, একটা শান্ত নির্লিপ্ততা মাখানো…মাটির দিকে চোখ রেখেই এসে শুধু নীরবে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। মায়ের সামনে সে কোনোদিনই কথা কয় না, কিন্তু চোখেও তার কোনো সম্ভাষণ, কোনো অভ্যর্থনা ফুটে উঠল না।

একটু পরে সে ভেতর থেকে মুখ-হাত ধোবার জল এনে দিলে, আর একটা গামছা। পিতলের গাড়ুটাও বোধ হয় নেই—জল মাটির পাত্রে। কিন্তু, সেদিকে অজয়ের নজর ছিল না—যার চোখের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার চোখ ব্যস্ত, সে একবারও মাথা তুললে না, কথা কইবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না।

অজয় বুঝতে পারলে না এ কী! এ কি অভিমান? এমনি ক'রে সব ভার ওর ওপর চাপিয়ে অজয় চ'লে গিয়েছিল, তারই জন্য অভিমান? কিন্তু, মিনতি তো জানে যে, তাতে অজয়ের কোনো অপরাধ ছিল না। ঘটনাটা একেবারেই আকস্মিক। তাছাড়া, সে যখন সত্যি সত্যিই সংসার ফেলে ঐ সব ক'রে বেড়িয়েছে—তখনও তো কোনোদিন কোনো অনুযোগ করে নি মিনু, বরং সর্ব-প্রকার সাংসারিক প্রশ্ন থেকে তাকে আড়াল ক'রেই রাখত সে। তবে?

মা অনর্গল বকে যেতে লাগলেন। তাঁর পাঞ্জাবী ছেলেটিকে কেমন ক'রে হঠাৎ পাওয়া গেল—সে কত উপকার করেছে, ইত্যাদি। এসব যে তাঁর বৌমার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, বৌমার চেষ্টা ও উপস্থিত বুদ্ধিতেই যে এতগুলি জীবন বেঁচেছে, তাও বললেন বার বার। তবে সে ছেলে তাঁর যতই দিতে চাক—বৌমা যে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো জিনিসই তার কাছ থেকে নেয় না এবং কাউকে নিতে দেয় না—তার জন্যে সে বেচারা কত দুঃখ করে—এমন অনুযোগের সুরও তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেল।

মা যে এত দুঃখে আত্মসম্মান-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁর মনের

মধ্যে লোভের চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে আশ্চর্য হ'ল না অজয়, এটাই স্বাভাবিক। বরং স্ত্রী যে এখনও সেই সম্মান-জ্ঞানটুকু বজায় রেখেছে তাতেই সে আবার নতুন ক'রে শ্রদ্ধাবোধ করল তার সম্বন্ধে। শ্রদ্ধা আর বিস্ময়, দুই-ই!

কিন্তু, মিনু কেন তার কাছে আসছে না কিছুতেই? রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত আছে বটে, মায়ের সেবা, তার জলখাবার, সকলের আহার্য প্রস্তুত—এ সবই দরকার সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই ব'লে একবার তার কাছে আসতে পারত না সে? কেন তার এ ঔদাসীন্য? শুধু তাই নয়—তার ব্যবহারে এমন একটা কঠিন শৈত্য ফুটে উঠেছে যে, অজয়ও সাহস পাচ্ছে না নিজে থেকে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে…

জলযোগ শেষ ক'রে অজয় বাইরের মাঠে গিয়ে বসল। রীতিমত শীত পড়ে নি এখনও, তবু শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদটুকু ভালোই লাগে।…

ও ব'সে ব'সে সেই কথাই ভাবতে লাগল। কেন? কেন ওর এই অভিমান? কী যে অপরাধ ওর ঘটতে পারে কিছুতেই ভেবে পেল না। জেল থেকে চিঠি দেয় নি তাই? কিন্তু, মিনুর বোঝা উচিত সে কেন দেয় নি চিঠি—কী সুগভীর লজ্জা ও বেদনায় ও তাদের খবর নেয় নি। এর আগেও সে যতবার জেলে গেছে, বাড়িতে চিঠি দেয় নি একবারও। অপরকে পড়িয়ে তবে চিঠি পাঠাতে হবে—এ অপমান ওর বড় বেশী লাগত। সুতরাং, নতুন ক'রে অপরাধ নেবারও কিছু নেই। তবে?…

এ 'তবে'-র উত্তর কোথাও মিলল না। বেলা বাড়তে লাগল ক্রমশ, শূন্য মাঠের বাতাস রৌদ্র-তপ্ত হয়ে উঠল। দূর-দূরবর্তী শালগাছের পল্লবের দিকে চেয়ে চেয়ে এ সমস্যার কোনো সমাধানই করতে পারলে না অজয়। কয়েক ঘণ্টা আগে-পর্যন্ত যে আশঙ্কায় ওর মন ভারী হয়েছিল, সে শঙ্কার কারণ আর নেই; কিন্তু, তার সঙ্গে ওর সব চেয়ে যেটা বড় আশা অন্তরের, সেটাও এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা সে একবারও ভাবে নি। মিনু যদি বেঁচে থাকে তো সে মিনু ওরই থাকবে—একান্ত ভাবেই ওর—এইটুকুই সে ভেবেছে এতকাল, কিন্তু এ কী অভাবিত দূরত্ব রচিত হ'ল ওদের মধ্যে! এ কী অকারণ অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান! কেমন ক'রে এ বাধা পার হবে ও, কেমন ক'রে আবার প্রসন্ন দৃষ্টি ফুটে উঠবে মিনতির চোখে, সে উপায় ও ভাবতেই পারে না—কেন সে প্রসন্নতা চ'লে গেল এই ভেবেই যে বিহ্বল হয়ে পড়েছে!

আরও বহুক্ষণ ব'সে থেকে অজয় নিজেকে সামলে নিলে। কারণ যাই হোক—মিনতির অভিমান নিয়ে ওর অন্তত অভিমান-বোধ করবার অধিকার নেই। তার যেটা কঠিনতম কর্তব্য ছিল, সর্ববৃহৎ দায়িত্ব ছিল, তা মিনুই বহন করেছে তার হয়ে, তাকে লজ্জা ও দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছে সে—সুতরাং, আজ সে-ঋণ শোধ করবার জন্য যত দৈন্যই স্বীকার করতে হোক্, করবে। সে-ই তপস্যা করবে মিনতির প্রসন্নতার জন্য।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে অজয় নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ ক'রে উঠে পড়ল। মিনতির 'বোধ হয় এতক্ষণ রান্না শেষ গিয়েছে—এবার বাড়ি ফেরাও দরকার। আর কীই বা হাতিঘোড়া রাঁধবার আছে ওর, মা তো ব'লেই দিয়েছেন, একেবারে দেহরক্ষা করবার জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী ভিক্ষা সে নেয় না।

'ভিক্ষা' শব্দটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের আত্মা যেন শিউরে উঠল। পরক্ষণেই একটু হেসে সে বাড়ির পথ ধরলে। নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে লাভ কী? ভিক্ষাই তো! মায়ের মুখে যেটুকু শুনলে তাতে এটা বুঝতে বাকি থাকে না যে, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি ওদের সাহায্যই করেন নিয়মিত। আর সে সাহায্য মিনতিই তাঁর কাছে চেয়ে নিয়েছে একদিন। সত্যি, কী না করেছে তার জন্য মিনু—কী অসম্ভবই সম্ভব করেছে। ভিক্ষা শুধু চাইলেই এতদিন ধ'রে এমন ভাবে ভিক্ষা পাওয়া যায় না—কৌশলে আদায় করতে হয়। এতবড় দাতা কেউ নেই যে, এতদিন ধ'রে নিয়মিত ভাবে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করবে। বিশেষ, মায়ের কথার ফাঁকে ফাঁকে সে লোকটির যে পরিচয় পেয়েছে অজয়, তাতে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, সে অন্তত সে রকম দাতা নয়।...কী ক'রে এমন অঘটন ঘটালে মিনু, কে জানে!...

বাড়ির বাইরে এসে অজয় থম্‌কে দাঁড়াল। ওদের বাইরের নিমগাছটাতে কী একটা সুন্দর পাখি বাসা করেছে। একটা নয়—একজোড়া। মাদী পাখিটা বাসায় ব'সে বোধ হয় ডিমে তা' দিচ্ছিল, এতক্ষণ তাকেই দেখেছে অজয় দূর থেকে। এখন মদ্দাটাও কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ ক'রে ফিরে এল। বাচ্চাদের জন্য খাবার পক্ষীমাতারা সংগ্রহ করে এ দৃশ্য সে অনেক বার দেখেছে, কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একটু অভিনব। মদ্দা পাখিটা, বোধ হয় গিন্নীর জন্যই—ঠোঁটের খাবার ওর সামনে নামিয়ে রেখে আবার উড়ে চ'লে গেল। আর গিন্নী পাখিটা অনায়াসে সেই খাবার খেতে লাগল ব'সে ব'সে—

আপন মনেই হেসে ওঠে অজয়। প্রেম তাহ'লে এদের মধ্যেও আছে! আশ্চর্য!

মিনু এসে তেলের বাটি রেখে গেল ওর সামনে, আর গামছা। সেখানে কেউ নেই তখন, তবু মিনু কথা কইবার চেষ্টা করলে না। অজয় আর থাকতে না পেরে ডাকল, 'মিনু, শোন।'

যেন চম্‌কে উঠল মিনু। মুখ তুলে চাইল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে আনন্দ নেই—আশা নেই। শঙ্কিতা হরিণীর মতই ভীত, আর্ত তার চাহনি। এইবার প্রথম বুঝতে পারল অজয়, এতক্ষণ যাকে সে নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য ব'লে মনে করেছিল তা আসলে হয়তো অপরিসীম ভয়। সেই আশঙ্কা দমনের প্রাণপণ চেষ্টাই তার মুখকে অমন ক'রে তুলেছিল।

চোখে চোখ পড়ল, তবু মিনু দাঁড়াল না। একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল!

তেল মেখে স্নান করতে যেতে যেতে সেই কথাই ওর মনে হ'তে লাগল। এ আবার যেন নতুন সমস্যা! কিসের ভয় তাকে? ভয় যে, সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই ওর মনে, ভয়ের এ স্পষ্ট চেহারাটা সে চেনে। মিনু তো ওর কাছে কোনো অপরাধ করে নি, তবে ভয় কিসের!

যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবেই একবার পাখির বাসাটার দিকে চাইলে অজয়।

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, রৌদ্র যেন ঠিকরে পড়ছে। একেবারে স্নানের ঘাটে গিয়ে জলে পা ডুবিয়ে বসল, আঃ! কী শান্তি!

কিন্তু, দেহ ঠাণ্ডা হ'লেও মন শান্ত হয় না কিছুতে। একটা অস্বস্তি কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে। কত কী চিন্তা, কত সম্ভাবনা খানিকটা ক'রে মনে আসে, আবার একটা সম্ভাবনার তলায় তা চাপা প'ড়ে যায়।

এমনি ক'রে কতক্ষণ সে বসেছিল তা মনে নেই। হঠাৎ একসময় ওর চমক ভাঙ্গল ভাগ্নীর কণ্ঠস্বরে, 'মামা তুমি চান করতে নামো নি এখনও—সবাই আমরা ব'সে আছি যে! দিদিমা হয়তো একটু পরেই কান্নাকাটি শুরু ক'রে দেবে।'

তা বটে! কথাটা ওর মনেই ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে উঠল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁরে, মায়ের এখনও সেটা আছে?'

'নেই আবার! ও বছর দুর্ভিক্ষের সময় যখন এক-একদিন মামীমা কিছুতেই কিছু যোগাড় করতে পারত না তখন উপোসেই কাটত তো! আমরা ছেলেমানুষ

হয়েও চুপ ক'রে থাকতুম, কিন্তু দিদিমা কেঁদেকেটে মামীমাকে গাল দিয়ে অনর্থ করত। সেইজন্যেই তো মামীমা শেষ পর্যন্ত ঐ লাখপৎ মামার কাছে গেল সাহায্য চাইতে। নইলে, লাখপৎ মামা ওর ঢের আগেই নাকি আমাদের চাল-ডাল কাপড় পাঠাতে চেয়েছিল, তখন মামীমা কিছুতে রাজি হয় নি, আমাদের বলেছিল ওতে তোমার মামার অপমান করা হবে মা! কিন্তু কী করবে, তখন মামীমা আর থাকতে পারলে না, সেইদণ্ডেই দুপুর রোদ মাথায় ক'রে ওদের বাড়ি চ'লে গেল—'

রমা আরও কত কী বকে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে আর অজয়ের কান ছিল না। সে ভাবছিল মিনতির কথা। কত কীই না সহ্য করতে হয়েছে বেচারাকে! না ছিল সেদিন কোথাও একটু সহানুভূতি, না ছিল কোনো অবলম্বন! তবে একটা কথা সে অনেক চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারলে না যে, আগেও যা ক'রে মিনু অন্ন-সংস্থান করছিল তাও তো ভিক্ষাই, তবে লাখপৎ রায়ের সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছিল কেন?

বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে তখন। বেশী চিন্তা করার সময়ও ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মাথা মুছে উঠে পড়ল। বাড়ি যেতে যেতে রমা পাশের নিমগাছ-তলাটা দেখিয়ে বললে, 'দুর্ভিক্ষের সময় ঐ গাছতলায় যে কত লোক মরে প'ড়ে থাকত তার ইয়ত্তা নেই। বোধ হয় পুকুরে জল আছে আর গাছের ছায়া আছে এই লোভেই আসত। কিন্তু মামা, সে কী কষ্ট, সে যে মানুষের চেহারা তা বোঝা যেত না। এক-একদিন থাকতে না পেরে নিজেদের পাতের ভাত এনে ওদের খাওয়াবার চেষ্টা করেছে মামীমা, কিন্তু তারা খেতেও পারত না—অনেকে খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই ভাতের মধ্যেই মুখ গুঁজে মরেছে!'

ছবিগুলো ওর চোখের সামনে দিয়ে যেন স'রে স'রে যেতে লাগল। অভুক্ত অসুস্থ অজয় শিউরে উঠতে লাগল বারবার। মানুষের জীবনের মূল্য কত কম তা এই দুর্ভিক্ষই শিখিয়ে দিয়ে গেল ওদের।

বাড়ির সীমানায় পা দিয়েই রমা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে লাখপৎ মামা আমাদের বাড়ি ঢুকছে—'

সেখান থেকে একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ভদ্রলোকের পিছনটাই দেখা গেল শুধু—সেও এক মুহূর্তের জন্য।

অজয় জোরে জোরে পা হাঁকাল। যে তাদের এত উপকার করেছে—মৌখিক শিষ্টাচারে অন্তত তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন বৈকি!

কিন্তু, বাড়ির মধ্যে পা দিয়ে সে কাউকেই দেখতে পেলে না। মিনতি নতমুখে কী একটা কাজ করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে। মা ওধারের ঘরের মধ্যে। অজয় বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিক চাইছে, রমা প্রশ্নটা ক'রেই ফেললে, 'লাখপৎ মামা এসেছিল না?'

মাথা না তুলেই মিনতি উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ।'

'কৈ দেখছি না তো।'

'চ'লে গেছেন।' সংক্ষিপ্ত এই উত্তরটি দিয়ে মিনতি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

এই রৌদ্রে এতটা পথ এসে কেনই বা তিনি এমন অকস্মাৎ চ'লে গেলেন তার কোনো কারণই খুঁজে পেল না অজয়। বিশেষ ক'রে গেলেনই বা কোথা দিয়ে? সোজা পথেই তো সে এসেছে। হয়তো পিছনের দরজা দিয়ে বাগানের পথে বেরিয়ে গেছেন।

কিন্তু কেন?...

এই 'কেন'টাই ওর মাথায় ঘুরে বেড়ায় অনেকক্ষণ ধ'রে। আহারাদির পর শ্রান্ত দেহ ঘুমে শিথিল হয়ে আসারই কথা, কিন্তু অজয়ের চোখে তন্দ্রা এল না। মিনতির ব্যবহারে যে একটা কঠিন ঔদাসীন্য, একটা দূরত্ববোধ ফুটে উঠছে—তারও যেমন কোনো কারণ খুঁজে পায় না অজয়, তেমনি ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারটাও দুর্জ্ঞেয় ব'লে মনে হয়। শুধু একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তা ওর মনকে পীড়িত করতে থাকে—

শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার কিছু আগে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরোচ্ছে শুনে মা প্রশ্ন করলেন, 'কোথা যাবি?'

অন্যমনস্কভাবেই অজয় উত্তর দিলে, 'তোমার ঐ নতুন ছেলেটির সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে আসি। ও-বেলা কেন ভদ্রলোক অমন ক'রে হঠাৎ চ'লে গেলেন তারও একটু খোঁজ নেওয়া দরকার তো! তাছাড়া, কৃতজ্ঞতাটা আমারই জানাতে যাওয়া উচিত!'

মা আর কোনো কথা কইলেন না, কিন্তু সে যখন বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে প্রায় রাস্তায় পড়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে রমা বললে 'মামীমা তোমাকে ডাকছে একবার, এখুনি—'

মামীমা ডাকছে!

তাহ'লে কি মিনুর কথা কইবার অবসর হ'ল এতক্ষণে? বিস্মিত অজয় ঘরে ঢুকে দেখলে মিনু স্তব্ধ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, ও পাশের জানালাটার দিকে চেয়ে।

কাছে এসে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে অজয়, 'আমাকে ডাকছিলে মিনু?'

'তুমি—তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির বাড়ি—একটু আলাপ ক'রে আসা উচিত নয় কি?'

'না—তুমি ওখানে যেও না।'

'কেন বল তো।'

'না, কোনোমতেই ওর সঙ্গে দেখা করা হবে না তোমার!' সহসা যেন মিনু উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ওর মুখ দেখলে মহাপাপ হয়—ও, ও তোমার সামনা-সামনি দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়!'

আরও বিস্মিত হয়ে অজয় বললে, 'কী ব্যাপার বল তো? হয়তো ভদ্রলোক অসাধু উপায়ে কিছু টাকা করেছেন, কিন্তু—উনি যে আমাদের এত উপকার করলেন সেটা ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? আমাদের অন্তত উচিত নয় ওঁর বিচার করতে যাওয়া।'

মিনু কী যেন একটা মানসিক উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছিল, ওর কণ্ঠ ভেদ ক'রে একটা আর্তনাদ বেরোল, 'ওগো তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না? আমি, আমি যে আর পারি না এ যন্ত্রণা সহ্য করতে!'

অকস্মাৎ একবার অজয়ের চোখের সামনে সেই পাখির বাসাটা ভেসে উঠল। একটা অস্ফুট অথচ মর্মান্তিক সংশয় নিমেষের মধ্যে ওর আত্মাকে যেন পীড়িত, মথিত ক'রে চ'লে গেল। ডুবন্ত মানুষ প্রথমবার জল খেয়ে যেমন হাঁপিয়ে ওঠে, তেমনি ভাবে ও ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠল নিশ্বাস নেবার জন্য।

সেই সঙ্গেই ম্লান আলোতে ঘরের দেওয়ালগুলোর মধ্যেকার জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন ওকে পিষে ফেলতে লাগল। একবার আকুল ভাবে কী একটা যেন প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলে ও, তার পরই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারের মধ্যেই শালবনে ও যে কতক্ষণ পাগলের মত ঘুরে বেড়াল, তা ও নিজেই জানে না। এমন কি, ঠিক কী যে ও ভাবছে তাও বোধ হয় তখন বলতে পারত না। শুধু কিছুতেই যে ও তখন স্থির হয়ে থাকতে পারছে না—এইটুকুই অনুভব করছিল।

মিনু ? মিনু শেষে এই করল !

রাগ—কিংবা অভিমান কিংবা ধিক্কারবোধ তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত—হয়তো শুধুই একটা গ্লানি ওর কণ্ঠ পর্যন্ত উপছে পড়ছিল। আর একটা অসহায় ভাব। কী করবে ও, কী করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয় !

কী দরকার ছিল মিনুর এমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার আর বেঁচে থাকবার। না হয় সবাই যেত, যেমন ক'রে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে তেমনি ক'রেই। ধিক্—ধিক্ ওকে !

কিন্তু, সন্ধ্যা যখন রাত্রিতে ঢ'লে পড়ল, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের নিচে সীমাহীন বিশাল প্রান্তর ক্রমে নিস্তব্ধ ও নির্জন হয়ে এল—তখন ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কও একটু ক'রে ঠাণ্ডা হ'তে লাগল। অজয় নিজেই তো ব'লে গিয়েছিল মিনুকে—'যেমন ক'রে হোক্ মাকে বাঁচিয়ে রেখো !' ওর বুড়ো অসহায় মা, খিদে পেলে আজও কাঁদেন ছেলেমানুষের মত, মাথা ঠোকেন। তিনি কি পারতেন অমনি ক'রে মরতে, ঐ যারা দলে দলে নিঃশব্দে মরেছে ওদেরই পুকুর-পাড়ের গাছতলায় ? না, সে চিন্তাও অসহ্য ! আর ওর ঐ ক্ষীরের পুতুলের মত মেয়ে, ওর মাতৃহারা ভাগ্নী !

কর্তব্য তো তারই, বিবাহের মন্ত্র প'ড়ে সেই তো চিরকালের মত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছিল—কোন্ অধিকারে সে দেশের কাজ করতে নামে তাদের কোনো ব্যবস্থা না ক'রেই ? সে জেলে গিয়েছিল, সেইটেই যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার মনে ক'রে দেশবাসীর কাছ থেকে হাততালি ও বাহবা আশা করে। কিন্তু, যারা সামনে এগিয়ে আসে নি, কোনোদিক থেকেই যাদের ঐ বাহবা পাওয়ার আশা নেই, তারা কি কম ত্যাগস্বীকার করেছে বা করছে ওদের চেয়ে ?

বেচারী মিনু—যে ওকে একদিনের জন্যও অশান্তি ভোগ করতে দেয় নি, একদিনও ওর কাজে বাধা দেয় নি—ওর গর্ব, ওর আত্মার আনন্দ মিনু—সে যে নিঃশব্দে কত বড় আত্মত্যাগ করল, স্বার্থপর পুরুষের মন ওর, সে কথা কি ও একবারও ভেবে দেখেছে ? তিলে তিলে কী যন্ত্রণা সহ্য করেছে সে—সে কি ওদের চেয়ে কম কষ্ট পেয়েছে ! ওর এতবড় ত্যাগস্বীকার, এতবড় দুঃখবরণের ঋণ কোনো মূল্যেই যে শোধ হওয়া সম্ভব নয় !

তবে ?

ওরা একবার জেলে তিনদিনের জন্য অনশন ধর্মঘট করেছিল—সে কথা ওর

আজও মনে আছে। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গিয়েছিল ও বলতে গেলে। সেইদিনই ওর মনে হয়েছিল, মান-সম্ভ্রম-লজ্জা সবই জীবনকে কেন্দ্র ক'রে, মানুষ যখন মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়ায়, তখন এসবের কোনো মূল্যই আর থাকে না। মিনুকে বিচার করতে বসেছে সে ? আশ্চর্য, সে তো তপস্যা করেছে ওর আজ্ঞা পালন করবার জন্য—ওদের কোনোমতে শুধু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করেছে সে একটু একটু ক'রে, প্রতিদিন সে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহ্য করেছে।...

অনেকক্ষণ এমনিভাবে ঘুরে বেড়াবার পর গভীর রাত্রে অপরাধীর মত নত-মস্তকে অজয় বাড়ি ফিরল। তখন সকলেই খেয়ে শুয়ে পড়েছে, শুধু মিনতি একা ব'সে আছে রান্নাঘরের দাওয়ায়, পাথরের মত কঠিন হয়ে।

আস্তে আস্তে ও কাছে গিয়ে ডাকল, 'মিনু !'

বোধ হয় মিনু একবার শিউরে উঠল, কিন্তু কোনো উত্তর দিলে না।

ওর পাশে ব'সে প'ড়ে ভগ্ন-কণ্ঠে অজয় আবার ডাকলে, 'মিনু, অপরাধ আমার অনেক বড়, কিন্তু তুমি তো আমার অনেক অন্যায় মাপ করেছ, এবারেও ক'রে নাও।'

## বৈরাগীর বাসা

কলকাতা শহরের এত কাছে এরকম জঙ্গল আছে, বিশ্বাস করা শক্ত বৈকি ! কতই দূর, ট্রেনে আট মাইলেরও কম, বাসে গেলে বোধ হয় পুরো আট মাইলই দাঁড়ায়। হাজারেরও বেশী লোক প্রত্যহ এই স্টেশন থেকে মাসিক টিকিটে যাতায়াত করে, কলকাতার ছোঁয়াচ এর সর্বাঙ্গে। তবু এখানকার রাস্তা পাকা হয় না, বর্ষায় হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে ডুবে যায়। পথে আলো তো জ্বলেই না, ঈশ্বরদত্ত যেটুকু আলো আসতে পারত, সেটুকুও আড়াল ক'রে রাখে অসংখ্য বাঁশঝাড় আর ঘন আগাছার জঙ্গল। পানীয় জলের জন্য এখনও অধিকাংশ লোককে পচাপুকুরের মুখ চেয়ে থাকতে হয়—ফলে, ম্যালেরিয়া এবং পেটের অসুখে সবাই মুমূর্ষু। এদের চেহারা আর স্বভাবের মধ্যে কোথাও প্রাণ-শক্তির চিহ্নমাত্র নেই।

তবু এদের দেবদ্বিজে যে ভক্তির অভাব নেই—এটা মানতেই হবে। এ

যদি কেউ প্রমাণ চান তাহ'লে আমাদের সাধুজীর কথাই বলব। সেই কবে উনিশ শ' সাতাশ সালে গঙ্গাসাগর-মেলার ফেরত এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর তাঁকে কোথাও যেতে হয় নি। স্থানটি যে তাঁর এত পছন্দ হয়েছিল তার মূলে এই কারণটাই বোধ হয় বড় ছিল যে, ঈশ্বর-আরাধনার যেটা প্রধান অঙ্গ, নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত আহার—সেটার অভাব এখানে কোনোদিনই হবে না।

আর তা হয়ও নি। বরং একটু একটু ক'রে অন্য ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সরস্বতীর শীর্ণ খালের ধারে নির্জন শ্মশানপ্রান্তে তাঁর একটু কুটীর উঠল, কুটীরের সামনে জমিতে বেড়া দেওয়া হ'ল, এমন কি ক্রমে ক্রমে তাতে লাউ-কুমড়োর মাচাও দেখা গেল। সাধুজী সুখেই ছিলেন। বারো মাসে তের পার্বণ—সিধে ও নিমন্ত্রণ তো লেগেই আছে। তিনি কোনো গৃহস্থবাড়িতে খেতে যেতেন না, গৃহস্থরাই লুচি-তরকারি বা অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়ে যেত। রেঁধে খেতে হয় তাঁকে দৈবাৎ। রাত্রে প্রত্যহই কুণ্ডুবাবুদের ঠাকুরবাড়ি থেকে শীতলের প্রসাদ আসত। সুতরাং, জীবনধারণের চিন্তা অন্তত তাঁর ছিল না এখানে কোনোদিনই। আরামে ও আলস্যে, ভগবানের নাম ক'রে গ্রামবাসীকে প্রয়োজনমত দুটো গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিয়ে, কখনও বা কোথাও দু'-চার দিনের জন্য ভাগবত ও চণ্ডী পাঠের কাজ নিয়ে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছিল। এখানে দু'-চার ঘর তাঁর গৃহস্থ-মন্ত্রশিষ্য ছিল, কাজেই সন্ন্যাসী-শিষ্য না থাকলেও অসুখ-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষারও ভাবনা ছিল না। অর্থাৎ, এতদিন তো কাটলই—জীবনের বাকি দিন ক'-টাও তাঁর এইখানেই কাটবে এই কথা সবাই জানত—এমন কি তিনি নিজেও।

কিন্তু, হঠাৎ তাঁর এই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে বাইরের একটা ঝটকা হাওয়া এসে লাগল একদিন, তার ফলে এতদিনের বাসার মূল অবধি উঠল কেঁপে।

ব্যাপারটা কিছুই না, সাধুজী নিজেও যেমন ক'রে ভাসতে ভাসতে একদিন এখানে এসে ঠেকেছিলেন, তেমনি ক'রেই আর একটি বৈষ্ণব বাবাজী এসে পৌঁছলেন। বাবাজী একা নন্—তাঁর সঙ্গে তাঁর মাতাজীও, অর্থাৎ গৃহিণী-শিষ্যা-সেবাদাসীর একটা অপূর্ব সম্মেলন! বাবাজীর কাঁধে কাঁথা, বগলে ঝুলি আর মাতাজীর কোমরে পুঁটুলি—এই অবস্থায় একদিন গঙ্গাসাগরের ফেরত এসে বেড়ার আগড় ঠেলে সাধুবাবার উঠোনে ঢুকলেন, বেশ প্রশান্তমুখেই বললেন, রাধে রাধে—সাধুবাবা, দণ্ডবৎ হই।'

বলা বাহুল্য সাধুজীর ললাটে একটা বড় রকমের ভ্রূকুটি দেখা গেল। কিন্তু, তবু তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, 'নারায়ণ, নারায়ণ! আপনারা কোথা থেকে আসছেন বাবাজীমশাই?'

'আজ্ঞে গিয়েছিলাম গঙ্গাসাগর। থাকি বাবা অনেক দূরে—শ্রীধাম বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রয় পেয়েছি একটুখানি, সেখানেই থাকি। আসা আর হয় না—তবু বলি, সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার, একবারও অন্তত ডুবে আসি চল্। মাগী বলে রেলের ভাড়া পাব কোথায়? আমি বলি রেলে কী হবে, তীর্থে যাব হেঁটে। এখানেও তো মাধুকরী ক'রেই খেতে হয়—না হয় তাই করতে করতেই চ'লে যাব। তা বাবা, মিছে কথা বলব না—কলকাতা পর্যন্ত রেলেই এসেছিলুম, একজনা ভাড়া দিয়েছিল। বাকি পথটা হেঁটে গিয়েছি, আবার বোধ হয় সব পথটাই হেঁটে ফিরতে হবে। তাই ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি; শুনেছিলুম কুণ্ডুবাবুদের ঠাকুরবাড়ি প্রসাদ পাওয়া যায়, থাকবার আশ্রয়ও বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। মাগীর পা ফেটেছে, গাঁটে ব্যথা, দু'-একটা দিন না জিরিয়ে চলতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত ব'লে বোধ হয় দম নেবার জন্যই বাবাজী একটু থামলেন। কিন্তু, তখনও সাধুবাবার দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে আছে দেখে বললেন, 'যাচ্ছিলুম ঐ দিকেই, পথে একটি ভদ্রলোক আপনার সন্ধান দিলে, তাই ভাবলুম যে, যখন এই পথেই এসে পড়েছি তখন এমন সুযোগ আর ছাড়া উচিত নয়। এতবড় একজনা সাধু যেকালে এখানে রয়েছেন সেকালে একবার শ্রীচরণ দর্শন ক'রেই যাই!'

এই পর্যন্ত ব'লে বাবাজী ভক্তিভরে আর একটি প্রণাম করলেন। সাধুবাবার দৃষ্টি যেন এবারে প্রসন্ন হ'ল একটু, তিনি দাওয়ার কোণে গুটোনো একটা মাদুর দেখিয়ে দিয়ে বললেন 'ঐটে টেনে নিয়ে বোস। একটু বিশ্রাম কর। মুখ-হাত ধুতে চাও তো এই ঘরের পিছনের রাস্তা দিয়ে নদীতে যেতে পার, ঘাট আছে!'

কিন্তু, বিশ্রাম করার জন্য যতটা সময় লাগা উচিত তার অনেকখানি বেশী সময়ও কেটে গেল, তবু বাবাজীমশাই মাদুর ছেড়ে উঠলেন না। বরং পুঁটুলি থেকে হুঁকো কলকে বার ক'রে জমিয়ে ব'সে তামাক খেতে খেতে হাত-পা নেড়ে শ্রীবৃন্দাবনের গল্প করতে লাগলেন। সাধুবাবার অত দেশ ঘোরা ছিল না, প্রথম যৌবনে গুরুর সঙ্গে এধারে চন্দ্রনাথ-কামাখ্যা, আর, ওধারে গয়া-কাশী-প্রয়াগ পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। তারপর কিছুদিন দেওঘরে কাটিয়ে সেই যে গঙ্গাসাগরের

ফেরত এখানে এসে আস্তানা গেড়েছেন, আর কোথাও নড়েন নি। সুতরাং, এসব গল্পে তাঁরও নেশা লাগে, তিনি ব'সে ব'সে শোনেন, বাবাজীমশাই একহাতে হুঁকোটা ঝুলিয়ে ধ'রে ব'লে যান, 'ওখানে বাবা বুঝলেন, এদেশের মত চাল ভিক্ষে দেওয়া নেই। সব রুটি। মাধুকরী যত বাড়িই করুন না কেন, রুটি জমবে শুধু। কেউ আধখানা, কেউ সিকিখানা কেউ বা পুরো রুটি দেয়। সব রুটি তো আর লাগে না, বিশেষত বাঙালী যাঁরা আছেন তাঁদের মাঝে মাঝে ভাত না খেলে চলেও না, কাজেই রুটি যা বাঁচে অনেকে আবার রোদে শুকিয়ে রেখে দেন। সেই সব রুটি জালায় জমানো থাকে, বর্ষাকালে যখন মাধুকরী করার অসুবিধা, কিংবা অসুখ-বিসুখে যখন বেরোতে পারে না, তখন সেই সব রুটি বার ক'রে গরম জলে তার গায়ের ছাতা ধুয়ে ভিজিয়ে একপয়সার দই আর গুড় মেখে খায়। ফকিরাবাদ দেশ বুঝলেন না বাবা, বড় গরিবের দেশ, আকবর বাদশা ওর নাম রেখেছিলেন ফকিরাবাদ—এখনও সেই ফকিরাবাদই আছে। কিছুটি ফেলবার জো নেই।"

কথা থামিয়ে উপরি উপরি দু'টান দিয়ে নিলেন বাবাজী। হতাশ হয়ে বললেন,'নাঃ, গল্প করতে করতে নিভে গিয়েছে। তবে বুঝলেন বাবা, আমার অন্ন প্রসাদের অভাব হয় না। বাঙালীর ঠাকুরবাড়ি তো আছে দু'-একটা, সেখান থেকে ব'লে ক'য়ে এক এক মুঠো অন্ন ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি। একটা পারসও পাই, একজনের মত পুরো প্রসাদকে ওরা বলে পারস—তাতে অবিশ্যি ভাত রুটি দুই থাকে। তা মিলিয়ে মিশিয়ে একরকম চ'লে যায়। তা ব'লে অমন উঞ্ছবৃত্তিও নেই, সাত মাসের শুকনো রুটি গরম জলে ভিজিয়ে খাব—প্রসাদ আমার মাথায় থাকুন—অমন খাওয়ার মুখে ঝাড়ু মারি!'

কিন্তু, শুধু গল্পে বেলাই বাড়ে। বাবাজীর সঙ্গের স্ত্রীলোকটি, চন্দ্রাবলী তার নাম, সে উস্‌খুস করে। থেকে থেকে একসময়ে ব'লেই ফেলে, 'বাবাজী এখনও গল্প করছ—এর পর গেলে কি আর প্রসাদ পাবে? পেটে কিল মেরে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ—পেটে কিল মেরে থাকতে হবে! মাগীর যা বুদ্ধি, এতবড় সাধুর চরণে যখন একবার এসে পৌঁছেছি তখন আর কী ভাবি। যা হয় হবে। আর রাধারানী যদি অন্ন মাপিয়ে থাকেন তাহ'লে তা মিলবেই।'

সাধুবাবারও হুঁশ হ'ল। ন'ড়ে চ'ড়ে উঠে গাছের ছায়ার দিকে চেয়ে বললেন, 'এত বেলায় আর প্রসাদ পাবে না সত্যিই, তাছাড়া আগে থাকতে

না জানালে এখানে মেলেও না। এখন আর আগেকার দিন নেই, ভোগ রান্না হয় হিসেব ক'রে। তার চেয়ে এক কাজ কর, চালডাল দিচ্ছি, পাতা-লতা জেলে দুটো ফুটিয়ে নাও। ওবেলা তখন ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রো'খন।'

হাত বাড়িয়ে আর একদফা সাধুর পায়ের ধুলো নিয়ে বাবাজী বললেন, 'দেখছি মাগী, ছ্যাগ্। মানুষ চিনি যে আমরা, সাধ ক'রে কি আর নিশ্চিন্তি হয়ে ব'সে আছি!'

রান্না-খাওয়া শেষ ক'রেও চন্দ্রাবলী চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না। বাগান ঝেঁটিয়ে শুকনো পাতা জড়ো করে, নারকেল পাতা কেটে একদিকে জমা ক'রে রাখে। নিজেই কোথা থেকে একটা ন্যাকড়া যোগাড় ক'রে সাধুবাবার ঘরের দাওয়া, তুলসীতলা নিকিয়ে ঝক্‌ঝকে করে। সাধুবাবার হাত থেকে তাঁর পূজোর বাসন কেড়ে নিয়ে খাল থেকে মেজে আনে। তার ভাবভঙ্গি দেখে একবারও মনে হয় না যে, সে পথশ্রমে ক্লান্ত।

সাধুবাবা একটু হকচকিয়ে যান বৈকি! প্রথম প্রথম উৎপাত ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু, পরিচ্ছন্ন উঠান ও পরিষ্কার দাওয়ার দিকে চেয়ে তিনি প্রসন্ন হয়ে ওঠেন। এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। ছোটবেলা বাড়ির কাছে ঐ গঙ্গাসাগরের ফেরতই একদল সাধু এসে আস্তানা গেড়েছিল, তাদের কাছে এসে বসতে বসতে গাঁজা আর ঘি-চপ্‌চপে হালুয়ায় নেশা লাগে, একদিন বাড়িঘর ছেড়ে তাদের দলের সঙ্গেই ভেসে পড়েন। তারপর থেকেই বলতে গেলে পথে পথে—শীতকালে ধুনি জ্বালিয়ে গাছতলায় কাটাতে হয়েছে কতকাল। সুতরাং, এখানে এসে আশ্রয় একটা পেলেও গুছিয়ে ঘরকন্না করার মত অভ্যাস তাঁর কোনোদিনই হয় নি। কোনোমতে পূজাপাঠ আর রান্না সারতেন। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে জীবনযাত্রা যে বেশী তৃপ্তিদায়ক হয় এমন কথা মনেও হয় নি কখনও। যখন নিতান্ত অগোছালো হয়ে পড়ত শিষ্য-শিষ্যারা কেউ কেউ এসে একটু গুছিয়ে দিয়ে যেত। তাই এই নতুন অভিজ্ঞতাটা তাঁর কাছে অভিনব ব'লে মনে হয়। কথার ফাঁকে মধ্যে মধ্যে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

বাবাজীর কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য নেই। কাজ তিনি করতে পারেন না, ওসব বোঝারও চেষ্টা করেন না। তামাক আর গল্প, এই দু'টিই তাঁর প্রিয়। সন্ধ্যার সময় হরিনামের মালা নিয়ে জপে বসেন বটে, কিন্তু জপের চেয়ে গল্পটাই চলে বেশী। মালাটা মাথায় ঠেকিয়ে বলতে শুরু করেন, 'আমাদের বুঝলেন না

রাধারানীর রাজত্বে খাওয়ার অভাব নেই। ভেখ্‌ধারী বৈষ্ণব আমরা, ভিক্ষা ক'রেই আমাদের খাওয়া নিয়ম। তবে ঐ যা বলেন, মাধুকরীতে খাওয়ার অভাব থাকে না বটে, পয়সা মেলে কম। অবিশ্যি তারও ব্যবস্থা আছে একটা, এক মারোয়াড়ী ওখানে সদাব্রত খুলেছে, সকালে বিকেলে ছ'ঘণ্টা ক'রে তার ওখানে নামগান করলে সকালে চাল-আটা বিকেলে শুধু ছ'টা ক'রে পয়সা পাওয়া যায়। চাল-আটা তো আর অত লাগে না, বিক্রি ক'রেও দু'-পয়সা হয়। দিন কেটেই যায় একরকম ক'রে।'

কখনও বা বলেন, 'জিনিসপত্র ওখানে বাবা জলের দাম ছিল। রাবড়ি চার আনা আর দুধ চার পয়সা এ বরাবরই মিলত। বছরে দু'বার মেলা হয়, ঝুলনে আর দোলে—সেই সময়ই যা একটু আক্রা হ'ত আগে। রাবড়িটা আট আনা এমন কি কখনও কখনও দশ আনাও হয়েছে। এই পোড়ার যুদ্ধ বেধেই তো সব আগুন লেগে গেল। তবু বলব সাধুবাবা, এখানে যেমন আকাল আমার রাধারানীর রাজত্বে তেমন নেই! এখনও ধরুন না—গোকুলের দিকে—'

সাধুবাবার মন তাঁর গল্প থেকে ফিরে আত্মস্থ হয়ে ওঠে। এখানকার এই বন-ডোবা-বাঁশঝাড় ছেড়ে কোথায় কোন্ সুদূর না-দেখা বৃন্দাবনে চ'লে যান তিনি। সেখানে মুক্তালতারা মাথা হেঁট ক'রে আছে আজও। আজও সেখানে বঙ্কুবিহারীর ঘুম ভাঙ্গবার ভয়ে টিক্‌টিকি ডাকে না, সকালে কাক থাকে নীরব। পুরনো শহরের যে রাস্তাটা বঙ্কুবিহারীর গলির মোড় পার হয়ে মদনমোহনের পুরানো মন্দির ছাড়িয়ে নির্জন ও অন্ধকার যমুনা-পুলিনের দিকে চ'লে গিয়েছে—সে রাস্তাটা যেন তিনি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পান। গোকুল, কাম্যবন, রাধাকুণ্ড যেন মনে হয় কত পরিচিত।

শুধুই কি বৃন্দাবন! বাবাজীমশাই বহু তীর্থে ঘুরেছেন এই বয়সেই। কথায় কথায় সে-সব প্রসঙ্গও ওঠে। মিনিট কয়েক নীরবে মালা ঘুরিয়েই একবার ক'রে বকতে শুরু করেন, 'ভক্তি যদি দেখতে হয় বাবা তো নাথদ্বার যান একবার। ব্যাটারা সিদ্ধি খায়, গাঁজা খায়, কঞ্জুস সবই মানি, কিন্তু ঐ কাঠ-খোট্টা গোঁয়ার-গুলোর যে কী ভক্তি, কী বলব। দেখলে চোখে জল আসে, সত্যি। ভাবি রাধারানী আমাদের কবে এমন ভক্তি দেবেন।'

সাধুবাবা মৃদুকণ্ঠে একবার বলেন, 'বাবাজীমশাইয়ের অনেক জায়গা ঘোরা আছে দেখছি!'

'ঘোরাই তো কাজ ছিল বাবা! যেদিন থেকে ভেখ নিলুম, সেদিন থেকেই

তো স্বাধীন। এই কাঁথা আর ঝুলি নিয়ে বলুন না পৃথিবী বেড়িয়ে আসছি। তবে কি জানেন, এখন বড় জব্দে পড়েছি। গুরুদেব রজ পেলেন, তাঁর আস্তানার ভার পড়ল আমার ওপর। গিরিধারী আছেন—কিছু জুটুক না জুটুক, একটু গুড় দিয়েও নিদেন দু'বেলা তাঁর সেবা করতে হয়। ছাড়তেও পারিনে। তাহ'লে ঘরটুকু যায়। বুড়ো হচ্ছি, এখন একটা আশ্রয় মাথার ওপর না থাকলেও চলে না। নইলে আগে—বছরে ন'-মাসই ঘুরতুম। ঐ তো সরলা, ওকেও কুড়িয়ে পেয়েছিলুম এক তীর্থেই। সরলা মানে আমাদের এই চন্দ্রাবলী, চন্দ্রাবলী ওর ভেখের নাম, ভেখ নেবার আগে সরলাই ছিল। সেবারে পুষ্করে গিয়ে দেখি ওর ওলাউঠো-মত হয়েছে, সঙ্গের লোকেরা ফেলে পালিয়েছে। পাণ্ডার ঘরে উঠেছিল, তারাও ভয় পেয়ে রাস্তায় বার ক'রে দিয়েছে। বাঙালীর মেয়ে বেঘোরে পথে প'ড়ে মরবে, এটা আর দেখতে পারলুম না। তুলে হাসপাতালে নিয়ে এলুম, ওষুধপথ্যির ব্যবস্থা করলুম। ব্যস্ আর যায় কোথা! মাগী সেই যে কাঁঠালের আঠার মত জড়িয়ে ধরলে আর ছাড়াতে পারলুম না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! রাধারানীর মনে যা ছিল তিনি তাই করলেন। এতকালের সাধনভজন গেল!

চন্দ্রাবলী সারাদিন ভূতের মত খেটে উঠোনেই একটা ছেঁড়া চ্যাটাই পেতে শুয়েছিল, হয়তো সে তন্দ্রামগ্ন জেনেই বাবাজীমশাই সাহস ক'রে কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখা গেল কথাগুলো ঠিকই তার কানে পৌঁছেচে সে উঠে এসে বাবাজীর মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে, 'আ মরণ! মালা জপ ক'রে কেমন নির্জলা মিথ্যেগুলো ব'লে যাচ্ছে দেখ না। আমি তোমাকে বলি কতবার যে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পথ দেখি। ন'-বছরে বিধবা হয়েছিলুম, বত্রিশ বছরে তোমার সঙ্গে দেখা, এর ভেতরে অতিবড় শত্রুও আমাকে একটা কথা বলতে পারে নি। আমি ওঁর সাধনভজনে ব্যাঘাত করলুম, ওঁ আমার সাধনভজনওলারে!'

গতিক খারাপ দেখে বাবাজী আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করলেন না, আপন মনেই মালা জপে যেতে লাগলেন, যেন কথাগুলো তাঁর কানেই পৌঁছয় নি। চন্দ্রাবলীও আর কথা বাড়ালে না, সাধুবাবার পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে বললে, 'দিন ঠাকুর পা-দুটো একটু ছড়িয়ে, টিপে দিই।'

সাধুজী বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'নারায়ণ, নারায়ণ। এ আমি পছন্দ করি না, তাছাড়া মেয়েছেলে মহামায়ার অংশ, তাঁদের হাতের সেবা কি নিতে আছে। তুমি শোওগে, আমার পা টেপ্‌বার দরকার নেই—'

চন্দ্রাবলী ঘাড় নেড়ে বললে, 'না বাবা, সে শুনব না! যখন অনেক পুণ্যে আপনার দর্শন পেয়েছি তখন এটুকু আর ছাড়ছি না। চিরকাল তো ঐ ভণ্ড বিট্‌লের পা টিপে নরকেই ডুবছি, আজ একটু উদ্ধার হই। এ দয়াটুকু করতেই হবে আপনাকে।'

এই ব'লে সে একরকম জোর ক'রেই সাধুবাবার পা টিপতে বসল। তিনি কতকটা অভিভূতের মতই তার সেবা নিলেন। ইদানীং তাঁর একটু বাতের মত হয়েছিল, কখনও কখনও শিষ্যশিষ্যা কেউ তেল মাখাতে বা সেবা করতে এলে ভালোই লাগত, তবু তিনি নিজে থেকে কাউকে বলতেন না, বরং সাধ্যমত বাধাই দিতেন। কিন্তু, আজ চন্দ্রাবলীর পদসেবা পেয়ে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল তাঁর—পা টেপারও যে ভালোমন্দ আছে সেটা আজ বুঝতে পারলেন। তার সেবায় সমস্ত স্নায়ু যেন আরামে শিথিল হয়ে আসে।

বাবাজীমশাই মৃদু মন্তব্য করলেন, 'তা মাতাজী পা টেপে ভালো—কী বলেন বাবা? ঐ জন্যেই তো আরও—রাধারানী যে কী মায়ায় জড়িয়ে ফেললেন!'

·

সে রাত্রিটা ওদের সাধুবাবার দাওয়াতেই কাটল। পরের দিন তিনি নিজে গিয়ে কুণ্ডুবাবুদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। স্থির হ'ল যে, ঠাকুরবাড়ি থেকে একবেলার মত প্রসাদ দু'জনকে দেওয়া হবে সাত দিন। আর একবেলার ব্যবস্থা করতে হবে ওদের ভিক্ষে ক'রে। অবশ্য তাতে বাবাজীমশাই দমলেন না, বললেন, 'তা হোক্ না বাবা কন্ট্রোলের আমল, তা ব'লে দুটো প্রাণী কি আর না খেয়ে মরব? সে ঠিক রাধারানী জুটিয়ে দেবেন।'

ফলে, এই দু'টি মানুষ বেশ জাঁকিয়েই বসলেন সাধুজীর আশ্রমে। কুণ্ডুবাবুদের মন্দির-সংলগ্ন যে ভাঙ্গা অতিথিশালা ছিল সেখানে যে একেবারে থাকা চলত না তা নয়, কিন্তু সাধুবাবা মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারলেন না কিছুতেই। ওরা দাওয়াতেই থাকে, আর উঠানে রেঁধে খায়, এইভাবেই চলে ওদের।

কিন্তু, প্রথমটা ওদের সাহচর্যে একটা নেশা লাগলেও সাধুজী বুঝতে পারলেন দু'দিনেই যে, কাজটা তিনি ভালো করেন নি। নির্জন শ্মশানে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, দিনরাত কলরব তাঁর সহ্য হয় না। বাবাজীর অবিশ্রান্ত বকুনি যদি-বা সয়, ওদের আপসে যে অবিরাম কলহ চলে সেটা সাধুজীর স্নায়ু সইতে পারে না। বিশেষত পূজার সময়। সাধুজী ভোরেই উঠতেন, কিন্তু চন্দ্রাবলী আর বাবাজীমশাই আরও ভোরে ওঠেন। ফলে, তাঁর পূজা-ধ্যানের সময়টুকুও

শান্তি পান না। শেষ পর্যন্ত ঘর ছেড়ে সরস্বতীর ধারে গিয়ে বসতে শুরু করলেন।

অথচ, এর যে কোনো প্রয়োজন নেই তা সাধুবাবা ভালো ক'রেই জানেন। 'যাও' বললেই ওরা চ'লে যাবে। ওদের কোনো জোর নেই—জোর ক'রে থাকবেও না এটা ঠিক। তবু সাধুজীরই যেন সঙ্কোচে বাধে।

কিন্তু, শুধুই কি সঙ্কোচ ?

এ প্রশ্নও নিজেকে করেন বৈকি মধ্যে মধ্যে। চন্দ্রাবলী এসে তাঁর আশ্রমের শ্রী ফিরিয়েছে। ঘর-দোর নিকোনো ঝক্‌ঝক্ করে আজকাল। রান্নার জায়গাটি এত পরিচ্ছন্ন থাকে যে, সাধুজী খুশী না হয়ে পারেন না। জিনিসপত্র সব নতুন ক'রে ঝাড়ামোছা সাজানো হয়েছে। তাঁর খড়ের ওপরে হরিণের ছাল পাতা বিছানাটাই এত আরামদায়ক হয়ে উঠেছে যে, সেখানে শুলে আজকাল যেন সহজে ঘুম আসতে চায় না। রান্না অবশ্য তিনি রোজ করেন না, কিন্তু যেদিন করেন সেদিন আর আগের মত তাঁকে বিব্রত হ'তে হয় না। উনান ধরাবার কাঠ-কুটো থেকে শুরু ক'রে কোটা-কুট্‌নো, ধোয়া চাল পর্যন্ত সব হাতের কাছে পান। তারপরের কাজগুলো, অর্থাৎ রান্নার স্থান পরিষ্কার করা বা বাসনমাজা, তার জন্যও ভাবতে হয় না। এ আরাম দু'দিনের, চন্দ্রাবলী চ'লে গেলে আবার তাঁকে পুনর্মূষিক হ'তে হবে—এ সবই সাধুজী জানেন, তবু এই স্বাচ্ছন্দ্যের, এই সেবার কেমন একটা নেশা লাগে যেন, জোর ক'রে এটা বন্ধ করতে পারেন না।

অনুযোগও করেন অবশ্য মধ্যে মধ্যে; হয়তো বলেন, 'চন্দ্রাবলী এসব বা অভ্যেস ধরানো কি ঠিক ? সন্ন্যাসী মানুষ চিরকাল শ্মশানেই কাটাতে হবে—শু শুধু দু'দিনের জন্য—'

চন্দ্রাবলী সে সব অনুযোগ গায়ে মাখে না। বলে, 'হোক্ না ঠাকুর দু'দিন। আপনি সাধু, আপনার তো সব অবস্থাই সমান। আপনি আর কিসের অভাব বোধ করবেন বলুন! মাঝখান থেকে আমার যদি একটু পুণ্যি হয় তো বাধা দেন কেন?'

কিন্তু, শুধু চন্দ্রাবলীর সেবাই নয়—বাবাজীমশাইয়ের গল্পেরও কেমন একটা জাদু আছে, নিজের কাজ সারা হ'লেই মন তাঁর সঙ্গ চায়। এতদিন কোথাও যান নি, তার অভাববোধও ছিল না মনে, কিন্তু এখন যেন বাবাজীর গল্পের পিছু পিছু মন সব ফেলে রেখে ছুটে চ'লে যেতে চায়। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তীর্থগুলি যেন বায়স্কোপের ছবির মত দ্রুত স'রে যেতে থাকে, আর মন হয়ে ওঠে উতলা—কিছুতে, কোনোমতেই এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা থাকতে চায় না।

বাবাজী হয়তো বলেন, 'যদি কখনও কেদারবদরী যান তো দেখবেন যে, নদীর আওয়াজ কী! অলকনন্দার গর্জনে একদিন ঘুমই হ'ল না সারারাত। তবে তা-ও বলি বাবা, যা দেখেছি জীবন সার্থক হয়ে গেছে। হিমালয় পাহাড় যে দেখলে না তার জীবনই বৃথা। হরিদ্বার থেকেই শুরু হ'ল বটে, তবে যত এগোবেন ততই অবাক্ হয়ে যাবেন।'

আবার কখনও বলেন, 'অনেকে বাবা রামেশ্বর দেখেই ফিরে আসে, কিন্তু আমি বলি, যে কন্যাকুমারী দর্শন করলে না, তার তো তীর্থ করাই মিথ্যে হ'ল। সে কী স্থান—চোখ জুড়িয়ে যায়, ইচ্ছে করে না যে আর ফিরি।'

কিংবা—'যে যতই বলুক বাবা, হোটেল তো বলি জগন্নাথের। এখন কী হয়েছে জানি না, আগে চারপয়সার অন্ন-পেসাদ, একপয়সার ডাল আর একপয়সার তরকারী কিনলেই একটা লোকের পেট-ভরা হয়ে যেত। আর সে কী সোয়াদ বাবা, কী বলব! তেল নেই, লঙ্কা নেই, কোনো মশলার বালাই নেই, শুধু সেদ্ধ চাল, তা-ই যেন আজও জিভে লেগে আছে।'

এমনি ক'রে দ্রুতবেগে বাবাজী এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে চ'লে যান, হাজার হাজার মাইল পথ যেন চক্ষের নিমিষে লাফিয়ে পার হন। তাঁর কল্পনার সেই উদ্দাম দ্রুত বেগে সাধুবাবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, সব সময়ে যেন তাঁর নাগাল ধরতে পারেন না। তবু বারবার শুনে কোথায় কী দ্রষ্টব্য আছে, তাঁরও মুখস্থ হয়ে যায়। অযোধ্যা কি বৃন্দাবনের নাম হ'লেই নিজের অজ্ঞাতসারে সাধুবাবা বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন, কোথাও বানর ব'সে আছে কি না।

সুতরাং, ওঁদের অবস্থানটা যখন সাতদিন থেকে কুড়ি-একুশ দিনে এসে পৌঁছল, তখনও সাধুজী ওদের চ'লে যাবার কথাটা বলতে পারলেন না। শেষে বললেন একদিন ওঁরা নিজে থেকেই—সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন পরে কোথা থেকে একটু গাঁজা সংগ্রহ ক'রে তরিবতের সঙ্গে সাজাতে সাজাতে বাবাজী বললেন, 'অনেকদিন আপনার আশ্রয়ে কাটল বাবা, এবার তো পথ দেখতে হয়!'

সাধুবাবা যেন চমকে উঠলেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'সেকি, এরই মধ্যে যাবে?'

'আর এরই মধ্যে কী বাবা, বেরিয়েছি কি আজ? ভেবেছিলুম দোলের মধ্যেই ফিরব, তা তো হ'ল না। ফাল্গুন মাস প'ড়েই গেল—এখন কতদিনে ফিরতে পারব, তারও ঠিক নেই। গাড়িভাড়াটা যদি এখান থেকে তুলে নিতে

পারি সেই চেষ্টায় ছিলুম—তা গোটা পনেরোর বেশী কিছুতে তুলতে পারলুম না। যাই হোক—কাশী পর্যন্ত তো যাই, তারপর ওখানে কিছু যোগাড় করতে পারি ভালোই, নয়তো এমনিই চ'ড়ে বসব, যা করেন রাধারানী। এক-এক বেটা টিকিট-চেকার থাকে বড় পাজী—মারধোর করে, এই বড় ভয়। নইলে আর কি —এত তীর্থ কি আর সব টিকিট কেটে ঘুরেছি?'

সাধুবাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থেকে বললেন, 'তা দোলের মধ্যে যখন ফিরতে পারলেই না, তখন আরও ক'টা দিন থেকে যাও না—যদি গাড়িভাড়াটা ওঠে।'

'হ্যাঁ—এ যা জায়গা! এই যা উঠেছে—আপনি ছিলেন ব'লে তাই, নইলে কিছুই হ'ত না। তা-বাদে স্থান-ছাড়া বহুদিন, বুঝলেন না, গিরিধারী রয়েছেন। পাশের কুঞ্জের এক বেটা পূজারীকে ব'লে এসেছিলুম বটে, তা সে কী করছে, কে জানে! হয়তো ঠাকুর উপবাসীই থাকছেন। একখানা ঘরে ভাড়াটে আছে, তিন টাকা দেয়, সেই টাকাটাই পূজারীর নেবার কথা, টাকাটা নিয়ে ঘরেই ব'সে থাকছে হয়তো, তার ঠিক কি! সে ভাড়াটেও আবার তেমনি—হয়তো দোর-জানালাই বেচে খাচ্ছে এতদিনে।'

তারপর গোটা দুই বড়গোছের টান দিয়ে কাশতে কাশতে বললেন, 'আমি বলি কি সাধুবাবা, আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে চলুন। মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল সব আমি নিজে ঘুরে দেখিয়ে দেব। ওখান থেকে চাই কি এধারে পুষ্কর ওধারে হরিদ্বার অবধি ঘুরে আসতে পারবেন। যদি সুবিধে পাই, মাগী যদি রাজি হয় তো ওকে বৃন্দাবনে রেখে আমিও আর একবার আপনার সঙ্গে ভেসে পড়ব।'

খুবই লোভনীয় প্রস্তাব, কথাটা তিনি নিজেও যে দু'-একবার চিন্তা করেন নি তা নয়, তবু কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়েই বললেন, 'তা কি আর হয়। যা হোক আস্তানা একটা গেড়ে বসেছি, এরা ঘরদোরও তুলে দিয়েছে এখন ছ'-মাস এক বছর বাইরে থাকলে এসব নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে কেউ নেই যে, শ্মশানে এসে আমার ঘরদোর আগলাবে। তাছাড়া আমারও তো ঠাকুর রয়েছেন! তাঁর কী করব?'

'ঠাকুর! ও ঝুলির মধ্যে ক'রে নিয়ে যাবেন—তাতে কী হয়েছে?......আর ঘরদোর না হয় গেলই—যারা ক'রে দিয়েছে, তারাই আবার করবে।'

'হ্যাঁ—তাই কি সম্ভব! এই বাজারে কে কত দিতে পারে? আগেকার তৈরি তাই, এখন হ'লে আর মোটেই হ'ত না।'

'তা না হয় নাই বা হ'ল বাবা। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার যে এক জায়গাতেই বরাবর মাথা গুঁজে থাকতে হবে তার ঠিক কি? তাহ'লে তো ঘরকন্না পাতলেই পারতেন।······আপনি যেখানেই যাবেন, সেখানেই আশ্রয় মিলবে আপনার। না হয় বৃন্দাবনেই থেকে যাবেন। বৃন্দাবন ভালো না লাগে যে কোনো তীর্থে গিয়ে বাস করবেন। আপনার আবার থাকার ভাবনা কী?'

তা বটে! মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েন সাধুজী। তাঁর অন্তত ঘরকন্নার মায়া শোভা পায় না। বরং, এক জায়গায় এমনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করাই হয়তো অন্যায়, এখানকার লোকের ওপর বোধ হয় একটু অন্যায় জুলুমই হচ্ছে।

তবু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সাধুজী কৈফিয়ত একটা দিলেন, 'স্থানটা নির্জন, মন স্থির ক'রে সাধনভজন করা যায়। তীর্থস্থানে বড় কোলাহল, বড় অনাচার। ওসব জায়গায় এমনিই এত সাধু আছে যে, সকলকেই লোকে ভণ্ড ভেখধারী সন্ন্যাসী মনে করে। মনে করে শুধু পেট্-কা-ওয়াস্তে—'

ততক্ষণে গঞ্জিকা-প্রসাদাৎ বাবাজীমশাই রীতিমত তেতে উঠেছেন। হাত-পা নেড়ে বললেন, 'বেশ তো, দরকার কি আপনার তীর্থে গোলমালের মধ্যে থাকবার। ওখানে কি আর নির্জন স্থান নেই? ধরুন না কেন, গোকুলেই যদি গিয়ে বাস করেন—কিংবা হিমালয়ের ওপর কোথাও। তীর্থগুলো ঘুরে নিন আগে, তারপর যেখানে মন যাবে সেখানেই গিয়ে থাকবেন। চলুন, চলুন—আর দ্বি'মত করবেন না।'

ইতিমধ্যে কাজ সেরে চন্দ্রাবলীও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেও কণ্ঠস্বরে অনুনয়ের সুর এনে বললে, 'তাই চলুন ঠাকুরমশাই—তবু দু'দিন বেশী সেবা করতে পারব আপনার। আমরা সঙ্গে থাকলে যেখানেই যান না কেন, সেবা-শুশ্রূষার অভাব হবে না।'

'দেখি একটু ভেবে—' সাধুজী শুষ্ককণ্ঠে মন্তব্য ক'রেই চুপ ক'রে যান।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পায়ে তেল মালিশ করতে এসে চন্দ্রাবলী আবার সেই কথাই তুললে। তারপর যেন ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই বললে, 'কী ভেবে দেখলেন ঠাকুরমশাই?'

সাধুজী কী যেন ভাবছিলেন, এই প্রশ্নে চমকে উঠে বললেন, 'না চন্দ্রাবলী, এখনও কিছু ভেবে দেখি নি—'

'চলুন—ঠাকুরমশাই, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি—'। হঠাৎ কণ্ঠে যেন

একটা আকুলতা ফুটে ওঠে চন্দ্রাবলীর। সাধুজী বিস্মিত হয়ে তাকান ওর মুখের দিকে। প্রদীপের ক্ষীণ আলো, তবু তাইতেই ওর মুখের ভাব দেখে তিনি বোঝেন যে, এ অনুরোধ ও অনুনয় আন্তরিক।

'কেন বল তো? মিছিমিছি আমাকে টানতে চাইছ কেন?'

কিন্তু, ততক্ষণে চন্দ্রাবলী বোধ হয় লজ্জিত হয়ে পড়েছে। সে মাথা নিচু ক'রে বললে, 'না, কিছু নয়। এমনিই—আপনি তো দেখেন নি কিছু—বেশ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। আজানা জায়গায় আমরা সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হ'ত।'

চন্দ্রাবলী আর কিছু বললে না। অন্য দিনের চেয়ে বরং কিছু কম সময়েই সে পদসেবার কাজ সেরে প্রদীপ নিভিয়ে সাধুজীর ঘরের আগড় বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু, সাধুজীর ঘুম এল না কিছুতেই। ফাল্গুনের প্রথম, তবু এরই মধ্যে হাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছে। সে হাওয়াতে শীতের তন্দ্রা মাখানো নেই—বসন্তের উত্তেজনাই আছে, এমনিতেই ঘুম আসা শক্ত। সাধুজীও জেগে বহুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলেন। শুক্লপক্ষের গোড়ার দিক, চাঁদ এরই মধ্যে অস্তাচলে চলেছেন, ঘরের সামান্য একটুখানি জানালা দিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সাধুজীর মাথা নানা চিন্তাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল।......

এসব কিছুই জানতেন না তিনি, কোনোদিন ভেবে দেখবার প্রয়োজন হবে তা-ও মনে করেন নি। বাল্যকালে ঘর-ছাড়া, সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে মানুষ। সাধনভজনের প্রতি কোনো উগ্র আকর্ষণ ছিল না। ওটাকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে, অভ্যাস হিসাবে সহজভাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু, তাই ব'লে গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধেও কোনো কৌতূহল, কোনো ক্ষোভ মনের মধ্যে বহন করেন নি তিনি। জীবন-ধারণের স্থূল প্রয়োজনগুলো মানতেন, সে সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু মানুষের জীবনপ্রবাহ নিয়ে মাথা ঘামান নি কখনও। ও-জীবন তাঁর জন্য নয়—এই জেনেই নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত ছিলেন। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এ সংস্কারটা আপনা থেকেই চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু, হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে কোথায়। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের আরামটা মন আজ চাইতে শিখেছে, সেটা পেলে তিনি খুশী হন, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এমন কি—কথাটা তিনি এইমাত্র বুঝতে পারলেন—তাঁর জন্য কেউ চিন্তা করে, তাঁর সাহচর্য কামনা করে এমন একজনও আছে—এটা জানতে পারলেও তিনি খুশী হন! একটি মানুষের মানস-প্রদীপে তাঁর চিন্তাই শিখার মত জ্বলছে—কল্পনা করতেও ভালো লাগে যেন।

আজ তিনি বুঝতে পারলেন সংসারের আকর্ষণ এত প্রবল কেন—কিসের জন্য মানুষ এমন জড়িয়ে পড়ে।

এর মধ্যে কোনো পাপ নেই—তা তিনি জানেন। তাঁর পক্ষে আর এসব পাপে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়—এ শুধুই সেবা-যত্ন-সাহচর্যের লোভ। আর সত্যিই, অজানা তীর্থের পথে যদি পা বাড়াতেই হয় তো এমন সঙ্গীই প্রয়োজন। এ সুযোগ হয়তো আর না-ও মিলতে পারে। কিন্তু, তবু এই মুহূর্তে কোথায় যেন একটা সঙ্কোচে বাধছে। একটা সচেতনতা, জীবনের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে যার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না, আজ যেন তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন জীবন কেটেছে একটা ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তার গতানুগতিকতা সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন ওঠে নি. মনোবিকলন ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটা জিনিস। অন্যায় তিনি কিছু করেন নি, কিন্তু তা থেকে সতর্ক থাকবারও কারণ ছিল না। তেমন কোনো সুযোগও কোনোদিন আসে নি। সন্ন্যাসী হয়েছিলেন একদিন সহজেই—আজও সাধু আছেন সহজে। জীবনের বৃত্তি হিসাবেই সন্ন্যাস ছিল তাঁর বলতে গেলে, তবু প্রতারণার কোনো প্রশ্ন কোনোদিন ওঠে নি।

কিন্তু, আজ সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। এরই নাম কি মোহ? এ-ই কি অন্যায়কে সঙ্গে ডেকে আনে? এমনি ক'রেই কি প্রকৃতি তাঁর প্রতিশোধ নেন? এইভাবেই কি পদস্খলন হয়?

কে জানে!......

যে ঈশ্বরকে এতদিন যন্ত্রচালিতের মতই, নিয়ম-পালনের জন্য স্মরণ করেছেন সেই ভগবানকে আজ মন দিয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন। মনে হ'ল সন্ন্যাস তিনি যে কারণেই নিন, যেমন ভাবেই নিন—তার একটা দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা যেন থাকে।

বহু রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থেকে সাধুজী স্থির করলেন যে, না—প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে আর নতুন ক'রে মায়ায় জড়াবেন না তিনি। ওদেরই বিদায় ক'রে দেবেন, আর তা কালই।

বাবাজীমশাই কিন্তু সকালে উঠে ধ'রেই নেন যে, সাধুবাবা ওঁদের সঙ্গে যাবেন। কোনো প্রতিবাদই শুনতে প্রস্তুত নন তিনি। বলেন, 'কী বলছেন বাবা, স্বয়ং রাধারানী আপনাকে টেনেছেন—আপনি না বললে চলবে কেন? এ সুযোগ

আর ছাড়বেন না। এ যে তাঁরই যোগাযোগ, তা কি বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা চলুন, বৃন্দাবন-হরিদ্বার অযোধ্যা ক'রেই না হয় ফিরে আসবেন, বড় জোর পুষ্করটা—কত আর সময় লাগবে, না হয় মাস-তিনেকেই লাগুক। আপনার শিষ্য-যজমানরা এই সময়টা ঘরবাড়ি দেখবেন।'

সাধুজী লোভে 'দোলাচল-চিত্ত' অবস্থায় অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চন্দ্রাবলী আজ আর অনুরোধে যোগ দেয় নি, কিন্তু ততক্ষণে নিপুণ-হস্তে সে তার প্রাত্যহিক কাজগুলো ক'রে যাচ্ছে। পূজোর বাসন মাজা হয়ে গেছে, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা সব প্রস্তুত, ঠাকুরের বেদীর সামনে তাঁর আসন পাতা, পূজার সব আয়োজন পরিপাটি ক'রে সাজানো। ওদের গুরুর পট এবং একটি যুগল পায়ের ছাপ সঙ্গে আছে, তারও একটি আসন বাইরের দাওয়াতেই তৈরি হয়ে ছিল ইতিমধ্যে—সেখানেও পূজার আয়োজন শেষ হয়েছে। এইবার সে সাধুজীর রান্নাঘরের সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখতে ব্যস্ত। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তিনি একবার কল্পনা-নেত্রে দেখে নিলেন আগেকার তাঁর অপটু জীবনযাত্রার ছবিটা—এরা চ'লে গেলে আবার সেই অবস্থাতেই ফিরে যেতে হবে। প্রত্যহ নিজের হাতে সব গুছিয়ে নেওয়া,—নিঃসঙ্গ, নির্জন জীবনযাত্রা।

হঠাৎ যেন কী একটা প্রতিজ্ঞায় মন স্থির ক'রে ফেললেন তিনি। বাবাজী-মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা চলুন, ঘুরেই আসা যাক্—রাধারানী টেনেছেন মনে হচ্ছে।'

উদ্যোগ-আয়োজন সামান্যই, একবেলাতেই তা হয়ে যায়। শিষ্য-শিষ্যাদের ডেকে ঘরের চাবির ব্যবস্থা করা হ'ল। স্থির হয়েছে, সন্ধ্যার ট্রেনে এখান থেকে গিয়ে হাওড়া থেকে রাত সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জার ধরা হবে। এখান থেকে কাশী যাওয়া হবে আগে—তারপর বৃন্দাবন। সাধুবাবার হাতে কিছু টাকা ছিল, গাড়ি ভাড়ার আপাতত অভাব হবে না।

কিন্তু, স্টেশনে পৌঁছে আব্‌ছায়া অন্ধকারে ট্রেনের প্রতীক্ষা করতে করতে সাধুজীর যেন আবার নতুন ক'রে চমক ভাঙল। সত্যই কি তীর্থের টানে তিনি চলেছেন? ভগবানের দর্শনই কি আজকের এই যাত্রার উদ্দেশ্য? না, আর কিছু? যে সংসারকে তিনি একদিন পরিচয়ের আগেই ত্যাগ করেছিলেন, যে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসে তাঁর কোনো অধিকার নেই—সেই সংসার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের লোভই কি আজ জীবনসায়াহ্নে তাঁকে মূল ছিঁড়ে নতুন একটা অভিজ্ঞতা, নতুনতর পরিবেশের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না?

সাধুজী যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি যাবেন শুনে চন্দ্রাবলীর মুখ যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এটা তাঁর চোখ এড়ায় নি। সে যে নিপুণ দ্রুত-হস্তে তাঁর ঝুলি সাজিয়ে দিয়েছে, তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন।···সন্ন্যাস সম্বন্ধে এতদিন কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাঁর, গুরুর উপদেশের অর্ধেক অর্থই এতদিন উপলব্ধি করতে পারেন নি—কিন্তু আজ আব্ছা হ'লেও কতক কতক তা মনে পড়ছে এবং তার অর্থ বুঝতে পারছেন। সম্পর্ক যাই হোক, কোনো মায়াতে জড়িয়ে পড়াই তাঁর উচিত নয়।

ট্রেন দেখা দিয়েছে দূরে। প্ল্যাটফর্মে ব্যস্ততার অন্ত নেই। সাধুজী কিন্তু তখনও যেন ধ্যানমগ্ন। চন্দ্রাবলী তাঁর পা ছুঁয়ে বললে, 'উঠুন ঠাকুরমশাই, গাড়ি এসে পড়েছে যে!' তারপর তিনি চোখ চাইতে হেসে বললে, 'এখন থেকে আমিই আপনার অভিভাবক তো, দেখাশোনা আমাকেই করতে হবে।'

ট্রেন এলে বাবাজীমশাই ছুটোছুটি ক'রে আগেই উঠে পড়লেন। চন্দ্রাবলীও উঠে সাধুজীর ঝুলির জন্যে হাত বাড়িয়ে বললে, 'দিন দিন, ওটা আমার হাতে দিয়ে উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে যে!'

কিন্তু, সাধুজীর কোনো উদ্বেগ দেখা গেল না। তিনি একটু ম্লান হেসে বললেন, 'না চন্দ্রাবলী, এ-যাত্রা আর আমার যাওয়া হ'ল না। রাধারানী বোধ হয় ঠিক টানেন নি এখনও—তোমরাই যাও।'

ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওরা মূঢ়ের মত চেয়ে মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রইল। সাধুজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার গ্রামের পথ ধরলেন।

সরস্বতীর শীর্ণ খালের ধার দিয়ে ফিরতে ফিরতে সাধুজীর সবচেয়ে যে ভাবটা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল সেটা হচ্ছে নিরতিশয় আত্মতৃপ্তি। দেশভ্রমণ তাঁর হ'ল না, তীর্থদর্শনের সাধ অপূর্ণ রইল—চন্দ্রাবলীর অতন্দ্র এবং অক্লান্ত সেবা থেকেও বঞ্চিত হলেন—এ সবই সত্য, এর জন্য বেদনা অনুভব করছেন না এমনও নয়—কিন্তু, সে বেদনার চেয়েও এই মুহূর্তে তাঁর আত্মপ্রসাদই বড় হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসের আসল কথাটা এতদিন পরে তিনি বুঝেছেন, অর্থ না বুঝেই একদিন যে জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিলেন তার লক্ষ্য এতদিন পরে তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছে—আর তিনি কোনো প্রলোভনেই পা বাড়াবেন না। কোনো-রকম প্রস্তুতি ছিল না, কোনো কৃচ্ছ্রসাধন বা বিরাট তপস্যার ঐতিহ্য থাকা সম্ভব নয়—তবু যে এত বড় প্রলোভন কাটিয়ে উঠেছেন এজন্য নিজের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।

সরস্বতীর পুলের ওপর উঠে নিজের আশ্রমের দিকে চেয়ে দেখলেন। শান্ত স্তব্ধ কুটীরখানি নির্জন শ্মশানের প্রান্তে যেন মূর্তিমতী শান্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। সে দিকে তাকিয়ে মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। এই ভালো তাঁর—এই ভালো। বাইরের হাওয়া এসে লেগেছিল ক্ষণকালের জন্য; কিন্তু, সে হাওয়া বয়ে চ'লে গিয়েছে। এই চিরকালের স্তব্ধতাই থাক তাঁর সারা জীবন ভ'রে। তিনি রাস্তা ছেড়ে শ্মশান পেরিয়েই চ'লে এলেন দ্রুতগতিতে, বাগানের বেড়ার সামনে এসে একেবারে দাঁড়ালেন। জ্যোৎস্নায় আশ্রমের উঠানটি ভ'রে গিয়েছে, সে আলোয় আজ যেন নতুন ক'রে সব সুন্দর লাগল। সামান্য কুটীর—তবু এর প্রতি অংশটি তাঁর প্রিয়। ঐ যে মাচার ওপর লাউডগাগুলো লতিয়ে আছে ওর মসৃণ পাতাগুলো যেন তাঁকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সন্ধ্যামণি ফুলের ছোট্ট ডালটাও যেন মাথা দুলিয়ে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে, এসেছ।'

শান্তি আর আনন্দ। নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রারও একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে বৈকি। পুরাতন পরিবেশের মায়াই বা কম কি!

কিন্তু, বেড়ার আগড়টা খুলে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ সাধুজী আর একবার থমকে দাঁড়ালেন। একি, একটু আগেই যে সন্ন্যাসের আসল অর্থটা বুঝেছেন ব'লে মনে মনে বাহাদুরি নিচ্ছিলেন, সামান্যতম বন্ধনের প্রলোভনও কাটিয়ে উঠেছেন ব'লে আত্মতৃপ্তির অন্ত ছিল না—সে যে এত অর্থহীন তা তো তখন বোঝেন নি। আশ্রম এবং আশ্রয়ের মায়াই বা কম কি? চন্দ্রাবলীর সাহচর্য হারাবার বেদনা তিনি যে অত সহজে ভুলতে পারলেন আসলে সেটার কারণ তাঁর মনের বৈরাগ্য নয়, এই নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়ই। এই মায়াই তাঁকে দুর্বার বেগে টানছিল ব'লে তিনি এত সহজে ফিরে আসতে পেরেছেন।

অর্থাৎ, এখানে তাঁর বৃহত্তর বন্ধন।

বহুক্ষণ, প্রায় আধ ঘণ্টারও ওপর সাধুজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপর কাঁধের ঝুলিটা বেড়ার ওপর দিয়ে উঠানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে আবার তিনি সরস্বতীর পুল পেরিয়ে ঘন বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেবার বিহিটার কাছে যে পাঞ্জাব-মেল-দুর্ঘটনা হয়েছিল তার বিবরণ আপনারা কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন। এমন আরও কত দুর্ঘটনাই কত জায়গায় ঘটেছে—পাঞ্জাব-এক্সপ্রেস, পাঞ্জাব-মেল, বোম্বে-মেল, দেরাদুন-এক্সপ্রেস, দেরাদুন-দিল্লী-এক্সপ্রেস—এমন কি মাজদিয়াতে আমাদের নর্থবেঙ্গল-এক্সপ্রেস পর্যন্ত। সরকারী খবর বেরোয় এত মরেছে, এত আধমরা—বেসরকারী খবর আসে আরও ঢের বেশী, আর প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সাতমুখ ঘুরে চুপিচুপি কানেকানে যে খবর এসে পৌছয় তার অঙ্কের সঙ্গে সরকারী বেসরকারী কোনো খবরই মেলে না। আপনারা সকালবেলা জেলি-মাখানো সেঁকা-রুটির সঙ্গে চা খেতে খেতে অলস ভাবে খবরগুলোয় চোখ বুলোন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সরকারী খবরটা যে আগাগোড়াই ধাপ্পা, ওর চেয়ে ঢের বেশী লোক মরেছে, এ সম্বন্ধে আপনার কাছে যে উড়ো খবরটা এসে পৌছেচে সেইটেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য—এইটে প্রমাণ করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন! এইভাবে চলে দু'-তিন দিন, তারপর নিত্য-চলমানা পৃথিবীর নতুন নতুন রাজনীতিক খবরের বন্যায় এসব তুচ্ছ সংবাদ কোথায় ভেসে চ'লে যায়। কিন্তু, অকারণে, নিজেদের বিনাদোষে, এই যে লোকগুলি মারা গেল তাদের প্রত্যেকটি লোকের স্বতন্ত্র ইতিহাসের এই আকস্মিক পরিসমাপ্তি নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়। যারা মারা গেল তাদের মধ্যে হয়তো সকলেই একেবারে মরে নি, হয়তো তাদের অনেককে সময়ে উদ্ধার করলে, চিকিৎসা করালে বাঁচত —হয়তো বেচারারা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প'ড়ে একবিন্দু জল কিংবা একটুখানি হাওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে, হয়তো বা সেই শেষমুহূর্তেও প্রিয় যে আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসেছে, কিংবা তাদের চেয়েও প্রিয় জীবনের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অসমাপ্ত রেখে চ'লে যেতে হ'ল, সেস ব কথা চিন্তা ক'রে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে বাঁচবার জন্য, আর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার আগেও আশা করেছে যে, তার জীবনের পরিসমাপ্তি অন্তত এমন শোচনীয় ভাবে হবে না। সেই অরণ্য-প্রান্তরে অন্ধকারে অথবা মফঃস্বলের অজ্ঞাত, অক্ষম

হাসপাতালে যে সমস্ত বিপুল সম্ভাবনা অকালে নষ্ট হ'ল, যে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার শিখা অসময়ে নিভ্‌ল তাদের কথা নিয়ে বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাবেন, এমন সময় কৈ আপনাদের ?

হয়তো আমিও মাথা ঘামাতুম না, আপনাদের মত চায়ের পেয়ালার তুফান চা-পানের সঙ্গেই শেষ ক'রে নিজের জীবনের অধিকতর মূল্যবান খুঁটিনাটিতে মনোনিবেশ করতুম ; বড়জোর পরবর্তী ভ্রমণের সময় কথাটা একবার স্মরণ ক'রে মাঝামাঝি কোনো গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা ক'রেই এই সব হতভাগ্যদের জীবনের মূল্যে অর্জন-করা অভিজ্ঞতার মূল্য দিতুম ! আমি যে তা পারি নি, আমার পক্ষে যে অত সহজে ব্যাপারটাকে মন থেকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হয় নি তার কারণ বোধ হয় এই যে, এইরকম একটা দুর্ঘটনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে, প্রহরের পর প্রহর চারদিকে অসহায় মুমূর্ষু-লোকের আর্তনাদ শুনেছে, অথচ নিজে এতটুকু সাহায্য করতে পারে নি কাউকে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে অলোকসাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে, আমরা যেটাকে দুর্ঘটনা আখ্যা দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যাই সেই চরম নিষ্ঠুরতার প্রতিটি বিন্দু অনুভব করেছে নিজের অপরিসীম দৈহিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, এমনি একটি ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভিজ্ঞতার অংশগ্রহণ করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। আজ সেই গল্পই আপনাদের কাছে বলতে বসেছি—আর কিছু না হোক, সময় কাটাবার উপকরণের বৈচিত্র্য হিসাবেও তো কাজে লাগতে পারে ! তবে যাঁরা এই ভূমিকাতেই বীভৎস রসের আভাস পেয়ে নিজেদের অনুভূতি-প্রবণতা প্রমাণ করবার জন্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করবেন তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তাঁরা এ কাহিনী পড়বেন না।

যার কথা বলতে বসেছি, গল্পটা যে তার কাছে শুনি নি বলাই বাহুল্য, কারণ সে আর বেঁচে নেই, তার মৃত্যুর কাহিনীই বলছি। শুনেছি তার সেই বিশেষ দিনের, তার জীবন-দিনান্তের যাত্রাসহচরীর মুখেই। তবে হ্যাঁ, বিনয় আমার পরিচিত বৈকি ! এমন কি তাকে বন্ধু আখ্যা দিলেও অতিশয়োক্তির দায়ে পড়তে হয় না—পরিচয়টা এতই ঘনিষ্ঠ ছিল।

বিনয় আসছিল সাহারানপুর থেকে। নতুন কী একটা কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছিল সাহারানপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে—তারই তদ্বির তদারক করতে তিন দিনের জন্য ওকে সেখানে যেতে হয়েছিল। ফিরে আসবার পথে বাধ্য হয়েই ইণ্টারক্লাসে উঠেছিল, সেকেণ্ডক্লাস বার্থ ছিল না। ফার্স্ট ক্লাসে আসবার মত বড় কাজ ওটা

নয়—অর্থাৎ, এমন কিছু লাভ হবে না।

দীর্ঘ পথ। ভিড় অবশ্য প্রথমটা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু লাক্‌সারে গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল। ঘুমের আশা প্রায় ত্যাগ করতে হ'ল। বিছানা একটা ও কোণে বিছিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সেটা গুটিয়ে গুটিয়ে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছল যে তাতে কোনোমতে একটু ঠেস দিয়ে বসা যায়, শোবার কল্পনা পর্যন্ত অসম্ভব। যাই হোক্—তাতে ওর দুঃখ ছিল না। অল্প বয়স, স্বাস্থ্য ভালো—আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজার সময় তখনও ওর জীবনে আসে নি। তাছাড়া, সঙ্গে ছিল ভালো ভালো বিলিতী থ্রিলার বা গোয়েন্দা-কাহিনী, সময় কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

এমনি ক'রেই সারাদিন কাটল। একেবারে কাশীতে এসে গাড়িটা একটু হাল্কা হ'তে বিনয় ক্লান্তভাবে বিছানাটা আবার বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক আরাম ক'রে শোবার মত জায়গা হয়তো ছিল না, তবু কুড়ি ঘণ্টা ব'সে থাকবার পর এইটুকু স্থানই যথেষ্ট। এতক্ষণ গাড়িতে এতই ভিড় ছিল যে, সহযাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিতেই পারে নি। বিশেষত, ওর সামনের বেঞ্চে একটি মারোয়াড়ী পরিবার ব'সে জলে খাবারে ফলের খোসায় হাতেমাটির মাটিতে স্থানটা এমনই নোংরা ক'রে তুলেছিল যে, বিনয় প্রাণপণে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কিংবা বইয়ের দিকেই চেয়ে বসেছিল। এইবার শুয়ে শুয়ে গাড়ির বাকি যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলে। মজলিশ, অর্থাৎ মাঝারি সাইজের গাড়ি, মধ্যে দরজা—দু'পাশে তিনখানা ক'রে ছ'খানা বেঞ্চি। বিনয়ের ঠিক সামনের বেঞ্চিতেই বসেছিলেন একটি মুসলমান ও একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। ওর বেঞ্চির অর্ধেকটা জোড়া করেছিলেন এক মাদ্রাজী খ্রীষ্টান। একেবারে ওধারের বেঞ্চিতে জন তিনেক হিন্দুস্থানী ছিলেন। এদিক থেকে চোখ বুলিয়ে ও-পাশের সারটায় গিয়েই বিনয়ের দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। সামনাসামনি দুটো বেঞ্চি নিয়ে দু'টি কাবুলীওয়ালা ও একটি পাঞ্জাবী পরিবার—সেদিকে মন দেবার কিছু নেই, কিন্তু এপাশের বেঞ্চিটায় যারা ছিলেন তাঁরা তারই স্বদেশবাসী, মানে বাঙালী। স্বামী আর স্ত্রী, সঙ্গে আর একটি বিবাহিতা তরুণী, হয়তো ভদ্রলোকটির বোন হবেন। এঁরা লক্ষ্ণৌ থেকে উঠেছিলেন দুপুরে, বোধ হয় কলকাতা পর্যন্তই যাবেন। ওঠবার সময় লক্ষ্য করেছিল বটে, কিন্তু তখন এত ভিড় ছিল যে, ভালো ক'রে দেখতে পায় নি। এতক্ষণে দু'টি তিনটি বাঙালীর মুখ দেখে ওর দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। হোক্ অপরিচিত, তবু মনে হ'ল যে আত্মীয়ের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। এত

ক্লান্ত না হ'লে হয়তো উঠে আলাপ শুরু ক'রে দিত, এখন আর ইচ্ছা হ'ল না। শুয়ে শুয়ে, যতক্ষণ না চোখের পাতা একেবারে বুজে এল সেইদিকেই চেয়ে রইল শুধু। ওরা ওকে লক্ষ্য করেন নি, নইলে হয়তো অসভ্য ভাবতেন, নিজেদের মধ্যেই পারিবারিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।······ভদ্রলোকটির বয়স হয়েছে, চল্লিশের কম নয়। সরকারী অফিসে মোটা মাইনের চাকরি করার মত নাদুস-নুদুস চেহারা। গৃহিণীটিও তথৈবচ—মোটা-সোটা শ্যামবর্ণের! রঙীন শাড়ি আর হাল্‌কা গয়না প'রে আধুনিকা সাজবার চেষ্টাটা প্রথমেই নজরে পড়ে। কারণ, ওঁর আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সেটা একেবারেই বেমানান। তরুণী মেয়েটির বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে, অন্তত বিনয়ের তাই মনে হ'ল। বেশ সুশ্রী দেখতে, ভাবভঙ্গির মধ্যে উগ্র অধুনিকতা নেই ব'লেই শিক্ষিতা মনে হয়—কথাবার্তার ধরনে রীতিমত সংস্কৃতির ছাপ।

কী নাম মেয়েটির কে জানে, কোথায় থাকে তাই বা কে জানে! হয়তো বালিগঞ্জেই থাকে, ওর পাড়াতে। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল তাহলে কি একদিনও পথে-ঘাটে দেখা হ'ত না! খুব-সম্ভব লক্ষ্ণৌতেই থাকে, এই প্রথম কলকাতা যাচ্ছে।······অবিবাহিত তরুণ বিনয়ের মন সেই আধো-তন্দ্রা আধো-জাগরণের মধ্যে কত কী কল্পনার জাল বুনে যেতে লাগল। আচ্ছা, কী নাম মানায় ওকে? রেখা? দীপ্তি? লতা? না—না, আজকালকার এই দু' অক্ষরের নামগুলো ওর মোটে ভালো লাগে না। বেশ তো, তিন অক্ষরেই ভাব যাক্ না, মঞ্জুশ্রী? সুপ্রিয়া? ইন্দ্রাণী? দীপালী? অমলা? এর কোনোটাই যেন ওকে মানায় না।···তবু ওরই মধ্যে, অমলা মন্দ নয়। হয়তো আরও ভালো কোনো নাম আছে ওর।······ভাবতে ভাবতে ওর ক্লান্ত-চৈতন্য ঘুমে শিথিল হয়ে আসে। চশমাটা খাপের মধ্যে পুরে ও জুত ক'রে পাশ ফিরে শোয়। ক্ষিদে অবশ্য একটু পেয়েছিল, কিন্তু এখন আর উঠে খাবার কথা ভাবা যায় না—থাক্‌গে, যদি পাটনাতে ঘুম ভাঙে তো দেখা যাবে!

এরপর মোগলসরাই এসেছে ওর তন্দ্রার মধ্যেই—কে উঠেছে আর কে ওঠে নি তা টের পাবার মত ওর অবস্থা নয়। ঘুম ভাঙল একবার মিনিট কতকের জন্য বক্সারে—সেই বাঙালী পরিবারটি অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানেই নেমে গেলেন। কুলি ডাকাডাকিতে ওর তন্দ্রা শিথিল হয়ে এল, একবার উঠে বসলও। মেয়েটির নাম ওর জানাই হবে না কখনও, আর দেখা হবারও সম্ভাবনা রইল না। হয়তো বক্সারেই থাকে ওরা, কে জানে! এমন অদ্ভুত স্টেশনে নামবে, তা কে ভেবে...

......ওর সহযাত্রীদের মধ্যে আর একটিও বাঙালী রইল না—ভাবতেই বিশ্রী লাগল বিনয়ের, কিন্তু কী আর করা যায়। বক্সার থেকে ট্রেন ছাড়বার পরও খানিকটা চুপ ক'রে ব'সে থেকে সে আবার শুয়ে পড়ল। এখানে খোঁজ করলে হয়তো খাবার কিছু মিলত—যাক্ গে, মনে মনে বললে বিনয়। আবার অত হাঙ্গামা কে করে। বরং দানাপুরে দেখা যাবে—

এর পর আর কিছু মনে নেই ওর। শুধু প্রচণ্ড একটা শব্দ, মনে হ'ল কানের কাছে কী একটা প্রলয় ঘটে গেল। আর কতকগুলো আঘাত, পর পর। সে আঘাতে বর্ণনা করা যায় না, ঠিক হয়তো অনুভবও করতে পারে নি। ঘুমের ঘোরে মনে হ'ল ওকে যেন কে কতকগুলো ভারী এবং কোণযুক্ত মালের সঙ্গে একটি বিরাট পিপেতে পুরে ঝাঁকি দিচ্ছে। কোথা থেকে যেন তুলে নিয়ে কোথায় ফেললে, মুহূর্তের মধ্যে আরও একটা কোথায় গিয়ে পড়ল। হাড়-পাঁজরা যেন ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল, চামড়া সমস্ত ছিঁড়ে দড়ির মত পাকিয়ে উঠল। এ সব যেমন আকস্মিক, তেমনই দ্রুত। ব্যাপারটা কী ঘটল ভালো ক'রে বোঝবার আগেই আবার সব যেন শান্ত হয়ে এল। আঘাতের তীব্রতা মুহূর্ত কতক অনুভব করবার পরই সমস্ত চৈতন্য, বোধ করি সেই আঘাতের ফলেই, আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ তা কেউ জানে না—তখন ক'টা তাও জানবার উপায় নেই—বিনয়ের জ্ঞান হ'ল। মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে, বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত ভারী কী একটা চেপে ব'সে রয়েছে, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। পিঠের নিচে লোহার লাইন কিংবা মোটা রড্ বা ঐ রকম কিছু, সমস্ত পিঠটা চড় চড় করছে, ফলে হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা। দুটো পায়েরই হাঁটু থেকে নিচের দিকে কোনো সাড় নেই, শুধু একটা বিশ্রী দপ্-দপানি আর থেকে থেকে কট্ কট্ ক'রে উঠছে, একসঙ্গে অনেকগুলো ফোড়া পাকার মত।

ব্যাপারটা কী চোখ চাইবার পরও কিছুক্ষণ বুঝতে পারলে না বিনয়। ওর কিছু মনে নেই। চারিদিকে অন্ধকার। পাহাড়ের মত ওর ওপর কী যেন স্তূপাকার হয়ে রয়েছে, আকাশ দেখা যাচ্ছে না ভালো ক'রে। ওঃ—এ যন্ত্রণা কিসের এত? সে কোথায়? এখানে কী ক'রে এল? কী করছিল সে?...

হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে। সাহারানপুর গিয়েছিল সেখান থেকে বাড়ি

ফিরছে। সেই যে সুশ্রী মেয়েটি কোথায় যেন নেমে গেল। দিলদারনগরে? না-না, বক্সারে। কিন্তু, এটা কি ট্রেন? না, সে বাড়িই ফিরে এসেছে?

কৈ না তো! চারিদিকে কাদের এত আর্তনাদ, এত গোঙানি কিসের? খুব দূরে, অনেক দূরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ, যেন কারা কথাও বলছে। ওর ঘাড়ের ওপর এগুলো কী এত? ঐ তো একটা ফাঁক দিয়ে আকাশও একফালি দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের তারাভরা স্বচ্ছ আকাশ।

ঘাড় ঘুরিয়ে ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করলে বিনয়, পারলে না। ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। চেষ্টা করাও অসম্ভব। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে একটুখানি নাড়তে গেলেও। তাছাড়া, এদিকে কী একটা গোঁজামত বেরিয়ে আছে, মুখ ফেরাতে গেলে ওরই চোখে লাগবে।

—তবে কি—

অকস্মাৎ দারুণ একটা সংশয়ে ওর মন ভ'রে উঠল,—তবে কি দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছু একটা? ট্রেন প'ড়ে গেছে, কিংবা সংঘর্ষ হয়েছে, কিংবা ঐরকম একটা কিছু? যে ট্রেনখানায় ও ছিল, বোধ হয় পাঞ্জাব-মেল—সেই গাড়িটার ওপর দিয়েই দুর্ঘটনা ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত? কিন্তু, তা কী ক'রে হবে। বিশেষ ক'রে বিনয় যে ট্রেনে উঠল—সেইটেই এমন ক'রে ভাঙবে! এ যে অবিশ্বাস্য। দুর্ঘটনার কথা সে বিস্তর পড়েছে বটে কাগজে, তাই ব'লে সত্যি-সত্যি ওরই জীবনে সেই অভিজ্ঞতা হবে?

বিনয়ের আহত, অসুস্থ মস্তিষ্ক কিছুতেই যেন সম্ভাবনাটা মেনে নিতে পারে না। কেবলই মনে হয় ওর—তা কেমন ক'রে হবে, কেন হবে!

কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সেই কথাটাই বিশ্বাস করতে হয়। চারদিকের গোঙানির শব্দ, আহতদের আর্তনাদ ছাড়া আর কী-ই বা হ'তে পারে? ওর এই অসহনীয় দৈহিক যন্ত্রণারও আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, ওর দেহের ওপর পাহাড়ের মত ঐগুলোই বা কী? গাড়িভাঙা কাঠ আর লোহার স্তূপ ব'লেই তো মনে হয়!

কথাটা যতক্ষণ ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি ততক্ষণ ওর দৈহিক যন্ত্রণাটাই শুধু তীব্র ছিল। মন তখনও অবসন্ন হয়ে পড়ে নি। এখন ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার না হ'লেও ঝাপ্‌সা ভাবে ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্নায়ুকেন্দ্র থেকে একটা অবশ শৈথিল্য ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কপালে ঘাম ছিলই, এখন বড় বড় ধারায় তা গড়িয়ে পড়তে লাগল, সমস্ত অনুভূতিটা যেন কী

একটা আশঙ্কায় ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

কিন্তু, দেহের এ যন্ত্রণাও যে সহ্য করা যায় না আর! উঃ! হাত দুটো যদি সে কোনোমতে টেনে বার করতে পারত, যদি নাড়তে পারত, তা হ'লেও হয়তো কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু, হাত দু'খানাও যে ভারী পদার্থ-গুলোর নিচে চাপা প'ড়ে আছে। তাছাড়া, আর একটা ভয়ও চুপিচুপি ওর মনের মধ্যে উঁকি মারতে শুরু করেছে তখন, হাত-দুটো ঠিক আছে তো! বাঁ হাতে ভয়াবহ রকমের একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বটে, কিন্তু ডানহাতটার যেন কোনো সাড়ই নেই। হাতটা আছে কি না তাই বা কে জানে! তবে কি—

ভয়ে, দুঃখে, যন্ত্রণায় ও চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু পারলে না। উঃ—বুকের এই ভারটা একটুখানি না নড়ালে তো আর নিশ্বাস নিতেও পারছে না। পিঠের নিচে থেকে এটা কি কোনোরকমে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়? হাওয়া কি কোথাও নেই? হাঁ ক'রে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করে ও বেশী ক'রে—কিন্তু, শুকনো গলায় হাওয়া লেগে ছুঁচ বেঁধার মত যন্ত্রণা হয়। জল, একটুখানি জল পেলেও বোধ হয় যন্ত্রণা কমত খানিকটা। এমন কি কপালের ঐ ঘামের ফোঁটাগুলোকেও যদি কোনোরকমে টেনে মুখের মধ্যে ফেলা যেত! শুকনো জিভটা সে আরও শুকনো ঠোঁটের ওপর বারকতক বোলাল, কিন্তু ওপরের ঠোঁটের দু'তিন বিন্দু লবণাক্ত ঘাম ছাড়া এতটুকু সরস কিছু মিলল না। জিভও ভালো ক'রে নাড়তে পারছেনা যেন, সেটুকু পরিশ্রম করার ক্ষমতাও নেই।

আরও খানিকটা পরে কানের খুব কাছে দীর্ঘনিশ্বাস এবং অস্ফুট একটা আর্তনাদের শব্দ শুনে বিনয় চমকে উঠল। অনেকক্ষণ ধ'রেই ওর বাঁ দিকের গালের ওপর গরম একটা নিশ্বাস এসে লাগছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে ওর খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ। চমকে ওঠবার পর কথাটা মনে হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হ'ল যে, ওরই কোনো সহযাত্রী মানুষ হবে—ওর মতই হতভাগ্য।

কথা কইবার চেষ্টা করলে ও—সেই দু'তিন ফোঁটা লবণাক্ত জলেই জিভের আড়ষ্টতা অনেকটা কমেছিল, কিন্তু গলা তেমনি শুকনো। ফিস্‌ফিস্ ক'রে আওয়াজ বেরোল, 'আপ্ কোন্ হ্যায়?'

সে কথার উত্তর এল না, শুধু গোঙানিটা যেন আরও বাড়ল, আর সেই সঙ্গে কাছেই কোথায় একটা যেন চুড়ির আওয়াজ হ'ল, মিষ্টি চুড়ির আওয়াজ। তবে কি ওর পাশে যে আছে সে মেয়েছেলে? তবে কি সেই মেয়েটি? সেই সুশ্রী বিবাহিতা মেয়েটি? যার নাম রাখতে চেয়েছিল ও অমলা? না না, ওরই যে

ভুল হয়ে যাচ্ছে, তারা যে, বক্সারে না দিলদারনগরে, কোথায় যেন নেমে গেল। না, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, সে নয়।

ও আবারও প্রশ্ন করলে, 'আপনি কে বলুন তো?'

ঠিক পাশেই, বাঁ দিকের কাঁধের ওপর কী একটা ন'ড়ে চ'ড়ে উঠল। ঠিক কানের কাছে গোঙানি শব্দ—আরও বিরক্তিকর, নিজের যন্ত্রণার চেয়েও অসহ্য যেন। কাঁধ ও ঘাড়টা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে আর একবার, কিন্তু পারলে না। মাথাটা ঝুলে আছে নিচের দিকে, সেটাও যদি কেউ সোজা ক'রে দিতে পারত।

হঠাৎ কণ্ঠে শক্তি এনে বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই বললে বিনয়,'চুপ করুন না—কষ্ট তো সবাই পাচ্ছে, আমিও কম পাচ্ছি না, কৈ আপনার মত গ্যাঙাচ্ছি না তো!'

ব'লে ফেলে ও যেন এই অবস্থার মধ্যেই একটু অনুতপ্ত হয়ে উঠল। ওর মনে হ'ল মেয়েটি হয়তো বাঙালীই নয়, হয়তো মেয়েও নয়। চুড়ির শব্দ আর কারও কাছ থেকে এসেছিল।

কিন্তু, গোঙানিটা সত্যি-সত্যিই এইবার থেমে গেল। আর একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি ওর কানের পাশেই, এমন কি বলতে গেলে ওর কানের মধ্যেই, জড়িয়ে জড়িয়ে কে কী বললে। কথাগুলো বোঝা গেল না, তবে বিনয়ের কেমন যেন মনে হ'ল কথাগুলো বাংলাই। সে-ও জবাব দিতে গেল, কিন্তু আগেকার কথা কইবার চেষ্টাতেই ও রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তখন আর গলার আওয়াজ বেরুল না। আর ওর যন্ত্রণাও যেন বেড়ে গিয়েছিল বেশী রকম—সর্বাঙ্গে, ঘাড়ে, পিঠে, বুকে, হাতে, পায়ে অবর্ণনীয় অসহনীয় যন্ত্রণা।

এইবার স্পষ্ট হয়ে এল ওর প্রতিবেশিনীর কথা, 'আমি, আমি উঠতে পারছি না কেন?'

হ্যাঁ, মেয়েছেলেই বটে। অল্পবয়সী বাঙালী তরুণী—তাতে আর সন্দেহ নেই। এ কি সেই অমলা—? না, না, সে তো বক্সারে নেমে গিয়েছে। ও যেন মেয়েটির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, যথাসম্ভব ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলে, 'উঠতে পারছেন না তার কারণ প্রায় মন আষ্টেক ওজনের লোহা আর কাঠ আপনার এবং আমার দেহের ওপর স্তূপাকার হয়ে চাপা দিয়েছে। হয়তো বা আরও বেশী, সেই জন্যেই গা নাড়তে পারছেন না।'

'আ-আপনি তো ঠাকুর-পো নন্!'

'না।' সংক্ষেপে জবাব দেয় বিনয়।

মুহূর্ত-কয়েক চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি আবার প্রশ্ন করে, 'আমাদের কী হয়েছে বলুন তো? আমি ঠিক ভালো বুঝতে পারছি না।'

এটা অসহ্য ন্যাকামি মনে হয় প্রথমটা বিনয়ের, তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কিন্তু, পরেই মনে পড়ে যে, ওরও ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল একটু আগে। তাছাড়া, মেয়েটির গলার সুর বড় মিষ্টি। সে ঢোঁক গেলবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'ট্রেন-এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, বুঝতে পারছেন না? হয় ট্রেনটা অন্য কোনো গাড়ির ওপর গিয়ে পড়েছে, নয় তো ডি-রেল্‌ড্‌ হয়েছে। আমরা সেই গাড়ি থেকেই ছিট্‌কে কোনো মাঠে এসে পড়েছি, আর গাড়ির কামরাগুলো ভেঙ্গেচুরে আমাদের চাপা দিয়েছে।'

'তাহ'লে'—মেয়েটি ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'তাহ'লে এই যে যন্ত্রণা হচ্ছে এটা আঘাত লাগারই যন্ত্রণা? তাহ'লে আমাদের হাত-পা বোধ হয় ভেঙে গিয়েছে না?'

'খুব সম্ভব।'

'ওরা, ওরা আমাদের তুলছে না কেন?' ওর কণ্ঠস্বর যেন আর্ত হয়ে ওঠে।

মেয়েটির ন্যাকামিতে বিনয়ের মনের পৌরুষ যেন ফিরে আসে। ওর প্রতি-মুহূর্তের ভয়াবহ যন্ত্রণা ভুলে ও ব্যঙ্গের সুরেই প্রশ্ন করে, 'ওরাটা কারা?'

সে-প্রশ্নের পরের কথাগুলো মেয়েটি যেন বুঝতে পারে। হয়তো বা বিনয়েরই মত ভয়ে বিহ্বল হয়ে চুপ ক'রে যায়।

বিনয়ও একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আমাদের গাড়ি দানাপুর পেরোয় নি খুব সম্ভব, তাহ'লে আমার ঘুম ভাঙত। তার মানে এ্যাক্‌সিডেণ্টটা হয়েছে রাত বারোটারও আগে। হয়তো কোনো ছোট স্টেশনের কাছে, নয়তো তা-থেকেও দূরে জনবসতির বাইরে কোথাও প'ড়ে আছি আমরা। শব্দ পেয়ে যদি বা দু'-একজন গ্রামবাসী এসে থাকে তো তারা কতটুকুই বা করবে, কাকে আগে বাঁচাবে বলুন। তাছাড়া, যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান কেউ থাকে তো আগে সে যাত্রীদের মালপত্র চুরি করবার চেষ্টাই করবে।... বড় স্টেশনে খবর পৌঁছে রিলিফ-ট্রেন আসতে আসতে সেই কাল সকাল।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে বিনয় ক্লান্ত হয়ে চুপ করল। মাথাটা নিয়েই হয়েছে ওর সবচেয়ে অসুবিধে—কোনোমতে যদি সোজা করতে পারত!

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলে, 'তাহ'লে কি কাল সকাল অবধি এই ভাবে থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ—অবশ্য যদি ততক্ষণ বেঁচে থাকি।'

একটা নরম গাল ওর কাঁধের ওপর কে যেন চেপে ধরলে। বোধ হয় মেয়েটিই। সে যেন শিউরেও উঠল একবার। কে এই মেয়েটি, এ কি সেই অমলা? যাকে অমলা কিংবা আরও ভালো নামে ডাকতে চেয়েছিল সে? ও—না না, তারা যে বক্সারে নেমে গিয়েছে।

মেয়েটি বললে, 'শুনেছি এসব ব্যাপারে অনেক আহত লোককে ওরা মেরে ফেলে, কিংবা জ্যান্ত পুঁতে ফেলে দেয়—এ কি সত্যি!'

এত দুঃখের মধ্যেও বিনয়ের হাসি পেল, বললে, 'কী ক'রে জানব বলুন, এর আগে তো এরকম এ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ি নি! তবে বিচিত্রও নয়—একটা মানুষের কাছে আর একটা মানুষের জীবনের মূল্য কী! যারা চুরি-ডাকাতি করে তারা স্বাক্ষী রাখতে চায় না বোধ হয়, তাই জ্যান্ত মানুষগুলোকেও মেরে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়!'

মেয়েটি আবারও শিউরে উঠল। এবার যেন কান্নার সুরে বললে, 'আপনি বড্ড ভয় দেখাচ্ছেন! ঠাকুর-পো কোথায়? আর মা, আমার শাশুড়ী?'

বিরক্ত হয়ে বিনয় উত্তর দিলে, 'আমি কেমন ক'রে জানব। দোহাই আপনার, একটু চুপ করুন, কানের কাছে বকবেন না।'

সে চুপ ক'রেই রইল, কিন্তু ওর গরম চোখের-জল গড়িয়ে পড়ল বিনয়ের কাঁধে। বিনয়ের যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওপাশে অনেক দূরে কারা এসেছে। যেন দু'-একটা আলোর রেখাও ওর দৃষ্টির সীমানার মধ্যে এসে স'রে-স'রে গেল। ওরা কারা কে জানে! ওদের ডাকতে পারলে হয়তো কাঁধের নিচে একটা বালিশ পাওয়া যেত, আর পিঠের নিচের এই লোহাটা—

না, গলা চড়ে না একটুও। ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডাকলে ও, 'অমলা, ও অমলা, শুনছ?'

ওরা বোধ হয় শুনতে পেলে না। ও কারা কথা কইছে? ওর মা আর দাদা কি? না—না, তাঁরা এখানে কোথায়? এসব কী ভাবছে ও—বোধ হয় গ্রামের লোক আলো নিয়ে এসেছে।

মেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'ওদের একটু চেঁচিয়ে ডাকতে পারেন? একটু জল যদি ওরা দিত অন্তত।'

মেয়েটিও চেষ্টা করলে, কিন্তু তারও গলা বেশী দূর গেল না, তেমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে আওয়াজ বেরোল। সে চুপিচুপি বললে, 'পারছি না চেঁচাতে, এই যে

কাঁধের ওপর কী একটা চেপে রয়েছে, কেমন যেন বুকে লাগছে। নিশ্বাস নিতেও পারছি না ভালো ক'রে। একটু সোজা হ'তেও পারছি না।'

বিনয় প্রশ্ন করলে, 'আপনারও কি দুটো হাত বন্ধ ?'

'না, ডান হাতটা একটু নাড়তে পারছি, কিন্তু কোনো জোর নেই। তাতে এ বোঝা সরাতে পারব না।'

আবার যেন বিনয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ওদের কাঁকুলিয়া রোডের ছোট্ট বাড়িটা। মা ওর পথ চেয়ে বসেছিলেন, দাদা ভাবছিলেন। ওকে দেখে সকলের মুখে হাসি ফুটল। ওর ভাই-পো খোকনটা, কী মিষ্টি ছেলেটা—যেন এক ডেলা মাখন। মা বলছেন, 'কী হবে অত ব্যবসা ক'রে ? না বাপু তোকে আর অত দূরে যেতে দেব না। এই আষাঢ়েই তোর বিয়ে দেব অমলার সঙ্গে।' ও জবাব দিলে, 'অমলা ? তার তো বিয়ে হয়ে গেছে মা।' 'দুর পাগল! বিয়ে কেন হবে ?' 'বা-রে! আমি যে দেখলুম তার সিঁথিতে সিঁদুর, বক্সারে নেমে গেল!'

হঠাৎ শুনলে কানের পাশে মেয়েটি বলছে, 'অমলা কে বলুন তো ? আপনার স্ত্রীর নাম কি ? তিনি কি আপনার সঙ্গে ছিলেন ?'

'অমলা ? কই কেউ তো নেই আমার সঙ্গে! আমার বিয়েই হয় নি।'

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে সে আপনা-আপনিই। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, এখন যেন বুক অবধি শুকিয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতে গেলেই ছুঁচ বেঁধার মত কষ্ট হচ্ছে। আর একবার জিভটা সে ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। আছে, দু'তিন ফোঁটা ঘাম জমেছে আবার।

শুনলে, মেয়েটি আবার প্রশ্ন করছে, 'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'বালিগঞ্জে। আপনি ?'

'আমি ? শ্রীরামপুর। বাপের বাড়ি আমার কাশীতে, শাশুড়ী আর দেওর গিয়েছিলেন কাশীতে তীর্থ করতে, আসবার সময়ে নিয়ে আসছিলেন।'

একটু চুপ ক'রে থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিলে বিনয়, তারপর প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি আমার গাড়িতে ছিলেন ? মনে হচ্ছে যেন—একটি মেয়ে ছিল বটে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু তারা যে বক্সারে নেমে গেল ?'

মেয়েটি জবাব দিলে, 'কৈ আমাদের গাড়িতে তো আর কেউ বাঙালী ছিলেন না। আমরা একটা তিন বেঞ্চির ছোট ইন্টারক্লাস কামরায় ছিলুম।

'তা হ'লে বোধ হয় আমার পাশের গাড়িটাই হবে। হ্যাঁ, ছোট একটা

কামরা ছিল বটে, ঠিক আমারই পাশে।'

ওরা দু'জনেই কান পেতে থাকে। কারা যেন এসেছে, ওখানে একটা ছুটোছুটিও চলেছে। বোধ হয় নিকটের গ্রামবাসীরা আলো আর কোদাল নিয়ে এসে পৌঁছেচে। ওরা কি এদিকে আসবে না? এদিকে যেন ছায়া-মূর্তির মত দুটো একটা লোক নিঃশব্দে আনাগোনা করছে, সম্ভবত যাত্রীদের মালের দিকেই ঝোঁক তাদের। কিন্তু, সবাই দূরে। চেঁচিয়ে ডাকতে পারলে হয়তো শুনতে পেত—সে ক্ষমতা নেই। কাঠ ও লোহার এই স্তূপের নিচে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ওরা, কারুর চোখে পড়াও সম্ভব নয়।

হঠাৎ মেয়েটি যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'আর কতকক্ষণ এমন ক'রে থাকতে হবে! আমি যে আর পারছি না। ওরা কি কেউ আসবে না? ডাকুন না ওদের!'

দূরে, বোধহয় যে বগিগুলো এখনও আস্ত আছে সেখান থেকে, কান্নার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তারা বোধ হয় ভয়ে কাঁদছে। আশ্চর্য, যারা ভালো আছে তারাও কাঁদছে, অর্থাৎ জনসাধারণের সহানুভূতিতে ওদেরও খানিকটা অধিকার আছে, এইটিই বোধ হয় জানাতে চায়! একটা প্রবল, অসহ ক্রোধে বিনয়ের কপালের শিরাগুলো টন্ টন্ করতে থাকে।

মেয়েটি একটু পরেই প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আচ্ছা এ্যাক্সিডেণ্ট কেন হয়? আজকাল তো প্রায়ই হয়।'

'হয় কতকগুলো লোকের নির্বুদ্ধিতায় আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়!' রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলে বিনয়। সব রাগটা ওর গিয়ে পড়ে এই দুষ্কৃতির জন্য দায়ী কর্মচারীদের ওপর—'কোথাও কণ্ট্রোল থেকে ভুল ক'রে সিগ্ন্যাল দেয়, কোথাও ড্রাইভার মদ খেয়ে সিগ্ন্যাল ভুল দেখে, কোথাও বা স্টেশন-মাস্টার লাইন-ক্লিয়ার দিতে গিয়ে গোলমাল ক'রে ফেলে! অথচ, সহজেই এগুলো বন্ধ করা যায়। একটা এ্যাক্সিডেণ্টের জন্য দায়ী যারা এমন কতকগুলো লোককে ধ'রে সোজাসুজি যদি ফাঁসি দেওয়া যায়—কিংবা আরও কঠোর কোনো শাস্তি, সেই মধ্য-যুগে ইউরোপে যেমন কোয়ার্টার করত, চারটে হাত-পা চারটে ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালিয়ে দিত—সেই রকম শাস্তি একবার দিলেই সবাই সতর্ক হয়ে যায়!'

কথা বলতে বলতেই বিনয়ের গলা জড়িয়ে এল, মেয়েটি যে তার বর্ণনার পৈশাচিকতায় শিউরে উঠল তা-ও লক্ষ্য করলে না, চুপিচুপি ব'লে চলল,

'জানো অমলা, আমি কী করব? যদি এ যাত্রা বেঁচে উঠি তো দশ বারোজন মিলে আজকের এই এ্যাক্‌সিডেণ্টের জন্য যারা দায়ী তাদের খুঁজে বার ক'রে লিঞ্চ্ করব। লিঞ্চ্ করা কাকে বলে জানো? জানো না—ঐ যে আমেরিকার সাহেবরা নিগ্রোদের করে? হয় ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলে, নয়তো গরম আল্‌কাতরার মধ্যে ফেলে দেয়—নইলে—'

মধ্যপথেই থেমে যায় সে। মেয়েটি আবারও চুপিচুপি প্রশ্ন করে 'আচ্ছা অমলা কে বলুন না? আমার নাম তো অমলা নয়।'

কিন্তু, সে প্রশ্নের কোনো উত্তর আসে না। বিনয়ের সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে, সে যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। খানিক পরে অকস্মাৎ তীব্র একটা যন্ত্রণায় আবার তার সংবিৎ ফিরে আসে, প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে, 'উঃ!'

ওর সঙ্গিনী সজলকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'আপনার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? আমি যে কিছুই করতে পারছি না।…আচ্ছা, মাথাটা আপনার ঝুলে আছে, না? এক কাজ করুন—না, আপনি তো ঘাড় নাড়তেই পারছেন না। আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি, আমার ডান হাতটা আপনার মাথার কাছেই আছে—এই যে, একটু ঘাড়টা তোলবার চেষ্টা করুন তো।'

সে ডান হাতটা ওর ঘাড়ের নিচে দিয়ে চালিয়ে দিলে। আঃ, এতক্ষণ পরে এই প্রথম একটু আরাম বোধ হ'ল বিনয়ের। কী নরম সুন্দর হাত! ওরই গলার নিচে একটি অপরিচিত তরুণীর হাত (তরুণীই নিশ্চয়, মুখ না দেখতে পেলেও, কণ্ঠস্বরে অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওর)—আগে হ'লে কল্পনা করতেও বিনয়ের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। সে অনেকক্ষণ ধ'রে যেন সেটা অনুভব করতে লাগল। তারপর এক সময়ে আরও চুপিচুপি বললে 'তুমি তো অমলা, না?'

'অমলা কে বলুন তো? বারবার তার নাম করছেন। আমি অমলা নই, আমার নাম ললিতা। কিন্তু, অমলা কে?'

'ও, তুমি অমলা নও? হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তো বক্সারে নেমে গেল। আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, আমি যেন মধ্যে মধ্যে আর কিছু বুঝতে পারছি না।……অমলা সেই যে মেয়েটি, দেখ নি তাকে? লক্ষ্ণৌ থেকে উঠল। সুশ্রী ভদ্র মেয়েটি। তার নাম জানি না, কিন্তু আমার তাকে অমলা ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করছিল—'

হঠাৎ থেমে গেল বিনয়। আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে

ললিতারও, কিন্তু তবু তার যেন প্রাণশক্তি ফিরে আসছে একটু একটু ক'রে। বিনয়ের জন্য ওর দুঃখ হচ্ছে নিজের চেয়ে বেশী। ওর শাশুড়ী আর দেওর, তারা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, তারা বেঁচে নেই একথা ললিতা একবারও কল্পনা করতে পারলে না। বড়জোর তারই মত আহত হয়ে কোথাও প'ড়ে আছে।

এবার কোলাহল যেন কাছে আসছে, মনে হচ্ছে লোকজন অনেকে এসে পড়েছে। আর একটু, আর একটু সহ্য করবার শক্তি দাও ভগবান, আর একটু!

বিনয়ের জ্ঞান বারবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তারপরই যেন সুখের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে ওর—একবার ক'রে জেগে উঠছে তীব্র যন্ত্রণায়। সে আর্তনাদ সহ্য করা যায় না, ললিতার স্নায়ু অবশ হয়ে আসে তা শুনলে।

আবারও বিনয়ের চৈতন্য ফিরে এল। ওর গোঙানি শুনে ললিতা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আপনার গা এমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কেন? আমার গালের নিচেই তো আপনার কাঁধ—যেন বরফের মত!'

'কী জানি', শুক্‌নো জিভটা শুক্‌নো ঠোঁটে বার-দুই বুলোবার চেষ্টা ক'রে বিনয় বললে, 'হয়তো শেষ হয়েই আসছে সব। সত্যি, মধ্যে মধ্যে যেন ঘুমিয়ে পড়ছি, এই ঘুম যদি না ভাঙত আর তো খুশী হতুম। এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'ত না।...সব চেয়ে কষ্ট হচ্ছে তেষ্টায়, জিভটা একটুও যদি ভিজোনো যেত।...আর পারছি না।'

ওর করুণ কণ্ঠস্বরে ললিতার দু'-চোখ ভ'রে জল এল। সে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কী যেন ভাবলে, তার পর সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের মুখখানা তুলে বিনয়ের মুখের কাছে নিয়ে এল। চুপিচুপি বললে, 'আমার মুখ এখনো অত শুকোয় নি—আমার জিভটা একটু চুষে দেখবেন, আপনার যন্ত্রণা কমে কি না?'

মৃত্যুর সামনে প্রত্যক্ষ দাঁড়িয়ে তার সমস্ত দ্বিধা যেন চ'লে গিয়েছিল।

এ অভিজ্ঞতা শুধু অভূতপূর্ব নয়—সমস্ত কল্পনার অতীত। বিনয়ের অবসন্ন ধারণাশক্তি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেও পারলে না হয়তো, শুধু একটা বিচিত্র সুখে ওর সমস্ত অনুভূতি ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। ওর শিরায় শিরায়, আর একবার, বোধ হয় শেষবারের জন্যই, রক্ত চঞ্চল হয়ে নেচে উঠল, উষ্ণতার একটা স্রোত ওর সর্বাঙ্গে আর একবার ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সেই অচিন্তিতপূর্ব অভিজ্ঞতায় ডুবে থাকবার পর বিনয় বললে, 'এ আমি কখনও ভাবতে পারি নি অমলা যে, মরবার আগে এমন সৌভাগ্য আমার

হবে। ভগবান এমন ক'রে আমার জীবন পরিপূর্ণ ক'রে দেবেন।…আর হয়তো দিনের আলো আমি দেখব না, তবু মরবার পর যদি কোনো অনুভূতি মানুষের থাকে তো তোমার এ দয়া আমি ভুলব না।'

তারপর আরও চুপিচুপি, আরও স্খলিত-কণ্ঠে বললে, 'একটু আগেই হিসেব করছিলুম যে, যদি আর নাই বাঁচি, যদি এইভাবেই চ'লে যেতে হয় তো কত সাধ, কত ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে যেতে হবে।……কত স্বপ্নই দেখি আর দেখেছি। যশ, অর্থ, সব চেয়ে বেশী স্বপ্ন দেখেছি ভালোবাসার।…এই তো পেলাম আজ, দু'হাত পুরে।……অমলা, সকাল অবধি কি বাঁচব না, আর একবার তোমার মুখটা দেখে নিতুম—?'

তারপর কী ভেবে সে যেন একবার মাথাটা নাড়তে চেষ্টা করলে, 'ঐ দেখুন আবারও ভুল হচ্ছে। আপনি যে ললিতা। আপনি আরও মিষ্টি, আপনাকে দেখি নি, তবু আপনি আরও সুন্দর!……আশ্চর্য, শরীরের নিচের দিকে যেন আর কোনো যন্ত্রণা নেই, শুধু এই পিঠটা যদি—অমলা, অমলা, তোমার হাতটা দিয়ে আমাকে আরও জড়িয়ে ধরতে পারছ না—আরও?'

শেষের শব্দটা যেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বেরিয়ে এল। তারপরই সে চুপ ক'রে গেল। নিশ্বাস পড়ছে এখনও, কিন্তু দেরিতে, আর তার কী শব্দ। আচ্ছা একেই কি শ্বাস-ওঠা বলে? সমস্ত শরীর যে আবার ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'শুনছেন? শুনছেন, কথা বলুন না, আমার যে বড় ভয় করছে।'

কিন্তু, বিনয় আর বললে না, তখনও না, আর কোনোদিন, কখনই না।

দূরে ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, ললিতা কান পেতে শুনলে। রিলিফ ট্রেনটা বোধ হয় এসে পৌঁছল!

## যৌবন-স্বপ্ন

নভেম্বর মাসের প্রথমেই উপেনদা আসিয়া ধরিলেন তাঁহার লেখা পাঠ্যপুস্তক কয়খানি লইয়া পশ্চিমবঙ্গটি ঘুরিয়া আসিতে হইবে।

কহিলেন, 'ভাই ব'সে তো আছিস, যদি এই উপকারটুকু করিস!…বাজারে যে সব ক্যানভাসার পাওয়া যায় তাদের কাউকে বিশ্বাস নেই। অবিশ্যি, টাকা

আমি দেব—কিন্তু, তুই গেলে যেমন নিশ্চিন্ত হ'তে পারি'—ইত্যাদি—

এ কাজে আমার খ্যাতি ছিল। কিন্তু, আর কখনও পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হেডমাস্টার মহাশয়দের বিরক্ত করিতে যাইব না স্থির করিয়াছিলাম —এটাও ঠিক। তবে টাকার দরকার সে সময়টায় খুবই ছিল, উপেনদা দুই চারিবার বলার পরই রাজি হইয়া গেলাম। মনটা কিন্তু ভার হইয়াই রহিল, আবার সেই স্কুলে স্কুলে ঘোরা, হেডমাস্টার মহাশয়দের ধৈর্যের উপর আবার সেই উৎপীড়ন! মফস্বলের শিক্ষকরা অধিকাংশই ভদ্রলোক। কিন্তু, তবুও ভাবি যে, প্রত্যহ হরেক রকমের ক্যানভাসারের অত্যাচার তাঁহারা সহেন করিয়া!

যাক্—বাহির হইয়া পড়িলাম। এদিকে সবই প্রায় জানা-শুনা, সকলেই স্নেহ করেন। সুতরাং, কাজও অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। প্রথম দিকের খুঁত-খুতে ভাবটা শীঘ্রই চলিয়া গেল, মহা উৎসাহে উপেনদার বই-এর মহিমা কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু, গোল বাধিল মুর্শিদাবাদে গিয়া।

বহরমপুরেই শরীরটা খারাপ হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর কাঁদী গিয়া আহারাদির যথেষ্ট অত্যাচার হইল। কাজেই, কাঁদী হইতে ফিরিয়া যেদিন মুর্শিদাবাদ গেলাম সেদিন উদরাময় আর জ্বর ভালোরকমই দেখা দিয়াছে।

মুর্শিদাবাদে ভালো হোটেল নাই জানিতাম, ভরসা ছিল ডাকবাংলো। ডাক-বাংলোয় পৌঁছিয়া শুনিলাম কোথা হইতে জন চারেক টুরিস্ট-সাহেব আসিয়াছেন, সেখানে স্থান হইবে না!

কিন্তু, তখন আর আমার দাঁড়াইয়া থাকিবার মত অবস্থা নয়। ফিরিয়া আসিয়া সেই উড়িষ্যাবাসী ঠাকুরের হোটেলেই উঠিলাম। হোটেল সেটা নয়—এক কথায় ভাতের দোকান। সকাল ও সন্ধ্যায় বাহিরের লোক খায় ও চলিয়া যায়, সেখানে থাকিবার কোনো ব্যবস্থা নাই। একটি অত্যন্ত অন্ধকার ঘরের একদিকে থাকিত গরুর খড়, অপরদিকে একটি ভাঙা তক্তাপোশ। তাহার মাঝের তক্তা ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া পতনরোধের জন্য নিচে এক থাক সাজানো আছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট উঁচু হয় নাই, ফলে মাঝখানটা চারিপাশ হইতে অনেকখানিই নিচু।

ঠাকুর সেই অদ্বিতীয় তক্তাপোশটিই ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাফ করিয়া দিল। তখন আমার অবশ্য অত দেখার অবস্থা নয়, কোনোরকমে বিছানাটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘরের ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ বা অন্ধকার কিছুতেই তখন

বিচলিত হইবার অবস্থা ছিল না।

পরের দিন কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙিয়া যখন ব্যাপারটা উপলব্ধি করিলাম তখন যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। দৈহিক অবস্থা তখনও খুব খারাপ, সেখান হইতে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং সেখানেই থাকিতে হইবে। অথচ, সেই ঘর—সে যেন নরককুণ্ড! অনেক ভাবিয়া ঠাকুরকে ডাকিলাম।

কহিলাম, 'নরোত্তম, কাছাকাছি এখানে কারুর বাইরের ঘর-টর ভাড়া পাওয়া যাবে না? তাহ'লে দু'-একদিন সেখানেই থাকতুম। খাবার-দাবার অবিশ্যি তুমিই ক'রে দিতে পার, কিন্তু এখানে থাকতে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে।'

নরোত্তম অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'এখানে তো কৈ সেরকম তো মনে পড়ছে না, তবে গাঙ্গুলীমশায়কে একবার জিগ্যেস ক'রে দেখতে পারি; ওদের অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে, দু'-এক টাকা দিলে হয়তো রাজি হ'তে পারে।'

আমি সাগ্রহে কহিলাম, 'দেখনা ঠাকুর, যা চায় আমি দেব।'

নরোত্তম অভয় দিল, ডালটা চাপাইয়াই সে গাঙ্গুলীর খোঁজ করিতে যাইবে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, হে ভগবান, গাঙ্গুলী যেন রাজি হয়। যদিচ গাঙ্গুলীর বাড়ি দেখি নাই, তবুও তাহা যে ঠাকুরের এই গর্তের চেয়ে ভালো হইবে তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আধ ঘণ্টাটাক পরে নরোত্তমের সহিত একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক দেখা দিলেন। একটি ছেঁড়া, কিন্তু পরিষ্কার, উড়ানি গায়ে জড়ানো, পায়ে একজোড়া জরাজীর্ণ খড়ম। অনুমানে বুঝিলাম ইনিই গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলী-মহাশয় ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, 'নরোত্তমের মুখে খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, সেকি কথা, ভদ্রলোকের ছেলে বিদেশে এসে অসুখে পড়েছেন, আমরা থাকতে তাঁর শুশ্রূষা হবে না? চলুন, আমি আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি, নরোত্তম আপনার জিনিসপত্র আর বিছানা পাঠিয়ে দেবে এখন। নরোত্তম ঠাকুর লোক ভালো, এমন ঠাকুর এ অঞ্চলে আর নেই—'

বলিতে বলিতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কহিলেন, 'আমার বাড়ি এই পেছনেই—এইটুকু হেঁটে যেতে পারবেন তো?'

আমি তখন সে গর্ত হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হইলাম। নরোত্তমকে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া কহিলাম, 'ওটা তোমার কাছেই রাখ; এবেলা একটু জলবার্লিই—'

গাঙ্গুলীমশাই বাধা দিয়া কহিলেন, 'বিলক্ষণ, আমি সাবু করতে ব'লে তবে

এখানে এসেছি। আমার কুঁড়েয় যাবেন, আর একটু সাবু-বার্লি যাবে হোটেল থেকে?'

লজ্জিত হইয়া নরোত্তমকে কহিলাম, 'আচ্ছা তবে থাক্। বিছানাপত্র-গুলো পাঠিয়ে দাও, পয়সা আর ফেরত দিতে হবে না।'

চলিতে চলিতে গাঙ্গুলী কহিলেন, 'পারুলকে বাইরে একটা বিছানা ক'রে রাখতে ব'লে এসেছি।...পারুল আমার বড়মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে বাবু। কিন্তু, কষ্ট পাচ্ছি সে কেবল অদৃষ্ট-দোষে।'

কী কষ্ট সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার মত ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না। তবে অনুমান করিতে পারিলাম যে, পাত্র জুটিতেছে না।

মিনিট তিনচারের মধ্যেই গাঙ্গুলী-মহাশয়ের বাড়ি পৌঁছিলাম। বহুকালের জরাজীর্ণ বাড়ি, এককালে অট্টালিকাই ছিল—কিন্তু, সে বোধ হয় সেই মুর্শিদ-কুলীখাঁর আমলে—তাহারই বাহিরের ঘর। ঘরে বালির কাজের চিহ্নমাত্রও নাই, মেঝেও নিজের অস্থি দেখাইতে লজ্জা পায় না, এই অবস্থা। কিন্তু, উহারই মধ্যে ঘরটি যতটা সাফ্ রাখা সম্ভব তাহা রাখা হইয়াছে।

একপাশে জানালার ধারে একটি তক্তাপোশের উপর বিছানা করা রহিয়াছে। তাহার উপকরণ সামান্যই—কিন্তু, সেখানেও একটা জিনিস নজরে পড়ে, তাহা পরিচ্ছন্নতা।

আমি পৌঁছিয়াই গায়ের কাপড়টা টানিয়া শুইয়া পড়িলাম। গাঙ্গুলী ব্যস্ত হইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঝিরঝিরে গঙ্গার হাওয়ায় বোধ করি একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল, সহসা কাহার অতি মধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া বাজিল, 'আপনার বার্লি কি এখন আনব?'

চমকিয়া চোখ মেলিলাম, বছর-ষোল বয়সের একটি মেয়ে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, বিপুল সিক্ত কেশরাশি সারা পিঠ জুড়িয়া রহিয়াছে, সুন্দরী নয়, কিন্তু সেদিকে চাহিয়া যেন সহসা চোখ জুড়াইয়া গেল—তাহার সারা দেহ ঘিরিয়া এমনিই চমৎকার একটি শ্রী বিরাজ করিতেছিল।

আমার বিহ্বল চাহনিতে যেন একটু লজ্জা বোধ করিয়া সে চোখ নামাইল। কহিল, 'বার্লি কি আনব?'

আমি কহিলাম 'বার্লি, না সাবু? তোমার বাবা যে বললেন সাবু করা আছে?'

মেয়েটি জবাব দিল, 'আপনি বার্লি খেতে চেয়েছেন শুনে আবার বার্লি করা হ'ল।'

আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, 'কি আশ্চর্য, আবার বার্লি কেন ? সাবুই খেতুম ন হয়, আচ্ছা নিয়ে এস—'

মিনিটখানেক পরে পারুল একটা পাথরবাটিতে বার্লি ও একটা রেকাবিতে খানকতক কাঁচকলা ভাজা লইয়া ঘরে ঢুকিল, পিছনে গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী কহিলেন, 'শুধু জলবার্লি খাবেন তাই গিন্নী বললেন খানকতক কাঁচকলা ভেজে একটু মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে দিই, জ্বরের মুখে ভালো লাগবে, অথচ পেটের অসুখেরও উপকার হবে—'

সত্যই ভালো লাগিল। লেবু, নুন ও মিছ্‌রি মেশানো বালি ও মরিচের গুঁড়া দেওয়া কাঁচকলা ভাজা খাইতে খাইতে বাড়িতে মায়ের কথা মনে পড়িল। এমন যত্নের কথা কল্পনা করাও যায় না।

পারুল বাহির হইয়া গিয়াছিল, গাঙ্গুলী-মহাশয়কে বলিলাম, 'গোটাদুই টাকা রাখুন গাঙ্গুলীমশাই, এর পর নোট ভাঙিয়ে আরও কিছু দেব—'

গাঙ্গুলী-মহাশয় জিভ্‌ কাটিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, 'না বাবু, মাপ করবেন। গরিব হয়েছি, খেতে পাই না একথা সত্যি—কিন্তু, এখনও যখন বাপ-পিতামহর ভিটেতে বাস করছি, তখন সাবু-বার্লির দাম নিতে পারব না। আপনি বিদেশী লোক, আপনার সামান্য উপকার যদি আমার দ্বারা হয় তো সেই আমার সৌভাগ্য, কিন্তু তার জন্য টাকা নিতে আমায় বলবেন না—'

আমি অভিভূত হইয়া কত কী বলিতে গেলাম, কিন্তু তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, 'ব্রাহ্মণকে পাপে জড়াবেন না আর, মাপ করুন।'

পরমুহূর্তেই সবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

দুর্বল দেহ, বেশীক্ষণ ভাবিবার মত শক্তি ছিল না। শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই মহৎ পরিবারটির কথা এবং কী করিয়া ইহাদের ঋণ শোধ দেওয়া যায় সেই কথা। কিন্তু, কখন যে এই সব চিন্তার মধ্যে একটি সদ্যোস্নাতা কিশোরীর মুখ মনে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কত চিন্তা কত কল্পনা অলস মনে জাল বুনিয়া ঘুরিতে লাগিল তহা বুঝিতেও পারিলাম না।

জ্বর সারিল। পেটেরও গোলমাল নাই। কিন্তু, তবুও দুর্বলতার অজুহাতে দিন কাটিতে লাগিল। উপেনদা'কে আগেই চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলাম ব্যবস্থা করিতে, টাকাও কিছু আনাইয়াছি। কিন্তু, আর থাকা যায় না—

গাঙ্গুলী-মহাশয় আর তাঁহার স্ত্রী ঠিক নিজের ছেলের মত যত্ন করেন; দিন-রাতের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা আমার জন্য ব্যস্ত থাকেন, নানাবিধ খাদ্য আর নানারকমের স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরেই তাঁহাদের দিন কাটে। কিন্তু, সেই আকর্ষণই তো সব নয়? ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ব্যাপারটা ভালো রকমেই ধরা পড়িয়াছে যে, আমার এই বাড়ি না যাওয়ার মূলে রহিয়াছে ঐ আশ্চর্য মেয়েটি—

পারুল সেবায় ও ব্যাকুল আগ্রহে তাহার বাপ-মাকে তো বহুদিনই ছাড়াইয়া গিয়াছে—তাহার প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই নিঃশেষে ব্যয়িত হইতেছে। আমার ঘর ঝাড়ে সে দিনের মধ্যে তিনবার। পাঁচ মিনিটের জন্যও বাহিরে গেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ইতিমধ্যে একবার বিছানা ঝাড়া হইয়া গিয়াছে। জামা-কাপড়ে রোজই সাবান দেওয়া হইতেছে। বালিশ রোদে দেওয়া হইতে শুরু করিয়া জুতা বুরুশ পর্যন্ত সব কাজ বারবার করিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হয় না। একটুখানি বাহিরে গেলেই তাহার দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না, বারবার ব্যাকুলভাবে অনুযোগ করিতে থাকে, 'আবার আপনি অতটা হেঁটে এলেন? দেখুন দেখি, আপনি রোগা মানুষ, যদি পথে কোথাও প'ড়েই যান!

নয় তো—

'ঘোরাঘুরি ক'রে আবার যদি অসুখ বাড়িয়ে ফেলেন তাহ'লে কিন্তু আমি রক্ষে রাখব না—। কতদূর হেঁটে এলেন? বাজার পর্যন্ত তো?'

বুঝিতে পারি যে, চক্ষুলজ্জার দিক দিয়া আর একদিনও থাকা উচিত নয়, এতদিন থাকাও অন্যায় হইয়াছে, তবুও নড়িতে পারি না। ইঁহারা টাকাকড়ি নেন্ না, মধ্যে মধ্যে বাজার করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতেও অনুযোগের সীমা নাই। এই ব্যাপারে আমার থাকাটা আরও অশোভন হইয়া পড়িয়াছে—তাহাও বুঝি, কিন্তু তবুও নড়িতে পারি না। একটু বাহিরে গেলেই মন সেই সেবারত মুখখানির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, দীর্ঘকালের জন্য ছাড়িয়া থাকিব কী করিয়া?

এক একবার ভাবি, ইঁহারা তো আমারই স্বঘর, বিবাহের প্রস্তাবটা করিয়াই ফেলি। পরক্ষণেই নিজের সামান্য আয়ের কথা মনে পড়ে,—ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি না।

দিন কিন্তু কাটিতেই থাকে—অথচ, আর কোনো অজুহাতেই থাকা চলে না, তাহাও বুঝিতে পারি।

একটা জিনিস কিন্তু বড়ই আশ্চর্য ঠেকে। যে পারুল দিনের বেলায় প্রতিনিয়ত আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যস্ত থাকে, সন্ধ্যার পর তাহাকে কোনোদিন, কিছুতেই দেখা যায় না কেন ?

প্রথম প্রথম প্রশ্ন করিলে গাঙ্গুলী-মহাশয় বা পারুলের মা বলিতেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছে,—ও একটু সকালেই ঘুমোয়।'

কিন্তু, প্রত্যহ একটা লোক ঠিক সন্ধ্যা হইতেই ঘুমায় কী করিয়া ? পারুলকে প্রশ্ন করিলে সে শুধু মুখ টিপিয়া হাসে, জবাব দেয় না। কর্তা বা গৃহিণী এ বিষয়ে কথা উঠিলেই জোর করিয়া অন্য প্রসঙ্গ পাড়েন, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং, সন্দেহভঞ্জন করি কী করিয়া ? আরও সন্দেহের কারণ—ইদানীং যখন বাড়ির ভিতরে যাওয়ার আর সঙ্কোচ রহিল না, তখন একাধিক দিন লক্ষ্য করিয়াছি সন্ধ্যার পর হইতেই উহাদের শয়ন-ঘরের দ্বার বন্ধ থাকে, বাহির হইতে। 'পারুল ঘুমোচ্ছে কিনা—' গৃহিণীর এই মন্তব্যে খুশী হইতে পারি নাই, কারণ সেজন্য বাহির হইতে দরজা বন্ধের কারণ কী ?

যাহাই হউক, এধারে আমার যাত্রার দিন স্থির করিয়া ফেলিলাম। ইঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য, কিন্তু তবুও কিছু করা উচিত। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কাপড় কিনিয়া দিলে নিশ্চয়ই কিছু বলিতে পারিবেন না। শুক্রবার দিন ফিরিব স্থির করিয়াছিলাম, কাজেই বৃহস্পতিবার বাজারে গেলাম—গৃহিণীর জন্য একখানি তাঁতের শাড়ি, কর্তার জন্য থান ও পারুলের জন্য একখানা ছাপা ধরদের কাপড় কিনিয়া ফেলিলাম। দাম হয়তো কলিকাতার চেয়ে কিছু বেশীই পড়িল, কিন্তু সে কথায় আর লাভ কী ?

বাড়ি ফিরিতে গাঙ্গুলী-মহাশয় বকাবকি করিলেন, গৃহিণী অভিমান প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পারুল সোজাসুজি খুশীই হইল। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি, সলজ্জ হাসিতে সে কথা বারবার প্রকাশ পাইল। শাড়িখানি সে সারাদিন নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু প্রাণ ধরিয়া পরিতে পারিল না। তাহার মা-ও বলিলেন, 'এম্‌নি প'রে নষ্ট ক'রে কী হবে, তার চেয়ে তুলে রাখ্‌—কোথাও যেতে-আসতে পরবি তখন।...'

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসিল না। কাল বৈকালে ইঁহাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতে লাগিল। এমনি করিয়া কখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে টের পাই নাই, সহসা চমক ভাঙিতে জোর করিয়া ঘুমাইব ভাবিতেছি এমন সময় ভেজানো কপাট ধীরে

ধীরে খুলিবার শব্দ হওয়ায় চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার অসুস্থতার অজুহাতে সারারাত ঘরে আলো জলিত, সেই ক্ষীণ প্রদীপের আলোতে চাহিয়া দেখি, আমারই দেওয়া ছাপা গরদের কাপড় পরিয়া পারুল ঘরে ঢুকিতেছে।—'একি, পারুল? এত রাত্রে?'

এই প্রথম সন্ধ্যার পর পারুলকে দেখিলাম। সে আমার বিস্ময়কে আরও বাড়াইয়া কহিল, 'পালিয়ে এসেছি। আমায় ওরা বেরোতে দেয় না। সন্ধ্যে হ'লেই শেকল দিয়ে রাখে—'

ততক্ষণ সে ঘরের মধ্যে আসিয়াছে, প্রদীপটা উস্‌কাইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আমায় কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি?'

সত্যই তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী মনে হইতেছিল। শুধু সে সিল্কের শাড়িই পরে নাই, পরিপাটী করিয়া কেশ-প্রসাধন করিয়া সাজিয়া আসিয়াছে। সেদিকে চাহিলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

কহিলাম, 'চমৎকার। কিন্তু, তোমাকে ওরা আট্‌কে রাখে কেন?'

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'জানি না। বোধ হয় মনে করে পালিয়ে যাব। যাই হোক, কিছুতেই বেরোতে দেয় না। আজ কিন্তু আমি পালিয়ে এসেছি—'

'কেন এলে পারুল?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করব ব'লে। তুমি কাল চ'লে যাবে বলছ, কিন্তু আমি তোমায় ছেড়ে থাকব কী ক'রে? আর সেখানেই বা তোমায় দেখবে কে? যা অসাবধান তুমি!'

প্রতি কথাটি যেন ক্ষত-বিক্ষত বক্ষে অমৃতের প্রলেপ দিতেছিল। আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলাম, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে পারুল? আমায় বিয়ে করবে?'

সে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া কহিল, 'ওমা, তাও কি তুমি বুঝতে পার নি?'

'কিন্তু, আমি যে গরিব। আমায় বিয়ে করলে তুমি কষ্ট পাবে!'

'কিসের কষ্ট? গরিব ব'লে? আমার বাবাও তো গরিব! কিছু ভেবো না, তুমি আমায় যা এনে দেবে তাইতেই আমি সংসার চালিয়ে নেব। না হয় তো পরের বাড়ি রেঁধে দিয়ে আমিও কিছু রোজগার করব। তোমার কষ্ট হ'তে দেব না কিছুতেই।'

আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত-দু'টি ধরিয়া কহিলাম, 'তুমি আমায় বাঁচালে পারুল, আমি এই কথাই ভাবছিলুম ক'দিন।'

অকস্মাৎ সে হাত-দু'টি টানিয়া লইয়া কহিল, 'ওমা আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো

না, ছুঁয়ো না, আমি যে পেত্নী! আমায় চিনতে পারছ না? গতজন্মে আমি তোমার স্ত্রী ছিলুম, এ জন্মে পেত্নী হয়েছি।'

তাহার পরই সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে শুরু করিল, কিন্তু সে হাসি পরিহাসের হাসি নয়, সে হাসি যেন পাগলের হাসি—!

পাগল?

বুকে যেন কে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল। পাগল! পারুল পাগল! রাত্রে তাই হইলে তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখার এই-ই কারণ?—'পারুল! পারুল! লক্ষীটি, চুপ কর, অত হাসছ কেন?'

পারুল আরও জোরে হাসিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, 'তোমার ভয় করবে না? পারবে আমায় বিয়ে করতে?···না, তোমায় বিয়ে করব না, জগদীশকে বিয়ে করব, শুনছ? জগদীশকে!'

সমস্ত বুকটা যেন কে ভারী পাথরে পিষিয়া দিয়া গেল। হায় রে! ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া প্রতিদিন তিলে-তিলে মধুর যৌবন-স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।··· নির্বোধের মত—স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু, এই মানুষকেই তো দিনের বেলায় প্রত্যহ দেখিয়াছি, কখনও তো উন্মাদের চিহ্নমাত্রও দেখি নাই!

গাঙ্গুলী-মহাশয় ও পারুলের মা দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পারুলের মা গঞ্জনা দিয়া উঠিলেন, 'আবাগী, ফাঁক্ পেয়েই চ'লে এসেছিস্? মাগো—কাপড়খানার কি দুর্গতি! চল্, শুবি চল্ শীগ্‌গির!'

হাত ধরিয়া টানিতেই পারুল সহসা আমার কাছে আসিয়া কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'না-গো আমি তোমাকেই বিয়ে করব, আমায় ধ'রে রাখো, নইলে ওরা বড্ড মারবে।'

ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া পারুলের মা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, 'হতভাগী আমার হাড় ভাজা-ভাজা করলে, মান-সম্ভ্রম, ইজ্জত কিছু রাখলে না!'

গাঙ্গুলী-মহাশয় আমারই বিছানার একপাশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'কী জ্বালা যে বুকের মধ্যে অহর্নিশ জ্বলছে বাবু, এ কথা শুধু অন্তর্যামীই জানেন!'

আমিও কথা কহিতে পারিতেছিলাম না, অনেক কষ্টে কহিলাম—'কিন্তু একদিনও তো আমি লক্ষ্য করি নি!'

গাঙ্গুলী-মহাশয় কহিলেন, 'দিনের বেলায় ও ভালোই থাকে, আজ তিন-চার বছর হ'ল শুধু রাত্রিবেলায় ওর কথাবার্তা গোলমাল হয়ে যায়—উন্মাদের লক্ষণ।'

'কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন?'

'কোথা থেকে করব বাবু? টাকা চাই তো? দৈব-টৈব দু'-চারটে করিয়েছি—ফল হয় নি। এ-কথা কাউকে বিশেষ বলিও না। পাঁচজন সে কথা আলোচনা ক'রে মাকে আমার লজ্জা দেয়।'

আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমিও তেমনি বসিয়া রহিলাম, সারারাত একটুও ঘুম আসিল না।

পরের দিন ভোরবেলাই বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনও পারুল ওঠে নাই। পাছে দিনের বেলা চোখোচোখি হওয়ায় সে লজ্জা পায় বলিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিলাম। তাহার বাপ-মাও বাধা দিলেন না। পারুলের মা চোখ মুছিলেন, বাবা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন।

ট্রেন হু-হু করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু, আমার ও তাহার মধ্যে যতই দূরত্বের ব্যবধান বাড়িতেছিল, ততই যেন বুকের মধ্যে মোচড় দিতেছিল। তাহার সেবা, তাহার স্নেহ, তাহার সেই সপ্রেম মুখ কখন মনের মধ্যে এত গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই।

ভাবিতেছিলাম সে-বেচারীর দোষ কী? আর কিসেরই বা আমার ভালোবাসা, তাহার বাপ-মা এই তিন বৎসর ধরিয়া যাহা সহ্য করিয়াছে একদিনেই তাহা আমার মনের সব ভালোবাসা নষ্ট করিয়া দিল!

বাড়িতে পৌঁছিয়া যত ভাবিতে লাগিলাম, ততই মাথা গরম হইয়া উঠিল। শেষকালে কোন্ এক মুহূর্তে স্থির করিয়া ফেলিলাম পারুলকেই বিবাহ করিব। নিজের কাছে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় তাহাকে ভালো করিয়া তুলিব। না হয় আমার বুকভরা ভালোবাসা দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিব—কিন্তু, তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন যেন পুলকে ডুবিয়া গেল। সারারাত কখনও তন্দ্রায়, কখনও জাগরণে সোনালী স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিলাম। সকালে উঠিয়া মাকে বলিলাম, 'মা, আমি বিয়ে করব।'

মা খুশী হইলেন, 'বেশ তো বাবা, চারুকে চিঠি লিখি, ওদের গাঁয়ে ভালো মেয়ে আছে।'

'মেয়ে আমার দেখা আছে মা। তার বাপকে চিঠি লিখছি সব ঠিক করতে।'

মায়ের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন মাকে সব কথাই খুলিয়া বলিলাম, এবং—বহু মিনতি ও যুক্তির পর তাঁহাকে রাজি করাইলাম।

গাঙ্গুলী-মহাশয়ের জবাব শীঘ্রই আসিল। শোকার্ত পিতার দীর্ঘ পত্রের ভারে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইব না, তবে তাহার মর্মার্থ এই—

আমি চলিয়া আসিবার পর পারুল উঠিয়া আমার খোঁজ করে। সেই সময় সহসা তাহার মার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় তিনি বহু গঞ্জনা দেন। সেই সব গঞ্জনার মধ্য হইতে সে পূর্ব রাত্রির কথা সবই জানিতে পারে। তখন কিছুই বলে নাই, কিন্তু অপরাহ্ণ হইতে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরদিন সকালে নসীপুরের ঘাটে তাহার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছিল।*

* এই গল্পের রচনাকাল —১৯৩১

## মন্দির

ললিতা জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সেই পুরাতন ছোট স্টেশনটি এবং প্লাটফর্মের ফটক হইতে নামিয়া আসা সেই অতি পুরাতন সঙ্কীর্ণ রাস্তা। রাস্তার এপারে তাহাদের অর্থাৎ ছোটবাবুর কোয়ার্টার, ওপারে বড়বাবুর এবং পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে পোর্টার সিগন্যালার প্রভৃতির দুই-তিনটি ছোট ছোট ঘর—এইতো তাহার জগৎ! আর যতদূর দৃষ্টি চলে ডাইনে বামে উত্তরে দক্ষিণে দিগন্ত-বিস্তৃত ধু-ধু মাঠ, লোকালয় নাই, বনজঙ্গল নাই, শুধু মাঠ আর মাঠ। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া ললিতা ক্লান্ত, আর তাহার ভালো লাগে না।

সে অসহিষ্ণুভাবে ঘড়িটার দিকে চাহিল। এখনও দেড়টা বাজিতে মিনিট পাঁচেক দেরি আছে। ঠিক দেড়টায় সদর হইতে একটি ট্রেন আসে, এই ট্রেনে নিশ্চয় লোকজন নামিবে, আর কেহ না নামুক বুড়া ফিরিওয়ালা বনমালী তো নামিবেই। মানুষের মুখ না দেখিলে আর চলে না—নূতন মানুষ! আজ এই নির্জনতা তাহার বড়ই একঘেয়ে লাগিতেছে। ঘরে কিছুই নাই, খবরের কাগজ তাহার স্বামী কেনে না, বলে, 'ও স্রেফ্ বাজে খরচ, ঐ পয়সাটা থাকলে ভালোমন্দ খেয়ে বাঁচব।' বড়বাবুর বাড়ি কাগজ আসে হপ্তায় দুইবার, সেইটা চাহিয়া

আনিয়া ললিতা পড়ে বটে, কিন্তু সে-ও সেই পরশুদিন শেষ হইয়া গিয়াছে সপ্তাহে একদিন দশটার ট্রেনে অফিসের লাইব্রেরি হইতে গাড়ি করিয়া বই আসে, প্রায়ই পুরানো বই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে, তবু তাহাই তিন-চারবার করিয়া সে আদ্যোপান্ত পড়ে। কিন্তু, এবারের বইখানি এতই অপাঠ্য যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আজ আর তৃতীয়বার পড়িতে পারিল না। মধ্যে মধ্যে এক-আধখানা চিঠি আসিলে ললিতার দুই-এক দিন কাটে ভালো। চিঠিটা বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পড়া চলে, কিছুক্ষণ সময়টা ভালোই কাটে। একখানা চিঠিতে কত কথাই বা থাকে, কিন্তু সে চিঠির মধ্য দিয়া হঠাৎ বাহিরের অনেকখানি জগৎ উঁকি মারে; মনে হয় যেন তাহার এই নিরবচ্ছিন্ন নির্জনবাসের মধ্যে সহসা অনেকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাও, ললিতা মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, আজ আর কোনো জায়গা হইতেই চিঠি আসিবার সম্ভাবনা নাই!

বড়বাবুর বাড়ি বেড়াইতে গেলে খানিকটা সময় কাটে বটে। ললিতা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে ইচ্ছা দমন করিয়া লইল। বড়বাবুর গৃহিণী এতক্ষণে শুইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার নাক-ডাকার শব্দ সে এখান হইতেই যেন শুনিতে পাইল; আর থাকার মধ্যে তাঁহার বিধবা কন্যা, কিন্তু তাহার সেই একঘেয়ে শ্বশুর-বাড়ির গল্প আর ভালো না। গত তিন বৎসরের মধ্যে অন্তত হাজারবার শুনিয়াছে—

দূরে আকাশের গায়ে ধোঁয়ার রেখা ফুটিয়া উঠিল। ঐ যে সিগন্যালও পড়িয়াছে। ললিতা প্রাণপণে জানালায় মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া লাইনের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সুন্দর কপালে রেলিংয়ের দাগ কাটিয়া বসিতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। একটু একটু করিয়া ইঞ্জিনের ছবিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আর একটু পরেই গাড়িখানা আসিয়া পড়িবে।...

সেদিন দেড়টার ট্রেনে যাত্রী নামিল মাত্র দুইজন, এক বুড়ী, একটা বিরাট বোঁচ্‌কা বগলে করিয়া লাইনের ওপারের রাস্তা ধরিল, খুব সম্ভব বসন্তপুর যাইবে, আর একজন আমাদের বনমালী, প্রকাণ্ড ঝাঁকা মাথায়, বাঁকিয়া চুরিয়া ধীর মন্থর গতিতে এইদিকেই আসিতেছে।

ললিতা হাতটা বাড়াইয়া ডাকিল, 'ও বনমালী, শোন, শোন! এদিকে একবার নামাও না ঝাঁকাটা, দেখি কী আছে—আজ নতুন কী এনেছ?'

বাহিরের বারান্দায় ঝাঁকাটা নামাইয়া বনমালী মাথায় পাকানো গামছাটা

খুলিয়া তাহারই সাহায্যে হাওয়া খাইতে খাইতে কহিল, 'নতুন আর কী আনব বৌমা, সবই সেই !'

তাহার পর ঝাঁকার পাশেই দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'আর পারিনে মা, বয়স হচ্ছে রোদ্দুরটা বড় লাগে।'

ললিতা তখন উপুড় হইয়া পড়িয়া বনমালীর পণ্যসামগ্রীর মধ্যে দ্রুত হাত চালাইয়া যাইতেছিল। ছোটখাটো এলুমিনিয়ামের বাসন, সেলুলয়েডের শৌখীন জিনিস, ভেলভেটে-মোড়া পুতুল, কাঁচের চুড়ি, দার্জিলিং পাথরের মালা—আরও কত কি! কিন্তু, সে সবই ললিতা বহুবার দেখিয়াছে এবং কিনিয়াছে, নূতন কিছুই নাই। সে মাথা তুলিয়া কাপড়ের ইজিচেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'আর কতদিন এমন ক'রে ফিরি ক'রে বেড়াবে বনমালী, এইবার ঘরে গিয়ে বোস না!'

বনমালী মুহূর্তকয়েক নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমার আর কি শখ, এই বয়সে এই সব করবার? কিন্তু, কী করব মা, যা দু'চার পয়সা জমিয়েছিলুম তা সবই তো গতবার বুড়ীর অসুখে বেরিয়ে গেল কিনা! তার ওপর বুড়া মরবার সময় বাক্যিদত্ত করিয়ে নিলে যে, আর তো কেউ নেই, ভিটেতে যেন একটা মন্দির ক'রে দিই! সেই সত্যিটা না পালতে পারলে যে ছুটি নিতে পাচ্ছি না মা!'

বনমালীর স্ত্রী!...আশ্চর্য! এখানে ললিতা যে তিন বৎসর আসিয়াছে, সেই তিন বৎসরই দেখিতেছে বনমালীকে এমনি ন্যুব্জদেহ; তাহার ঘর-সংসার স্ত্রী-পুত্রের কথা কোনোদিন মনেও পড়ে নাই। সে সাগ্রহে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, 'বনমালী তোমার বৌয়ের গল্প বল একটু শুনি—"

বনমালী ম্লান হাসিয়া কহিল, 'আমাদের আর বৌয়ের গল্প কি বৌমা, বুড়ো-বুড়ীর কাণ্ড! আমাদের কি আর আজকে বিয়ে হয়েছে? তখন আমার কুড়ি বছর বয়স আর এখন এই সামনের অঘ্রানে বোধ হয় পঁয়ষট্টি কি ছেষট্টি বছর বয়েস হবে।'

ললিতা কহিল, 'বিয়ে যখন হয় তোমার বৌয়ের কত বয়স ছিল বনমালী?'

বনমালী কহিল, 'সে লজ্জার কথা আর তুলবেন না। ওর তখন সাত বছর বয়েস। আমাদের পণ দিয়ে মেয়ে আনতে হ'ত কিনা, একুশ টাকার বেশী পণ তখন যোগাড় করতে পারি নি!'

ললিতা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, 'সে যে নেহাত খুকী

গো! সাত বছরের মেয়ে বিয়ে করলে?'

বনমালী হাসিয়া কহিল, 'খুকীই তো ছিল। বিয়ের পরেই যে রাসটা হ'ল, ওকে নিয়ে সদরে বাবুদের বাড়ি মেলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। ফেরবার সময় বলে কি জানো মা, বলে আমার পা ব্যথা করছে, আমায় কোলে কর।'

ললিতা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, 'তারপরে? তুমি কী করলে?'

বনমালী কহিল, 'কী আর করব, ওকে কোলে ক'রেই সেই সারাটা পথ হেঁটে এলুম।'

ললিতা আরও কী প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই সময়ই ব্যস্তসমস্তভাবে হরিশ আসিয়া পড়িল—হাতে একটা কাগজে জড়ানো কতকগুলি চিংড়িমাছ। সেগুলি ললিতার পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, 'ওগো আমাদের সেই তুলসী গার্ডকে ব'লে দিয়েছিলুম চিংড়িমাছের কথা, আজই সে এনে হাজির করেছে। রাঁধো দিকিন্ আজ একটু ভালো ক'রে মালাইকারি। রামউচিতকে পাঠিয়েছি গাঁয়ে, যদি একটা নারকোল পায়—না হয়তো এমনি একটু মিষ্টি বেশি ক'রে দিয়ো, বুঝলে না—'

যেমন আসিয়াছিল তেমনিই ব্যস্তসমস্তভাবে হরিশ আবার স্টেশনে চলিয়া গেল। খানিকটা পথ গিয়া একবার মুখটা ফিরাইয়া কহিল, 'বিকেলে চায়ের সঙ্গে দু'টি বরং চিঁড়ে ভেজে পাঠিয়ে দিও, বুঝলে! আমি আজ আর আসতে পারব না, রামউচিতকে দিয়ে ইস্টিশানে পাঠিয়ে দিও—'

বনমালী ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, 'বেলা হ'ল, আবার গাঁয়ে যেতে হবে মা—আজ তাহ'লে উঠি।'

ললিতা ঝাঁকার উপর আবার উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, 'বা-রে, আমার যে এখনও সব জিনিস দেখাই হ'ল না। আর একটু বোস বনমালী!...এ হার ছড়াটার দাম কত? পাঁচ আনা? চার আনা নাও না।'

বনমালী কী বলিতে যাইতেছিল, ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা সাড়ে চার আনাই দেব'খন।...বনমালী, বুড়ীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল, না?'

বনমালী আবার বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'তা আর হবে না মা, হাতে ক'রে তো মানুষ করলুম বলতে গেলে!...একবার সেই বাইশ সালে বোধ হয়, খুব অজন্মা হ'ল না? তার মধ্যে তখনও তুমি জন্মাও নি, যাই হোক্—সেইবারে বাকি খাজনার জন্যে জমিদারের পাইক আমাদের জনকতককে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল;

উঃ সে ওর কী কাণ্ড, সটান গিন্নীমার কাছে গিয়ে কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি ব্যাপার ক'রে তুললে! গিন্নীমা সেই রাত্রেই কাছারিবাড়িতে লোক পাঠিয়ে আমাদের ছেড়ে দিলেন।'

বনমালী কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। বোধ করি তাহার চোখের সম্মুখে সুদূর অতীতের মধুর দৃশ্যগুলি ভাসিয়া উঠিতেছিল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমিই কি তার জন্যে সাজা কম পেয়েছি! একদিন খুব রাগ হয়েছিল ব'লে গরম কল্‌কেটা ছুঁড়ে মেরেছিলুম। মেরেই ভাবলুম না জানি কী কাণ্ডই করবে এক্ষুনি—কিন্তু, সে কিছুই বললে না, ভাঙ্গা কল্‌কের টুক্‌রোগুলো কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেল। বকলে না, রাগ করলে না, একটা কথাও বললে না। কিন্তু মা, সেই চুপ ক'রে থাকা দেখেই আমার মাথা গেল খারাপ হয়ে—কত রকম চেষ্টা করলুম ঝগড়া বাধাবার, সে একটা জবাবও দিলে না। শতশেষ তার চোখের সামনেই একটা জলন্ত আংরা নিয়ে যখন নিজের হাতের ওপর চেপে ধরলুম তখন ছুটে এসে হাতটা ধ'রে ফেললে। তারপর তার কী কান্না মা, বলে, 'কেন তুমি অমন করলে?'…যতদিন না সে ঘা সেরেছে, আমাকে এক-পা কোথাও বেরোতে দেয় নি। এই যে দেখুন না, এখনও এই কব্জিটার কাছে দাগ রয়েছে—'

বনমালী তাহার শীর্ণ হাতখানি মেলিয়া ধরিল। কিন্তু, সেই পোড়া দাগটার দিকে ললিতা চাহিয়া দেখিতে পারিল না। সে দুই চোখে হাত চাপা দিয়া যেন টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিয়া কোনোমতে সাড়ে চার আনা পয়সা বাহির করিয়া দিল। বনমালী ঝাঁকাটা মাথায় তুলিয়া আবার সেই খর-রৌদ্রের মধ্যেই মাঠের পথ ধরিল। গাঁয়ে গাঁয়ে তাহাকে ফেরি করিয়া বেড়াইতে হইবে, এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে চলে না।

বনমালী চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত ললিতা গৃহকর্মে মন দিতে পারিল না, সামান্য চাষাভূষার ঘরের প্রণয়-কাহিনী, স্বামী-স্ত্রীর তুচ্ছ মান-অভিমানের ব্যাপার—স্বাভাবিক অবস্থায় শুনিলে হাসি পাইবার কথা; কিন্তু, তাহার মনটা সেদিন কেমন একটা সুরে বাঁধা ছিল, বারবার বনমালীর ঘর-সংসারের কথাটাই তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল।

চমক ভাঙ্গিল তাহার রামউচিতের পদশব্দে। সে গ্রামের মধ্য হইতে একটা নারিকেল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, সেরখানেক পেঁয়াজ, আর কিছু চিনি।

এসব বিষয়ে হরিশের অদ্ভুত নজর, কোনো কিছুই ভুল হইবার জো নাই। সে তাড়াতাড়ি রামউচিতকে উনান ধরাইতে বলিয়া মাছকয়টা লইয়া নিজেই বাছিতে গেল।

ইহার পর তাহাকে অনেকখানি সময় রান্নাঘরেই ব্যস্ত থাকিতে হইল। সন্ধ্যার পর সব কাজ সারিয়া রামউচিত যখন চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহাকে ডাকিয়া চুপিচুপি কহিল, রামউচিত, 'বড়বাবুর গাছ থেকে আমাকে দুটো বড় দেখে গোলাপফুল তুলে দিয়ে যেতে পারিস ?'

রামউচিত একটু পরেই গোটা তিনচার বড় বড় গোলাপফুল একটা তোড়ার মত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। ললিতা তাহার বিবাহের সময় উপহার-পাওয়া একটা বাহারী ফুলদানিতে জল দিয়া ফুলগুলি সযত্নে সাজাইয়া রাখিল, তাহার পর বহুদিন পরে নিজে পরিপাটী করিয়া প্রসাধন করিতে বসিল। তাহার বিবাহের সময় বহু প্রসাধন-সামগ্রী উপহার পাইয়াছিল, সেগুলি আর ব্যবহার করা হয় নাই, আজ অনেকদিন পরে আলমারি খুলিয়া সেই সব বাহির করিল। অতি যত্নে খোঁপা বাঁধিয়া নিজের উঠান হইতে একগুচ্ছ মাধবীলতা গুঁজিয়া দিল, মুখে ক্রীম ঘষিয়া খুব পাতলা করিয়া পাউডার দিল, ঠোঁটে ও নখে রং দিয়া একেবারে রীতিমত কুমারী বয়সের মত সজ্জা করিল। তাহার পর আবার সেগুলি গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া বাহিরের ইজিচেয়ারটায় বসিয়া হরিশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হরিশকে আসিয়া কিছুতেই সকাল করিয়া ঘুমাইতে দিবে না। একটু পরেই চাঁদ উঠিবে, যেমন করিয়া হউক হরিশকে চাঁদের আলোতে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিবে। হরিশকে এই ইজিচেয়ারটাতেই বসাইবে, আর সে নিজে বসিবে মেঝের উপর, তাহার পায়ের কাছে, হরিশের হাঁটুর উপর একটা হাত রাখিয়া। কে জানে, হয়তো বা বনমালীর দাম্পত্যলীলার কাহিনীই তাহাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে; আজ তাহার কেবলই যেন মনে হইতেছে তাহার বিবাহের পর এই দীর্ঘ তিন বৎসরেও হরিশের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে নাই—সে আছে আগেকার মতই নিঃসঙ্গ, একা। কিন্তু আর নহে, এমন করিয়া সে আর জীবন কাটিতে দিবে না।

কিন্তু, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, হরিশের দেখা নাই। অন্য দিন ন'টার গাড়িটা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাসায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু আজ তো সে গাড়ি কখন চলিয়া গেছে, দশটাও বাজিয়া গেল, তবু তাহার দেখা নাই

কেন? ললিতা অস্থির হইয়া উঠিল, একটা লোকও নাই যে, কাহাকেও দিয়া ডাকিয়া পাঠায়। আজই কি এত কাজ পড়িয়া গেল?...

প্রায় সাড়ে দশটার সময় হরিশ ফিরিয়া আসিল। আসিল প্রায় লাফাইতে লাফাইতে—'ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল, না? সাড়ে দশটা? তাইতো!...কী করব, পোস্টমাস্টার ছাড়লে না, জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল তাসের আড্ডায়। সেখানে আবার চা-টা হ'ল; ওঃ—পোস্টমাস্টারের বৌ যা চমৎকার ঘুগ্‌নি করেছিল, কী বল্‌ব, 'মার্ভলাস্' একেবারে। আলু-মটর-নারকোলকুরো, আর তার সঙ্গে চিনেবাদাম ভাজা আর কিসমিস্। চমৎকার! তুমি একদিন ক'রো দেখি।...আবার আমার ফরমাশ হ'ল হালুয়া না খেয়ে উঠব না—তা মাস্টারের খুব ভদ্রলোক, বুঝলে, এই রাত্তিরে নতুন ক'রে উনুন ধরিয়ে হালুয়া তৈরি ক'রে দিলে, তার সঙ্গে আর একদফা চা। তাইতেই তো এত দেরি হয়ে গেল।'

ততক্ষণে তাহার জামা-কাপড় ছাড়া হইয়া গেছে। সে ঘরের মধ্য হইতেই কহিল, 'নাও, নাও, আর মিছিমিছি ব'সে থেকে লাভ কী? তুমি ভাতটা বেড়ে ফেলগে, আমি এরই ভেতর চট ক'রে একবার পাইখানাটা সেরে আসি—!'

হরিশ কুয়াতলায় চলিয়া গেল। ললিতা আরও মিনিট দুই নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া রান্নাঘরে ভাত বাড়িতে গেল। খানিকটা পরেই হরিশ কলরব করিতে করিতে আসিয়া খাইতে বসিল, 'বাঃ, মালাইকারিটার বেড়ে রং হয়েছে তো! টোমাটো দিয়েছিলে বুঝি? এটা কি চচ্চড়ি? ওবেলার ছিল? একি, সব মাছগুলোই আমাকে দিয়েছ দেখছি যে, তোমার জন্য রাখ নি?'

ললিতা গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, 'আমার তেমন খিদে নেই, তুমিই খাও।'

হরিশ ঘোররবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, 'না না, সে কখনও হয়? এ হ'ল গে অসময়ের জিনিস, আমি কদ্দিন ধ'রে তুলসীকে ব'লে ব'লে তবে আনিয়েছি। এই বাটিতেই রইল, বুঝলে? লক্ষ্মীটি, মাছ ক'টা দিয়ে একগাল ভাত খেও—'

ললিতা প্রতিবাদ করিল না। কে জানে কেন তাহার যেন তখন কেমন একটা সুগভীর ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, কথা কহাও তখন যেন দুঃসাধ্য।

অকস্মাৎ একবার হরিশ চোখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বোধ হয় তাহাকে অত নীরব দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিল—ললিতার মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা তাহার নজরে পড়িতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, 'তোমার মুখটা অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল দেখি, অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?

তাহার পরক্ষণে নিজেই মীমাংসা করিয়া দিল, 'ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়, না রাতও তো কম হয় নি! আচ্ছা রোস' আমি টপ ক'রে খেয়ে নিই

হরিশ তাড়াতাড়ি আহার সারিতে লাগিল। ললিতা তাহার কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিল দুধের জন্য। দুধ লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল হরিশ তখন আবার অন্য কথায় চলিয়া গিয়াছে, 'পাল-কে বলেছি ভালো কুমড়োর বিচি দিতে, বুঝেছ? ঐ মাধবীলতা গাছটার পাশেই দুটো বসিয়ে দেব'খন। দুটো গাছ একসঙ্গেই ছাদে উঠবে, কেমন? কুমড়ো গাছ তো দু'দিনের। ওতে তোমার ফুলগাছের কোনো ক্ষতি করবে না—'

আহারাদির পর শয়নঘরে ঢুকিতে গোলাপফুলগুলি নজরে পড়িল, 'বাঃ বেশ গোলাপ তো! বড়বাবুর গাছের বুঝি? আঃ—'

তাহার পর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ললিতার উদ্দেশে কহিল, 'গোলাপ-ফুলগুলো দেখে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল, ছেলেবেলায় আমরা একরকম খাবার খেয়েছি, 'গুলকন্দ্' বলত তাকে, গোলাপের পাপড়ি চিনির রসে কী ক'রে পাক করত—জানো নাকি করতে?'

ললিতা মুহূর্তখানেক পরে জবাব দিল, 'না'।

ক্ষুন্নকণ্ঠে হরিশ কহিল, 'আমিও জানি না ছাই। তখন যদি শিখে রাখতুম আহা বেশ গোলাপ, এই রকম ফুলের পাপড়ি দিয়েই করত নিশ্চয়!'

ললিতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর অন্নব্যঞ্জনগুলো একটা থালায় জড়ো করিয়া কোয়ার্টারের পিছনের দ্বার দিয়া মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসিল। কুকুর বিড়াল ঢের আছে, কাল সকাল অবধি এসবের কোনো চিহ্ন থাকিবে না কিন্তু, সে নিজে তখন আহারের কথা ভাবিতেই পারিতেছে না। রান্নাঘরের কাজকর্ম সারিয়া ঘরে যাইবার আগে ললিতা খোঁপা হইতে মাধবীলতার গুচ্ছটি খুলিয়া পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আগে ফুলদানিটা সরাইয়া উঁচু তাকের উপর তুলিয়া রাখিল, যাহাতে সহজে না নজর পড়ে। হরিশ তখনও একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে নাই, ললিতা মশারির মধ্যে ঢুকিয়াছে অনুভব করিয়া জড়িত-কণ্ঠে কহিল, 'আজ বড্ডই অত্যাচার হ'ল পেটের ওপর, কাল আর ডালটাল রেঁধো না, বেশ ঠাণ্ডা ঝোল আর দু'-একটা ভাজা-ভুজি, বরং রামউচিতকে একবার গাঁয়ে পাঠিয়ে দিও, দইটই যদি পায়—'

পরের দিন বনমালী নিজেই আসিয়া ঝাঁকা নামাইল, 'বৌমা কোথায় গো

একটু জল খাওয়াতে পারেন ? বড়ই পিপাসা লেগেছে।'

ললিতা শুধু জলই আনিল না, সকালবেলা গ্রাম হইতে মিষ্টান্ন আনাইয়াছিল, তাহাও দুইটা আনিয়া দিল। তাহার পর মৃদু ভৎর্সনার সুরে কহিল, 'বুড়ো বয়স অবধি মোট মাথায় ক'রে রোদে রোদে ঘুরবে, জলতেষ্টার আর অপরাধ কী ?'

বনমালী আকণ্ঠ জল পান করিয়া গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, 'কী করব মা, বুড়ীর শেষ সাধটা না মেটানো পর্যন্ত ছুটি পাচ্ছি কৈ ?...কখনো কোনো জিনিস ভরসা ক'রে চায় নি, পাছে আমায় কষ্ট ক'রে যোগাড় করতে হয়। আর এই তার শেষ-চাওয়াটা না দিয়ে কি পারি মা ?...সেই যেবার ঐ বাবুদের পাটকল খোলা হ'ল, বাবুরা আমাকে কলে কাজ করবার জন্যে অনেক সেধেছিল, আমিও নিমরাজি গোছ হয়েছিলুম, কিন্তু বুড়ীর জন্যে যাওয়া হ'ল না। কিছুতে যেতে দিলে না, বললে, 'তাহ'লে আমি বিষ খাব। তোমার এই দুর্বল দেহ, অত খাটুনি সইবে না।' আমি বললুম, 'কিন্তু না গিয়েই বা কী করি, এইতো রোজগার, না দিতে পারি একখানা ভালো কাপড় তোকে, না দিতে পারি একটা গয়না।'...তা একেবারে ফোঁস ক'রে উঠল, বললে, 'তোর বুকের রক্ত জলকরা পয়সায় আমি পরব রঙান কাপড় ? তার আগে নিজে হাতে এ পোড়ার দেহে আগুন ধরিয়ে দেব না !'

কথাগুলো বলিতে বলিতেই বনমালীর দুই চোখ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমাকে ছেড়ে যেতে হবে ব'লে গিন্নীমা নিখরচায় তিথ করাতে চাইলেন, তবু সে গেল না !...সে আজ আমাকে ছেড়ে কী ক'রেই আছে !'

তাহার কান্না দেখিয়া ললিতারও চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, 'কত টাকা হ'লে তোমার মন্দির হয় বনমালী ?'

বনমালী কান্নার বেগটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, বাবুরা হিসেব টিসেব ক'রে ব'লে দিয়েছেন তিনশ' টাকার যোগাড় হ'লে মন্দির মায় পিতিষ্ঠে পর্যন্ত হয়ে যাবে। ইট আমার তৈরি করানো আছে কিনা একপাঁজা—ঘরের জন্যে করেছিলুম, কিন্তু আর ঘর কী হবে মা,...তিনশ' টাকা পড়বে, তা প্রায় দুশ' টাকার ব্যবস্থা আছে, এখন বাকি একশ'টি টাকা যে কদ্দিনে গুছিয়ে নিতে পারব তা জানিনে, যা বেচাকেনা হয়েছে আজকাল, কিছুই প্রায় থাকে না !'

ললিতা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'কিন্তু, শুধু তো মন্দির করলেই চলবে না বনমালী, আবার ঠাকুরসেবার ব্যবস্থা তো চাই !'

বনমালী মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, 'সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে মা। বাবুরাই সে ভার নেবেন বলেছেন। আমার যা একটু জমি-জায়গা আছে সব দেবোত্তর ক'রে বাবুদের সেবাইত ক'রে দেব, তারপর ওঁদের ভাবনা ওঁরা ভাববেন।'

ললিতা প্রশ্ন করিল, 'আর তুমি?'

বনমালী ম্লান হাসিয়া কহিল, 'আমার একটা পেটের জন্য ভাবনা কী মা? দিন কতক একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াব, তারপর এসে ঐ মন্দিরেরই বাইরেটায় প'ড়ে থাকব, দিনান্তে দু'মুঠো প্রসাদ পেলেই দিন চ'লে যাবে—'

ললিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা ধর, কেউ যদি তোমাকে ঐ একশটা টাকা দিয়ে দেয়, তাহ'লে তুমি কি আজই মন্দির শুরু ক'রে দাও?'

বনমালী জবাব দিল, 'তা আর বলতে, কিন্তু সে আর কে দেবে মা, আজকালকার দিনে একটা টাকাই পাওয়া যায় না, তা একশ' টাকা!'

ললিতা আর কথা কহিল না। বনমালীও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁকাটা মাথায় তুলিয়া লইতে লইতে কহিল, 'আর যদি একটা বছর টেনে চালিয়ে যেতে পারি তাহ'লেই একশটা টাকার যোগাড় করতে পারব। তাই ভগবানকে শুধু দিনরাত জানাচ্ছি মা, এই একটা বছর আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখ, বুড়ীর হুকুমটা তামিল ক'রে নিই!'

বনমালী মাঠের পথ ধরিল। সে চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত ললিতা সেই ইজিচেয়ারটার উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একেবারে তাহার চমক ভাঙ্গিল রামউচিত চায়ের তাগাদায় আসিতে, বাবু বলিয়া দিয়াছেন চা আর খানকতক পাঁপর-ভাজা পাঠাইতে। আর অমনি খানকতক কড়া করিয়া আলুভাজা, যদি সম্ভব হয়।

রাত্রে রান্নার কাজ সারিয়া ললিতা তাহার বাবাকে চিঠি লিখিতে বসিল, খানিকটা একথা-সেকথার পর লিখিল, 'আপনারা বিবাহের সময় আমাকে মফচেন ছাড়াও একছড়া বারমেসে হার দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও দেন নাই। তাহার জন্য প্রায়ই আমাকে নানা কথা শুনিতে হয়। যদি সম্ভব হয় তো তাড়াতাড়ি ওটা গড়াইয়া দিবেন।'

চিঠিটা খামে মুড়িবার সময় একবার তাহার পিতার অভিমান-ক্ষুন্ন মুখ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আঠা-দেওয়া অংশের উপর কপালের

ঘাম বুলাইয়া খামটা জুড়িয়াই দিল।

ইহার পর সাত-আট দিন কাটিয়া গেল উত্তরের আশায়। বনমালী প্রায় রোজই আসে, কখনও ললিতা তাহার নিকট হইতে কিছু কেনে, কখনও বা কেনে না, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না রোজই একসময় বনমালীর স্ত্রীর কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে সেই গল্পই চলে। এক একদিন হরিশের নজরে পড়িলে সে মৃদু অনুযোগ করে, 'কী পয়সাটাই ঐ বুড়োটাকে তুমি দিতে পার ললিতা। তার চেয়ে যদি ঐ পয়সায় একসের ক'রে রোজ দুধ খাও তো গায়ে একটু জল লাগে—'

ললিতা জবাব দেয়, 'আমার গায়ে আর জল লাগার দরকার নেই, তোমার থাকে তো তুমি খেয়ো—'

দিন দশেক পরে দুপুরবেলা পিওন আসিয়া একটা ছোট্ট ইন্‌সিওর-করা পার্শেল দিয়া গেল। ললিতা ঘরের মধ্যে গিয়া পার্শেল খুলিয়া ফেলিল, একটা কাগজের বাক্সর মধ্যে একছড়া ঘষা গোট-হার, তাহার সহিত চিঠিপত্র কিছুই নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পার্শেলের বাক্স প্রভৃতি রান্নাঘরে ঘুঁটের গাদার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আসিল এবং হারছড়াটি বিছানার নিচে রাখিয়া দিয়া বাহিরের চেয়ারে আসিয়া বসিয়া বনমালীর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু, সেদিন দেড়টার ট্রেনে বনমালী নামিল না। ললিতা ভাবিল বোধ হয় তিনটার ট্রেনে আসিবে, কিন্তু সে ট্রেনেও সে নামিল না। হয়তো তাহার অসুখ করিয়াছে কিংবা কোনো মেলাটেলায় চলিয়া গিয়া থাকিবে—

সাড়ে তিনটার সময় হরিশ আসিল চা খাইতে। মুড়ির সহিত ঘি চিনি ও নারিকেলের কুরা মাখিয়া মুখে পুরিতে পুরিতে কহিল, 'পিওনটা এসেছিল দেখলুম না? কার চিঠি?'

ললিতা নতমুখে চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে কহিল, 'বাবার চিঠি।'

'কেমন আছেন সব, ভালো খবর তো? তোমার দাদার ছেলেপুলে সব ভালো? ওকি, তোমার চা রাখলে না? জল নাও নি নাকি?'

ললিতা জবাব দিল, 'শরীরটা ভালো নেই, এখন আর চা খাব না—'

কিন্তু, পরের দিনও বনমালী আসিল না। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনখানি ট্রেন আসে ওদিক হইতে, তিনটি ট্রেনের সময়ই ললিতা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু বনমালীর বিচিত্র পণ্যের ঝাঁকাটি কিছুতেই নজরে পড়িল না।

রাত্রে আহারে বসিয়া হরিশ কহিল, 'যাক্ বাবা একটা খরচ বাঁচল। ঐ পয়সাটা খেয়ে বাঁচব—

লতিকার বুকটা অকস্মাৎ ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। সে প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া কহিল, 'তার মানে?'

থালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কৈ মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে হরিশ জবাব দিল, 'ঐ যে তোমার পুষ্যিপুত্তুর গো! সেই বুড়ো ফিরিওলা, কাল রামচন্দ্রপুরের কাছে লাইন ডিঙ্গোতে গিয়ে কাটা পড়েছে, সেই জন্মেই তো বারোটার গাড়িটা কাল অত লেট করলে—'

ললিতা একরকম ছুটিয়াই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল অকস্মাৎ যেন কে তাহার গলা চাপিয়া ধরিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে হরিশের আহার শেষ হইলে সে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু নিজে একটি গ্রাসও মুখে দিতে পারিল না, কাজ সারিবার ছুতায় বহুক্ষণ রান্নাঘরে বসিয়া থাকিয়া অন্নব্যঞ্জনগুলি সব বাহিরে ঢালিয়া দিয়া আসিল। তাহার পর গভীর রাত্রে আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিল।

কিন্তু, তাহার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। কোথাকার কে বুড়া ফিরিওয়ালা ট্রেনে কাটা গিয়াছে তাহারই শোকে তাহার গলার কাছে যেন কান্না ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। ফলে সে নিজেই যেন নিজের কাছে লজ্জিত হইয়া উঠিল। অবশেষে শেষরাত্রে হরিশ উঠিবার বহু পূর্বেই সে উঠিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে বিছানার নিচে হইতে নূতন হারছড়াটা বাহির করিয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিল। তাহার পর কোয়ার্টারের পিছনের দ্বার খুলিয়া একেবারে বাহিরের কুয়াতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। মিনিটখানেক যেন একটু ইতস্তত করিল, তাহার পর ঊর্ধ্বে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া হারটি কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল…

আবার তেমনি করিয়া নিঃশব্দ-পদক্ষেপে ললিতা যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, হরিশের ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই।

# পুরাতন

বছর পাঁচেক পূর্বের কথা। তখন সবে হাকিমী চাকুরিতে ঢুকিয়াছি, এদেশ ওদেশ ছুটাছুটি করিতে করিতে প্রাণান্ত হইয়া যাইতেছি। হাকিমীতে জবাব দিয়া ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাত যাইব, কিংবা ইস্কুল-মাস্টারির জন্য দরখাস্ত করিব অথবা রামকৃষ্ণ-মিশনে নাম লিখাইব—এমনি যাহা হয় একটা ভয়ঙ্কর কিছু করিব বলিয়া প্রত্যহই স্ত্রীকে ভয় দেখাইতেছি, সেই সময়কার কথা। কথাটা আজ সহসা মনে পড়িয়া গেল।

সেও মাস তিনেকের জন্য একটা মফঃস্বল শহরে গিয়াছিলাম হাকিমী করিতে। মাত্র তিন মাসের জন্য বলিয়া 'বাড়ির ওঁনাদের' লইয়া যাইতে পারি নাই, মনটা সুতরাং খারাপই ছিল। তাহার উপর প্রথম দিনটিতেই পেশকারবাবু যখন ছুটির দরখাস্ত লইয়া হাজির হইলেন, তখন বলাই বাহুল্য, মনটা ঠিক কাহাকেও কিছু বকশিশ করিবার মত উদার হইয়া উঠিল না।

পেশকাররা শখ করিয়া সুস্থ শরীরে ছুটি নেয় এমন কখনও শুনি নাই। সুতরাং, বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলাম, 'হঠাৎ আপনার ছুটির কী দরকার হয়ে উঠল এখনই? তাও আবার একমাস?'

পেশকার মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, 'শরীরটা খারাপ, একটু চেঞ্জে যাব ভাবছি!'

তাঁহার বলিষ্ঠ শরীরের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিলাম, 'সে না হয় মাস-তিনেক পরেই নিতেন। নতুন হাকিম, আবার নতুন পেশকার—সরকারের কাজ চলে কী ক'রে?

পেশকারবাবু নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। বুঝিলাম, ছুটির দরখাস্ত ফিরাইয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। অপ্রসন্ন মুখে কহিলাম, 'যাক্, দরখাস্ত ফরওয়ার্ড ক'রে দেব এখন, মোদ্দা আমি রেকমেণ্ড করতে পারব না।'

পেশকার সহসা হাত দুইটা জোড় করিয়া কহিলেন, 'হুজুর তাহ'লে আমার বড্ড অসুবিধে হবে। ছুটির আমার বিশেষ দরকার।'

আরও বিস্মিত হইলাম। ছুটির অর্থ পেশকারের লোকসান—সুতরাং, খামকা

ছুটির জন্য এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না। একবার কহিলাম, বাড়িতে কি কারও অসুখ-বিসুখ কিছু—?'

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'আজ্ঞে না, আমারই—'

তাহার পর কী একটা বিড়বিড় করিয়া কহিলেন, বোঝা গেল না।

সেদিনকার মত কথাটা ঐখানেই চাপা পড়িয়া গেল। দরখাস্তটা পাঠানোর সময় হইল না, আমার টেবিলের উপরেই চাপা রহিল। কিন্তু, সন্ধ্যার সময় বাংলোতে ফিরিয়া সবে খবরের কাগজটি লইয়া ইজিচেয়ারে বসিয়াছি, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, 'বাবু, একটি মেয়েছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—'

মেয়েছেলে? এই নির্বান্ধব দেশে? এখানে আবার কে আমার সহিত দেখা করিতে আসিল? কহিলাম, 'কে জেনে আয় আগে।'

ভোলা কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, 'মালী বলছিল পেশকারবাবুর বৌ!'

পেশকারবাবুর বৌ। কী সর্বনাশ!

অগত্যা উঠিয়া বসিয়া কাগজটা নামাইয়া রাখিলাম। একটু পরেই কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন, বুঝিলাম, ইনিই পেশাকারবাবুর স্ত্রী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দেহ বর্তমানে কিছু স্থূল হইলেও কালে ইনি তন্বঙ্গী এবং রূপসীই ছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। আমি ঈষৎ বিব্রতভাবে তাঁহাকে একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া কহিলাম, 'বসুন।'

কিন্তু, তিনি বসিলেন না, নতমুখে দাঁড়াইয়াই পরিচয় দিলেন, 'বাবা, আমি আপনার পেশকারের স্ত্রী।'

আমি কহিলাম, 'ওঃ—তা আপনি এমন সময় কষ্ট ক'রে এলেন কেন—ডেকে পাঠালে আমিই যেতুম!'

তিনি জিভ্ কাটিয়া কহিলেন, 'তা কি পারি বাবা! আপনি হলেন আমাদের মনিব, আপনাকে ডেকে পাঠালে আমার অপরাধ হ'ত।'

তাহার পর একটু থামিয়া কহিলেন, 'আর, তাছাড়া আমি এ কথাটা একটু গোপনেই বলতে চাই।'

আমার কাছে তাঁহার কী গোপন কথা থাকিতে পারে বুঝিতে না পারিয়া আরও বিস্মিত হইলাম।

তিনি বোধ করি আমার বিস্ময় অনুমান করিয়াই লজ্জিত কণ্ঠে কহিলেন, 'এমন কিছু নয়, ওঁর কাজেরই একটা কথা। উনি কি ছুটির দরখাস্ত করেছেন আজ?'

ওঃ—তাহা হইলে ইহাই তাঁহার গোপন কথা! ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না দেখিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়াছেন সুপারিশ করিতে। ছিঃ ছিঃ। মনটা ভারি ছোট হইয়া গেল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ করেছেন বটে!'

তিনি একটু ইতস্তত করিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি না-মঞ্জুর করেছেন?'

আমি জবাব দিলাম, 'মঞ্জুর করার মালিক ঠিক আমি তো নই, তবে আমি সুপারিশও করব না স্থির করেছি।'

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আমি ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলুম। আপিস থেকে ফিরে গিয়ে যে রকম কাঠ হয়ে প'ড়ে রয়েছে বিছানায়, তাই দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম!'

কৌতূহল আর সংবরণ করা গেল না। বিরক্তও হইয়াছিলাম বোধ হয়, একটু তিক্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলাম, 'তা এই ছুটিটা না নিলেই চলে না, এমন কী প্রয়োজন আপনাদের? যেন মনে হচ্ছে এর ওপরেই আপনাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে!'

তিনি আরও যেন অপ্রতিভ হইলেন। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'বাবা, আপনি আমার ছেলের বয়সী, কিন্তু তা হ'লেও লজ্জার কথা পরের কাছে বলা যায় না। প্রয়োজন আমার কিছু নেই, তবে এটুকু জানি যে, ছুটি না পেলে উনি চাকরি ছেড়ে দেবেন নিশ্চয়ই। এতগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে একেবারে উপোস ক'রে মরতে হবে—এই কথাটাই জানাতে এসেছিলুম আপনার কাছে। ও উন্মাদ—ওর কোনো বিবেচনা নেই তো!'

উন্মাদ! পেশকারবাবু?

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল তাঁহার শ্যামবর্ণ বর্তুলাকার দেহ, বিপুল টাক ও ভীষণ গোঁফ! ছোট ছোট চোখ দুইটি সর্বদা মক্কেলের পকেটের দিকে নিবদ্ধ। সেই মানুষ উন্মাদ!

কহিলাম, 'আমি অবশ্য তাকে বেশিক্ষণ দেখি নি, কিন্তু তাঁকে তো উন্মাদ ব'লে মনে হ'ল না!'

তিনি অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, 'আমি সেভাবে উন্মাদ বলি নি। মানুষের নেশায় ঘা পড়লে তো বিবেচনা থাকে না বাবা, তখন যে সব মানুষই উন্মাদ হয়ে পড়ে।'

কথাটা যেন ক্রমশই জটিলতর হইয়া পড়িতেছে। বিরক্ত হইয়া কহিলাম, 'আপনার কথার হেঁয়ালি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, যদি পরিষ্কার ক'রে

বলতে পারেন তো বলুন।'

তিনি আঁচলে চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, 'বাবা স্বামীর কলঙ্ক আমি বলতে পারব না, তবে এই নিবেদনটুকুই শুধু জানিয়ে গেলুম, যেন ছেলেপুলে নিয়ে শুকিয়ে না মরি।'

এই বলিয়া তিনি উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ আর কাগজ পড়া হইল না। প্রায় বৃদ্ধ, অর্থলোলুপ পেশকারের কী এমন কলঙ্কের কথা থাকিতে পারে যাহা স্ত্রী পরের কাছে মুখে আনিতে পারেন না? এবং যদি চরিত্র-দোষ থাকেই—তাহার সহিত বিশেষ করিয়া ছুটি লওয়ারই বা সম্পর্ক কী? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনটা কৌতূহল এবং অস্বস্তিতে পূর্ণ হইয়াই রহিল।

পরের দিন অফিসে গিয়া অবসরমত পেশকারবাবুর ছুটির রেকর্ড খুলিয়া দেখিলাম, যে কয়বৎসর তিনি এখানে আছেন সেই কয়বৎসরই এই সময়টায় তিনি ছুটি লইয়াছেন। কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া দুই-একজনকে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্নও করিলাম, কিন্তু কোথাও সদুত্তর মিলিল না।

ছুটির দরখাস্তও আর চাপা গেল না। যথাসময়ে 'রেকমেণ্ড' করিয়া পাঠাইয়া দিলাম এবং ছুটিও মঞ্জুর হইয়া গেল। সংবাদ লইয়া জানিলাম পেশকারবাবুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এখানেই আছে, শুধু তিনি নিজে দার্জিলিং চলিয়া গিয়াছেন।

মনে মনে বিস্মিত হইলাম, পেশকারও দার্জিলিং যায় তাহা হইলে?

ইহার পর এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, বহু স্থানে খুচরা হাকিমী করিয়া অবশেষে এই একবৎসর হইল পাকা হইয়াছি। বহু লোক ও বহু স্থানের স্মৃতির মধ্যে পেশকারবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর কথাটা মনের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, আর একবারও মনে পড়ে না।

কিন্তু, সহসা সেদিন আবার সেই পেশকারবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। কার্শিয়ং যাইব বলিয়া দার্জিলিং মেলে উঠিয়া বসিয়া আছি, সহসা দেখি ভদ্রলোক কুলির মাথায় বিছানাপত্র চাপাইয়া প্রত্যেক কামরাটির মধ্যে উৎসুকভাবে উঁকি মারিয়া দেখিতে দেখিতে প্লাটফর্ম দিয়া আসিতেছেন। টাক এবং গোঁফ ঠিক তেমনিই আছে, চেহারারও বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সুতরাং, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম।

মনে পড়িয়া গেল তাঁহার প্রতি বৎসর দার্জিলিং বিহারের কথা, সময়টাও সেই বৈশাখ মাস—তবে কি এইবার তাঁহার রহস্যটা উদঘাটিত করিতে পারিব? উৎসাহের প্রাবল্যে তাড়াতাড়ি তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়া আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও কোনো উৎসাহ দেখাইলেন না, বরং যেন ঈষৎ বিরক্তই হইলেন। আমার গাড়ির সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিয়া গেলেন, 'আসছি হুজুর!'

তবু ভালো যে, 'হুজুর'-টুকু ভোলেন নাই!

ইঞ্জিনের কাছ পর্যন্ত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত হতাশ ও বিবর্ণমুখে ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইলেন, অভ্যস্তভাবেই প্রশ্ন করিলেন, 'কেমন আছেন হুজুর, ছেলেপুলে সব ভালো তো?

কিন্তু, তাঁহার মন ও চক্ষু দুই-ই দূরে প্লাটফর্মের প্রবেশপথে নিবদ্ধ। সুতরাং, সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কাউকে খুঁজছেন বুঝি?'

তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, 'না এমন কিছু নয়—ঐ একজনের যাবার কথা ছিল তাই, সে এমন কিছু নয়।'

কিছু নির্মমভাবেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলাম, 'তাহ'লে উঠে পড়ুন না, মিছিমিছি দেরি করছেন কেন?'

অসহিষ্ণু কুলিটাও কী একটা অর্ধ স্বগতোক্তি করিল, অর্থাৎ বিলম্ব করার অর্থ সে-ও বুঝিতে পারিতেছে না।

পেশকারবাবু বার-দুই ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, 'দেরি, হ্যাঁ—না দেরি করার আর দরকার নেই।'

কিন্তু, পরক্ষণেই কুলিকে কহিলেন, 'ওরে তা দেখ্, মালগুলো বরং ওখানে নামিয়ে রাখ্—আর মিনিট কতক—বেশী দেরি হবে না। বরং আমি তোকে পুষিয়ে দেব এখন—'

কুলিটা প্লাটফর্মের উপর বাক্সবিছানা নামাইতে নামাইতে কহিল, 'মিছিমিছি দেরি করিয়ে দিলেন বাবু, এতক্ষণে আমার তিনটে মোট ধরা হ'ত।'

কে জানে কেন সেদিন মানুষটাকে বিঁধিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিলাম, 'ও, তিনি না এলে যাওয়া হবে না বুঝি?'

পেশকারবাবুর কালো মুখ নিমেষে বেগুনী হইয়া উঠিল। তিনি অপ্রতিভ হইয়া মিথ্যা কহিতে গেলেন, কিন্তু তা-ও ভালোরূপ কহিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'না, বিশেষ কেউ নয়। যাবই আমি—তবে ঐ বাড়ি থেকে একটা

জিনিস দিয়ে যাবার কথা আছে কিনা, যদি খুঁজে না পায়—'

'বাড়ি?'

আরও অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, 'না, ঐ এক বন্ধুর বাড়ি।'

ইতিমধ্যে ভিড় বাড়িতে লাগিল। আমরা দু'জনেই প্লাটফর্মের প্রবেশপথের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, তিনি বাহিরে তাঁহার মালের উপর, আমি গাড়ির মধ্যে।

অকস্মাৎ খানিকটা পরে পেশকারবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কুলিকে তাড়া দিয়া কহিলেন, 'এই ওঠ্ ওঠ্—মাল তোল্ শিগ্গির।'

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'না, কেউ এল না। আমি তাহ'লে যাই হুজুর, মিছিমিছি আর অপেক্ষা করব না। ভিড় বাড়ছে ভয়ানক, শেষে আর জায়গা পাব না।'

তিনি দ্রুত একটা ইণ্টারক্লাস কামরার দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু, আমি তাঁহার এ ছলনায় ভুলিলাম না। গলা বাড়াইয়া যতটা দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিলাম, সমস্ত প্লাটফর্মটার মধ্যে তখন মাত্র একটিই স্ত্রীলোক আসিতেছে। অত্যন্ত শীর্ণ, ক্ষীণ দেহ, চোখে একজোড়া পুরু চশমা, হাতে মেয়েলী ব্যাগ, কুলির মাথায় মাল চাপাইয়া একা-ই জায়গা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আর একটু কাছে আসিতেই আর সংশয় রহিল না, এ আমাদের লীলা!

লীলা আমারই পিসতুতো বোন। সম্পর্কটা খুবই সামান্য বটে, কিন্তু বাল্যকালে বৎসর-খানেক পিসিমার বাড়ি কাটাইতে হইয়াছিল বলিয়া পরিচয় ছিল ভালো রকমই। বহুকাল দেখা হয় নাই, তবে শুনিয়াছিলাম, শরীর ভালো নয় বলিয়া বিবাহ করে নাই—কোন্ এক মেয়েস্কুলে মাস্টারি করে।

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিলাম, 'লীলা! এই যে—এদিকে জায়গা আছে।'

লীলা বিস্মিত শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকটা তাকাইয়া থাকিবার পর চিনিতে পারিল। কহিল, 'আরে, তুমি এ গাড়িতে যাচ্ছ নাকি? ভালোই হয়েছে। মেয়েদের মোটে একটা সেকেণ্ডক্লাস দিয়েছে, তার সব ক'টা বার্থই জোড়া। ভাবছিলুম কী ক'রে একা পুরুষদের গাড়িতে যাব। তা তুমি যখন আছ, তখন আর ভাবনা নেই। এই কুলি, ইধার আও—'

আমার গাড়িটা তখনও খালি ছিল। সে আমারই সামনের বেঞ্চে ভালো

করিয়া বিছানা বিছাইয়া সুস্থ হইয়া বসিল, তাহার পর কুলিকে বিদায় করিয়া দিয়া কহিল, 'উঃ অনেক কাল পরে দেখা! তারপর, কোথায় হাকিমী করছ এখন ?'

স্থানটার নাম বলিলাম। সে আমার পরিবারের অন্যান্য সকলের কুশল প্রশ্নের পর কহিল, 'দৈহিক কুশল-প্রশ্ন ছাড়া অবিশ্যি আর কিছু বলবার নেই। অন্য দিকে ভালোই আছ বুঝতে হবে। সেকেণ্ডক্লাসে ক'রে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছ, অবস্থা ভালোই।'

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম, 'এই অঞ্চলেই হাকিমী করি যখন, তখন অবস্থা ভালো না হ'লেও আমাকে সেকেণ্ডক্লাসে যেতে হবে। কিন্তু, তুমি বাংলাদেশে ইস্কুল মাস্টারি ক'রে সেকেণ্ডক্লাসে চড়ছ এইটেই আশ্চর্যের কথা।'

সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'তা বটে! তবে সেকেণ্ডক্লাসে চড়বার খরচটা আমাকে দিতে হয় না, এই যা।'

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'তার মানে ?'

সে তেমনি রহস্যজনকভাবেই জবাব দিল, 'তার মানে প্রত্যেক বৎসর এই সময় হ'লেই কোন্ এক অজানাভক্ত আমাকে একশটি ক'রে টাকা পাঠায়। সেই টাকার সঙ্গে শুধু কাতর মিনতি থাকে যে, আমি যেন এই সময়টা কয়েক দিন দার্জিলিং-এ কাটিয়ে আসি, নইলে আমার এ দেহ বেশী দিন টিকবে না, আর আমি যেন সেকেণ্ডক্লাসেই যাই, নইলে ভিড়ে আমার বড্ড কষ্ট হবে!'

কথাটা শেষ করিয়া আমার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কিন্তু, মুহূর্ত-কয়েক পরেই আমার চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হইয়া গেল। আমি সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলাম, 'লীলা, তোমার সেই ভক্তটিকে যেন চিনি ব'লে মনে হচ্ছে।'

সে বিশ্বাস করিল না। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বরে কহিল, 'যথা ?'

আমি তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'লীলা, মহিমবাবু পেশকারকে তুমি চেন ?'

মুহূর্তে তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'তুমি হাকিম সেটা ভুলে গিয়েছিলুম, পেশকারদের সঙ্গে যে তোমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।'

লীলা আবার চুপ করিল। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম, 'আসল ব্যাপারটা শুনতে চাওয়া কি খুবই ধৃষ্টতা হবে লীলা ? মনে ক'রে দেখ, একসময়ে তোমার

সঙ্গে আমার বিয়েরও একটা কথা উঠেছিল, আমার কাছে কোনো কথা গোপন করা কি তোমার পক্ষে অধর্ম হবে না?'

সে হাসিয়া ফেলিল। কহিল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা, হবু পতিদেবতা', সে হবে এখন! সারারাতই তো প'ড়ে আছে—'

অগত্যা তখনকার মত ক্ষান্ত হইলাম। আমি বাড়ি হইতে খাবার আনি নাই, রানাঘাটে কিছু কিনিয়া লইব এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, লীলা কিছুতেই বাজারের খাবার কিনিতে দিল না। তাহার টিফিন-কেরিয়ারে খাবার ছিল, সে প্রায় সবগুলিই আমাকে ধরিয়া দিল, নিজের বেলা অজুহাত দিল যে, তাহার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই, এই অক্ষুধায় খাইলে তাহার অত্যন্ত অসুখ করিবে।

লীলাকে চিনি বলিয়া প্রতিবাদ করিলাম না। সেবা করার ইচ্ছা মেয়েটির সহজাত, গৃহস্থালির কর্মে ও সকলের সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করিবার মত মনোবৃত্তি লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান রুগ্ণ দেহ দিয়া তাহাকে এমন মারিলেন যে, তাহার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ হইয়া গেল।...তাহার নিজের খাওয়ার চেয়েও আমাকে খাওয়াইয়া নিজে উপবাস করাটা তাহাকে বেশী তৃপ্তি দিবে তাহা জানিতাম বলিয়াই, প্রতিবাদ না করিয়া সবগুলি নিঃশেষে আহার করিলাম।

তাহার পর এটা-ওটা কথা কহিতে কহিতেই গাড়ি কখন পার্বতীপুর আসিয়া গেল, টের পাইলাম না। কিন্তু, পার্বতীপুরে গাড়ি দাঁড়াইতে সহসা নজর পড়িল, প্লাটফর্মের দূর প্রান্ত দিয়া মহিমবাবু চলিয়া যাইতেছেন। আমাদের দু'জনকে কথা কহিতে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেন একটু বিস্মিত, কিন্তু নিশ্চিন্ত! লোকটি কাছে আসিল না, বরং আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেল।

কিন্তু, আমার কথাটা মনে পড়িয়া যাওয়াতে আবার লীলাকে ধরিয়া পড়িলাম, ভিতরের কথাটার জন্য। সে আর এড়াইতে পারিল না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে শুরু করিল, তাহার বা তাহাদের রোমান্স!

লীলা কহিল, 'সে অনেক দিনের কথা। তখন তুমি আমাদের বাড়িতেই থাক! তুমি লক্ষ্য কর নি, কিন্তু মহিমবাবু তখন আমাদের ঐ গলিটাতেই ভাড়া থাকতেন। আমার বয়স তখন বোধ হয় তেরো, আর মহিমবাবুর ছাব্বিশ সাতাশ।...তোমার তখন কত, পনেরো? তা হবে।

'মানুষটা তখনও ঠিক ঐরকম দেখতে। মোটা, বেঁটে এবং কালো, মাথায় টাক ঠিক তখনও না পড়লেও চুল পাতলা হয়ে এসেছিল, টাক কতটা পড়বে তা তখনই বোঝা যেত। নির্বিবাদী লোক, ঘাড় হেঁট ক'রেই গলি দিয়ে যাতায়াত করতেন, কখনও কারুর দিকে চোখ তুলে চাইতে দেখি নি। কিন্তু, তবু আমাদের পাড়াসুদ্ধ মেয়ের ঠাট্টা করার ঐ একটি মাত্র পাত্র ছিল। দিনরাত বেচারীর আনাগোনার সময় চারদিক থেকে বাক্যবাণ বর্ষিত হ'ত, আর তার উপলক্ষ্য ছিল ঐ চেহারা।

'আমার বোনেরা, পাড়ার মেয়েরা, সবাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারে মেতে উঠত বটে, কিন্তু আমি নিজে কখনও তাতে যোগ দিতুম না; বরং ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতুম। মানুষের চেহারা তো আর নিজের সৃষ্টি নয়, তা নিয়ে অহোরাত্র তাকে আঘাত দেওয়া কি ঠিক? যাই হোক্—অতগুলি মেয়ের মধ্যে আমিই যে একমাত্র ওঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগ দিই নি, এই তথ্যটি ক্রমে ওঁর কাছেও পৌছল। কী ক'রে পৌছল তা জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করতে লাগলুম যে, যখন আর কেউ থাকত না, তখন যাওয়া-আসার পথে চুপিচুপি উনি চোখ তুলে আমার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাতেন। ঐ পর্যন্ত, তখন আর বেশী বোঝার আমার সাধ্যও ছিল না, ও নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাতুম না।

'এমনি ক'রে আরও বছর দুই কাটল। মহিমবাবু ঐখান থেকেই বিয়ে করলেন। এই বিয়ে করা নিয়েই আমাদের পাড়ার যত তরুণী বা কিশোরীর দল আবার ওর পেছনে লাগল। নানা রকম অত্যাচারে বেচারী বিব্রত হয়ে উঠল। আমার কিন্তু ওঁর অবস্থা দেখে বড়ই দুঃখ হ'ত, আমি প্রায়ই ওদের অনুযোগ করতুম এই ব্যাপার নিয়ে—শেষে একদিন অনু আর বেলার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়াই হয়ে গেল। সেই রাগে বেলারা আমায় জব্দ করবার এক চক্রান্ত করলে, আর তাই-ই হ'ল আমাদের কাল!...'

এই পর্যন্ত বলিয়া লীলা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। উজ্জ্বল বিজলী আলোতে লক্ষ্য করিলাম যে, তাহার মুখটা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার নাম ক'রে ওকে প্রেমপত্র লিখলে বুঝি?'

সে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, 'ঠিক তাই!...কী লিখেছিল ওরা তা জানি না। কিন্তু, দিন-দুই পরেই তার জবাব আমার কাছে এসে পৌছল। উঃ—সে কী চিঠি পরিতোষদা, তার প্রত্যেকটি অক্ষর যেন ওর বুকের রক্ত দিয়ে লেখা! আমার সেই জাল-চিঠির জন্য বহু ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলেন যে, সেই দিন থেকে ঐ

চিঠিই হয়ে রইল তার জীবনযাত্রার পাথেয়, তার সারা জীবনের মরুভূমির মধ্যে একমাত্র স্নিগ্ধ আশ্রয়!—তারপর কী আকুলিবিকুলি! কেন আমি দু'দিন আগে তাঁর প্রতি আমার এই অনুগ্রহের কথা জানালুম না! তাহ'লে তো তিনি যেমন ক'রেই হোক আমার বাবার হাতে পায়ে ধ'রে আমাকে চেয়ে নিতেন। এমনি আরও কত কথা। যাই হোক্—সে চিঠি পেয়েই বেলার দুষ্টুমি বুঝতে পারলুম। তখনই একটা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে ওঁর ভুল ভেঙ্গে দিতে বসলুম। কিন্তু, চিঠির যখন আদ্ধেকটা লেখা শেষ হয়েছে, তখন হঠাৎ বেচারীর মুখটা আমার মনে পড়ল। এ চিঠি পেলে যে কী নিদারুণ আঘাত তিনি পাবেন মনে ক'রে আর চিঠি দিতে মন সরল না; তার চেয়ে থাকুন উনি, এই ভুল নিয়েই!

'অন্যদের কিছু বললুম না। ওরা মহিমবাবুর চিঠির কথাও জানত না। ভাবলে বোধ হয় যে, মতলবটা খাটল না। ব্যাপারটার সেইখানেই যবনিকা পড়ল, কারণ মহিমবাবুকে তারপরই বদলি হয়ে চ'লে যেতে হ'ল।

'এর পর অনেক দিন আর ওঁর কোনো খবর পাই নি, সত্যি কথা বলতে কি, ভুলেই গিয়েছিলুম। মাস্টারি চাকরি নেবার পর আমার যখন ভারী অসুখ হয়, তখনকার কথা তুমি শুনেছ তো সব? ডাক্তার বললে, মাস দুই দার্জিলিং-এ গিয়ে থাকতে, নইলে থাইসিস্ হ'তে পারে। কিন্তু, তখন বাবা নেই, ভায়েদের অবস্থাও তথৈবচ—দু'মাস দার্জিলিং-এ থাকবার খরচা দেবে কে? আমি মাইনে পাই তখন সামান্য। অগত্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চেপে গেলুম। কিন্তু, দিন-তিনেক পরেই হঠাৎ আমার নামে একটা ইন্‌সিওর এল। প্রেরকের নামটা চিনতে পারলুম না, ভেতরেও টাইপ-করা চিঠি, পাছে আমি হাতের লেখা দেখে চিনতে পারি। দু'শ টাকা পাঠিয়ে প্রেরক লিখেছেন যে, আমি যেন নিশ্চয়ই পত্রপাঠ দার্জিলিং-এ চ'লে যাই এবং সেকেণ্ডক্লাসেই যাই। এ অনুরোধ যদি না শুনি তাহ'লে শুধু যে আমারই মৃত্যুর কারণ ঘটবে তা নয়, আরও একজন লোককে আত্মহত্যার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে।

'চিঠিটা পেয়ে অনেক ভাবলুম, কিন্তু এ টাকা যে এমন দুঃসময়ে কে পাঠাতে পারে তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। তখন কিন্তু আর দেরি করারও সময় ছিল না। চ'লে গেলুম দার্জিলিং। দাতা অজ্ঞাতই রইলেন। তার পরের বছরও ঠিক গরমের ছুটির মুখে পেলুম একশ' টাকা। তার সঙ্গেও ঐ অনুরোধ, আমার শরীর খারাপ, বিশ্রাম করা দরকার; এবং সেকেণ্ডক্লাসেই যেন আমি যাই, নইলে ভিড়ে কষ্ট হবে, আমার অসুস্থ শরীর, সহ্য হবে না। বিস্ময় আরও বেড়ে গেল—

অথচ, সত্যিই গরমের সময় আমার শরীর আজকাল এত খারাপ হয় যে, কোথাও যেতে পেলে যেন আমি বেঁচে যাই! গেলুম চ'লে—কিন্তু, সেইবার দার্জিলিং যাবার সময়ই আসল কথাটা বুঝতে পারলুম। হঠাৎ দেখলুম, প্লাটফর্মের ওপার দিয়ে মহিমবাবুও ঐ ট্রেনে চলেছেন দার্জিলিং।

'কিন্তু তখনও মনে একটু সন্দেহ ছিল, কারণ মহিমবাবু কোনোদিনই আমার কাছে আসেন নি, কিংবা আলাপ করার চেষ্টা করেন নি। কোনোদিন দৈবাৎ ম্যাল্-এ দেখা হ'ত তাও দূর থেকেই। তবে সেইবার ফিরে এসে কী মনে হ'ল, রামটহলকে ( রামটহলকে তোমার মনে আছে তো? ও আমাদের বহুকালের চাকর ) নিয়ে পড়লুম। বহু জেরার পর সবই ধরা পড়ল, মহিমবাবু কোনোদিনই সামনে আসেন নি বটে, কিন্তু বরাবরই তিনি ওর মারফত আমার সংবাদ নেন। রামটহল বললে, 'তোমার অসুখের সময় বাবু আমাকে একতাড়া পোস্টকার্ড দিয়ে গিয়েছিল, রোজ চিঠি পাঠাতে হ'ত।'

'বুঝলুম, আমার অসুখের জন্য এত মাথাব্যথা কার! তখন মনে মনে নিঃশব্দে একবার অনু আর বেলাকে ধন্যবাদ দিলুম! তারপর থেকে প্রতি বৎসরই এই অভিনয় চ'লে আসছে, ঠিক গরমের ছুটির মুখে টাকাটি পাই, আর যাওয়ার দিনও প্রতিবারই দেখি ওঁর চকচকে টাকটি বহুদূর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। দূর থেকে, নিঃশব্দে পূজা ক'রেই উনি খুশী!...'

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি জেনেশুনেও টাকাটা নাও?'

সে শান্ত চোখ-দুইটি মেলিয়া কহিল, 'কেন নেব না? আমি যদি না নিতুম তাহ'লে ও বেচারার অবস্থা কী হ'ত ভেবে দেখেছ কি? আমার এই অভিনয়-টুকুই তো ওঁর জীবনের সম্বল!'

তাহার পর কতকটা অন্যমনস্কভাবেই সে কহিল, 'আর তাছাড়া আজ বোধ হয় আমার ও টাকাতে অধিকারও জন্মেছে পরিতোষদা, মনে হয় আমিও আজ ঐ কুৎসিত লোকটিকে ভালোবেসে ফেলেছি।

সে চুপ করিল।

গাড়ি হু-হু শব্দে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিল। লীলা ও আমি দু'জনের কাহারও চোখেই সে রাত্রে আর ঘুম আসিল না। সে জানালার মধ্য দিয়া দূর অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কী ভাবিতে লাগিল কে জানে! আমি ভাবিতে লাগিলাম তাহাদের কথাই—একটি রুগ্ণ মেয়ে ও একটি কুৎসিত লোকের অপূর্ব প্রণয়োপখ্যান।

## অনীতার প্রণয়-কাহিনী

লেডি মুখার্জির 'এ্যাট হোম্'। বালিগঞ্জের যত সাহেব-ঘেঁষা বড় এবং মেজো লোক, প্রায় সকলকারই নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ভিড় খুব—পুরুষরা এই ভিড়ের সুযোগে নিশ্চিন্ত হইয়া বৈষয়িক পরামর্শ বা কুৎসা করিতেছে, মেয়েরা খুঁজিতেছে 'ফ্লার্ট' করিবার মত লোক।

ইহারই মধ্যে বালিগঞ্জের সর্বাধিক বিখ্যাত সুন্দরী অনীতা বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বেতের চেয়ারে দেহ এলাইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। ইহা ক্লান্তির চিহ্ন, মানসিক ক্লান্তির—আর সেই জন্যই ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

পায়ের আওয়াজে একবার মাত্র চোখ খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া অনীতা পুনরায় চোখ বুজিল, এবং ক্লান্তভাবেই কহিল, 'এস ইন্দ্রজিৎ!'

ইন্দ্রজিৎ মুখ হইতে পাইপটা নামাইয়া নাটকীয় ভাবে কহিল, 'হে সুন্দরী-কুলশ্রেষ্ঠা অনীতা, বঙ্কিমের ভাষায় আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে যে, তোমার যে মণিমাণিক্য-খচিত, স্বর্ণ-মণ্ডিত পাদুকা একদা তুমি প্রণয়-দেবতার মস্তকে রেখেছিলে, কামদেব এতদিন পরে কি সে পাদুকা ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন?'

অনীতার ঠোঁটের কোণে এতক্ষণ পরে সামান্য একটু হাসি দেখা দিল, সে জবাব দিল—'অর্থাৎ?'

ইন্দ্রজিৎ পাশের একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, তোমার ভাব-ভঙ্গি দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, এতদিন পরে তুমি বোধ হয় কারুর প্রেমে পড়লে।'

অনীতা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, 'আর কিছু আশা হচ্ছে না?'

ইন্দ্রজিৎ হাতজোড় করিয়া কহিল, 'রক্ষে কর ভাই! এমন কি, সে আশা করতেও আমার ভয় করে! গরিব বামুনের ছেলে, কোথায় তোমাকে রাখব বল দেখি? উর্বশী দেবরাজ ইন্দ্রের ঘরেই শোভা পায়, ঠাকুরুনটিকে মর্ত্যে নিয়ে এলে মানুষ একদিনেই পাগল হয়ে যায় যে!'

তাহার পর অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, 'কী ব্যাপার বল দেখি, তুমি এমন একান্তে, চুপচাপ ব'সে আছ—কারণটা কী? তোমার ভক্তবৃন্দ যে এতক্ষণ

দিশেহারা হয়ে গেল !'

অনীতা কহিল, 'আজ মনটা সত্যিই খারাপ আছে, এমন কি ভক্তবৃন্দের স্তুতিও ভালো লাগছে না !'

ইন্দ্রজিৎ কহিল, 'কেন বল তো ? আজ সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি দৈবাৎ কেশের মধ্যে কোনো রজত-রেখা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ ?...নাকি প্রৌঢ়ত্বের অন্য কোনো চিহ্ন—'

অনীতা হাতের বাহারী পাখাটা ইন্দ্রজিতের মুখের উপর চাপিয়া কহিল, 'চুপ! কোনো মেয়েছেলেকে ও প্রশ্ন করতে নেই ! কেন যে আজ পর্যন্ত কোনো স্ত্রীলোক তোমাকে গ্রহণ করলে না, তা আজ বুঝলুম !'

ইন্দ্রজিৎ কহিল, 'না, না—তা নইলে থামকা তুমি এমন আঁধারে গা-ঢাকা দিতে চাও কেন ?'

অনীতা কহিল, 'ইস্ ! যা শ্রদ্ধা তোমার আমাকে ! আমার এই দেহটি বাদ দিয়ে মনের কোনো অস্তিত্ব বুঝি থাকতে নেই ?'

ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হইবার ভঙ্গিতে কহিল, 'তোমার মন, তোমার হৃদয় ! দেবী, তাও কি সম্ভব ?'

সত্যই বিস্মিত হইবার কথা বটে। অনীতা সুন্দরী, বিত্তশালিনী এবং অভিভাবকহীনা। কিন্তু, এই ত্রিবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে অনূঢ়াই আছে। তাহার যে পাণিও প্রণয়-প্রার্থীর অভাব হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, সে নিজেই কাহারও বিবাহ-বন্ধনে বা প্রণয়-বন্ধনে ধরা দিতে রাজি হয় নাই। বিবাহ করা তো অসম্ভব, অনীতা বলে, 'এমন কি ভালোবাসাও কঠিন ! কারণ, মেয়েরা যে সত্যই সব দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে ছোট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কাজেই একটু ঘনিষ্ঠতা হ'লেই পুরুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মেয়েদের আর উপায় থাকে না ! সেই মানসিক দাসীপনাতেই আমার আপত্তি।'

সুতরাং, আজ পর্যন্ত অনীতা অবিবাহিতাই আছে। পুরুষের সামনে সে দীর্ঘকাল রূপের লেলিহান্ শিখা বিস্তার করিয়াই আছে, বহু পতঙ্গ তাহাতে পাখা পোড়াইয়াছে বটে, কিন্তু আগুন নিভাইতে কেহ পারে নাই। ফুলের মধু খাইতে আসিয়া প্রজাপতির দলই মরিয়াছে, ফুল আছে আজও তেমনি অম্লান !

ইন্দ্রজিতের বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া অনীতা একটু হাসিল, তাহার পর কহিল,

'আচ্ছা, তোমাকে যদি বলি যে, আমি সত্যই একজনকে ভালোবেসেছিলুম, বিশ্বাস করবে?'

ইন্দ্রজিৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না। করব না।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনীতা কহিল, 'বিশ্বাস করতে না পারলে আমি নিজেই খুশী হতুম। কিন্তু, সত্যিই আমি একদা প্রেমে পড়েছিলুম।'

ইন্দ্রজিৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'তারপর, সে লোকটি কে? বল, বল, তার নাম বল—আমি সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারীটিকে তোমার বালিগঞ্জীয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হই।'

অনীতা বলিল, বোস, বোস—খামকা চেঁচিও না। একবার আহাম্মুকি ক'রে প্রেমে পড়েছিলুম ব'লে কি সত্যই আমি এত বোকা যে, নামটিও তোমাকে শুনিয়ে দেব? আর তুমি আমার পরাজয়ের সেই কাহিনী পাঁচজনকে শুনিয়ে বিখ্যাত হবে?'

ইন্দ্রজিৎ করজোড়ে কহিল, 'কিন্তু দেবী, সে অমর প্রেমের কাহিনীটা অন্তত শোনাতে হচ্ছে যে! আজ আমার একটা গল্পের বিশেষ প্রয়োজন। সম্পাদক টাকা দিতে চাইছে, কিন্তু মাথায় গল্প নেই—অতএব হে অনীতা সুন্দরী, তুমি প্রসন্ন হও।'

অনীতা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'সাড়ে চার আনার থিয়েটারগুলো কেবল দেখছ বুঝি? কথাগুলো একেবারে সেই দিক ঘেঁষা। যাক্—বললে আমি তোমাকে শোনাতে পারি, কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা ক'রো না।'

'শোন তবে—

'জানই তো আমি বিয়ে করার পক্ষপাতী নই। এবং বিয়ে বাদ দিয়ে ঐ যে আর একটা জিনিস, যাকে তোমরা বল স্বাধীন প্রণয়, তাকেও বিশেষ পছন্দ করি নে। প্রথমটায় আপত্তি এই জন্যে যে, যার সঙ্গে চিরকাল বাস করতে হবে সে রকম মানুষ মেলা শক্ত, আর দ্বিতীয়টাকে পছন্দ নয় বড় ভাল্‌গার ব'লে। নেহাতই যেন কাঙালপনা। বিয়ে করার মধ্যে তবু কিছু গৌরব আছে, পুরুষ নিজের স্বাধীনতা খুইয়ে, চিরজীবনের দায়িত্ব স্বীকার ক'রে অনেক যত্নে ঘরে নিয়ে যায়, কিন্তু ওতে কিছুই নেই! বড় বেশী হীনতা স্বীকার করা যেন, ছিঃ!'

ইন্দ্রজিৎ অস্ফুটস্বরে একবার বলিল, 'প্রবন্ধটা আপাতত থাক্ না হয়। গল্পটা পেলেই চলবে।'

ভ্রূকুটি করিয়া অনীতা জবাব দিল, 'আবার! প্রত্যেক ভালো জিনিসেরই

ভূমিকা আছে। যেমন কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা। ওটা শুনতেই হবে, নইলে গল্পটাও হয়তো বাদ পড়বে।

'যাক্—মন দিয়ে শোন।

'মনের এই অবস্থাই বরাবর, তার পরিবর্তন করার কোনো আবশ্যকতাও বুঝি নি, করিও নি। অকস্মাৎ একদিন এই লেডি মুখার্জীর এক গার্ডেন-পার্টিতে তাকে প্রথম দেখলুম, সমস্ত মানুষগুলো যখন তাদের সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমাকে দেখবার জন্যে কাড়াকাড়ি করছে তখন সেই মানুষটিই একমাত্র তার দীর্ঘ সাড়ে ছ'ফুট দেহ এবং স্বপ্নলীন চোখ নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল সমস্তক্ষণ। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে লোকটির অদ্ভুত ঔদাসীন্যই সহসা আমাকে সচেতন ক'রে তুলল, মনে মনে খেয়াল হ'ল লোকটিকে একটু খেলাবার, একটু জব্দ করার।

'তুমি তো জানোই ইন্দ্রজিৎ, যদিও আমি কারুর সঙ্গেই ফ্লার্ট করতে যাই না, তবু ফার্স্ট ক্লাস ফ্লার্ট ব'লে আমার বদনাম আছে। ভাবলুম, আমার সেই স্বাভাবিক ক্ষমতাটাকে কাজে লাগাব। সুযোগের অভাব ঘটল না—দুরাত্মার ছলের অভাব কোনোদিনই হয় না—ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধা ক'রে নিলুম, বারবার পড়তে লাগলুম চোখের সামনে, জীবন চন্দ্রমণ্ডলের মত নিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেললুম।

'কিন্তু বেচারী আমি! তূণের সমস্ত অস্ত্রই যখন একে একে নিঃশেষিত হয়ে গেল, তখন একদিন বহু বিলম্বে, আবিষ্কার করলুম যে, মানুষটি একেবারেই পাষাণ, কোনো ভাবান্তর তার মধ্যে আনবার চেষ্টা করাও পাগলামি।

'অথচ প্রথমে যা ছিল খেলা, আমার কাছে তাই তখন হয়ে উঠেছে মর্মান্তিক সত্য, আমার তখন তাকে প্রয়োজন, নাচাবার জন্যে নয়, আত্মসমর্পণের জন্য। যেদিন পরাজয়টাকে মেনে নিলুম সেই দিনই ও সত্যটাকেও মেনে নিতে হ'ল যে, ঐ পাষাণটিকেই আমার চাই, ইতিমধ্যেই কখন তার কাছে নিজেকে হারিয়েছি। কিন্তু, আমি হতাশ হলুম না, মনে পড়ল পার্বতীর ইতিহাস, মদন-বসন্তের ষড়যন্ত্রে শিবকে টলানো যায় নি বটে, কিন্তু উমার তপস্যায় তিনি ধরা দিয়েছিলেন তো?

'সেইদিন থেকেই শুরু হ'ল তপস্যা। মনে হ'ল যেন এইবার পাষাণদেবতা চোখ মেলে চাইলেন, কিন্তু তবু তখনও দৃষ্টি তাঁর প্রসন্ন নয়। বুঝলুম, আরও সাধনা চাই, অপর্ণার তপস্যা—

'অবশেষে একদিন মনে হ'ল সৌভাগ্য যেন আপনিই এসে ধরা দিতে

চাইলে। হঠাৎ একদিন এসে বললে, চল অনীতা, দিন-কতক ডায়মণ্ডহারবার ডাকবাংলোতে কাটিয়ে আসি—

'বলা বাহুল্য, আমি আর একটি মুহূর্তও দেরি করলুম না। যে অবস্থায় ছিলুম, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে চ'লে এলুম, আমার তখন আশায় আবেশে বুক কাঁপছে নবোঢ়া বধূর মত, অভিসার-যাত্রী শ্রীমতীর মত! কিন্তু, ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে বুঝলুম শিব প্রসন্ন হয়েছেন, তবে এখনও ধরা দেবার সময় আসে নি।

'হয়তো কিছু হতাশ হলুম। কিন্তু, তবুও ডায়মণ্ডহারবার ডাকবাংলোর সেই সাতটি দিনই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক'টি দিন। সব চেয়ে আনন্দের, সব চেয়ে সার্থকতার সাতটি দিন। মনে হ'ল যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সাতটি দিন আর সাতটি রাত কেটে গেল। মনে আশা হ'ল বর-প্রাপ্তির আর বেশী দেরি নেই, তপস্যার বোধ হয় শেষ হ'ল।

'কিন্তু, সাতদিন পরে ওখান থেকে ফিরে এসেই হঠাৎ সে কোথায় চ'লে গেল। কোনো খবর নেই, চিঠি নেই, এমন কি সে জানিয়েও গেল না একবার যে, সে চিরদিনের মত গেল কি না, আর কখনও আসবে কি না।

'রাগে ক্ষোভে দুঃখে পাগলের মত হয়ে উঠলুম! প্রেম আর ভালোবাসাকে একদা আমি লিভারের অসুখ ব'লে ঠাট্টা করতুম, তারই প্রতিশোধ যে এমন ক'রে নিতে হবে কে তা জানত! তুমি শুনলে ঠাট্টা করবে, কাল থেকে হয়তো লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না, তবু এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আটচল্লিশটি ঘণ্টা আমি কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, সারাদিন আর সারারাত।

'সাত-আট দিন যখন কেটে গেল তখন শুরু হ'ল, তোমরা যাকে ব'ল বায়লজিকাল রি-এক্‌শান। নিজেকে একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ডুবিয়ে দেবার, নিজেকে যেমন ক'রে হোক নষ্ট করবার ইচ্ছা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। উন্মত্ততাকে দূর করতে হবে উন্মত্ততা দিয়েই, নইলে আর বাঁচব না!

'বলা বাহুল্য লোকের অভাব হ'ল না। তোমারই সহকর্মী একজন, মানে ব্যারিস্টারিতে, সাহিত্যচর্চায় নয়—তাকে নিয়ে একদিন যাত্রা করলুম সোজা ওয়াল্‌টেয়ার। তাকে বেছে নিলুম সবচেয়ে নির্বোধ ব'লে, আমার পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল্‌গার ব'লে। কিন্তু, ওয়ালটেয়ারে গিয়েই ভুল ভাঙ্গল, বুঝলুম এ লোকটির সঙ্গে আর যাই হোক নির্জনবাস করা যায় না, তাছাড়া আমার উন্মত্ততায় ও তুষ্ট নয়। সেই দিনই ওয়ালটেয়ার থেকে ফিরলুম, কিন্তু হায় রে!

তখনও যে ভুল ভাঙে নি!

'ভাবলুম ডায়মণ্ডহারবারের যে স্বপ্নের স্মৃতি এমন ক'রে মনকে উতলা করছে সেই স্বপ্ন না ভাঙতে পারলে বোধ হয় সুস্থ হব না। তাই কলকাতায় না ফিরে সোজা হাওড়া-স্টেশন থেকেই চ'লে গেলাম ডায়মণ্ডহারবার। ডায়মণ্ডহারবার ডাকবাংলোর সামনে আমাদের গাড়ি গিয়ে যখন থামল তার কিছু পূর্বেই আর একখানা ট্যাক্সি এসে থেমেছে, তার আরোহী নেমে তখন ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছেন। আগে ভালো ক'রে চেয়ে দেখি নি, কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে যখন তার মুখের দিকে চোখ পড়ল তখনই একেবারে যেন পাষাণ হয়ে গেলুম। তোমরা যাকে বল প্রাণ লাফিয়ে ঠোঁটের কাছে আসা—সেই রকমই একটা অনুভূতি তখন বোধ হয় টের পেয়েছিলুম।

'হয়তো আমার গলা দিয়ে একটা কিছু স্বরও বেরিয়েছিল, হয়তো অব্যক্ত আর্তনাদের মত—সে চমকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে। একটি মুহূর্ত! একবার আমার মুখের দিকে আর একবার আমার সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু, সেই এক মুহূর্তের মধ্যেই তার মুখের ওপর যে কঠিন বিদ্রূপের ছায়া ফুটে উঠেছিল তা আমার চোখে এড়ায় নি।

'সে তখনই আবার গাড়িতে উঠে ব'সে স্টেশনের দিকে যাত্রা করলে। মনে হ'ল চিৎকার ক'রে ডাকি, কিন্তু পারলুম না। ছুটে যাবার চেষ্টা করলুম, কে যেন হাত ধ'রে ফেললে। একটু পরে আমরাও কলকাতায় ফিরে এলুম। স্বপ্ন ভাঙবার জন্যে গিয়েছিলুম, কিন্তু এমন ক'রে যে ভাঙবে তা কে ভেবেছিল!

'কলকাতায় ফিরে এসে দেখি আমার নামে একখানা চিঠি অপেক্ষা করছে। যখন ওয়াল্‌টেয়ার গিয়েছিলুম সেই সময় এসেছিল, ঠিকানা না-জানায় কেউ পাঠাতে পারে নি। খাম খুলে দেখলুম তার হাতের লেখা, শুধু দুটি ছত্র—

'অনীতা, মঙ্গলবার ডায়মণ্ডহারবার ডাকবাংলোতে যাব, সেইখানেই আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব, যেখানে তোমাকে পেয়েছি সেইখানেই করব তোমার কাছে আত্মসমর্পণ!'

'চিঠিখানা কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। মনে হচ্ছিল তার প্রতিটি ছত্র যেন আমাকে নির্বোধ ব'লে বিদ্রূপ করছে!'

অনীতা চুপ করিল।

ইন্দ্রজিৎ কহিল, 'তারপর?'

অনীতা কহিল, 'তারপর আর কী? কিছু না। আমার সঙ্গীমশাই দিনকতক

খুব রাগারাগি করলেন, তারপর দিনকতক আমার নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়ালেন, তারপর আবার সব ঠাণ্ডা। যথা পূর্বং তথা পরং!'

ইন্দ্রজিৎ কহিল, 'তাইতো অনীতা, অবশ্য আমি খুবই দুঃখিত তোমার জন্যে—কিন্তু এটা ঠিক, বুঝলে, গল্প হ'ল না।

অনীতা জবাব দিল, 'জানি।' *

* বিদেশী গল্পের কঙ্কাল অবলম্বনে

## কৃপণ

বর্তমান ম্যানেজারের শালা হরিহরবাবু এই মেসেই বহুকাল ছিলেন। সম্প্রতি, মাত্র মাসকতক হইল তিনি বাসা করিয়াছেন। কিন্তু, এখনও এখানে আসা-যাওয়া হৃদ্যতা পুরাদস্তুরই বজায় আছে। এ-হেন হরিহরবাবুই একদা সুধাংশুকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘটা করিয়া আমাদের কাছে তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'কখনও সেকেণ্ড হয় নি, বুঝলে মনোহর? এম-এ পাস করেছে ফিলজফিতে, বড় চাট্টিখানি কথা নয়, তা আবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে। বি-টিও পাশ করেছে একেবারে সবার প্রথম হয়ে। ছেলে নয় মনোহর, সাক্ষাৎ রত্ন! এখন এ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টারি করছে বটে, বুড়ো হেডমাস্টার ম'লে ওরই গদি।'

বলা বাহুল্য, আমরা সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই অসাধারণ রত্নটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। চেহারা দেখিয়া তাহার অসাধারণত্ব খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন—অতিশয় শীর্ণ, শুষ্ক দেহ, খাঁড়ার মত নাসিকা এবং ফরসা রং—রূপের মধ্যে এইটুকুই নজরে পড়ে। কিন্তু তা হোক্—এত বড় বিদ্বান বোর্ডার পাইয়া আমরা পুলকিতই হইলাম এবং সকলে মিলিয়া ম্যানেজারকে অনুরোধ করিলাম, খালি তিনটি সীটের মধ্যে যে-টি সবচেয়ে ভালো সেইটিই সুধাংশুবাবুকে দেওয়া হউক। ম্যানেজারেরও ভক্তি কম হয় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যবস্থাই করিয়া দিলেন।

হায় রে! তখন কে জানিত যে, এই অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তিটির জন্যই আমাদের মেসে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিবার উপক্রম হইবে!…

লোকটির গুণ প্রকাশ পাইল প্রথম দিন হইতেই—

স্নান করিবার সময় স্যুটকেশ হইতে একটা গন্ধ-তেলের শিশি বাহির করিয়া তেল মাখিয়াছিলেন, তাহার পর আর সেটাকে তুলিবার কথা মনে পড়ে নাই, যথারীতি স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই ভদ্রলোক গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা তখন আদালতে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সেই ঘরেই বসিয়া জটলা করিতেছিলাম, তখনও শোভাময়ের চোগা-চাপকান আঁটা শেষ হয় নাই, তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া পান খাওয়া চলিতেছিল। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যাপার কি সুধাংশুবাবু, আবার ফিরলেন যে ?'

মুখ বিকৃত করিয়া সুধাংশুবাবু জবাব দিলেন, 'ঐ তেলের শিশিটা মশাই, আর কি! বাক্সয় তুলে রেখে যেতে ভুলে গেছি। মেস জায়গা—বুঝলেন না, এসব জিনিস বাইরে ফেলে রাখতে নেই; একশিশি তেল তা হ'লে দু'দিনেই খতম হয়ে যাবে—'

উপস্থিত সকলেরই মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল, তিনি কিন্তু বেশ নির্বিকার ভাবে বাক্স খুলিয়া শিশিটা তুলিয়া রাখিয়া পুনশ্চ চাবি বন্ধ করিলেন এবং বার বার টানিয়া দেখিলেন তালাটা ঠিক পড়িয়াছে কি না।

শোভাময় আর থাকিতে পারিল না। সস্তাদামের একটা জঘন্য তেল, তাহারও এক-তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে—ইহারই জন্য এই অভদ্র ইঙ্গিত! সে একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিল, 'কথাটা আপনার না বলাই উচিত ছিল সুধাংশুবাবু।'

তিনি তখন দ্বারের কাছে পৌঁছিয়াছিলেন, সেইখানেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, 'কেন বলুন তো ?'

শোভাময় জবাব দিল, 'কেন? মেসসুদ্ধ লোক কি এমনই যে, আপনার ঐ জঘন্য একরত্তি তেল চুরি করবার জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে আছে। মেসের এত-গুলো লোক চোর ?'

কিন্তু, শুধাংশুবাবু বিচলিত হইলেন না, বরং ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, 'মেসসুদ্ধ লোকই বা কথাটা ঘাড় পেতে নিচ্ছেন কেন? চাকর-বাকরও তো আছে, আর কে না জানে যে, মেসের চাকররা চোর হয়!'

এবং আমরা এই অভিযোগের ভালোরকম উত্তর দিবার পূর্বেই তিনি চাবিটা

জামার নিচে পৈতায় বাঁধিতে বাঁধিতে বাহির হইয়া গেলেন। আমরা কিছুকাল পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিবার পর শোভাময়কে লইয়া পড়িলাম, 'কী দরকার ছিল তোর যেচে অপমান হবার? সত্যিই তো, ওর জিনিস ও যদি বাক্সয় চাবি দিয়ে রাখতে চায় তো রাখুক না।' ইত্যাদি—

যাহাই হউক—সারাদিনের কাজের ভিড়ে সুধাংশুবাবুর কথাটা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর মেসে পা দিয়াই শুনিলাম ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে! সুধাংশুবাবু ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে জলযোগের জন্য একপয়সার চিঁড়া কিনিয়া আনেন এবং মেসের চাকর রঘুকে আদেশ করেন চিঁড়াগুলি ভিজাইয়া দিতে। রঘু বেচারী যেমন অন্য লোকের চিঁড়া ধোয় তেমনি ধুইতে গিয়াছিল, ফলে কলতলায় কয়েকটি চিঁড়া পড়িয়া যায়। রঘু বলিল, পাঁচটা কি ছয়টা দানা, সুধাংশুবাবুর মতে একমুঠা। কিন্তু, তিনি নাকি উপর হইতে সেই একপয়সার চিঁড়া পাহারা দিতেছিলেন, পড়িয়া যাওয়া মাত্র নিচে নামিয়া আসিয়া রঘুকে কুৎসিত ভাবে গালাগাল দিয়াছেন, এমন কি একবার মারিতেও গিয়াছিলেন। অতি কষ্টে ম্যানেজার তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়াছেন।

রঘু আমাদের কাছে একদফা কান্নাকাটি করিল। তাহার মুখে সব কথা শুনিয়া আমাদের সকলেরই মন খারাপ হইয়া গেল—শোভাময় রাগ করিয়া একরকম তাঁহাকে শুনাইয়াই কহিল, 'খুব লেখাপড়া শিখেছিল বাবা, এই রকম প্রবৃত্তি!'

ইহার পর দুই-তিনটা দিন খুব নির্বিবাদেই কাটিয়া গেল। মেসের সকলেই খুব সাবধান হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় আর গোলমাল বাধে নাই, কিন্তু মানুষটি যে কত ইতর তাহার পরিচয় আবার নূতন করিয়া পাওয়া গেল কয়েক-দিন পরেই—

সুকুমার ম্যানেজারের ছোটভাই, মেসে থাকিয়া বি-এ পড়ে। তাহারও ফিলজফিতে অনার্স ছিল, সেদিন তাহার পাঠ্যপুস্তকের কী একটা কথা ভালো বুঝিতে না পারিয়া সুধাংশুবাবুর শরণাপন্ন হইল। সুধাংশুবাবু তখন আমাদের ঘরে বসিয়া আমারই কাগজখানায় চোখ বুলাইতেছিলেন, সুকুমার বইটা হাতে করিয়া লজ্জিত নতমুখে কাছে গিয়া কহিল, 'আমাকে এইখানটা একটু বুঝিয়ে দেবেন সুধাংশুদা?'

সুধাংশুবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া একপ্রকার কঠিন দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'না, মাপ করবেন। আমি বিনাপয়সায় খাটি না, দরকার হয়

মাইনে বন্দোবস্ত করবেন, রোজ সকালে একঘণ্টা ক'রে পড়িয়ে দেব।'

আমরা ঘরসুদ্ধ লোক তাহার এই অভদ্র ব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এই সামান্য উপকারটুকু করিবার জন্য কেহ এমন করিয়া কড়া কথা বলিতে পারে তাহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। মনোহরদা বুড়ামানুষ, তিনি আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'তুমি তো আচ্ছা ছোটলোক হে!'

আশ্চর্য এই যে, লোকটি গালাগালিতেও বিচলিত হইলেন না বেশ প্রশান্ত কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'কেন বলুন দেখি মনোহরবাবু, পরের ব্যাগার দিতে পারিনে ব'লে?···কেন আমি লোকের উপকার করব, আমি তো কখনও মানুষের কাছে কোনো উপকার পাই নি। কাকার বাড়ি মানুষ হয়েছিলুম—আমার বাবার নিজের ভাই, তিনি সকাল থেকে রাত-দুপুর পর্যন্ত খাটিয়ে নিতেন শুধু দু'টি পেট-ভাতের জন্য। ইস্কুলের দুটো টাকা মাইনে—তাও তিনি দিতে চান নি, বলেছিলেন রোজগার ক'রে নিতে। পাশের বাড়ির ছেলেকে অ-আ শিখিয়ে দু'টাকা ক'রে মাইনে পেতুম—তাই দিয়ে তবে ইস্কুলে পড়েছি। কেন আমি লোককে দয়া করব? আমার কাছে উপকার নিতে এসেছেন উনি, কিন্তু কাল যদি আমি মেসের টাকা দিতে না পারি ওঁর দাদা আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন? না মশায়, ও আমি পারব না—'

কথাগুলি বলিয়া সুধাংশুবাবু বেশ প্রশান্তমুখেই স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। সুকুমার ছেলেমানুষ, অপমানে তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া শোভাময় সক্রোধে কহিল, 'দাও ও ইতরটাকে আজই তাড়িয়ে—'

শচীনবাবু জবাব দিলেন, 'কিন্তু, কী ব'লে তাড়াবে শোভাময়? এক মাসের টাকা আগাম দিয়ে মেসে এসেছে, আর এমন কিছু বে-আইনি কাজও করে নি, ওর খুশি ও যদি—ব্যাগার না দেয়—তোমাদের কী?'

তা বটে······অগত্যা আমরা নীরবেই রাগে ফুলিতে লাগিলাম। বাক্যালাপ তাঁহার সহিত তো বন্ধ করিয়া দিলামই, ঠারে ঠোরে অপমান করিতেও ছাড়িলাম না। অপমানের পাত্রটি কিন্তু বেশ নির্বিকার রহিলেন। বোঝা গেল যে, কঠিন কথা লোককে বলিতেও যেমন জানেন শুনিতেও তেমনি, ওদিক দিয়া কোনো সুবিধা করা যাইবে না।

এই ভাবেই মাস ঘুরিয়া আসিল। পরের মাসে আমরা তাঁহাকে চলিয়া যাইবার নোটিশ দিব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় শোনা গেল যে, তিনি এ মাসের টাকাও আগাম দিয়া গিয়াছেন। ম্যানেজার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, 'আমরাই না হয় একটু সাবধানে থাকি। একে ঐ দুটো সীট খালি প'ড়ে থাকাতেই যথেষ্ট লোকসান হচ্ছে, তার ওপর এমন ভালো টাকা দিচ্ছে, একেও তাড়াব ?'

সুতরাং, আমরা প্রস্তাবটা চাপিয়া গেলাম। কিন্তু, একবাড়িতে বাস করিয়া প্রতি মুহূর্তে একটা মানুষকে পরিহার করিয়াই বা থাকা যায় কিরূপে? অমন যে শোভাময় সে-ও সেদিন কী একটা ছোট দরকারে অন্যমনস্কভাবে তাহার কলমটা একবার চাহিয়াছিল, কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সুধাংশুবাবু সেই একমিনিটের জন্যও কলম হাতছাড়া করেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'মাপ করবেন, কলম পাঁচজনে ব্যবহার করলে নিপের আর কিছু থাকে না—'

নিজের প্রতি ক্রোধে ও ক্ষোভে শোভাময় সেদিন সারারাত ঘুমাইতে পারিল না।

যাহা হউক—এসব অত্যাচারও সহিয়াছিল, কিন্তু অসহ্য হইয়া উঠিল, যেদিন হঠাৎ মনোহরদা আবিষ্কার করিলেন যে, সুধাংশু ইতিমধ্যে ঠাকুরকে দু'-আনা পয়সা দিয়া তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন মাছের বড় ভাগটা যাহাতে প্রতিদিন তাঁহার পাতেই পড়ে—

কথাটা শোনামাত্র আমরা দল পাকাইয়া সুধাংশুবাবুর ঘরে গেলাম তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতে। সুধাংশুবাবু এই হীন অভিযোগেও কিছুমাত্র তাতিলেন না, বরং বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এতে আপনারা এতই বা চটছেন কেন? মেসে বাস করতে গেলে এরকম একটু-আধটু ব্যবস্থা না করলে কি চলে?—এ তো সবাই ক'রে থাকে। মাছের বড় ভাগটা এমনিই আমার পাতে পড়তে পারত, সে জায়গায় না হয় দু'-আনা পয়সা দিয়ে সেটাকে পাকা ক'রে নিয়েছি—তাতে হয়েছে কী?'

রাগে তখন শোভাময়ের মুখে ফেনা কাটিতেছে, সে কহিল, 'ওসব বন্দোবস্ত কোনো ভদ্রলোক করে না, আপনি অতি ইতর তাই গর্হিত কাজ ক'রে আবার জবাব দিচ্ছেন।'

সুধাংশুবাবু এবার একটু কঠিন হইলেন, রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'মেসের চাকর-বামুনকে দু'-এক আনা পয়সা বকশিশ তো ভদ্রলোকেই দিয়ে থাকে জানতুম, তাতে আপনাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? আমি তাকে বকশিশ করেছি তাতে যদি

সে খুশী হয়ে বড় মাছটা আমাকে দেয় তা আমি আর কী করব। আপনারা না হয় ঠাকুরকে বারণ ক'রে দিন—!'

তিনি পুনরায় কী একটা বই হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে শুরু করিলেন—যেন আমরা কেহই সেখানে উপস্থিত নাই।

এমন নির্লজ্জ ছোটলোকের সহিত আর কী বিবাদ করিব! শচীনবাবু আমাদের হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন, কহিলেন, 'এ সব ছোট কথা নিয়ে আর ঝগড়া করবেন না, এ মাসের ক'টা দিন গেলে ওকে বলবেন নতুন মেস খুঁজে নিতে। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'

সেই ব্যবস্থাই সকলে মানিয়া লইলেন। স্থির করা হইল, এই মাসেরই শেষ সপ্তাহে তাঁহাকে নোটিশ দেওয়া হইবে, মেস ছাড়িয়া যাইবার জন্য। কিন্তু, সে শেষ সপ্তাহ পর্যন্তও অপেক্ষা করিতে হইল না, তাহার পূর্বেই এক অঘটন ঘটিয়া গেল—

আমাদের মনোহরদার এক অনূঢ়া ভাইঝি বহুদিন যাবৎ তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। সহসা সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাহারও পাত্র জুটিয়াছে, শ' তিনেক টাকার গহনা এবং নগদ একান্ন টাকাতেই পাত্রপক্ষ তাঁহার দায় উদ্ধার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু, সামনের সপ্তাহেই এ মাসের শেষদিন, আর ঐ দিনেই বিবাহ হওয়া চাই।

মনোহরদার বৃহৎ সংসার, আয় কম। সামান্য এক টাইপরাইটারের দোকানে চাকরি করিয়া বিশেষ কিছু জমাইতে পারেন নাই। তবুও, এই ভাইঝিকে তিনি নিজের ছেলেমেয়ের অপেক্ষা বেশী ভালোবাসিতেন বলিয়া আর দ্বিধা করিলেন না, সম্মতি জানাইয়া তখনই দেশে চিঠি লিখিয়া দিলেন।

কিন্তু, এ কয়দিন হইতেই তাঁহার ছুটাছুটির অন্ত ছিল না। সারাজীবনের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পোস্টঅফিসে যে শ' চারেক টাকা জমিয়াছিল তাহা সবই তুলিয়াছেন, আরও একশ'টি টাকা কোনোমতে অফিসের মালিকের হাতে পায়ে ধরিয়া ধার করিয়া আনিয়াছেন—এসবই আমরা জানিতাম। বাজার-হাট আমরা কিছু কিছু করিয়া দিয়াছি, গহনার অর্ডার এবং শ'-দুই টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এতদিন পরে মনোহরদা দায়মুক্ত হইলেন মনে করিয়া আমরাও যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

অকস্মাৎ বিবাহের পূর্বদিন সকালে কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সিঁড়িটার উপরেই বসিয়া পড়িয়া, মনোহরদা ছেলেমানুষের মত চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া

উঠিলেন। সকলে হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। মনোহরদা বহুদিন যাবৎ এ মেসে আছেন এবং অতিশয় ভালোমানুষ বলিয়া আমরা সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতাম। সুতরাং, সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া প্রশ্ন-বর্ষণ শুরু করিয়া দিলাম। অতিকষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া জানা গেল যে, গহনার বাকি একশত টাকা লইয়া তিনি আজ গহনা ডেলিভারি লইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গহনার দোকানে পৌছিয়া দেখিয়াছেন পকেট খালি, টাকার চিহ্ন মাত্র নাই। দশখানি নোট যেন মন্ত্রবলে উবিয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনোহরদা একবার অসহায়ভাবে আমাদের সকলকার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিলেন, 'মনু মা আমার, তোর কিছুই করতে পারলুম না—'

শচীনবাবু প্রমুখ দুই-চারিজন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কীই-বা সান্ত্বনা দিবার আছে? আজই সন্ধ্যার গাড়িতে জিনিসপত্র লইয়া রওনা না হইলে কাল বিবাহ অসম্ভব। আর গহনাও সবগুলি উপস্থিত না দেখিলে পাত্রপক্ষ যে বিবাহ দিবেন না ইহাও নিশ্চিত। অথচ, এখনই এই মুহূর্তে কে একশত টাকা তাঁহাকে ধার দিবে?

মনোহরদা চুল ছিঁড়িয়া বুক চাপ্‌ড়াইয়া স্ত্রীলোকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। টাকা যাক—কিন্তু, তাঁহার মনু মায়ের বিবাহ যে বন্ধ হইয়া গেল, তিনি কী করিয়া তাহার কাছে মুখ দেখাইবেন?

আমরা তাঁহার এই মর্মভেদী বিলাপ শুনিয়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাছাড়া আর অন্য উপায়ও ছিল না। একশত টাকা ধার দিবার মত অবস্থা বোধ হয় আমাদের কাহারও ছিল না, থাকিলেও সে কথা তখন কেহই স্বীকার করিতে চাহিল না। মনোহরদাকে সবাই ভালোবাসিতে পারে, কিন্তু একশত টাকাও যে অনেক টাকা—

গোলমাল শুনিয়া আমরা যখন নিচে আসি তখন আমাদের সঙ্গে সুধাংশু-বাবুও আসিয়াছিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু এখন সহসা নজরে পড়িল যে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া ওপাশের দালানটায় পায়চারি করিতেছেন। তাঁহাকে কেহ কখনও বিচলিত হইতে দেখে নাই, সুতরাং অল্পবিস্তর সকলেই বিস্মিত হইলাম। কিন্তু, তাঁহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ ছিল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

এধারে মনোহরদার কান্না ক্রমশ কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু শোকের বেগ

কমিল না, তিনি তখনও মধ্যে মধ্যে 'মনু মা আমার'—'ও মা' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। এ অবস্থায় আমরা সকলের চেয়ে বিব্রত হইয়া উঠিলাম, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবারও শক্তি নাই, অথচ ছাড়িয়া যে যাহার ঘরে গিয়াই বা কী করিয়া বসি ?

সুধাংশুবাবুর অস্থিরতাও যেন ক্রমশ বাড়িয়া উঠিল। তিনি একবার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তিন-চার ধাপ গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন। আর একবার সোজা মেস ছাড়িয়া বাহির হইয়াই গেলেন, কিন্তু তাও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, মিনিট-পাঁচের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। এবার সোজা কলতলায় গিয়া চৌবাচ্চা হইতে জল লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মাথায় থাব্‌ড়াইলেন, কিন্তু তবু যেন সুস্থ হইতে পারিলেন না।

আমরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এবার শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম, লোকটার হিস্টিরিয়ার ব্যারাম আছে নাকি !—

তিনি কিন্তু কলতলা হইতে ফিরিয়া আর কোনোদিকে না চাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন আমাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার হাতে রহিয়াছে একগোছা নোট !

তিনি হন্‌হন্‌ করিয়া মনোহরদার সামনে আসিয়া কহিলেন, 'এই নিন্‌ মনোহরবাবু, টাকা নিয়ে গিয়ে গয়না কিনে আনুন গে, মিছিমিছি শোক ক'রে লাভ কী ?'

আমরা তো স্তম্ভিত হইয়া গেলামই, মনোহরদাও কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। সুধাংশুবাবু তাঁহাকে টাকা ধার দিতে চাহিতেছেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ?

একটু অসহিষ্ণুভাবেই সুধাংশুবাবু কহিলেন, 'কী হ'ল আপনার ? অমন ক'রে চেয়ে আছেন কেন ?'

টাকাসুদ্ধ তাহার হাতটা দুইহাতে চাপিয়া মনোহরদা আরও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, 'ভাই তুমি মানুষ নও, দেবতা—তোমাকে আমরা কেউ চিনতে পারি নি। আমার মনুর তুমি প্রাণ বাঁচালে—'

সুধাংশুবাবু তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে টাকাগুলা গুঁজিয়া দিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, 'মেয়েটি আপনার ভাইঝি বললেন না ? আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে।......আশ্চর্য !'

এবং তারপরই উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। মনোহরদাও উচ্চস্বরে আশীর্বাদ করিতে করিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেলেন।

দশটা বাজিয়া গিয়াছিল বলিয়া তখনই স্নানাহারের উদ্যোগ করিতে হইল, আলোচনাটা ভালো কবিয়া জমিল না। সেটা পুষাইয়া লইলাম আমরা অপরাহ্ণে। সকাল করিয়া ফিরিয়া সকলে একটা ঘরে জমায়ত হইলাম, আলোচ্য অবশ্য সুধাংশুবাবুরই ব্যবহার। শচীনবাবু বলিলেন, 'প্রতিক্রিয়া!' কিন্তু শোভাময় কহিল, 'ওর মতলব খারাপ—তা সে আপনারা যে যাই বলুন না কেন।'

প্রতিক্রিয়া ও মতলব লইয়া তর্কটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে আসামী স্বয়ং ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং জলযোগের পর আমাদেরই ঘরে আসিয়া গম্ভীর মুখে কাগজ পড়িতে বসিলেন। সুতরাং, আলোচনাটা বেশীদূর আর গড়াইল না। কিন্তু, ইতিমধ্যেই আর এক ব্যাপার ঘটিল। মনোহরদা বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধিয়া যাত্রার পূর্বে আমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিলেন, প্রত্যেকের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া শেষকালে সুধাংশুবাবুর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, 'তুমি যে উপকার করলে ভাই তার ঋণ ইহজীবনে শোধ হবার নয়। টাকার ঋণও যে কবে শোধ করতে পারব তা ভগবান জানেন। যাই-হোক্—এই হ্যাণ্ডনোটটি তুমি রেখো ভাই—'

তাঁহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই সুধাংশুবাবু সহসা রূঢ় কণ্ঠে কহিলেন, 'কী মূল্য আছে আপনার ও হ্যাণ্ডনোটের। আমি কি আপনার নামে ঐ একশ' টাকার জন্যে নালিশ করতে যাব, আর করলেই বা আদায় হবে কী ক'রে? কী আছে আপনার? যান-যান, হ্যাণ্ডনোট নিয়ে যান। টাকা দিলে আর যে ফেরত পাওয়া যায় না সে আমি জানি, সে আশা রেখে দিইওনি—'

অপমানে ক্ষোভে মনোহরদার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তবুও বোধ করি তিনি সকালবেলার উপকারটা স্মরণ করিয়াই প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমরা সকলেই তাঁহার অপমানে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম, কিন্তু যে লোকটা এইমাত্র তাঁহাকে অপমান করিল এতগুলি লোকের মধ্যে সেই যে কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহার অত্যন্ত বিপদে মান রক্ষা করিয়াছে সে কথাটা ভুলিতে পারিলাম না, মনের ঝাল মনের মধ্যেই চাপিয়া যাইতে হইল।

সেদিন রাত্রে শরীর খারাপ বলিয়া সুধাংশুবাবু কিছু খাইবেন না, সন্ধ্যা

হইতেই মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। শোভাময় বিদ্রূপ করিয়া কহিল, 'টাকার শোকে মারা যাচ্ছে, ও কি এখন খেতে পারে?'

আমরা সকলেই তাহাকে বকিয়া উঠিলাম। কিন্তু, তাহার কথার মূল্য বুঝিলাম পরের দিন সকালে।

ভোরবেলা হইতেই সুধাংশুবাবু তাঁহার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিতেছেন, এই খবরটা পাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় সুধাংশুবাবু নিজে ম্যানেজারের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, কহিলেন, 'আমি আজ বিকেলেই আপনাদের মেস ছেড়ে দিচ্ছি, আমার যা পাওনা কেটে নিয়ে বাকি টাকা দয়া ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দিন—আমি ইস্কুলের ফেরত বাসা ঠিক ক'রে ফিরব।'

ম্যানেজার বিস্মিতভাবে কহিলেন, 'এমন হঠাৎ—মানে মাসের মাঝখানে—'

বাধা দিয়া সুধাংশুবাবু কহিলেন, 'আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল, গেলে আর এই লোকসানটা হ'ত না। যা এ মেসের লোকগুলি, এখানে আর দু'মাস থাকলে বোধ হয় সর্বস্বান্ত হয়ে একদিন বেরিয়ে যেতে হবে—'

## স্মারক

স্টেশনের ঠিক বাহিরেই একটা বড় চালার নিচে একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া তিন-চারিটি দোকান—চায়ের, ময়রার, মনোহারীর, এমন কি শহরের অনুকরণে একটা ধোপার দোকান পর্যন্ত—'ন্যাশনাল ডাইং এণ্ড ক্লিনিং কোং'। বড় রাস্তার ধারে একটা চওড়া নালা, তাহারই উপর গুটিকয়েক বাঁশের মাচা বাঁধা আছে, ঐ দোকানগুলিতে যাইবার জন্য। পাঁকের গন্ধের সহিত ময়রার বাসী রসের টকগন্ধ এবং চায়ের দোকানের পিঁয়াজ ও ডিমের গন্ধ মিলিয়া বাতাসকে বহুদূর অবধি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে।

ইহারই মধ্যে একদিন কাশীনাথ তাহার কাপড়-জামার ছোট্ট পুঁটুলিটি লইয়া আসিয়া উঠিল এবং বৃন্দাবন ময়রায় ভাঙা কাঠের বেঞ্চিতে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া কহিল, 'দোকানদার-ভাই তোমার ঝাঁটাগাছটা একটু দেবে, এখানটা বড্ড নোংরা হয়েছে—'

বৃন্দাবন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল ষোল-সতেরো বছর বয়সের শ্যামবর্ণ

ছিপছিপে গঠনের একটি ছোকরার, চেহারার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই, শুধু দাঁতগুলি ভারি চমৎকার তাহার, মুক্তার মত শুভ্র এবং পরিপাটি, হাসিটিও ভারি মিষ্ট। আর হাসিয়াই আছে সে, সদাসর্বদা।......

প্রশ্ন সে করিল বটে, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা রাখিল না, দোকানের ভিতর হইতে ঝাঁটাটা বাহির করিয়া আনিয়া শুধু বৃন্দাবনের দোকানই নয়, সব কয়টি দোকানের সামনেই নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করিল। তারপর পিছনের পুকুর হইতে ঝাঁটাটা ধুইয়া আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া কহিল, 'আঃ, এখন কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি, কী নোংরা হয়েই ছিল এতক্ষণ! আমি আবার নোংরামি দেখতে পারিনে—'

তাহার পর পকেট হইতে একটা আনি বাহির করিয়া কহিল, 'যা-হোক কিছু মিষ্টি দাও না ভাই, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

গায়ে পড়িয়া উপকার করিবার প্রবৃত্তিকে কেহ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, বৃন্দাবনও এতক্ষণ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার কার্যকলাপ দেখিতেছিল—এখন আনিটি দেখিয়া তাহার মুখভাব স্নিগ্ধ হইল। সে বাহিরে আসিয়া দুটি বড় বড় রসগোল্লা তাহার হাতে দিয়া কহিল, 'তোমার নিবাস কোথায় খোকা?'

—'নিবাস আমার সেই মুকসুদোবাদ জেলা গো।'

বৃন্দাবন কহিল, 'এখানে কোথায় যাবে?'

কাশীনাথ একেবারে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, যেন মস্ত বড় একটা ঠাট্টা করা হইয়াছে; কহিল, 'কোথায় যাব তা জানি না। কাজের নেগে এসেছি গো—কাজকর্ম মিলবে?'

বৃন্দাবনের দৃষ্টি আবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, 'কাজের জন্য এতদূর এসেছ দেশভুঁই ছেড়ে?—তা শহরে গেলে না কেন?'

কাশীনাথ কহিল, 'এসেছিলাম আমি চিনির কলে কাজ করতে, তা ভাই পোষাল না: বড্ড খাটুনি, তাছাড়া যত মেড়োর ভিড়, ও আমার ভালো লাগল না। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলাম।'

ইহার আগের স্টেশনটাই একটু শহরের মত, চিনির কলটা সেখানেই। সুতরাং, বৃন্দাবন আশ্বস্ত হইল। কিছু যেন চিন্তিতকণ্ঠেই কহিল, 'কাজ আর এখানে কোথায় মিলবে ভাই, এক বাবুদের বাড়ি চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।'

সাগ্রহে কাশীনাথ প্রশ্ন করিল, 'মিলবে সেখানে?' বাবুরা কেমন লোক?'

বৃন্দাবন কপালে বদ্ধহাত তুলিয়া কহিল, 'কর্তাবাবু দেবতুল্য লোক, যদি পায়ে পড়তে পার তো হিল্লে একটা হবেই।'

কাশীনাথ পুঁটুলিটা তুলিয়া লইয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল, 'যাই তাহ'লে এখনই—।'

তাহার জলপান হইয়া গিয়াছিল।

বৃন্দাবন আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, 'এই পথ ধ'রে সোজা চ'লে যাও—ঐ যে আমগাছের ফাঁকে হল্‌দে দালান দেখা যাচ্ছে, ঐটেই।'

কাশীনাথ সামনের দেউড়িতে ঢুকিতে সাহস করিল না। ঘুরিয়া পিছনের বাগানে ঢুকিয়া পড়িল। বাগানের যে দিকটা ফুলবাগান, সেইখানেই গ্রামের জমিদার শঙ্করবাবু দাঁড়াইয়া বাগানের তদারক করিতেছিলেন, আন্দাজে তাঁহাকেই কর্তাবাবু বুঝিয়া একেবারে সামনে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

শঙ্করবাবু একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, 'কী রে?'

কাশীনাথ তাঁহার কণ্ঠস্বরেই বোধ হয় ভরসা পাইল, তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি ফুটিয়া উঠিল মুখে; কহিল, 'আপনার কাছে চাকরি করব বাবু।'

শঙ্করবাবু হাসিয়া কহিলেন, 'আমার কাছে চাকরি করবি? কিন্তু, লোকের তো আমার দরকার নেই।'

কাশীনাথ মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, 'তা জানি না বাবু, আপনার চরণেই স্থান দিতে হবে।'

—'কি মুস্কিল—লোক যে ঢের রয়েছে রে! না-হয় কাছারিবাড়িতে যা, যদি সেখানে কিছু খালিটালি থাকে; তা তুই ছেলেমানুষ, সেখানেই বা কী কাজে আসবি তাও তো বুঝছি না!'

এবার প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কাশীনাথ জবাব দিল, 'কাছারিতে আমি যেতে পারব না, আমি আপনার সেবা করব বাবু। মাইনে টাইনে চাইনে, আমায় শুধু দু'টি খেতে দেবেন।'

যে মালী বাগানে কাজ করিতেছিল, সে ধমক দিয়া কহিল, 'কেন শুধু শুধু বাবুকে দিক্ করছ? কাজ নেই বলছেন।'

কাশীনাথ একেবারে মালীর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'মালীভাই, রাগ ক'রো না। আমি ঠিক বাবুর চরণের তলায় জায়গা ক'রে নেব।'

শঙ্করবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, 'আচ্ছা যাক্ যাক্। তোর বাড়ি কোথায় রে? চুরি-টুরি ক'রে পালাবিনে তো আবার?'

কাশীনাথ জবাব দিল, 'আজ্ঞে না বাবু, রেখে দেখুন।…বাড়ি আমার মুখসুদোবাদ, নিমতিতে—।'

শঙ্করবাবু কহিলেন, 'আচ্ছা বাড়ির ভেতর যা। এই, কে আছিস রে, একে বৌমার কাছে নিয়ে যা তো, বল্‌গে, এ আমাদের এখানে কাজ করবে।'

কাশীনাথ চলিয়া গেলে মালী ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, 'চেনা নেই শুনো নেই ভিন্‌-দেশের ছেলে, বাবু অমনি তাকে বাড়ির মধ্যে জায়গা দিলেন। ও ছোঁড়া বদমাইশ বাবু।'

শঙ্করবাবু অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, 'না-না, ও এখনও ছেলেমানুষ যে কানাই, বদ্‌মাইশি এখনও শেখে নি।'

বহাল হইতে যা দেরি, কাশীনাথ তিনদিনের মধ্যেই পসার জমাইয়া তুলিল। সেবা সে নিটোলভাবেই করিতে পারে। বিপত্নীক শঙ্করবাবুর সেবা বিধবা পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে ক্ষুণ্ণ হইত না। কিন্তু, এমন শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য তিনি অনেক দিন পান নাই। ভোরবেলা চোখ খুলিতেই কাশীনাথ মাজন-জল-গামছা আনিয়া হাজির করে, পাইখানার গাড়ু পৌঁছাইয়া দিয়া আসে, বাহির হইতে আসিলে পা ধোয়াইয়া মুছাইয়া দিতে একটি মুহূর্ত বিলম্ব হয় না, আহারের পরে পা টিপিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া তবে নিজে আহার করে। রাত্রেও সেই ব্যবস্থা। এত চটপটে, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান সেবক শঙ্করবাবু অনেকদিন পান নাই। কাশীনাথ প্রথম দিন চাকরদের ঘরে শুইয়াছিল, দ্বিতীয় দিন হইতে তাহার শয়নের স্থান নির্দেশ হইল বাড়ির মধ্যে, উপরেই। আরও দিনচারেক পরে একদিন শঙ্করবাবুর রাত্রে বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি সাধারণত কাহাকেও বিরক্ত করিতেন না, সেদিনও নিঃশব্দেই উঠিয়া নিচে আসিয়াছিলেন। দ্বার খুলিয়া বাহিরে পা বাড়াইবেন, এমন সময় সহসা পিছনে আলোটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে দেখিলেন, কাশীনাথ আলোটা বাড়াইয়া গাড়ু হাতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেইদিন হইতে শঙ্করবাবু আদেশ দিলেন, কাশীনাথ রাত্রে তাঁহার ঘরের সামনের দালানেই থাকিবে।

শুধু শঙ্করবাবু নহেন, বাড়ির গৃহিণী, তাঁহার বিধবা পুত্রবধূও কাশীনাথের উপর খুব সন্তুষ্ট। কাশীনাথ তাঁহার পুষ্পচয়নের সময় ডাল নোয়াইয়া ধরে, গাছে উঠিয়া চাঁপাফুল পাড়িয়া দেয়, বাগান খুঁটিয়া পুনর্নবা শাক সংগ্রহ করে, ফাই-ফরমাশে ঝড়ের আগে ছোটে। সব চেয়ে তাহার মহৎ গুণ, হাসি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে এবং কাজ দিলে মনে মনে চটে না, খুশীই হয়!

শঙ্করবাবুর একটিই ছেলে ছিল, এখন আছে একটিমাত্র পৌত্র হরিচরণ, তাহার

বয়স তেরো এবং আর একটি পৌত্রী কমলা, তাহার বয়স পনেরো। এই দুইটি ক্ষুদে মনিবের মন যোগাইতে অন্য ভৃত্যেরা হিমসিম খাইয়া যাইত। কিন্তু, কাশীনাথ অতি সহজেই তাহাদের হাত করিয়া ফেলিল। শুধু হাত করা নয়, ছেলেমেয়ে দুইটি তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। আসল কথা, তাহাদের সমবয়সী বা খেলার সাথী এ বাড়িতে কেহই ছিল না—তাহারা কাশীনাথকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল এবং অনায়াসে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ককে লঙ্ঘন করিয়া প্রায় বন্ধুত্ব পাতাইয়া বসিল। এমন কি, কে কখন এই ভৃত্য-বন্ধুটিকে দখল করিবে, এই লইয়া ঈর্ষা বা কলহেরও অভাব ছিল না।

হরিচরণের যখন এই ভৃত্যটিকে প্রয়োজন, তখন কমলার তাহাকে না হইলে চলে না, আবার সে যখন কমলার কোনো ফরমাশ খাটে, তখনই হরিচরণের কোনো জরুরী আদেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর সেগুলি তখনই করা চাই, নহিলে রাগারাগি, মান-অভিমান পর্যন্ত গড়াইত। বিশেষত, এ বিষয়ে কমলার ঈর্ষাটাই বেশী ছিল, তাহার বিশ্বাস হরিচরণের উপরই কাশীনাথের পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী।

একদিনের কথাই বলি—কাশীনাথ সবে খাইতে বসিয়াছে, হরিচরণ আসিয়া হুকুম করিল, 'কাশীনাথভাই, টপ ক'রে খেয়ে নাও, আমাকে একটু বেলের আঠা পেড়ে দিতে হবে।'

কাশীনাথের অবশ্য তাহাতে আপত্তি নাই। সে যতটা সম্ভব দ্রুত আহার শেষ করিয়াই হরিচরণের সহিত চলিল বাগানের দিকে। কমলার মা ছেলেকে মৃদু তিরস্কার করিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য, মনিব বা ভৃত্য কেহই তাহাতে বিশেষ কর্ণপাত করিল না। কমলা তখন বাগানের কচি আমড়া সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল, এই দুইটিকে দূরে পুকুর পাড়ের বেলগাছের দিকে যাইতে দেখিয়া অকস্মাৎ ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। সে-ও আঁচলের আমড়াগুলি একটা নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া পিছনে পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কাশীনাথ সবে বেলগাছ হইতে বেল সংগ্রহ করিয়া নামিয়াছে, কমলা আসিয়া গম্ভীরভাবে আদেশ জানাইল, 'কাশী, আমাকে এক থোলো আমড়া পেড়ে দিবি? সেই মগ্‌ডালে চমৎকার এক থোলো আমড়া হয়ে আছে!'

হরিচরণ প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল, 'এসেছ হিঁস্‌কুটি? আর সহ্য হ'ল না!...ও এখন যাবে না, যাও।'

কমলা তাহার জ্যেষ্ঠাজনোচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া শুধু ডাকিল, 'কাশীনাথ

—শিগ্‌গির এস।'

হরিচরণ কহিল, 'দাঁড়াও, মাকে আমি ব'লে দিচ্ছি, ভাত খেয়ে উঠেই তুমি আমড়া খাচ্ছ।'

কিন্তু, কমলা তাহাতেও দমিল না। কহিল, 'মাকে আমিও ব'লে দিতে জানি। তুমি ভাত খেয়ে উঠেই ঘুড়ি ওড়াবার যোগাড় করছ!'

হরিচরণ তখন অন্য পথ ধরিল, বলিল, 'এইমাত্র ভাত খেয়ে উঠল ছেলেটা, আচ্ছা দিদি তোর কি একটু দয়া-মায়া নেই! এই ঠিক দুপুর রোদে বারবার গাছে উঠতে বলছিস—দেখছিস কিরকম ঘেমে গেছে।'

কমলা খিঁচাইয়া উঠিল, 'আহা এত দয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল! নিজে যখন গাছে উঠতে বলেছিলেন, তখন এসব কথা মনে ছিল না?'

হরিচরণ কোনোদিকেই সুবিধা করিতে না পারিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, 'আমার এখন ওকে দরকার আছে।'

কাশীনাথ তাড়াতাড়ি কহিল, 'আচ্ছা দাদাবাবু তুমি দু'-মিনিট দাঁড়াও না, আমি এক্ষুনি আসছি। ও আর কতক্ষণ লাগবে? তুমি ততক্ষণ আঠা লাগাও না, আমি এসে পড়লাম ব'লে, লক্ষ্মীটি!'

সে কমলার আগেই দৌড় দিল আমড়াগাছের দিকে।

আসলে কমলার আমড়াতে কোনো প্রয়োজনই ছিল না, আমড়া ছিলও তাহার কাছে প্রচুর—সমস্তটাই জেদের ব্যাপার। কিন্তু, কাশীনাথ ঘর্মাক্তদেহে আরক্ত মুখে গাছে চড়িতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না। আহা, মিছিমিছি বেচারাকে কষ্ট দেওয়া! সে একটু ইতস্তত করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিল, 'কাশী, নেমে আয় না হয়—দরকার নেই আমড়ার!'

কিন্তু কাশী নামিল না, কহিল, 'না দিদিমণি, এ আর কতটুকু বাকি আছে, এই পৌঁছে গেলাম।'

সেখান হইতে আমড়ার গুচ্ছটি পাড়িয়া নিচে ফেলিয়া দিয়া যখন সে নামিয়া আসিল, তখন বাস্তবিকই তাহার দিকে চাওয়া যায় না।

সে অবশ্য গাছ হইতে নামিয়াই হরিচরণের উদ্দেশে ছুটিতেছিল, কিন্তু কমলা তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিল না, তাহার একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া গাছের ছায়াটায় টানিয়া আনিয়া কহিল, 'এক্ষুনি যেতে পাবিনে তুই, আবার রোদ্দুরে ছুটোছুটি করলে আর বাঁচবিনে— '

কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার দু'টি চোখ ছলছল করিতেছে। সেদিকে চাহিয়া সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই কমলা যে নিজের আঁচল দিয়া তাহার ঘাম মুছাইয়া দিয়া আঁচল দিয়াই তাহাকে বাতাস করিতেছে, সেটা সে প্রথমটা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই! চমক যখন ভাঙ্গিল সে বলিয়া উঠিল, 'ওকি করছ দিদিমণি, ওতে যে আমার পাপ হবে। একটু গরমে আমার কিছু হয় না, ও আমার অভ্যাস আছে। দেশে থাকতে রোজই দুপুরবেলা কাটত আমার গাছে গাছে—।'

বলিয়া কোনোমতে কমলার হাত ছাড়াইয়া সে ছুটিয়া গেল হরিচরণের কাছে। হরিচরণ তখন মুখটা গোঁজ করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। কাশীনাথ পাশে বসিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকিল, 'দাদাবাবু রাগ করলে? আমি তো খুব তাড়াতাড়ি এসেছি।'

হরিচরণ জবাব দিল না, মুখখানা তেমনিই ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

কাশীনাথ তাহাকে খুশী করিবার অন্য উপায় না পাইয়া ঘুড়ি জুড়িতে বসিল। একটু পরেই কহিল, 'এ বেলটাতে তত আঠা নেই, আর একটা বেল পাড়ি?'

আসল কথাটা যে কী, তাহা হরিচরণের জানিতে বাকি ছিল না। সে কোনোমতে হাসি চাপিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু, কাশীনাথ যখন সত্য-সত্যই আবার গাছে চড়িতে আরম্ভ করিল, তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, 'আর বেল পাড়তে হবে না, তুই নেমে আয়।'

কাশীনাথ কহিল, 'এই যে হয়ে গেল দাদাবাবু, ঐ বেলটা নিয়েই—'

ধমক দিয়া হরিচরণ কহিল, 'নেমে আয় বলছি। বেল আমার চাইনে।'

অগত্যা কাশীনাথ নামিয়া আসিল। নিচে আসিয়া আগেকার ভাঙা বেলটা হাতে করিয়া কহিল, 'তবে এইতেই জুড়ে ফেলি, কী বল?'

'না, ঘুড়ি আমার চাইনে, জুড়তে হবে না তোকে।'

অর্থাৎ, এটাও রাগের কথা। কাশীনাথ কি করিয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। তখন হরিচরণই উঠিয়া তাহার হাত হইতে বেলটা কাড়িয়া লইয়া তাহার হাত ধরিয়া গাছতলায় জোর করিয়া বসাইয়া দিল। তারপর সহসা দুই হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধের উপর গালটা রাখিয়া কহিল, 'বোস্ দেখি চুপ ক'রে একটু।'

কাশীনাথ কহিল, 'কিন্তু, ঘুড়িটা জুড়ে রাখলে হ'ত না?'

'না, না, ঘুড়ি আমি আজ আর ওড়াব না। তার চেয়ে তুই ব'সে একটা গল্প বল্—'

তারপর গলাটা আরও একটু নামাইয়া কহিল, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে কাশী? খেয়ে উঠেই দু'বার গাছে চড়া—। আমি আর কক্ষনো তোকে বলব না—'

কাশীনাথ জবাব না দিয়া তাহাকে একটা হাতে জড়াইয়া ধরিল।

আরও নিবিড়ভাবে তাহার কাঁধে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া হরিচরণ কহিল, 'গল্প বল্ একটা, তোর দেশের গল্প।'

এমনি করিয়াই চলে। এই প্রায়-সমবয়সী বালক ভৃত্যটিকে উপলক্ষ্য করিয়া দু'টি ভাই-বোনের খুনসুটির অন্ত নাই। ইতিমধ্যেই কমলা কি করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিল, হরিচরণের প্রতিই কাশীনাথের পক্ষপাতিত্ব বেশী। সেজন্য সে সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই ঠিক হরিচরণের প্রয়োজনের সময়ই কাশীনাথকে তলব করিত এবং সম্ভব-অসম্ভব ফরমাশ করিত।

একদিন স্নান করিতে গিয়া কমলার কানের একটা দুল কি করিয়া খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল জলের মধ্যে। বকুনি খাইবার ভয়ে সে কাহাকেও কোনো কথা না বলিয়া একেবারে শরণাপন্ন হইল কাশীনাথের—'কী হবে কাশী?'

কাশীনাথ অভয় দিয়া বলিল, 'কী আর হবে, ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে তুমি চান করেছ দেখিয়ে দাও দিদিমণি, আমি খুঁজে দেব'খন।'

কমলা জায়গাটা ঢিল ছুঁড়িয়া বুঝাইয়া দিল, কিন্তু কাশীনাথের তখনই খোঁজা হইল না, কারণ সেটা কর্তার স্নানাহারের সময়, সে সময়ে কাশীনাথের হাজির থাকা প্রয়োজন। তাহার পরও কতকগুলি এমন কাজ পর-পর আসিয়া পড়িল যে, তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর রহিল না। একেবারে সে সময় পাইল আহারের পর—কিন্তু, তখন সেটা অনেকখানিই পাঁকের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। সে একবার করিয়া মুখ তুলিয়া দম লয়, আবার বহুক্ষণ ধরিয়া ডুব গালিয়া খোঁজে। অবশেষে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় যখন দুলটা পাওয়া গেল, তখন কাশীনাথের চোখ দুইটি হইয়া উঠিয়াছে রক্তের মত লাল এবং দেহের বর্ণ পাংশু।

কমলা উপরের জানালা হইতে রুদ্ধনিশ্বাসে এতক্ষণ তাহার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল, এখন ছুটিয়া নামিয়া আসিল, কিন্তু কাশীনাথের দিকে নজর পড়িবা-মাত্র তাহার দুলের উৎসাহ চলিয়া গেল, সে শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল, 'তোর কী চেহারা

হয়েছে রে কাশী, অসুখ করবে না তো ?'

কাশীনাথ তখন সেই দারুণ গরমেও ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিবার উপক্রম করায় মাথা ধরিয়া উঠিয়াছে তাহার—তবু সে জোর করিয়া বলিল, 'না, কিছু হবে না।...নাও, নাও, ফুলটা প'রে ফেল।'

কিন্তু, কমলা ততক্ষণে নিজের আঁচল হইতে খানিকটা কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সেটা কাশীনাথের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কমলা কহিল, 'এইটে দিয়ে আগে গা-মাথার জলটা মুছে নে—না-না, আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে, বেশ ভালো ক'রে মোছ, আমি দৌড়ে গিয়ে তোর শুক্‌নো কাপড় নিয়ে আসছি—'

সে সত্যই ছুটিয়া কাপড় আনিতে গেল।...

কিন্তু, তবু জ্বর ঠেকানো গেল না। সন্ধ্যার পূর্বেই জ্বর আসিল কাশীনাথের। প্রবল জ্বর, তাহার সহিত বমি প্রভৃতি অন্য উপসর্গ। পরের দিন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কহিলেন, 'নিউমোনিয়ার সম্ভাবনা আছে—জ্বরটা সোজা নয়।'

বাড়িতে গভীর উদ্বেগের ছায়া পড়িল। কাশীনাথ যে কখন সাধারণ ভৃত্যের গণ্ডি ছাড়াইয়া অন্তরের এতটা গভীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। চিকিৎসা-সেবার কোনো ত্রুটি হইল না, বরং অন্য ভৃত্যদের মনে হইল—এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে।

সব চেয়ে বিপদ হইল কমলার। সে বেচারা পর-পর দুই রাত্রি ঘুমাইতে না পারিয়া তৃতীয় দিন সকালে আরক্তমুখে দাদুর কাছে গিয়া নিজের অপরাধ খুলিয়া বলিল। মা শুনিয়া বকাবকি করিলেন খানিক—কিন্তু, দাদু শুধু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, 'তুই যে তোর দোষ বুঝতে পেরেছিস, এইতেই আমি খুশী হয়েছি দিদিভাই!...তুই ওরে সেবা করতে চাস নিজে?...কর্ না—'

কমলাকে মা এই দুইদিন কাছে যাইতে দেন নাই, যদিচ হরিচরণ সমস্ত তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া সারাদিনই প্রায় কাশীনাথের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত—এখন দাদুর অনুমতি পাইয়া কমলাও আসিয়া শিয়রে বসিল। দুই ভাই-বোনই তাহাকে ঔষধ খাওয়ায়, মুখে জল দেয়, বাতাস করে—একান্ত আত্মীয়ের মতই সেবা করে। শুধু রাত্রে শঙ্করবাবু জোর করিয়া উঠাইয়া দেন তাহাদের, তাই কোনোমতে রাতটা বিছানাতেই কাটে, আবার ভোর না হইতেই তাহারা আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করে। এমনিভাবেই, সত্যকারের স্নেহ সংস্কারকে

অতিক্রম করিয়া চলে—প্রতিদিন।

একদিন দুপুরের দিকে হরিচরণ স্নানাহার করিতে গিয়াছে, কমলা বসিয়া আছে একা, হঠাৎ কাশীনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর সে চিনিতে পারিল, চুপিচুপি কহিল, 'কে, দিদিমণি?...তোমাকে অনেকদিন খুঁজেছি দিদিমণি।...আমার, আমার মুখটা মুছিয়ে দেবে দিদিমণি আর একবার? সেই, সেদিনের মত?'

কমলা প্রথমটা তাহার কথা ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিল না, তাহার পর হাসিয়া কহিল, 'কিন্তু, তোর মুখে তো ঘাম নেই কাশী, জলও লেগে নেই, কী মোছাব?'

দুর্বলকণ্ঠে, অস্ফুটস্বরে কাশীনাথ জবাব দিল, 'তা হোক্‌না দিদিমণি, মুছিয়ে দাও না!'

সে ভুল বকিতেছে বুঝিয়াও কমলা আঁচল দিয়া তাহার মুখটা মুছাইয়া দিল। কিন্তু, পরক্ষণেই কাশীনাথ আবার চোখ বুজিল। তাহার চৈতন্য ততক্ষণে আবার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

কাশীনাথ দীর্ঘদিন ভুগিয়া সারিয়া উঠিয়াছে। রোগ চলিয়া গিয়াছে, এখন প্রয়োজন শুধু বলটা ফিরিয়া পাওয়ার। কিন্তু তাহাও, আহার্যের বন্দোবস্ত যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে বেশী দেরি হইবে বলিয়া মনে হয় না—তাহার কৃশতা কাটিয়া ইতিমধ্যেই তাহার বলিষ্ঠ মাংসপেশীগুলি ক্রমশ পূর্বের আকার ধারণ করিতেছে। কাজকর্মের ফরমাশ তাহাকে কেহ না করিলেও, সে নিজেই একে একে সেগুলি আবার নিজের হাতে তুলিয়া লইতে চায়।

কিন্তু তবু, কোথায় যেন তাহার কী একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। সবই সে ফিরিয়া পাইয়াছে—পায় নাই শুধু পূর্বের উৎসাহ! কাজ করিতে করিতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, আগেকার মত কাজ না থাকিলেও গায়ে পড়িয়া খাটিতে যায় না। মাঝে মাঝে একা পুকুরের পাড়ে গিয়া বসিয়া থাকে, বসিয়া বসিয়া কী যেন ভাবে।...তাহার এ ভাবান্তর একমাত্র কমলার মা লক্ষ্য করেন, ভাবেন দুর্বলতা।

ইতিমধ্যে সহসা কমলার বিবাহ পাকিয়া উঠিল। কাশীনাথের অসুখের মধ্যেই কোথাকার এক জমিদার তাঁহার ছেলের জন্য কমলাকে দেখিতে আসিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছিলেন। তখন অবশ্য কথা ছিল—বিবাহটা হইবে অগ্রহায়ণ

মাসে, কিন্তু এখন হঠাৎ তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহাদের অসুবিধা আছে, শ্রাবণ মাসেই হওয়া চাই। পাত্রটি ভালো, সুতরাং শঙ্করবাবুকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল।

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। সময় খুব কম, অথচ সমারোহের কোনো ত্রুটি হইলে চলিবে না—শঙ্করবাবু জলের মত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন। হাঁক-ডাক ছুটাছুটির অন্ত রহিল না। কাশীনাথের সুপ্ত উৎসাহ যেন সহসা ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার মুখে আবার ফিরিয়া আসিল পূর্বেকার অকারণ হাসি। সে-ই ছুটাছুটি করিতে লাগিল সবচেয়ে বেশী—কোথায় গয়লা, কোথায় জেলে, কোথায় বাজনদার, কোথায় কাঠের গোলা—সর্বত্র, সব সময়েই কাশীনাথ ঝড়ের আগে ছোটে। ফলে সকলেই নিশ্চিন্ত হইল, কারণ কোনো কাজেই আর কোনো ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা রহিল না।

কিন্তু, সবচেয়ে ভাবান্তর হইল কমলার। আগেকার মত গাছকোমর বাঁধিয়া বাগানে বাগানে ঘোরে না। সে লাফালাফি, চিৎকার, আবদার কিছুই নাই। মুখ তাহার নত হইয়াই থাকে, আর সে-মুখে ক্ষণে-ক্ষণেই অকারণে রক্তাভা খেলিয়া যায়। এ যেন নূতন কমলা—সহস্র কাজের ফাঁকেও কাশীনাথ মুগ্ধ ও বিস্মিত নেত্রে তাহার এই রূপান্তর লক্ষ্য করে। সে যেন আশা করে—আগেকার মত আবদার, ফরমাশ—না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হয়। না চাহিতেও মধ্যে মধ্যে তাহার প্রিয় জিনিসগুলি বাগান হইতে আহরণ করিয়া আনে, কমলা স্মিতহাস্যে সেগুলি গ্রহণ করে, কিন্তু আগের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে না। বালিকা কমলা কোন্ মন্ত্রবলে কবে যে তরুণী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কাশীনাথ বুঝিতে পারে নাই।

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীর দলে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে, কাজের চাপে কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। কমলাকে সর্বদা নারীর দল ঘিরিয়া আছে, সমবয়সীরা কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করিতেছে, প্রবীণারা দিতে-ছেন উপদেশ, আর ছোট ছেলেমেয়ের দল শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে!

তাহারই ফাঁকে এক সময়ে দালানের মুখে কাশীনাথের সহিত দেখা হইয়া গেল। গত তিনদিনের মধ্যে কাশীনাথ তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পায় নাই—কথা বলা তো দূরের কথা। তবু সেদিনও সে ব্যস্তভাবে চলিয়াই যাইতে-ছিল, সহসা কমলা পিছন হইতে ডাকিল, 'কাশী—এই কাশী!

কাশীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল। কমলা কহিল, 'এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলি, এত খাটছিস কেন? আবার যদি ভারী অসুখে পড়িস? এবার আর

আমি কিন্তু সেবা করতে আসব না।'

কাশীনাথের নিকষ পাথরের মত মুখে একটা বেগুনী আভা যেন এক মুহূর্তের জন্য খেলিয়া গেল। সে মাথা নত করিয়া জবাব দিল—'আর, এই আজকের দিনটা তো ? তারপর কাল থেকে তো ছুটি !'

কমলা কহিল, 'তা হোক্—তবু একটু জিরিয়ে নেওয়া ভালো। জল খেয়েছিস ?'

কাশীনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'হাঁ', তারপরই একরকম ছুটিয়া চলিয়া গেল। কমলার দিকে একবার মুখও ফিরাইল না। বোধ হয় সেটুকু অবসরও নাই তাহার।......

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল—বরযাত্রীর দলও আসিয়া পড়িয়াছে। হাঁক-ডাক আরও বেশী শুরু হইল, আর সেই সঙ্গে যেন কাশীনাথেরও কর্মক্ষমতা দশগুণ বাড়িয়া গেল। একটা মানুষ যেন দশখানা হইয়া সব কাজের আগে ছোটে। কমলার মা মেয়েকে সাজাইতে সাজাইতে সজল চোখে বলিলেন, 'কাশীনাথ আর জন্মে তোদেরই ভাই ছিল কমলি—একেবারে আপনার জন না হ'লে এত খাটতে পারে না।'

এই স্নেহের সুরটির সহিত বিগত কয়েক মাসের সহস্র স্মৃতি মনে পড়িয়া কমলার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কত অত্যাচারই করিয়াছে সে, কত অকারণ জিদ্ !......সে যেন একবার মাকে কী বলিতেও গেল, কিন্তু চারিদিকের অসংখ্য আত্মীয়াদের দেখিয়া আবার লজ্জায় মাথা নত করিল।

বিবাহ নির্বিঘ্নে মিটিয়া গেল। প্রাচীন জমিদারবাড়ির বাসরঘর সারারাত নৃত্য-গীত-হাস্য-পরিহাসে মুখর ও জমজমাট হইয়া উঠিল। কাশীনাথ একবার নানা কাজের ফাঁকে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেল বাসরঘর আর তাহার মধ্যে বধুবেশিনী কমলাকে। বিস্ময়ের যেন তাহার অন্ত ছিল না। এ কোন্ কমলা, তাহার ক্রীড়াসঙ্গিনী কমলা নিশ্চয়ই না। কিন্তু, বেশী ভাবিবার সময়ও আর তাহার ছিল না—কাজের ঘূর্ণাবর্তে আবার সে সম্পূর্ণরূপে তলাইয়া গেল।

তাহার এই অপরিসীম পরিশ্রমের অবসাদ আসিল পরের দিন ভোরে। বাহিরে বর-সভার এক কোণে সতরঞ্চির উপরই পড়িয়া সে বোধ করি শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করবাবুই প্রথম দেখিতে পান এবং তাহাকে ডাকিতে

নিষেধ করেন। কিন্তু, সে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াও আর যেন কোনো কাজে মন দিতে পারিল না; সারাদেহে তাহার অসহ্য বেদনা—পা পাথরের মত ভারী—তাহার চেয়ে ভারী বোধ হয় তাহার মন—কোথা হইতে কতদিনের ক্লান্তি আর অবসাদ আসিয়া যে তাহার মনে জমা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সমস্ত কাজ এড়াইয়া দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। গতদিনের পরিশ্রম স্মরণ করিয়া তাহাকে কেহ সেজন্য অনুযোগও করিল না।

কমলাও উৎসবের এই উন্মত্ত সমারোহের মধ্যে কাশীনাথের কোনো সংবাদই লইতে পারে নাই। পরের দিনকার সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইতে একেবারে যখন একটু অবসর মিলিল, তখন একবার হরিচরণের কাছে সে খবর লইয়াছিল। কিন্তু, সে-ও ভালোরকম খোঁজ দিতে পারিল না। অবশ্য খোঁজ-খবর করিবার মত অবস্থাও কমলার ছিল না। উপবাস ও রাত্রি-জাগরণে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তখন, তাহার মুখের দিকে চাহিলে ভয় করে। মা তাহার অবস্থা দেখিয়া জোর করিয়া তাহাকে দু'টি ভাত খাওয়াইয়া একেবারে উপরে নিজের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন—দুই ঘণ্টার আগে যেন কেহ তাহাকে না ডাকে।

একটা দীর্ঘ দিবানিদ্রা দিয়া কমলা যখন উঠিল, তখন বাড়িতে হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে—কাশীনাথকে নাকি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আহারের সময় কমলার মা চারিদিকে তাহার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও কোনো পাত্তা মেলে নাই। শেষ খবর আসিয়াছে স্টেশন হইতে, সে নাকি দেড়টার ট্রেনে কলিকাতার দিকে গিয়াছে! কেন, কোথায়—তাহার যাইবার কী প্রয়োজন হইল, সে কথা সে কাহাকেও জানাইয়া যায় নাই। সব চেয়ে বড় কথা, একেবারে একবস্ত্রে চলিয়া গিয়াছে—তাহার কাপড়জামাগুলিও পড়িয়া রহিয়াছে।

এই কয়দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে এমন অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া গেল—এই কথা স্মরণ করিয়া কমলার মা বারবার চোখ মুছিতে লাগিলেন। কমলার মনটাও বেদনায় ভারী হইয়া উঠিল। তাহার বিদায়ের ক্ষণটি পর্যন্তও সে অপেক্ষা করিতে পারিল না! একটা কথাও বলিতে পারিত তো সে!···কিসের অভিমান, কাহার উপর রাগ করিয়া সে এমনটা করিল, তাহাও বুঝিতে পারিল না। অপরাধটা তাহারই হইল কি না জানিতে না পারিয়া সারাক্ষণ তাহার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

আত্মীয়স্বজনদের দু'একজন 'চুরি করিয়া পলাইল কি না খোঁজ করিবার'

উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করবাবুর ভ্রূকুটি দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। কোনো নীচ কাজ সে করিতে পারে না, তাহা শঙ্করবাবু জানেন—যদিচ আসল কারণটা তিনিও কিছুতে অনুমান করিতে পারিলেন না।

অপরাহ্ণের পূর্বেই বরবধূ বিদায় লইবে। কাশীনাথকে লইয়া মাথা ঘামাইবার বেশী অবসর কাহারও নাই। কমলাকে সাজাইতে বসিলেন সকলে। অলঙ্কারগুলি ভালো করিয়া পরাইয়া দিতে দিতে সহসা এক সময়ে মা প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁরে, তোর সে পুরোনো আঙটিটা কী করলি?'

কমলা বিস্মিত হইয়া খালি আঙুলের দিকে চাহিল। বৎসর-দুই পূর্বে একটি মুক্তার আঙটি দাদু তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছিলেন, ছোট হওয়াতে সেটি গত কয়েক মাস কনিষ্ঠাতে উঠিয়াছিল। তাহার দাগ এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে—কিন্তু, সে আঙটিটা নাই। যেন সদ্য কেহ খুলিয়া লইয়াছে।

মুহূর্ত-কয়েক শূন্যদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাথা নত করিয়া কমলা কহিল, 'খুলে রেখেছি মা, বড্ড ক্ষয়ে গিয়েছিল।'

কমলার মা আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না।

## এ-জন্মের পাপ

নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত যে ছোট লাইনটি গিয়াছে তাহারই একটি ট্রেনে তাহার সহিত আমার প্রথম এবং শেষ দেখা।

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর যাইতেছিলাম, সুতরাং এই ট্রেনে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু, তাহাকে রেলগাড়ি বলিলে গাড়ির অপমান করা হয়। সে এক কিম্ভূতকিমাকার গাড়ি। কোনোটা গাড়ির মত, কোনো-কোনোটা খোলা, খেলাঘরের গাড়ির মত। যায় লোকের আঙ্গিনা দিয়া, মাঠের ও ক্ষেতের উপর দিয়া।

অমনি এক খোলাগাড়িতে সেদিন চড়িয়া বসিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ছোট কামরা, চারখানি মাত্র বেঞ্চি, কিন্তু এত ছোট নয় যে, দু'জন আরোহী ধরে না, সুতরাং আমি উঠিয়া বসিতেই যখন গাড়ির এতক্ষণের একমাত্র ও অদ্বিতীয় আরোহীটি নামিয়া মেঝেতে বসিল তখন আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না।

কহিলাম, 'নেমে বসলে কেন হে কত্তা, উঠেই বোস।'

লোকটির আকৃতি দেখিলে চাষী বলিয়াই মনে হয়, বয়স একটু বেশীই—বোধ হয় ষাট পার হইয়াছে, ভাবভঙ্গি অতিশয় নরম।

সে ঘটা করিয়া একটা নমস্কার করিল, তারপর জিভ কাটিয়া কহিল, 'ও আদেশ আর করবেন না বাবুমশায়! আপনাদের সামনে কি আর আমরা সমান-সমান বসতে পারি?…গতজন্মে কত পাপ ক'রে এসেছিলুম, তাই এ-জন্মে কত কষ্ট পাচ্ছি—আবার এজন্মে?…উহুঁ!'

মনে করিলাম যে, লোকটার নিশ্চয় টিকিট নাই, তাই চিরাচরিত প্রথানুসারে টিকিট-কাটা ও না-কাটার ব্যবধান রাখিতে চায়। পুনশ্চ কহিলাম—'তা হোক—তুমি উঠেই বোস।'

সে যেন আমার মনের কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, 'ভাববেন না যেন আমি টিকিট করি নি—টিকিট না ক'রে কখনও রেলে চড়ি না, তা হেঁটে যেতে হয় সেও ভালো। গেল জন্মে ঠকিয়েছি, তাই এ-জন্মে সবেতে বঞ্চিত হলুম, আবার!'

বলিয়া সে মেরজাই-এর পকেট হইতে হল্‌দে টিকিটখানা বাহির করিয়া কহিল, 'একটা বিড়ি খাব বাবুমশায়?'

বিলক্ষণ! একে সে টিকিট করিয়াও মেঝেয় বসিয়া যাইতেছে, তাহার উপর নিজের পয়সায় বিড়ি খাইবে তাহারও অনুমতি! লোকটার শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া বর্তমান শিক্ষাকে মনে-মনে ধিক্কার দিতে দিতে কহিলাম, 'নিশ্চয় খাবে, সেকি কথা।'

সে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল, তারপর বাহিরের অজস্র ফুলে ভরা সরিষা ক্ষেতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আমিও কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু, লোকটার সৌজন্য এতটাই মনে লাগিয়াছিল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখ তাহার দিকে ফিরিয়া আসিল। কহিলাম, 'বাড়ি কোথায় বাপু তোমার?'

সে অবশিষ্ট বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া একবার নাকে-কানে হাত দিল, তারপর আর একদফা নমস্কার করিয়া কহিল, 'অপরাধ নেবেন না বাবু, বাড়ি! বাড়ি আমার উলো!'

—'কোথায় যাবে?'

সে একটু মৌন থাকিয়া কহিল, 'যাব শান্তিপুর বাবু!—সেখানে আমার বৌমার বাপের বাড়ি।'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আর বাবু যাওয়া !—যাওয়ার আর আমার পথ নেই ! গত বছর এমনি সময়েই দু'টি দিনের আড়াআড়িতে দু'-দুটো জোয়ান ছেলে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল।—ছিল একটা গুঁড়ো মেয়ে আর একটা নাতি, ছেলের ছেলে। ওদেরই মুখ চেয়ে বাবু বুড়ো-বুড়ী খাটছিলুম, তা আজ আবার তিনদিন হ'ল মেয়েটার বেহুঁস জ্বর। ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে কাল ডাক্তার এনেছিলুম, সে বললে নিমুনিয়া, তিন-চার টাকার ওষুধ লাগবে।—তাই, তাই—কিন্তু, তাও ভগবানের সইল না। আজ খবর পেলুম পরশুদিন নাতিটা হয়ে গেছে—ওঃ-হো-হো !'

লোকটি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমার বুকের মধ্যেটাও মোচড়াইতে লাগিল, কিন্তু একটি সান্ত্বনার বাণীও মুখ দিয়া বাহির হইল না। এই একান্ত শোকার্ত বৃদ্ধকে কী বলিয়া সান্ত্বনা দিব ? মঙ্গলময় দয়াময়ের এই নিষ্ঠুর শাস্তির কথা শুনিয়া শুধু পাষাণ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

লোকটা একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, 'শুনে আর স্থির থাকতে পারলুম না বাবুমশায়। ওষুধ কেনার টাকা নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম, বাচ্চা বৌ, সে কী করছে এতক্ষণ কে জানে !···আর ওষুধ কিনেই বা কী হবে ? ও কি বাঁচবে, ও-ও যাবে।' ভগবান আমার ঘরে আর কাউকে রাখবেন !···উঃ, গতজন্মে কী পাপ ক'রেই এসেছিলুম রে !'

একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কহিল, 'বাবুমশায় কিছু মনে করবেন না, সামলাতে পারলুম না—বুড়ো হয়েছি, আর ক্ষমতা নেই সইবার !'

সে চুপ করিয়া মাথাটা দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া বসিয়া রহিল—আমি তখনও সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। সে আরও মিনিট-পাঁচেক পরে কহিল, 'এবার বুড়ীকেও আর রাখা যাবে না, আমার বুকে যা সয়েছে, তা সে মেয়েমানুষ হয়ে সইতে পারবে কেন ? সে-ও যাবে এবার !'

আমি পকেট হইতে একটা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া কহিলাম, 'বাপু আমার একটা কথা রাখতে হবে, এই টাকাটায় যাবার সময়ই ওষুধ আর ফল যা ডাক্তার কিনে নিতে বলেছে কিনে নিয়ে যাবে।'

সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'ও পাপে আর আমায় ডোবাবেন না বাবু, যাবে তো সবাই, থাকবার কেউ নয়, মাঝখান থেকে আপনার কাছে পিতিগ্যেয়ো ক'রে পাপে ডুবব কেন ? আপনি আমার মেয়েকে অমনিই আশীর্বাদ

করুন—তাতেই যদি বাঁচে তো বাঁচবে।'

আমি কিন্তু নোটটা তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিলাম, 'আমি বামুনের ছেলে, আমার কথা না রাখলে আরও পাপে ডুববে। এটি তোমায় নিতেই হবে।'

সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নোটটি মাথায় ঠেকাইয়া পকেটে রাখিল, তারপর দুইহাতে সে আমার পা-দুইটা ধরিয়া কহিল, 'তবে কথা দিন দেবতা যে, এই পাপে যেন আবার আসছে জন্মে না এই রকম ভুগতে হয়।'

আমি তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কহিলাম, 'কিছু ভয় নেই—এতে তোমার কোনো পাপ হবে না।'

ইতিমধ্যে শান্তিপুর আসিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে সামান্য একটা গামছা জড়ানো পুঁটুলি ছিল; সে সেটা হাতে করিয়া লইয়া নামিয়া গেল এবং অতি দ্রুত প্লাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া মাটির পথ ধরিল। আমি ভারী ব্যাগটা লইয়া মুটের মাথায় চাপাইয়া যখন গেটের কাছে পৌছিলাম, তখন পিছন হইতে এক পুলিশের দারোগা ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'আপনার গাড়িতে যে লোকটা ছিল, ওকে টাকা-পয়সা কিছু দেন নি তো?'

বিস্ময়ের সীমা রহিল না, বলিলাম, 'কেন বলুন তো?'

দারোগাবাবু বলিলেন, 'লোকটা ধড়িবাজ, জোচ্চোর; লাইনে লাইনে ঘোরে আর নতুন যাত্রীর দেখা পেলে নানারকম গল্প ফেঁদে ঠকিয়ে টাকা নেয়।'

অত্যন্ত রূঢ় আঘাত, বোধ করি মুখটা কিছু বিবর্ণ হইয়াছিল, সেদিকে চাহিয়া দারোগা শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, 'নিয়েছে নাকি কিছু? বলুন, তাহ'লে ছুটে গিয়ে ধরি।

মিনিটখানেক স্বপ্নাবিষ্টের মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তারপর কহিলাম, 'না, আমায় ঠকায় নি।'

আগামী জন্মের শাস্তি হইতে যখন মুক্তি দিয়াছিই, তখন এজন্মের শাস্তিটাও না হয় মাপ করিলাম।

পূজা কন্‌সেশন চলিতেছে আজ কয়েকদিনই। কিন্তু, আজ হইতেই পূজার ছুটি আরম্ভ। সমস্ত সেভেন্ আপ ট্রেনখানা লোকে লোকারণ্য—হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, কাবুলী, মাড়োয়ারী, সিন্ধী, ওড়িয়া, সাঁওতালী, বাঙালী—ভারতের প্রায় সব ভাষা-ভাষী এবং সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীই সেই প্রয়াগে আসিয়াছেন। কিন্তু, মিলিত হইতে পারেন নাই। গালাগালি হাতাহাতি ঠেলাঠেলি এবং কিছু-বা রক্তারক্তিও চলিয়াছে, তবু শেষ পর্যন্ত যাত্রীরা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া কোনোমতে উঠিতেছেই—আর পরক্ষণেই পুরাতনদের দলে মিশিয়া বামপন্থীদের প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ফিরিওয়ালার চিৎকার, মুটেদের বচসা ও যাত্রীদের কটূক্তি সমস্ত মিলিয়া স্থানটিকে নরমেধ-যজ্ঞের আসর করিয়া তুলিয়াছে বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না।

ইহারই মধ্যে, ট্রেন ছাড়িবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটি বাঙালী যুবক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একটা মাঝারি কামরার হাতল ধরিয়া টপ্ করিয়া পা-দানিতে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির মধ্য হইতে বাংলা ও হিন্দুস্থানা ভাষায় নানা প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, 'এখানে নয়, এখানে নয়', 'হিঁয়া জা'গা কাঁহা', 'আগে যাও, বহুত খালি হ্যায়' ইত্যাদি। কিন্তু, ছেলেটি অবিচলিত ভাবে হাতের ছোট স্যুটকেশ এবং আরও ছোট্ট বিছানাটা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল, তাহার পর ধমক দিয়া কহিল, 'দেখ্‌তা নেহি, গাড়ি ছোড় দিয়া ?'

তাহার পর দরজা খোলা অসম্ভব দেখিয়া সে জানালা দিয়াই গলিয়া অনায়াসে ভিতরে চলিয়া আসিয়া একটা বিছানার বাণ্ডিলের উপর দাঁড়াইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল।

গাড়ির মধ্যের অসন্তোষ তখনও যায় নাই। একজন রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, 'ইঞ্জিনের দিকে দেদার জায়গা খালি প'ড়ে রয়েছে, তবু সকলে এইখানেই ভিড় করবে !'

ছেলেটি তখন চোখ বুজিয়া দম লইতেছিল, সে চোখ মেলিয়া বক্তার দিকে চাহিয়া হাসিয়াই জবাব দিল, 'আপনি আবার ই-আই-আরের গাড়ির সামনের

দিকে চড়তে বলেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একবার শিহরিয়া উঠিলেন। সম্প্রতি এতগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে কথাটা সকলেই একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সহসা মনে পড়িয়া গেল। তবু একজন ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 'খামকা ই-আই-আরেরই বা দোষ দিচ্ছেন কেন, এই তো সেদিন ঢাকা মেলে কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল !'

ছেলেটি কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে একটু হাসিল, তাহার পর কহিল, 'তা বটে ! কিন্তু সে-ও তো আমারই দোষে।'

আমারই দোষে !!

নিমেষের মধ্যে গাড়িসুদ্ধ লোক যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারই দোষে, এ কথার কী অর্থ হইতে পারে ?

—'ব্যাপার কী মশাই ?'

একজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন। আর একজন কহিলেন, 'আপনি কি ওখানে চাকরি করেন ? মানে, ই-বি-আরে ?'

সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ওধারের বেঞ্চে গুটিকয়েক বাঙালী ভদ্রলোক যতখানি সম্ভব বিছানা বিস্তৃত করিয়া বসিয়াছিলেন, উত্তরটা শুনিবার অসুবিধা তাহাদেরই বেশী। ফস্ করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন একটু সরিয়া বসিয়া কহিলেন, 'এইদিকে আসুন না দাদা, কতক্ষণ আর কষ্ট ক'রে যাবেন ? জায়গা একরকম ক'রে হয়েই যাবে এখন।'

বলা বাহুল্য আগন্তুক আর দ্বিধা করিল না। কোনোমতে স্তূপাকার মোট-ঘাট ঠেলিয়া মাড়াইয়া এপাশে আসিল এবং তাঁহাদেরই বিছানো জাজিমের উপর বেশ আরাম করিয়া বসিল।—'আঃ, বাঁচলুম ! ছুটোছুটি ক'রে এসে দাঁড়ানো যা কষ্ট !'

সে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাইল।

এধারে শ্রোতারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুখবন্ধস্বরূপ প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার নামটি কী, জিজ্ঞাসা করতে পারি ?'

ছেলেটি হাসিয়া জবাব দিল, 'বিলক্ষণ ! তা পারবেন না কেন ? আমার নাম, অসিত—অসিতারঞ্জন সেন।'

এইবার আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন, 'তা ঢাকা মেল দুর্ঘটনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক শুনতে পেলুম না তো ?'

রহস্যজনক ভাবে হাসিয়া অসিত জবাব দিল, 'মানে, আমি ঐ গাড়িতে ছিলুম আর কি !'

সকলেই বিস্মিত হইল। কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সকলেই প্রথমে পরস্পরের মুখের দিকে এবং পরে অসিতের মুখের দিকে চাহিল। অসিত কিন্তু তখন নির্বিকার ভাবে সিগারেট টানিতেছে, আর সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে।

শেষে একজন প্রশ্ন করিলেন, 'তার মানে? আপনি ছিলেন তা কী হয়েছে?'

সিগারেটের খানিকটা ছাই ঝাড়িয়া অসিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দেখুন, কথাটা আমার বলবার ইচ্ছে ছিল না মোটে, আপনাদের পেড়াপীড়িতেই বলতে হচ্ছে। এর মধ্যে যে ক'টা ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল তার সব ক'টাতেই আমি ছিলুম।'

কথাটা ঠিক-মত বুঝিতে না পারিলেও, অকস্মাৎ, বোধ করি অকারণেই, একটা হিম শৈত্য সকলের মেরুদণ্ড দিয়া দেহের নিচের দিকে যেন নামিয়া গেল। অনেকেরই মুখ হইয়া উঠিল বিবর্ণ।

অসিত কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছে, 'এমনি আমার দুর্ভাগ্য, যে ট্রেনেই আমি চড়ব একটা-না-একটা কিছু ঘটবেই! প্রায়ই আমি ই-আই-আরে যাই, শুধু পরখ করার জন্যেই সেবার ই-বি-আরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। যাবার সময় গিয়েছিলুম দার্জিলিং মেলে, বিশেষ কিছু হয় নি বটে, কিন্তু একটা কথা আপনারা হয়তো শোনেন নি—তিন-তিনটি লোক সেদিন দার্জিলিং মেলে কাটা পড়েছিল, আর একটা ফায়ারম্যানের দুটো আঙুল একেবারে উড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলুম, ফেরবার পথেও হয়তো অমনিই একটা কিছু ছোট-খাটোর ওপর দিয়ে কেটে যাবে, কিন্তু তা হ'ল না। তাও যখন সারারাত কাটল তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম, ঘুমও একটু এল, কিন্তু কে জানত মশাই যে, শেষ রাত্রে ঢাকা মেল অমন ক'রে এসে আমাদের ঘাড়ে চাপবে!'

'ইস্!'

দৃশ্যটা মনে পড়িয়াই বোধ হয় অসিতের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! সে একটুখানি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিল, 'সে যে কী মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য মশাই, কী বলব আপনাদের! সকাল হ'তে বেরিয়ে যখন দেখলুম ঐ সব অবস্থা, কারুর দেহের খানিকটা তাল পাকিয়ে গেছে, কারুর পাঁজরা ভেঙ্গে বুকে খানিকটা গর্ত, কারুর বা হাত-পা কোথায় উড়ে গেছে তার কোনো খবরই নেই—তখন সত্যি-সত্যিই মনে হ'ল যে, কাছা

কাছি কোনো গাছ খুঁজে নিয়ে গলায় দড়ি দই—! কী অনুশোচনা যে হ'ল তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। মনে হ'ল কেনই বা শখ ক'রে পরীক্ষা করতে এসেছিলুম, আমি যদি না আসতুম তা হ'লে তো আর এমনটা ঘটত না!'

অসিত চুপ করিল।

গাড়িসুদ্ধ তখন নিস্তব্ধ, শুধু তাহার ঠিক পাশেই যিনি বসিয়াছিলেন, রাধিকাবাবু তাঁহার নাম, তিনি প্রাণপণে একটুখানি ওপাশে সরিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখে চোখে, একটা ভয়ার্ত ব্যাকুলতা, কাহারও বা কথাটা শুনিতে শুনিতে মুখটা অনেকখানি হাঁ হইয়া গিয়াছিল, তিনি এখনও বুজিতে পারেন নাই, কেহ বা বহুক্ষণ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বসিয়া থাকিয়া ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলিতেছেন!

অনেকক্ষণ পরে ওপাশের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি কতকটা নিজেকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যেই বলিয়া উঠিলেন, 'ই সব আপনার বুঝা ভুল আছে বাবুজী!'

অসিত একটুখানি ম্লান ভাবে হাসিল, কোনো জবাব দিল না।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি তখন তাতিয়া উঠিলেন, 'হাসলেন যে বাবু? আপনে ছিলেন ঐ বিহিটা ডিজিয়াস্টারের সময়?'

অসিত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ছিলুম বৈকি! আর না থেকে উপায়ও ছিল না লালাজী, আজকাল আমি খুব দরকার না থাকলে ট্রেনে চাপি না, চাপলেও চেষ্টা করি দিনের বেলা যে সব ট্রেনে যাওয়া যায় সেই সব ট্রেনে যেতে; কিন্তু, সেদিন উপায় ছিল না ঐ ট্রেনে না এসে!'

তাহার পর রাধিকাবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, 'বললে বিশ্বাস করবেন না হয়তো, তারপর প্রায় পনেরো দিন ঘুমোতে পারি নি! যখনই ঘুমোতে চেষ্টা করতুম চোখের সামনে ভেসে উঠত ঐ সব চেহারা! কারুর মাথাটা থেঁৎলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, কারুর হয়তো সমস্তটাই চটকে তাল পাকিয়ে গেছে, শুধু মধ্যে প্রাণটুকু ধুক্-ধুক্ করছে। আর সে কী গোঙানি মশাই, এখনও মনে হ'লে যেন হাত-পা অবশ হয়ে আসে।'

রাধিকাবাবুর ওপাশে যিনি বসিয়াছিলেন, মনে হইল তিনি যেন চোখ বুজিয়া বেঞ্চিতে ঠেস দিয়া কান্নাই চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাধিকাবাবুও হেঁট হইয়া কুঁজা হইতে উপর্যুপরি তিন গ্লাস জল খাইয়া ফেলিলেন। আর পিছনের বেঞ্চে যে কয়জন মহিলা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখের চেহারা তো অবর্ণনীয়!

লালাজীর হাতে ছিল অর্ধভুক্ত একটা পেয়ারা, তিনি কম্পিত হস্তে সেটা

বাহিরে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, 'সব ঝুট্। আপনে খালি আমাদের ডর লাগাচ্ছেন।'

আবার সেই ম্লান হাসি। অসিত হাত দুইটা জোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইল। কহিল, 'ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই তো অহরহ করি লালাজী যে, একবার অন্তত এ ভয়টাকে ঝুট্ ক'রে দাও—তিনি শোনেন কৈ ?...সেদিন সকালে যখন পাঞ্জাব এক্সপ্রেসটা ফেল হয়ে গেল তখনও পরের দিন যাব ব'লেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা ছিল রাত্রের ট্রেনে আর যাব না। ছোটভাই বললে, 'দাদা একটা মিথ্যে কুসংস্কারের জন্যে কাজ ক্ষতি করবে ? দেরাদুন এক্সপ্রেসে চ'লে যাও—'। আমিও তাই বুঝে গেলুম, ভাবলুম সত্যিই বোধ হয় কুসংস্কার আমার, এবারে তাই প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু, রাত্রে ঘুমোতে পারি নি লালাজী, গোটা কামরার মধ্যে আমিই জেগেছিলুম শুধু—'

দম লইবার জন্যই বোধ হয় অসিত থামিল। নিজের অজ্ঞাতে রাধিকাবাবুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'তারপর ?'

অসিত কহিল, 'তারপর আর কী! ব্যাপারটা যখন ঘটল তখন অবিশ্যি আর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু চৈতন্য যখন হ'ল, তখন উঠে ব'সে আগে নিজেরই গালে মুখে চড়াতে লাগলুম! যদি রাত্রের ট্রেনে না চড়তুম তাহ'লে তো আর এইটি হ'ত না!...বিশেষ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন দেখতে হ'ল চোখের সামনে জ্বলন্ত গাড়ির মধ্যে থেকে লোকগুলো প্রাণের দায়ে চিৎকার করছে, অথচ তাদের বাঁচানো যাচ্ছে না, তখন যে প্রাণের মধ্যে কী হ'তে লাগল তা কাউকে বোঝানো যাবে না—'

অকস্মাৎ পিছনের বেঞ্চি হইতে একটি বৃদ্ধা মহিলা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ওরে বাবারে, আমি যে রোগা মেয়েকে দেখতে যাচ্ছি রে, আমার কী হবে রে—'

চাহিয়া দেখিলাম আরও দুই-একজন মহিলা আঁচলে চোখ মুছিতেছেন, ওপাশের শিখ-দম্পতিটি ব্যাপার ঠিক না বুঝিলেও গাড়িসুদ্ধ সকলের ভয় লক্ষ্য করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। আর সব চেয়ে কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন রাধিকাবাবু, পাশের ভদ্রলোকটির কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া কহিলেন, 'আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে, একটু হাওয়া করুন কেউ।'

অসিত মহিলাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'আপনারা এত ভয় পাবেন জানলে আমি এসব কথা বলতুম না, ইস্—ভারি অন্যায় হয়ে গেল।'

কিন্তু, মানুষের স্বভাব এমনিই যে, যতই ভয় পায় ততই তাহার সেই ভয়ের বস্তু সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ে। ওধারে দু'টি যুবক বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা অনেকদিন আগে সেই যে পাঞ্জাব মেলের ব্যাপার হয় তাতেও কি আপনি ছিলেন?'

অসিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ছিলুম বৈকি! তাতেই তো আমার বাবা মারা যা'ন। আমি বাবাকে নিষেধ করেছিলুম, তিনি শোনেন নি।'

যুবকটি কী একটা কথা বলিতে গিয়া যেন চাপিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে কহিল, 'আচ্ছা এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই কি রাত্রিবেলা?'

অসিত জবাব দিল, 'সমস্ত। সেদিন হরিদ্বার যাচ্ছিলুম দিল্লী হয়ে, এখানে থেকে সারা পথটা দিনের ট্রেনে ট্রেনে গেলুম। কিন্তু, দিল্লী গিয়ে ভাবলুম যে, এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সবই তো বিহারে, এত পশ্চিমে কি আর কিছু হবে? তাইতেই তো ঐ কাণ্ডটি ঘটল। দেরাদুন-দিল্লী এক্সপ্রেসে চড়লুম, তা-ও গেল।… আহা, এক বিধবা তার একমাত্র ছেলে নিয়ে যাচ্ছিল হরিদ্বার, বিধবাটি গেল বেঁচে, কিন্তু তারই চোখের ওপর ছেলেটা মরে গেল—'

ওপাশের বৃদ্ধাটি কান্না থামাইয়া অসিতের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি আবার ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আর রাধিকাবাবুর অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তাঁহার শেষ মুহূর্তই বুঝি বা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তখন শ্বাসের মত করিয়া নিশ্বাস লইতেছেন।

লালাজী কহিলেন, 'আ-আপ্‌নে কোথায় যাবেন বাবু?'

অসিত জবাব দিল, 'এলাহাবাদে।'

এলাহাবাদ! অর্থাৎ, কাল সকাল ছয়টা পর্যন্ত।

পিছনের যুবকটি কহিল, 'দিনে দিনে যাবার কি আর কোনো উপায় নেই আপনার?'

অসিত কহিল, 'তাহ'লে কি সোজা যাই?…কালই মোকদ্দমা আছে আমার।'

গাড়িসুদ্ধ সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু মহিলাটির ফোঁপানোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই তখন শোনা যাইতেছিল না। অসিতও বোধ করি তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল।'

একটু পরেই গাড়ি আসিয়া বর্ধমান পৌছিল। সেখানেও খুব ভিড়, দুই-একজন তাহার মধ্যে আমাদের কামরায় ঢুকিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু কোনো-মতে কপাট খুলিতে না পারিয়া আবার অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে গেলেন। কিন্তু, কখন

যে ইহার মধ্যে লালাজী মোটঘাট বাঁধিয়া লইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া দরজার কাছ পর্যন্ত পৌছিয়াছেন—তাহা আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই।

শিখ ভদ্রলোকটি সবিস্ময়ে কহিলেন, 'কেঁও শেঠ্‌জী, আপ্‌ হিঁয়া উতর্‌তে হৈঁ? দিল্লী তক্‌ নেহি জাইয়েগা?'

ততক্ষণে ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইয়াছে, তাড়াতড়ি নামিয়া পড়িয়া লালাজী প্ল্যাটফর্ম হইতে কী জবাব দিলেন তাহা ঠিক শোনা গেল না, তবে এইটুকু শুধু বোঝা গেল যে, তিনি আর এই ট্রেনে দিল্লী যাইতে প্রস্তুত নহেন। অন্য যে কোনো গাড়িতে, যত দেরিতেই হউক যাইবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। কিন্তু, তবুও গাড়ির সকলেই চুপচাপ, কাহারও কোনো কথা কহিবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। সকলের মুখের চেহারা যেন এই দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে।

অসিত ততক্ষণে লালাজীর শূন্যস্থানে নিজের বিছানাটা বিছাইয়া আরাম করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু সে-ও কোনো কথা আর তুলিল না। অনেকক্ষণ পরে সহসা রাধিকাবাবু অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনাকে একটি কথা বলব?'

স্মিতমুখে অসিত কহিল, 'বলুন।'

রাধিকাবাবু একবার ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, 'আ—আমরা, আমি বলছিলুম কি, আপনি এ গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্রেনে গেলে হ'ত না?'

অসিত কহিল, 'সে তো আগেই বলেছি আমি, উপায় নেই। কাল আমার মোকদ্দমার দিন আছে।'

রাধিকাবাবু কিছু উষ্ণস্বরেই কহিলেন, 'তাই ব'লে এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন করবেন আপনি?'

প্রশান্ত মুখে অসিত জবাব দিল, 'কী করব বলুন! উপায় কী?'

রাধিকাবাবুর সঙ্গেরই অপর একজন রাগিয়া বলিলেন, 'উপায় কী তা আমরা কী জানি, আপনাকে নেমে যেতেই হবে।'

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে অসিত কহিল, 'বটে! যেতেই হবে? কেন, শুনতে পাই কি?'

রাধিকাবাবু রাগে তোৎলা হইয়া গেলেন, 'আ-আ-আমাদের খুশি! নামো বলছি, নইলে ঘার ধ'রে নামাব।'

অসিতের গলার স্বরও রুক্ষ হইয়া উঠিল, কহিল, 'দেখুন সাবধান হয়ে কথা

বলবেন। আমিও টিকিট কিনে ট্রেনে চড়েছি, আপনারাও তাই—কী অধিকারে আমাকে গলা ধাক্কা দেবেন শুনি? বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমিই গার্ডকে ডেকে আপনাকে নামিয়ে দেব।'

কথাটার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া রাধিকাবাবুর দল যেমন অকস্মাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছিলেন, তেমনই অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। ওধারের মহিলারা শুধু ঘোলা, নিষ্প্রভ চোখে অসিতের দিকে চাহিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কী বলাবলি করিতে লাগিলেন।

একটু পরে রাধিকাবাবুই আবার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, এবারে তাঁহার স্বর আশ্চর্য রকম নরম। কহিলেন, 'আপনি কিছুতেই নামবেন না?'

অসিত কহিল, 'না'।

—'আপনার টিকিটের টাকাটা যদি আমরা সবাই মিলে চাঁদা ক'রে দিয়ে দিই—?'

অসিত কহিল, 'তাতে আমার কী হবে? মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণটা করতে রাজি আছেন কি আপনারা? দিন তাহ'লে দেড় হাজার টাকা, আমি নেমে যাচ্ছি। আর, সত্যি কথা বলতে কি, আবার কতকগুলো লোকের অপঘাত মৃত্যু দেখতে আমারও ইচ্ছে নেই!'

দেড় হাজার টাকা!

সকলেই চুপ করিয়া গেলেন। ওপাশের একটি যুবক শুধু ফিস্‌ফিস্ করিয়া রাধিকাবাবুকে বলিল, 'গার্ডকে ডেকে একবার বুঝিয়ে বললে কী হয়?'

কিন্তু, সে কথার কেহ জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে গাড়ি আসানসোলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা চাহিয়া দেখি, ওপাশের মহিলারা অভিভাবকের ইঙ্গিতে মালপত্র গুছাইতে শুরু করিয়াছেন। রাধিকাবাবু যেন আঁধারে কূল পাইলেন, তিনি সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া কহিলেন, 'আপনারা নামছেন নাকি স্যার?'

সেই ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'অগত্যা! রুগ্ণ বোনকে দেখতে যাচ্ছিলুম, আরও খানিকটা দেরি হয়ে গেল আর কি। কিন্তু, নিজের প্রাণের মায়া আগে··· বুঝলেন না!'

রাধিকাবাবুদের দল বোধ করি এই পথ দেখানোর অপেক্ষাতেই ছিলেন, তাঁহারাও ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধাছাঁদা আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি ওড়িয়া মেঝেতে বসিয়াছিল, তাহারা কতকটা বুঝিয়াছিল, কতকটা বোঝে নাই, কিন্তু তাহারাও

দেখি মালপত্র ঘাড়ে তুলিতেছে।

আসানসোল স্টেশনে গাড়ি থামিবামাত্র নামিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। শিখ ভদ্রলোকটি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'কেঁও বাবুজী, আপ্‌লোক সব চলা যাতে হেঁ?'

রাধিকাবাবু হাত-মুখ নাড়িয়া কহিলেন, 'না গিয়ে কেয়া করেগা সর্দারজী? প্রাণের মায়া তো সবাইকারই হ্যায়!...দেখ্‌তা নেহি, ও সাক্ষাৎ শমন বৈঠা হ্যায়!'

গাড়ি যখন আসানসোল হইতে ছাড়িল তখন ওপাশে শিখ-দম্পতিটি এবং এপাশে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেহ নাই। সমস্ত গাড়িটা ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

অসিত ভালো করিয়া বিছানাটা বিছাইয়া স্যুটকেশটা মাথায় দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'কৈ, আপনি নামলেন না তো!'

আমি জবাব দিলাম, 'আমি যে আপনার সঙ্গে একগাড়িতে রয়েছি! আপনি যত গল্প করলেন সব ক'টাতেই তো দেখলুম আপনি নিজে বেঁচে গেছেন। আপনি যদি বাঁচেন তো আমিও বাঁচব।'

অসিত কহিল, 'তা বটে!...উঃ একটুখানি শোবার জায়গার জন্যে কী পরিশ্রমই করতে হ'ল। আর কত মিথ্যে কথা!...'

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, 'এর সবটাই কি মিথ্যে নাকি?'

অম্লানবদনে অসিত কহিল, 'নিশ্চয়ই। ই-আই-আরের গাড়িতে আমি খুব কম চড়েছি। এর আগে একবার কাশী গিয়েছিলুম, আর এই আজ যাচ্ছি এলাহাবাদ!'

সে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ওধারের শিখ-দম্পতিও একটু পরে শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু, আমি কিছুতেই চোখ বুজিতে পারিলাম না। যদিও আমি পূর্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, এ সব কথাই মিথ্যা এবং এখন নিঃসংশয়ে জানিতে পারিলাম, তবুও সারারাতই কেমন যেন গা ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল, কিছুতে ঘুম আসিল না।

## বাইজীর মেয়ে

ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে যেদিন লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলাম সেদিন ঘর হইতে আনা তহবিল কমিতে কমিতে একখানা নোটেরও নিচে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অথচ, কাজকর্মের যে কোনোই ব্যবস্থা হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

স্টেশনের পাশে ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম, এবং নিজেই পাক করিয়া খাইতে লাগিলাম। কিন্তু, ধর্মশালায় বড়জোর দিন আষ্টেক-দশ থাকিতে দিবে; তাহার পর কোথায় যাইব এই ভাবিয়া এক রাত্রিও ঘুমাইতে পারিলাম না। বাড়ি ফিরিবার কিংবা অন্যত্র যাইবার মতও খরচ আর নাই।

শেষ পর্যন্ত হয় আত্মহত্যা, নয় ভিক্ষা—এই দুইয়ের একটা করিতে হইবে, এইরূপ যখন মনের ভাব, তখন সহসা একদিন যেন একটু আলোর রেখা দেখা গেল। কাইজারবাগে যে বাঙালী ভদ্রলোকের দোকানে গিয়া বসিতাম, তিনি একদিন বলিলেন, 'দেখুন যদিও আপনার জন্য টিউশানি যোগাড় করতে পারি তাতে আর কত আপনি পাবেন? বড়জোর দশটা টাকা, কী-ই বা ঘরভাড়া দেবেন, খাবেনই বা কী?—তার চেয়ে একটা কাজ করুন না?'

বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কী'?

—'একজন খুব বড় বাইজী আছে, তার হিসাবের খাতা লেখবার জন্য একটি লোক চাই; মানে, ইন্‌কামট্যাক্স ধরেছে আর কি! বাড়িতেই থাকতে দেবে, খেতে দেবে, গোটাদশেক ক'রে মাইনে দেবে। থাকুন না সেখানে, এই বিদেশে আর কে দেখতে যাচ্ছে যে, আপনি বাইজীর কাজ করছেন।'

আমি বলিলাম, 'বিলক্ষণ! দেখলেই বা আমার ক্ষতি কী? আমায় তো আর কেউ খেতে দেবে না। আপনি যদি যোগাড় করতে পারেন তাহ'লে আমি বেঁচে যাই।'

তিনি ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, 'সে আর যোগাড় করা কি, আমাকেই লোক ঠিক করতে বলেছে। ইন্‌কামট্যাক্সের বাবুর সঙ্গে ওর খাতির আছে খুব, তিনি নাকি বলেছেন যে, যেমন তেমন একটা হিসেবের খাতা বার করতে পারলেই ট্যাক্সটা তিনি মাপ ক'রে দেবেন। কাজ খুব ভারী নয়, তবে বিশ্বাসী

লোক হওয়া দরকার। ভালো লোক চট ক'রে তো বাইজীর কাজ করতে চায় না।—তবে, আপনার খাওয়া-দাওয়ার জন্যে চিন্তা নেই, ভালো ব্রাহ্মণ মহারাজ আছে।'

আমি তাঁহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিলাম, 'ভালো মহারাজ না থাকলেও আমার কোনো আপত্তি নেই, বাইজী যদি নিজে রেঁধে দেয়, তাহ'লেও নয়। খেতে না পেয়ে মরার চেয়ে বাইজীর হাতের ভাত খাওয়া অনেক ভালো।'

তিনি তখন কহিলেন, 'বেশ তো তাহ'লে আজই চলুন না, দোকান বন্ধ ক'রে যাবার সময় কথাবার্তা ক'য়ে যাই একেবারে?'

একবার আড়চোখে নিজের বেশভূষার দিকে চাহিয়া লইয়া কহিলাম, 'স্বচ্ছন্দে! যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো—আজ মুন্সীজী খবর নিয়েছেন যে, আরও কতদিন আমি ধর্মশালায় থাকব।'

তাহাই হইল, তারিণীবাবু দোকান বন্ধ করিয়া গোটা নয়েকের সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন আমিনাবাদের দিকে। সেইখানেই বাইজীর বাড়ি। বাইজীর নাম শুনিলাম সত্যবাই, বয়স হইয়াছে—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বদনাম নাই, অন্তত এখন নাই। তবে, একটি বছর ষোল-সতেরোর মেয়ে আছে, সেটি তাহার বিবাহিত স্বামীর কন্যা কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব।

অনেক ঘুরিয়া একটা গলির ভিতর এক প্রকাণ্ড বাড়ির সম্মুখে গিয়া তারিণীবাবু থামিলেন। দারোয়ানকে প্রশ্ন করিলেন, 'বাইজী আছে?'

সে তাঁহাকে সেলাম করিয়া কহিল, 'আছেন, ওপরে চ'লে যান।'

সঙ্কীর্ণ পাথরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তারিণীবাবু কহিলেন, 'বাইজীর সঙ্গে ভাব আমার অনেক দিনের। কলকাতা থেকে লোকজন এসে যখন গান শুনতে চায় তখন এখানেই নিয়ে আসি কিনা, বছরে অনেক টাকা পায়। আমাকে ওপরে উঠতে গেলে আর এত্তেলা দিতে হয় না।'

আমি অতি কষ্টে সেই খাড়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে মৃদুকণ্ঠে তাঁহার গৌরববৃদ্ধিকর দুই-চারিটা কথা কী কহিয়াছিলাম তাহা আজ আর স্মরণ নাই, তবে তিনি তাহাতে পুলকিত হইয়াছিলেন।

উপরে উঠিয়াই ঠিক সামনে প্রকাণ্ড একখানি ঘর। ঘরের মহার্ঘ সজ্জা ও অসংখ্য ঝাড়ের আলোগুলি যেন সগৌরবে অধিকারিণীর ঐশ্বর্য ঘোষণা করিতেছে।

আমি সেই বিলাস-সজ্জার মধ্যে একান্ত অসঙ্গতির মত একপাশে দিয়া দাঁড়াইলাম, তারিণীবাবু কিন্তু সকলরবে বাইজীর সঙ্গে রসিকতা করিতে করিতে ঢালা ফরাসের উপরে বসিয়া পড়িলেন। বাইজী সারেঙ্গীর সহিত বোধ করি বা রেওয়াজই করিতেছিল, ইঙ্গিতে তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিয়া আমাদের দু'জনকেই সেলাম করিল।

বাইজীর বয়স চল্লিশ কেন, হয়তো বেশীই হইয়াছে, কিন্তু সে কথা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা বোঝা কঠিন। তাহার সুরমা-দেওয়া চোখের যৌবন-চঞ্চলতা তখনও যেন ঘোচে নাই, তখনও তাহাতে বিজলী খেলে।

বাইজী যে বাংলা জানে তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য ভাঙ্গা বাংলাতেই তারিণীবাবুর সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল, 'তারপর তারিণীবাবু, কী মনে ক'রে ?—বৈঠিয়ে বাবুজী ! এ আপনারই বাড়ি মনে করবেন !'

তারিণীবাবু তখন সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, 'বাবুজী তোমার হিসেব লিখতে রাজিই হলেন যখন, তখন আর দেরি না ক'রে আজই নিয়ে এলুম, এখন তোমরা কথাবার্তা ঠিক ক'রে নাও।'

বাইজী চমৎকার হাসিয়া আর একদফা সেলাম করিল, তারপর কহিল, 'কথাবার্তা আর তো কিছু ঠিক করার নেই, সে-তো আপনি সব কয়েই এসেছেন। আমি আজ রাত্রে বাবুজীর ঘর ঠিক ক'রে রেখে দেব, কাল ভোরবেলাতেই আপনি আসবেন।'

তারপর আবার কী ভাবিয়া কহিল, 'আপনি নতুন মানুষ, হয়তো বাড়ি চিনতে পারবেন না, নয়তো লজ্জা পাবেন, তার চেয়ে আমিই লোক পাঠাব ধর্মশালায়—সে সঙ্গে ক'রে আনবে আপনাকে। কেমন ?'

তাহার বিবেচনায় খুশীই হইলাম। কহিলাম, 'আচ্ছা, তাই হবে, আমি ভোরবেলাতেই তৈরি হয়ে থাকব।'

তাহার পর অল্পক্ষণ একটু গল্পগুজবের পর তারিণীবাবু গোটা-দুই পান মুখে পুরিয়া এবং আর গোটা-দুই ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া কহিলেন, 'বাইজী লোক ভালো, আপনার অসুবিধা হবার কথা নয়।—আর সে যাই হোক্ আমি ভালো টিউশানি বা চাকরিরও চেষ্টায় রইলুম, একটা ব্যবস্থা হ'লে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ ?'

'লা-টুস্' রোডের মোড় পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে হাঁটিয়া গিয়া বিদায় লইলাম। এই নির্বান্ধব স্থানে একজন অপরিচিত দরিদ্রের জন্য তিনি যাহা করিলেন,

তাহার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার ছিল না। তবুও, যতটা সম্ভব ধন্যবাদ জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম আমার ধর্মশালার ঘরে, এবং বাতি জ্বালিয়া দেশে চিঠি লিখিতে বসিলাম।

জিনিসপত্র তো ভারি, হাল্‌কা একটা বিছানা আর ছোট একটা ব্যাগ, গুছাইয়া লইতে কিছুমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু বাইজীর লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল প্রত্যূষে। কোনোমতে স্নান সারিয়া ভিজা কাপড় হাতে করিয়াই তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাইজী তাহার টাঙ্গা পর্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং নির্বিঘ্নে আমিনাবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

সিঁড়ির মুখেই বাইজী অপেক্ষা করিতেছিল, সে হিন্দু—এবার হিন্দুমতেই নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিল, 'আসুন বাবুজী!'

তাহার পর নিজে আমার সঙ্গে গিয়া দ্বিতলের যে ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। হিন্দুস্থানী পছন্দের ঘর, তবুও ঘরটি অপেক্ষাকৃত ভালো। জানালার ধারে খাটিয়া পাতা, একপাশে চেয়ার-টেবিল, খাতা-কাগজ-কলম, সমস্ত পরিপাটি করিয়া টেবিলের উপর সাজানো। আমি স্নান করিয়া আসিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই আমার ভিজা কাপড় লইয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই মহারাজকে দিয়া ক্ষীরের বরফি ও গরম দুধ পাঠাইয়া দিল। মনে মনে তারিণীবাবুকে আর একদফা ধন্যবাদ দিয়া বহুদিন পরে প্রভাতী জলযোগ করিতে বসিলাম।

জলযোগ ও বিশ্রামের পর আবার বাইজী আসিল। টাকাকড়ি তাহার যথেষ্ট, কিন্তু কোনো প্রকার হিসাব নাই। আগাগোড়া বছর তিন-চারের হিসাব মনগড়া তৈয়ারি করিতে হইবে এবং তাহাতে দেখাইতে হইবে যে, মুজরোর সংখ্যা কম, অথচ কর্মচারীদের বেতন এবং রাহাখরচ এতই বেশী যে, লাভ খুব সামান্য থাকে।

বাইজী দেখিলাম মধুভাষিণী শুধু নয়, অত্যন্ত স্পষ্টভাষিণীও, তাহার যাহা বক্তব্য খুব অল্প কথায় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল। আমিও কাজ বুঝিয়া লইয়া তখনই খাতাপত্র লইয়া বসিয়া গেলাম। হিসাব লিখিবার মত পুরাতন খাতাও সংগ্রহ করা আছে, শুধু আরম্ভ করিলেই হয়।

একটা বাজে কাগজে সবেমাত্র একটা খসড়ার পত্তন করিয়াছি, এমন সময় সহসা পিছনে অলঙ্কার-শিঞ্জিনী শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম দ্বারপ্রান্তে অপরূপ রূপসী

একটি কিশোরী দাঁড়াইয়া আছে।

দুইধারের কপাটে হাত দিয়া সে যেন ফ্রেমে বাঁধা ছবির মত দাঁড়াইয়াছিল, অকস্মাৎ আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। যেন অদ্ভুত হাস্যকর কিছু দেখিয়াছে, এই ভাবে হাসিতে হাসিতেই সে আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত-কয়েক বোধ হয় সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহারই মধ্যে যে রূপের ছবি আমার চোখে পড়িয়াছিল তাহার রেশ রহিল অনেকক্ষণ ধরিয়া। তাহার কুন্তলের সুরভি ও আতরের গন্ধ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার নাকে আসিয়া বারবার সেই অপরূপ দৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, কিছুক্ষণ যেন আর কাজে মন বসিল না।

আমার স্থূল দেহের জন্য চিরকালই ঘরে ও বাহিরে যথেষ্ট উপহাস সহিতে হইয়াছে, সুতরাং, এই কিশোরীর হাসি আমার কাছে আশ্চর্যও মনে হইল না, আঘাতও করিল না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমন কি বাপ-মা পর্যন্ত আমার মেদবহুল দেহের কথা জীবনের প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, হাসিয়াছেন। বন্ধু-বান্ধবরা কেহ কেহ স্কুল ছাড়িবার পরই, কেহ বা গোঁফ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'রোমান্স' করিতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু তাহারা বরাবর এমন ভাবেই কথা কহিয়াছে যেন কোনো-কিছু 'রোমান্স' করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, এবং সে ঐ মেদের জন্য। আমিও তাহাদের কথা বারবার শুনিতে শুনিতে এক-রকম মানিয়াই লইয়াছি যে, কোনোদিনই কোনো তরুণীর মানস-কুসুম আমাকে দেখিয়া বিকশিত হইতে পারে না। ক্রমশ সেটা আন্তরিক বিশ্বাসেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সুতরাং, উহাকে হাসিতে দেখিয়া বিচলিত হইব কেন?

দ্বিপ্রহরে ভোজনের সময় স্বয়ং গৃহস্বামিনী আমাকে ডাকিতে আসিলেন এবং নিজে বসিয়া থাকিয়া তদারক করিতে লাগিলেন। সরু চালের ভাত, দাল, কুমড়ার তরকারি, চাটনি, দধি ও মিষ্টান্ন, ভোজ্যের তালিকা এই। কিন্তু, বাইজীর আগ্রহ ও অনুরোধে যেন আহারের সময় বারবার চোখে জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম যে, বাংলাও নাই, বিহারও নাই—মায়ের জাতি রহিয়াছেন সারা ভারত জুড়িয়া—

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সহসা বাইজী কহিল, 'আমার মেয়েকে দেখ নি বোধ হয় বাবুজী? জান্‌কী, এ জান্‌কী—'

দম্‌কা হওয়ার মত সেই পূর্ব-পরিচিতা কিশোরীটি ঘরে ঢুকিয়া সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার পরই শুরু হইল তাহার সেই অকাণ উচ্ছ্বসিত হাসি।

বাইজী সস্নেহ তিরস্কার করিয়া কহিল, 'অত হাসছিস কেন শুধু-শুধু ?'

তাহার পর আমাকে কহিল, 'মেয়েটা আমার একেবারেই পাগল বাবু, কিছু বুদ্ধি নেই।'

জানকী হাসি থামাইয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবুজী, তোমার ওজন কত ?'

ঠিক বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর। মুহূর্ত মধ্যে যেন মনে হইল সারা দেহে একটা আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া গেল। কিন্তু, মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়াই জবাব দিলাম, 'দু'মণ দশ সের !'

বিস্ময়ে তাহার চোখ দু'টি আরও ডাগর হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কহিল, 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ বাবুজী !'

আমি কহিলাম, 'ওজন ক'রে দেখ—!'

আবার সে কুল-কুল করিয়া হাসিতে শুরু করিল। তাহার মা এবার সত্য সত্যই তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'কী অসভ্য হচ্ছিস দিন-দিন জান্‌কী ! বাবুজী কী মনে করবেন বল্‌ তো ? ভদ্রলোকের মত কথা কইতে জানিস নে ?'

আমি বরং ব্যস্ত হইয়া প্রতিবাদ করিলাম, জানকী কিছুমাত্র অভদ্রতা করে নাই তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু দেখিলাম জানকী, না তাহার মায়ের তিরস্কারে, না আমার আশ্বাসে, কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এইবার শুরু হইল তাহার উপদ্রব, কারণে-অকারণে যখন-তখন আমার ঘরে উঁকি মারিয়া হাসিয়া অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার মা জানিতে পারিলে তিরস্কার করিত, কিন্তু সে-সবই ভস্মে ঘি ঢালা। ঝরনার জলের মতই তাহার স্বভাব লঘু ও চঞ্চল এবং প্রায় সেই রকমই উদ্দাম—বাধা স্বীকার করে না। বয়স তখন তাহার বোধ করি সতেরো হইবে, আঠারো হওয়াও বিচিত্র নয়, কিন্তু সে বয়স তখনও তাহার মনে যৌবন আনিতে পারে নাই ; শিশুর মত সরল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বয়সটাকে আর সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

হাসি বোধ করি তাহার অকারণেই পাইত। কখনও আমার দৈহিক স্থূলতা, কখনও আমার মাতৃভাষা, কখনও বা আমার চলিবার ধরন, তাহার উপহাসের উপলক্ষ্য হইত, একটা কিছু ছুতা করিয়া তাহার হাসিয়া লুটাইয়া পড়া চাই-ই ! এক-একদিন বলিত, 'বাবুজী গান গাও, হিন্দী নয়—একটা বাংলা গান গাও—'

আমি সবিনয়ে বোঝাইবার চেষ্টা করিতাম যে, সঙ্গীত-বিদ্যা আমার আজও আয়ত্ত হয় নাই। সে তাহাতেও হাসি চাপিতে পারিত না।

তাহার সেই চঞ্চল আয়ত চোখের হাসি ক্রমশ কী এক দুর্নিবার মোহজাল যেন আমার চারিদিকে সৃষ্টি করিয়া তুলিল, কিছুক্ষণ না দেখিলে মনখারাপ হইত, কাজে মন বসিত না। কিন্তু, সে শিশুর প্রতি স্নেহমাত্র, তাহা কলঙ্কিত মনের বাসনা-লোলুপ স্নেহ নয়।'

একদিন সহসা সে কোথা হইতে একখানা ফার্স্টবুক আনিয়া আমার খাটিয়ায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'বাবুজী আমি তোমার কাছে পড়ব, আমায় ইংরিজী শেখাতে হবে।'

প্রথমটা আমি বিপন্ন বোধ করিলাম, ভয় হইল যে, হয়তো গৃহস্বামিনী মন্দ কিছু ভাবিতে পারেন, কিন্তু উপায় কী? ভয়ে ভয়েই পড়াইতে হইল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বাইজীকে জানকীর নূতন খেয়ালের কথা জানাইলাম। বাইজীর মুখ কিন্তু সে সংবাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে হাতজোড় করিয়া কহিল বাবুজী, 'যদি দয়া ক'রে ওকে পড়াতে পার, তাহ'লে আমার বড় উপকার করা হবে। কত মাস্টার রেখেছি, পাগলীকে কেউ পড়াতে পারে নি, ও যদি নিজেই তোমার কাছে পড়ে তবে সে আমার ভাগ্যের কথা।'

যাক্—নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। জানকীর পাঠে কিন্তু একটুও অবহেলা দেখিলাম না। বরং নূতন খেলায় যেমন ছেলেমেয়েরা আগ্রহ প্রকাশ করে তেমনি আগ্রহের সহিত দুইবেলা বই ও শ্লেট লইয়া পড়িতে শুরু করিল। এমনি করিয়া আমাদের স্নেহের সম্পর্কটা একটু একটু করিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

চার-পাঁচ মাস এই ভাবেই কাটিল। মেয়েকে পড়ানোর জন্য বাইজী বেতন বৃদ্ধি করিয়া কুড়ি টাকা করিয়া দিয়াছে, যত্নেরও ত্রুটি নাই। সুতরাং ভালোই আছি বলিতে হইবে। তারিণীবাবুও আর নূতন টিউশানির চেষ্টা দেখেন নাই, সত্য কথা বলিতে কি আমিও আর তাগাদা দিই নাই। সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি আমার যেন নেশার মধ্য দিয়া কাটিতেছিল।

জানকীরই শুধু যে আমার কাছে পড়িতে ভালো লাগিল তাহা নয়, আমারও তাহাকে পড়াইতে অত্যন্ত ভালো লাগিল। তাহার মেধা যে অসাধারণ, তাহা মন দিয়া পড়িতে শুরু করিবার পরই বোঝা গিয়াছিল। সে তাহার ডাগর ও উজ্জ্বল আঁখি মেলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত, আমি মনের উৎসাহে

তাহাকে দেশ-বিদেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত কথা বলিয়া যাইতাম। ফলে, এক একদিন পড়ার সময় তিন-চারি ঘণ্টায় পর্যবসিত হইত। একদিন তাহার মায়েরই অনুরোধে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বায়স্কোপ দেখিতে গেলাম। কিন্তু, ঘণ্টাখানেক দেখিবার পরই সহসা সে উঠিয়া দাঁড়িইয়া কহিল, 'বাবুজী, বাড়ি চল, আর ভালো লাগছে না।'

আমি বিস্মিত হইলাম, বোঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে জেদ ধরিয়া কহিল, 'বাড়ি যাইব—।'

অগত্যা ফিরিয়া আসিলাম। বাইজী গিয়াছিল মুজরোয়, সুতরাং কেহ কারণও জিজ্ঞাসা করিল না। ফিরিয়া নিজের ঘরে বিশ্রামের যোগাড় করিতেছি এমন সময় সে বই-পত্র লইয়া হাজির হইল, পড়িবে।

তাহাকে পড়াইতে বসিয়া মনে মনে এই সত্যকেই স্বীকার করিতে হইল যে, আমারও মন ঠিক এই ব্যাপারটিকেই কামনা করিতেছিল, এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

তবুও সুখেই ছিলাম। কিন্তু, সে সুখ অদৃষ্টে সহিল না, কেমন করিয়া তাহাই বলি।

একদিন অপরাহ্ণে জানকী আসিয়া বলিল, 'বাবুজী, চল বেড়াতে যাই।'

আমি, কি জানি কেন, খুশী হইয়া উঠিলাম, দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিলাম, 'মাকে জিজ্ঞাসা করেছ ?'

ঘাড় নাড়িয়া, বেণী দোলাইয়া সে কহিল, 'করেছি। যাবে তো ওঠ শিগ্‌গির !'

জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। জানকী ইতিমধ্যেই দারোয়ানকে দিয়া একটা টাঙ্গা আনাইয়াছিল, তাহাতে চড়িয়া আমরা যাত্রা করিলাম, গোমতীর সেই বিখ্যাত ও প্রাচীন লৌহ-সেতুর দিকে।

পথে সে একটি কথাও কহিল না, শুধু কেমন যেন একটু উদাসভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। টাঙ্গা যখন পুলের উপর দিয়া ওপারে যাইবার সংকল্প করিতেছে তখন সে সহসা টাঙ্গা থামাইতে বলিল, তারপর একেবারে নামিয়া পড়িয়া কহিল, 'ওকে বিদেয় ক'রে দাও, আমরা নদীর ধারে হাঁটব।'

সেটা শ্রাবণের শেষ, গরম তখন বেজায়। সুতরাং, আমি আর বেশী কথা না কহিয়া তাহার প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেলাম। টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া পুলের পাশ দিয়া নামিয়া পড়িলাম নদীর চড়ায়।

সূর্যদেব তখন পাটে বসিয়াছেন, কিন্তু অন্ধকারের তখনও অনেক দেরি। নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে আমরা সেই ক্ষীণস্রোতার বালুচরের উপর দিয়া হাঁটিতে লাগিলাম—জানকীর ইচ্ছানুযায়ী ছত্রমঞ্জিলের দিকে।

কোথাও তখন পল্লীবাসিনীরা মাথায় করিয়া খালি কলস বহিয়া জল লইতে আসিতেছে, কোথাও বা রজকিনীরা ঘরে যাইবার উদ্দেশ্যে শুষ্ক কাপড় সংগ্রহে মন দিয়াছে। কিন্তু, যতই আমরা ছত্রমঞ্জিলের কাছাকাছি যাইতে লাগিলাম নদীতট ততই জনবিরল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কাঁটাবনের সংখ্যাও ততই বাড়িতে লাগিল। আমরা সন্তর্পণে কাঁটাবন বাঁচাইয়া তবুও চলিতে লাগিলাম, জানকীর অন্যমনস্ক মুখের দিকে চাহিয়া আমার যেন মনে হইল, তাহার সেদিন থামিবার ইচ্ছা মোটেই নাই, কেবলই চলিতে চায়।

বহুক্ষণ আমরা কেহই কথা বলি নাই। কিন্তু, ছত্রমঞ্জিলের পিছনে পৌঁছিয়া আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, কহিলাম—'এইবার ফেরা যাক জান্‌কী, সন্ধ্যে হ'ল।

সে সহসা আমার হাতটা ধরিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, 'একটু দাঁড়াও বাবুজী!'

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। দিনের আলো তখন একেবারেই ম্লান হইয়া আসিয়াছে, তবুও সেই অস্পষ্ট আলোতেই নজরে পড়িল তাহার মুখে সুগভীর ক্লান্তির চিহ্ন।

মনে হইল এ তো সে জানকী নয়, এ যেন আর কেহ। শঙ্কাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি কি থ'কে গেছ জান্‌কী?'

সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া কথাটা স্বীকার করিল। তারপর সহসা আর একটু কাছে আসিয়া দুইহাতে আমার বাহুমূল ধরিয়া আমার উপরে সম্পূর্ণরূপে ভার দিয়া কাঁধে মাথা রাখিল। তন্বী কিশোরীর লঘু দেহভার। কিন্তু, নিমেষের জন্য যেন আমার দেহ দুর্বল হইয়া আসিল। পরক্ষণেই প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইলাম। কিন্তু, প্রথম স্পর্শেই যে বিদ্যুৎ আমার দেহে খেলিয়াছিল তাহার আঘাত যেন অন্তরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল, ক্রমে তাহার রেশ একটা মৃদু পুলকানুভূতিতে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

মিনিটের পর মিনিট কাটিল, আধঘণ্টা—একঘণ্টা, দু'জনে ঠিক তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার ললাটের স্বেদে আমার কাঁধের জামা ভিজিয়া উঠিল, কুন্তলের সুরভি বাতাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া মৃদু আনন্দের মত নাকে আসিতে লাগিল; শুধু এইটুকু। আমার হৃদস্পন্দনের সঙ্গে তাহার

হৃদয়স্পন্দন মিলিয়া গিয়াছিল। সেই মিলিত হৃদয়স্পন্দনের অনুভূতি আর কাহাকেও বর্ণনা করিয়া বোঝানো যাইবে না, সেইটুকুই আমার চিরজীবনের সম্বল হইয়া আছে।

কেহ কাহারও সহিত কথা কহি নাই। কিন্তু, দু'জনেরই মনের কথা সেই অন্ধকারে গোমতীর জলের উপর বোধ হয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে কামনা করি, একথা এতদিন পরে আজ যেন প্রথম বুঝিতে পারিলাম। আর জানকী? সে-ও যে আমায় ভালোবাসিয়াছে এ সত্যও এই প্রথম চোখে পড়িল।

কিন্তু, সেদিনের সেই একঘণ্টা সময়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যাহা ঘটিল তাহা হইতেছে, জানকীর পরিবর্তন। আজ সে-ও তাহার মনের ছবি প্রথম দেখিল, প্রথম তাহার অন্তরের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। ছিল শিশু, সেই অল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হইল যুবতীতে।

ঘণ্টাখানেক পরে সে অত্যন্ত মৃদু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'চল, এইবার বাড়ি যাই।'

কিন্তু, আশ্চর্য এই যে, কামনার যে দুঃখ, তাহা আমরা দু'জনে কেহই অনুভব করি নাই। যেন পরিপূর্ণ আনন্দে দু'জনেরই মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, গতি সেই মতই লঘু হইয়া উঠিল। আমরা খোলাখুলি নিজেদের কথা পরস্পরের কাছে স্বীকার করিতে পারিয়াই যেন বাঁচিয়া গিয়াছি, আর কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা, দুঃখ নাই।

যখন বাড়ি পৌঁছিলাম তখন বাইজী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আসিয়াছি এই খবর পৌঁছিতেই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল আলোয় আসিতে প্রথম একটু লজ্জাবোধ করিলাম। কিন্তু, তাহার আগেই লক্ষ্য করিলাম বাইজী যেন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম যে, আশ্চর্য হইবারই কথা বটে, কী অদ্ভুত পরিবর্তন! তাহার মুখ এখনও আনন্দের আভায় উজ্জ্বল, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে শিশুর মত চপলতাটুকু একেবার মুছিয়া গিয়াছে, এখন সে মূর্তি পরিণত রমণীর, বালিকার নয়। আমি পাশ কাটাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলাম, বাইজীও তখন কোনো কথা কহিল না। শুধু একবার প্রশ্ন করিল, 'এতরাত করলি কেন রে জান্‌কী?'

জানকী তাহার স্বভাববিরুদ্ধভাবে মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, 'নদীর ধারে ঘুরছিলুম।'

সেই দিনই রাত্রে আহারাদির পর বাইজী আমাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বুঝিলাম যে, অন্ন উঠিল।

ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বাইজী কহিল, 'বাবুজী, বোস!'

বসিলাম। সে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'বাবুজী তোমার মা আছে, দেশভূঁই আছে, ভাইবোনও আছে, তুমি এখানে চিরকাল কিছুতেই কাটাতে পারবে না। একথা মান তো?'

পিছনে যে টান আছে মৌন থাকিয়া তাহা মানিয়া লইলাম। সে কহিল, 'তুমি কালই দেশে চ'লে যাও বাবুজী। আমি তোমাকে একটুও দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু এখানে থাকা আর তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তুমি আমার যা উপকার করেচ তা ভোলবার নয়, যদি কখনও প্রয়োজন হয় আমাকে স্মরণ ক'রো, সেই সেই দিনই বুঝিয়ে দেব যে আমি ভুলি নি।'

তাহার পর আঁচল হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, 'এ আমার প্রণামী বাবুজী, নিতে তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ ক'রো না। এই নিয়ে দেশে গিয়ে ব্যবসা শুরু কর, তোমার উন্নতি হবে।'

নোটের গোছাটি তুলিয়া লইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘরে চলিয়া আসিলাম। পরে গুনিয়া দেখিয়াছিলাম প্রায় হাজার টাকা। কিন্তু, তখন কোনো কথা মনে ছিল না।

অন্ধকারেই চুপ করিয়া বিছানার উপর আসিয়া বসিলাম। কী যে ভাবিতেছিলাম তাহা আজ মনে নাই। হয়তো স্পষ্ট কিছু ভাবিও নাই, শুধু জড়ের মত আচ্ছন্ন অবস্থায় বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। আজই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এখনই! শুধু এই কথাটাই বারবার বুকের মধ্যে কে বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা শাড়ির খস্‌খসানিতে চমক ভাঙ্গিল, কিন্তু তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। কে আসিল তাহা প্রাণের মধ্যেই অনুভব করিলাম, ফিরিয়া দেখিবার প্রয়োজনও ছিল না। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একেবারে আমার হাঁটুর উপর আসিয়া বসিয়া গলা জড়াইয়া কাঁধে মাথা রাখিল। বুঝিলাম, সে কাঁদিতেছে। কিন্তু, কোনো সান্ত্বনার কথাই বলিতে পারিলাম না, শুধু একটা হাত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলাম।

খানিকটা পরে সে-ই মাথা তুলিল। কহিল, 'ভালোই হ'ল বাবুজী, তোমাকে

ধ'রে রাখতে পারতুম না, একদিন তুমি মায়া কাটিয়ে পালাতেই। তার চেয়ে এই ভালো হ'ল। আমি হিন্দুস্থানী বাইজীর মেয়ে, তুমি বাঙালী ব্রাহ্মণ, তোমায় আমায় কত তফাত—।...তুমি আজই শেষরাত্রে চ'লে যেও, কাল হয়তো আর ছেড়ে দিতে পারব না।'

তাহার পর গলা হইতে মণিমুক্তা-খচিত সোনার হার খুলিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, 'আমার বরমাল্য তোমায় পরিয়ে দিলুম, এ হার কখনও কাছছাড়া ক'রো না। আর অনেকদিন, অনেকদিন পরে একবার তোমার জান্‌কীকে দেখতে এস। আমি তোমার অপেক্ষা করব। হয়তো তোমার চুলে তখন পাক ধরবে, আমার যৌবন যাবে ঘুচে, কিন্তু তবুও সেদিন আর একবার আমরা বেড়াতে যাব ঐ গোমতীর ধারে—আজকের মত।'

সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুইহাতে আমার মাথা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া বয়োজ্যেষ্ঠাদের মত অসীম স্নেহভরে আমার ললাটে অত্যন্ত লঘু একটি চুম্বন করিল।

তাহার পরই 'তবে আসি বাবুজী' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সেই মুহূর্তটুকুর জন্য আমার মনে হইল তাহার পদশব্দ সে ঘরের বাহিরে শুধু নয়, যেন আমার জীবনের বাহিরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হায়, বৃথা, বৃথা সে চেষ্টা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাক্সটা গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

## অতিথি

বইয়ের ব্যবসা করি, সেই কাজেই বর্ধমানে গিয়াছিলাম। বর্ধমানে কাজ সারিয়া কালনা যাইব স্থির করিলাম। বর্ধমান হইতে বাস্ ছাড়ে—সোজা কালনায় যায়। স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরার নানাবিধ দুর্ভোগের অপেক্ষা বাসে যাওয়াই ঠিক মনে হইল। বেলা বারোটার সময় গিয়া বাসে চাপিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু বাস্ যাত্রী সংগ্রহ করিয়া ছাড়িল দুইটায়—আবার পথে অন্যান্য যাত্রীদের ইচ্ছামত ঘোরাঘুরি করিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় কালনায় নামাইয়া দিল। কালনা তো কালনা। মনে ছিল যে, সেখানে কাছারি আছে, স্কুল আছে, জায়গাটা অন্তত শহরের মত

কিছু একটা হইবে, কিন্তু পৌছিয়া সে ভুল ভাঙ্গিল। একেবারে জলে পড়িলাম আর কি! হোটেল একটা আছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ হোটেলের মতই শুধু খাইবার হোটেল, সেখানে থাকা যায় না।……স্যাঁতসেতে মাটির দুইটি কুঠুরি ; একটিতে রান্না হয়, অপরটিতে ঠাকুর-মহাশয় স্ত্রী-পুত্র (?) লইয়া বাস করেন। সেখানে থাকার কোনো উপায় নাই।

গ্রামবাসীদের প্রশ্ন করিলাম, কেহ দয়া করিয়া জবাব দিল, কেহ বা দিল না। যাহারা দিল তাহারাও বিশেষ কোনো সন্ধান দিতে পারিল না। শুনিলাম ডাকবাংলো আছে। আশান্বিতভাবে সেখানে গেলাম, কিন্তু সেখানেও সুবিধা হইল না। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব কাছারি পরিদর্শনে আসিয়াছেন, তিনি সদল-বলে ডাকবাংলোয় আছেন। আমি একে বাঙালী তায় যুবক, সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত একত্রে ডাকবাংলোয় থাকা অসম্ভব। ইতস্তত করিতে করিতে বাস্-চালকটিকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে বিস্তর খোশামদ করিয়া অনুরোধ করিলাম যে, রাত্রের মত তাহার বাসেই থাকিতে দেওয়া হউক।

সে লোকটির অবশেষে দয়া হইল। সে কহিল, 'সেকি কথা বাবু,—বাসের মধ্যে কি সারারাত কাটাতে পারেন—আমি দেখছি, যদি একটু জায়গা ঠিক করতে পারি।'

খানিক পরে ফিরিয়া সে যাহা 'নিবেদন' করিল তাহার ভাবার্থ এই,—রায়েদের অবস্থা এখন খারাপ হইয়াছে, পেট চলে না ; সে ক্ষেত্রে কিছু পয়সা দিলে সেখানেই থাকিবার জায়গা হইতে পারে এবং আমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তো খাইবার ব্যবস্থাও। আমাকে তো পয়সা খরচ করিয়া খাইতেই হইবে—বিশেষত রায়েরা ব্রাহ্মণ। ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমি খুবই খুশী হইলাম। তখনই মুটের মাথায় ব্যাগ প্রভৃতি চাপাইয়া তথাকথিত রায়েদের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পথ-প্রদর্শক সেই বাস্-চালক। খানিকটা পথ হাঁটিয়া, বনের মধ্য দিয়া চলিয়া যেখানে আসিয়া সে থামিল, সে জায়গাটা দেখিয়া কিন্তু আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। ইহার চেয়ে যে বাস্ ভালো ছিল।

বাড়িটা এককালে হয়তো বড়ই ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। বাহিরে যতটা দেখা যাইতেছে সবটা ভাঙ্গা। শুধু কালো-কালো ভাঙ্গা ইটের স্তূপ—মাঝে মাঝে এক-আধটা দেওয়ালের ভগ্নাংশ মাথা উঁচু করিয়া আছে। বন্য গাছে, অশথ গাছে ভগ্নস্তূপ পরিপূর্ণ। গিয়া দাঁড়াইতেই কতকগুলি

শৃগাল রুখিয়া দাঁড়াইল, যেন নীরবে আমাদের অনধিকার প্রবেশে আপত্তি জানাইতে চায়। বাস্-চালক সে সব গ্রাহ্য না করিয়া সেই ইঁটের উপর দিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, 'এটা বার-বাড়ি ছিল বাবু, এখন আর কিছু নেই। ভেতর-বাড়িও গেছে। শুধু খান-দুই ঘরে এখনও থাকা যায়, তাও বর্ষাকালে নয়।'

গঙ্গাতীরে ফিরিয়া গিয়া রাত্রি কাটাইব কিনা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে একটা গলিপথ ( এককালে দরজা ছিল )—দিয়া ভিতর-বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে বাঁধান উঠান ছিল, কিন্তু এখন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহার উপর মাটি দিয়া নিকানো হইয়াছে। একপাশে একটা তুলসীগাছ ও কয়েকটা ফুলের গাছ। ভিতর বাড়িতেও অধিকাংশ ঘরেরই চিহ্ন আছে, কিন্তু ঘর নাই, পশ্চিম দিকে ভাঙ্গা দাওয়ার উপর পাশাপাশি দুইখানি ঘর এখনও খাড়া আছে, তাহাতেই থাকা চলে।

ঐ ঘরেরই—একটিতে আলো জ্বলিতেছিল। আমাদের সাড়া পাইয়া একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে কেরোসিনের ডিবে লইয়া বাহিরে আসিল। মেয়েটিকে সেই অল্প আলোর মধ্যেই যাহা দেখা গেল—পলকে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রূপসী মেয়ে দুই-চারিটি যে না দেখিয়াছি তাহা নয় কিন্তু, এত রূপ দেখি নাই। চাঁপা ফুলের মত সুন্দর সুগোল গঠন আর শুভ্র রজনীগন্ধার মত মুখের শান্ত শ্রী, দেখিলেই বোধ হয়—এ দেবভোগ্য সামগ্রী, সাধারণের ইহাতে কোনো অধিকার নাই।

আমার পথপ্রদর্শক তাহাকে দেখিয়া কহিল, 'সেই বাবুটি এসেছেন বৌদি, কোথায় থাকবেন দেখিয়ে দিলে বিছানা-পত্রগুলো—'

মেয়েটি যে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল তাহার পাশের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'এই যে, এই ঘরে।'

গলার আওয়াজটি মিষ্ট, বোধ হয় একটু করুণ।

মুটেকে বিদায় দিয়া বাস্-চালক ও আমি স্যুটকেশ দুইটি ও বিছানাটি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি তাহার গৃহ-জীবনের শেষ দশায় পৌঁছিয়াছে। এককালে বালি ও চুনের কাজ ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে দুই-এক হাত স্থান ছাড়া সর্বত্রই ইঁট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এখনও বালির কাজ আছে সেখানেও চুনের অংশটুকু কালো হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের মেঝে মাটি লেপা এবং পরিষ্কার। দুইটি জানালার একটি দরমা দিয়া ঢাকা, অপরটিতে কয়েকখানি

ভাঙ্গা ইঁট উপরি উপরি সাজাইয়া বন্ধ করা হইয়াছে। শুধু দরজায় তুইখানি অর্ধভগ্ন কপাট এখনও শোভা পাইতেছে।

ঘরের একপাশে একটি ভাঙ্গা তক্তাপোশ। তাহারই উপর বিছানাটি নামাইয়া রাখিলাম। আমার বাস্-চালক সঙ্গীটি স্যুটকেশ তুইটি মেঝেতে রাখিয়া কহিল, 'তাহ'লে আমি যাই বৌদি ?'

মেয়েটি ততক্ষণে—আমি কোনোপ্রকার বাধা দিবার পূর্বেই—আমার বিছানার বাঁধন খুলিয়া বিছাইয়া দিতেছিল। হাতের কাজ না থামাইয়া কহিল, 'বাবুটি যদি এখানে খান তো তোমাকে একটি কাজ করতে হবে ভাই কেষ্ট।'

কেষ্ট কহিল, 'বল না বৌদি, দোকানে যেতে হবে ?'

মেয়েটি কহিল—'হ্যাঁ। জানোই তো ঘরে কিছুই থাকে না,—বাবুর কাছে থেকে আনা তিনেক পয়সা চেয়ে নিয়ে কিছু সরু চাল, আধপো মুগের ডাল, আর একপো আলু যদি এনে দিয়ে যাও—!'

আমি তাড়াতাড়ি একটি টাকা বাহির করিয়া কেষ্টর হাতে দিয়া বলিলাম, 'আমার থাকার আর খাওয়ার জন্য এই টাকাটা ওঁকে দাও।'

মেয়েটি শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, 'সবসুদ্ধ আট আনা হ'লেই হবে। বাকিটা ওঁকে ফেরত দিও।'

কেরোসিনের ডিবেটা রাখিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। কেষ্টকে আমার টর্চটা দিয়া কহিলাম, 'এইটে নিয়ে যাও। অন্ধকারে বারবার যাওয়া আসা করা—ওঁকেও ডিবেটা নিয়ে যেতে বল ; আমার কাছে বাতি আছে, আমি জ্বালছি।'

কেষ্ট টর্চটা লইয়া চলিয়া গেল। আমি কাহারও সাড়া না পাইয়া ধীরে সুস্থে জামা ছাড়িয়া স্যুটকেশ খুলিয়া বাতিটা বাহির করিয়া জ্বালিয়া তক্তাপোশের উপর বিছানার পাশে রাখিলাম। বাতি জ্বালিবামাত্র মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া ডিবেটা লইয়া বাহির হইয়া গেল। বুঝিলাম, বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে বাহির হইতে সাড়া আসিল, 'জল রইল, মুখ হাত ধোবার—গঙ্গার জল!'

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ছোট একটি টিনের মগে খানিকটা জল। হাতমুখ ধুইয়া ভিতরে আসিয়া ন্যাপারের একটা নভেল বাহির করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু, পড়ায় মন বসিল না। একটু পরে কেষ্ট আসিয়া চাল ডাল প্রভৃতি পাশের ঘরে বুঝাইয়া দিয়া আমাকে আট আনা পয়সা এবং টর্চটা ফেরত দিয়া যাইবার সময় গলার স্বর যতদূর সম্ভব মৃদু করিয়া কহিল, 'আমাদের রায়মশায় বেহেড মাতাল বাবু···কিছু যদি বলে টলে···মনে করবেন না কিছু।'

তারপর নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমার বুকের রক্ত জল হইয়া আসিল কিন্তু। মাতাল জীবটার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ছিল ছেলেবেলা হইতে, এবং ভয়ও। কিছু বলে টলে কি? গালাগালি করিবে নাকি, যদি মারামারি বাধায়? সুন্দরী স্ত্রীর সহিত আমার মত যুবককে দেখিয়া যদি সন্দেহ হয়?...হয়তো কেষ্ট এখনও বেশী দূর যায় নাই, চেঁচাইয়া ডাকিলে এখনও শুনিতে পাইবে।...ফিরিয়া যাইব নাকি ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বসিয়াছি, এমন সময় বাহিরে অন্ধকারে কাহার খক্ খক্ কাশির শব্দ কানে গেল। কি জানি কেন বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম গৃহস্বামী আসিলেন।

পাশের ঘর হইতে তাড়াতাড়ি ডিবেটি হাতে করিয়া মেয়েটি বাহির হইয়া আসিল। উঠান হইতে লোকটা চিৎকার করিয়া কহিল, 'আলোটা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পার না হারামজাদী? আঃ তোর ছোটলোক রে!...'

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি বা রায়মহাশয় দাওয়ায় দাঁড়াইলেন, কহিলেন, 'পা ধোবার জল নেই?'

মেয়েটি আঙুল দিয়া মগটা দেখাইয়া দিল।

'পায়ে ঢেলে দিতে পার না? উঃ, নবাবের বেটী নবাব—আঙুল নেড়ে দেখিয়ে দিলেন। হারামজাদী, তোর বাপের মাথায় জুতো মারতে মারতে পা ধুইয়ে নেব তা জানিস?'

মেয়েটি উত্তর দিল না, নীরবে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি পায়ে জল দিবার কথা পরক্ষণেই ভুলিয়া গেল। টলিতে টলিতে একটু অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে কেন?...রান্না হচ্ছে নিশ্চয়ই? তবে যে আমায় বল্‌লি—ঘরে কিছু নেই, বিকেলে রান্না হবে না? আমি বাইরে থেকে খেয়ে এলুম! মিথ্যে কথা? আঃ তোর ছোটজাত রে।...

মেয়েটি এতক্ষণে কথা কহিল, 'একটি বাবু এসেছেন, তাঁর জন্যেই রান্না হচ্ছে।'

'বাবু এসেছেন, বাবু?'...পরক্ষণেই কুৎসিত গালাগালি করিতে লাগিল। মেয়েটির চতুর্দশ-পুরুষ তুলিয়া নানাবিধ কটূক্তি করিতে করিতে খানিকটা বমিও করিল। তারপর মেয়েটি রান্নাঘরের দিকে যেমন এক-পা বাড়াইয়াছে, লোকটা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, 'কোথায় যাচ্ছিস, হারামজাদী! খবরদার যেতে পারবি না,...আমার সামনে দিয়ে বাবুর জন্যে রাঁধতে যাচ্ছিস!'

বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে প্রহার। প্রহারের শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু

বাহিরে যাইব কি না ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে অমানুষিক প্রহার চলিতে লাগিল। কিল, চড়, লাথি, ঘুষি। মেয়েটির হাত হইতে আলোটি পড়িয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে নীরবে সে মার খাইল, কোনো-রকম কান্নার শব্দ, এতটুকু আর্তনাদ, কাহারও কানে গেল না।

শেষে আমি আর থাকিতে না পারিয়া আলো হাতে বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই লোকটা একেবারে ভালোমানুষ বনিয়া গেল। স্ত্রীকে ছাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আমার দিকে অগ্রসর হইল।

আমি মারামারির জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু সে সামনে আসিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।...মেয়েটি ততক্ষণে উঠিয়া ডিবেটি কুড়াইয়া লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেছে। লোকটা নমস্কার করিতে আমি প্রতি-নমস্কার না করিয়াই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাতালটা কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে-ও ভিতরে ঢুকিয়া মেঝের উপর উবু হইয়া বসিল।

'বেইমান জাত মশাই, বুঝেছেন! একটু শাসন কম করেছেন কি মাথায় চ'ড়ে বসেছে।...এই ব'লে দিলুম, এরপর দেখে নেবেন মশাই, মেয়েমানুষকে সবদা জুতোর তলায় না রাখলে মেয়েমানুষকে নিয়ে ঘর করা যায় না। আঃ তোর খচ্চরের জাত রে!...'

ইচ্ছা হইল জুতা-পাটি তুলিয়া লইয়া লোকটাকে শিক্ষা দিয়া দিই। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করিয়া রাখিলাম। লোকটি কহিল, 'আপনি ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, আমার কি আর সে ক্ষমতা আছে যে, আপনার মান-মর্যাদার উপযুক্ত যত্ন-আত্তি করি!...আপনি অতি মহাশয় লোক, সদ্বংশের লোক! ...ও হারামজাদী মাগী বড় পাজী মশায়! কখন এসেছেন আপনি, এখনও রান্না হ'ল না। কতদূর থেকে এসেছেন পথের কষ্ট, তাকি বোঝে—ঐ জন্যই তো মারতে হয়। দেখুন না মশায় মারতে গিয়ে হাতটা একেবারে ফুলে গেছে।'

তাহার নির্লজ্জতায় বাধা দিবার জন্য বইটা তুলিয়া তাহারই পাতায় মনঃ-সংযোগ করিলাম। সে উঠিয়া কাছে আসিয়া গলাটা খাটো করিয়া কহিল, 'দেবেন বাবু গণ্ডা-দুই পয়সা? বড় অভাবে পড়েছি মশাই, সংসার তো আমাকেই প্রতিপালন করতে হয়। ও মাগী তো যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েই খালাস।'

আমি একটা দো-আনি মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। সে লোকটা উহা কুড়াইয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া 'মহাশয় ব্যক্তি', 'মানুষের ঘরের ছেলে' বলিতে বলিতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ। আমি বইখানা চোখের

সামনে ধরিয়া রাখিলেও উহার পাতায় বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না।...চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া এই মাত্র যে অভিনয় হইয়া গেল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আধঘণ্টা পরে মেয়েটি আসিয়া ঠাঁই করিয়া আসন পাতিয়া দিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই ভাতের থালা আনিয়া ধরিয়া দিয়া কহিল, 'বসুন।' কলাইয়ের থালা আর কলাইয়ের বাটি। বুঝিলাম, প্রভু একছটাক পিত্তল-কাঁসা কোথাও বাকি রাখেন নাই।

খাইতে বসিলাম। মেয়েটি দ্বারের বাহিরে অর্ধ-অন্ধকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে সেই শান্ত আত্মস্থ ভাব। যেন কখনই কিছু হয় নাই, কোথাও তাহার জীবনযাত্রার মধ্যে এতটুকু অসঙ্গতি নাই।

দেখিয়া দেখিয়া আমার বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সেই শব্দে মেয়েটি উঠিয়া চমকিয়া কহিল, 'আর দু'টি ভাত আনব?'

কহিলাম, 'না।'

'আর কিছু চাই? দাল, আলুর তরকারি কিছু?'

'না। দরকার নেই।'

উঠিয়া পড়িলাম। বাহিরে জল প্রস্তুত ছিল। আচমন করিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে আমার উচ্ছিষ্ট বাসন উঠাইয়া লইয়া গেল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া মেঝে পরিষ্কার করিতে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?'

মেয়েটি মুখ তুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল। কহিল, 'দাঁইহাট।'

'সেখানে কি কেউ নেই?'

'না। বৈমাত্রেয় ভাই আছেন। তিনিও কিছু করেন না। তার ওপর তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে।'

'আর কেউ কোথাও নেই?'

তাহার কাজ সারা হইয়া গিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল—'নিজের স্বামী যাকে সম্মান করে না, তার সম্মান কে করবে? দয়া আমাকে ঢের লোক করে। তাতে দরকার নেই।...আপনিও দয়া করছেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারেন? জবাব দিন না!'

আমি মাথা নামাইয়া কহিলাম, 'না, তার চেয়ে বেশী কী আর করব?'

তাহার দৃষ্টি সহসা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, 'আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন,—ক্ষমতা আছে?'

আমি কহিলাম, 'আমার ক্ষমতা কী বলুন। কাজ-কর্ম কিছুই নেই। গরিব মানুষ।......বছর অন্তর একমাস এই বইয়ের কাজ, এই ক'টা টাকা।'

সে হাসিয়া কহিল, 'তা জানি। তবে আর অনর্থক দয়ার চোখে দেখে লাভ কী বলুন! দীর্ঘনিশ্বাসেরই বা প্রয়োজন কী?...যতদিন পারি চলুক। যেদিন পারব না নিজের উপায় নিজেই ক'রে নেব।...ছেলেবেলা থেকে শুকনো সহানুভূতিতে জীবন ভ'রে উঠেছে। ও আর চাই না।—'

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কপাট ভেজাইয়া দিয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। বহুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া ঘণ্টাখানেক বাদে উঠিয়া বাহিরে যাইব বলিয়া দ্বার খুলিলাম। দ্বার খুলিতেই চোখে পড়িল বাহিরের দাওয়াতে চুপ করিয়া বসিয়া আছে সেই মেয়েটি। পাশে ডিবেটা তখনও জলিতেছিল। তাহারই ম্লান আলোয় সুন্দর শান্ত মুখখানিকে যেন তপস্বিনীর মুখের মতই বোধ হইতেছিল। স্থির হইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ভাবলেশহীন মুখে না দুঃখ না ক্রোধ কিছুই বোঝা যায় না। কোনো প্রকার বিরক্তির চিহ্ন নাই। কী যেন এক নিবিড় রহস্য শুধু তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

বাহিরে সেই থম-থমে অন্ধকার, তাহারই মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে বড় বড় গাছগুলি দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে জাহ্নবীর অশ্রান্ত কান্নার শব্দ। বন্য শৃগাল দূরে কোথাও ডাকিতেছে, আর ডাকিতেছে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা। সবগুলিতে মিলিয়া একটা বিচিত্র একঘেয়েমি সৃষ্টি করিয়াছে। আর তাহারই মধ্যে নিস্পন্দ চোখ দু'টি মেলিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। যেন, কী এক অপরূপ সাধনা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহাকে কোনো প্রশ্ন করিলাম না, জানাইলাম না যে, আমিও জাগিয়া আছি। কিন্তু, নিজেও ফিরিয়া গিয়া শুইতে পারিলাম না।

## শেষ সুপ্রা

এর প্রথম অঙ্কের পট উত্তোলন করব আমরা কলকাতার ভিখারী-রাজধানী, মার্কাস-স্কোয়ারে। যেখানে একটা মাঠকে কেন্দ্র ক'রে পেভ্মেণ্টের উপরে অসংখ্য ভিখিরী বারোমাস বাস করে, তাদের চাটাই, হাঁড়ি, ইট এবং সিগারেট বা জ্যাম-জেলির খালি টিন নিয়ে। সেই সব এস্টেট্-পত্র নিয়েই তাদের চলে দিনরাত বচসা—আবার অবসর সময়ে সুখদুঃখের গল্পও হয় পরস্পরের সঙ্গে। মেয়েরা বাছে উকুন—পুরুষরা করে অশ্লীল রসিকতা।

আমাদের নায়িকা চুন্রীর তখন বয়স বোধ হয় দশ হবে, এক-চক্ষু ভিখিরী ঘুরউর সঙ্গে বেড়ায় সে, ঘুরউ তাকে ছেলেবেলায় ডাস্টবিনের ধার থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছিল। ওকে দিয়ে ঘুরউর সুবিধা হয় ঢের—ভিক্ষে করায়, রান্না করায়, এবং সময়ে অসময়ে পা টেপায়। তার বদলে কিছু ভাত আর প্রচুর প্রহার, এই মাত্র তাকে দিতে হয়।

আর নায়ক হ'ল বংশী—গাড়োয়ান বুলাকীপ্রসাদের ভাইপো—গাড়ি ধোয়, ঘোড়াকে খাওয়ায়, ভাড়ার তদ্বির করে—এই ওর কাজ। বাপ-মা নেই, কাকার আশ্রয়েই থাকে। এই পাড়া দিয়েই যাতায়াত আছে—এদের সবাইকেই একরকম সে চেনে। হঠাৎ একদিন যে এদেরই একজনের সঙ্গে তার জীবনের গ্রন্থি জট্ পাকিয়ে যাবে তা সে কল্পনাও করে নি।

ঘটনাটা হ'ল এই—

ঘুরউর ছেলেবেলাকার ভিক্ষে করার সাথী ভিখু হঠাৎ বারো বছর পরে আবার কলকাতায় এসে হাজির হ'ল এবং ঘুরউর সঙ্গে চুন্রীকে দেখে তার ভারি পছন্দ হ'ল। সে দু'চার দিন নিজে পয়সা খরচা ক'রে ঘুরউকে তাড়ি খাওয়ালে, তারপর তার সঙ্গে প্রচুর দরদস্তুর ক'রে একুশটি টাকার বিনিময়ে চুন্রীকে বিক্রি করতে রাজি করালে। কিন্তু, চুন্রীর তাতে ঘোরতর আপত্তি। ভিখুকে দেখতে ঠিক (ওর ভাষায়) যমদূতের মত—যেমন কালো, তেমনি বিচ্ছিরি, তার ওপর একগাল গোঁফদাড়ি। অবশ্য চুন্রীর আপত্তিতে কিছু আসে যায় না। ওরা দু'জনে মিলে একমত হ'ল যে, উভয়ের লাঠিতে তাকে রাজি

করানো কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। সুতরাং, টাকাটার লেনদেন হয়ে গেল এবং একদা অপরাহ্ণে ভিখু এল সম্পত্তিতে দখল নিতে।

চুন্‌রী কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু বেশী রকমই বেঁকে দাঁড়াল। দু'-চার ঘা লাঠি তার গা-সওয়া আছে, তাতে সে যেতে রাজি হ'ল না। অথচ, ঘুরউ এবং ভিখু দু'জনেই সেদিন বেশ ক'রে তাড়ি খেয়ে এসেছে—তাদের এ ধৃষ্টতা অসহ্য বোধ হ'ল, তারা দু'জনে মিলে বেদম ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করলে মেয়েটাকে।

ইতিমধ্যে বংশীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। চুন্‌রীর কান্নাতেই হোক্—বা চারপাশে অন্য সব ভিখিরীগুলো দাঁত বার ক'রে হাসছে দেখেই হোক্—হঠাৎ বংশীর মাথায় গেল রক্ত চ'ড়ে, সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনকার ওপরই। কিন্তু, তার 'যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না'—সে বালক, ঐ দুটো মাতালের সঙ্গে পারবে কেন? সে মার খেলে ভীষণ, শেষ পর্যন্ত ভিখুর লাঠিতে ওর কপাল কেটে দর দর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। ও তখন মরীয়া হয়ে, প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোমতে ভিখুরই লাঠিটা কেড়ে নিয়ে মারলে ভিখুর মাথায় এক ঘা—ভিখুরও মাথা ফাটল। ঘুরউর ততক্ষণে নেশা কেটেছে, এধারেও গোলমালে বহুলোক ছুটে এসেছে। ইতিমধ্যে পুলিশও কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল। পুলিশ এসে দু'জনকেই ধরলে।

দৈবক্রমে সেই সময় বুলাকীপ্রসাদের গাড়িতে চ'ড়েই দু'জন মিশনারী সাহেব যাচ্ছিলেন ঐ পথ দিয়ে। বুলাকীপ্রসাদ গাড়ি থামিয়ে নেমে এল—সাহেবরাও নামলেন। সব কথা শুনে সাহেবরা পুলিশকে কী ব'লে দিলেন, তারা বংশীকে ছেড়ে দিয়ে ভিখু আর ঘুরউকে নিয়ে চ'লে গেল। সাহেবরা আর একখানা গাড়ি ক'রে চুন্‌রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, যাবার সময় বুলাকীকে গোটা-পাঁচেক টাকা দিয়ে ব'লে দিলেন বংশীকে নিয়ে এখনই হাসপাতালে চ'লে যেতে।

যাবার আগে চুন্‌রী সজল চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বংশীর দিকে চাইল, সে দৃষ্টি যেন বললে, 'তোমাকে কখনও ভুলব না!'

এখানেই প্রথম অঙ্কের পটক্ষেপন হ'ল।

এর পরে আবার আমরা নায়ক নায়িকাকে দেখছি বছর-দশেক পরে।

মিশনারীদের আশ্রয়ে প'ড়ে চুন্‌রী লেখাপড়া শিখে ভদ্র হয়েছে। নানা স্থানে ঘুরে সে শেষ-পর্যন্ত প্রকাণ্ড এক পাটকলের মালিকের আশ্রয় পেয়েছে। তাঁর রুগ্‌ণা স্ত্রীর সঙ্গিনী এবং তাঁর সেক্রেটারীর পদ তার—সাহেব ও মেমসাহেব দু'জনেই তাকে কন্যার মত স্নেহ করেন। সাহেবের ছেলের অবশ্য ঠিক ওর ওপর

ভগ্নী-স্নেহ ছিল না—কিন্তু, সেটা এখনও প্রকাশ্য নয়।

এধারে ঐ পাটকলেই বংশী আজকাল কাজ করে। যদিও কেউই সে কথা জানে না। বংশী কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গেই দলে ভিড়ে গেছে। বিড়ি খায়, জুয়া খেলে, রেসেও যায় মধ্যে মধ্যে, দৈবাৎ এক-আধদিন দলে প'ড়ে দেশী মদও যে না খায় তা নয়। অর্থাৎ, সে যেমন আছে তাইতেই খুশী, বড় হবার স্বপ্ন সে দেখে না। চুন্নীর কথা তার আর মনেও নেই তেমন।

কারখানার লোকেরা কখনও, কোনো কালেই মালিকের ওপর সন্তুষ্ট নয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ষড়যন্ত্র একটা ভেতরে ভেতরে চলছিলই। ইতিপূর্বে একবার ছোট রকম ধর্মঘটের চেষ্টা হয়ে গেছে, সুবিধে হয় নি। সুতরাং, এবার ষড়যন্ত্রটা চলেছিল অন্য পথ ধ'রে। দু'বার জেল-ফেরত রঘু হয়েছিল ওদের দলের সর্দার। সৎপথে জীবনযাপনের দুঃখ ওর কিছুতে সইছিল না। বংশীর সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে ওর ওপর রঘুর নজর পড়েছিল প্রথম থেকেই, বলা বাহুল্য দলে টানতেও খুব বেগ পেতে হয় নি।

পাট কেনবার কাঁচা টাকা কোন্ সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে ঘরে রাখা হয় তা রঘু জানত। কিন্তু, টাকা ছাড়াও আর একটি জিনিসে ওর লোভ ছিল। সাহেবের খাপসুরৎ সেক্রেটারীটিকেও ওর চাই। সে সেই দুরূহ কাজটিরই ভার দিলে বংশীর ওপর। বুঝিয়ে দিলে যে, ওর ওপর সাহেবের নিজেরই নজর আছে, ওকে সরাতে পারলে সাহেব সবচেয়ে বেশী জব্দ হবে।

দিন-ক্ষণ ঘনিয়ে এল। রঘু আর দু'জন লোক ভার নিয়েছিল গুর্খা দারোয়ান দুটোর। বেচারারা পাহারা দিতে দিতে কখন তন্দ্রার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, ভরসা ছিল কুকুর জাগিয়ে দেবে, কিন্তু, কুকুরের মেথরকে ঘুষ দিয়ে বিকেল বেলাতেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখা হয়েছিল, সে তখন ঘুমে অচেতন।

ঘুমিয়ে ছিল সকলেই। খালি চুপ ক'রে জেগে শুয়েছিল চুন্নী একা। কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে সে তখন হারিয়ে-যাওয়া বংশীর কথাই ভাবছিল। ওদের একটু হিসেবের ভুলে রঘুর দল গুর্খা দারোয়ানদের আয়ত্ত করার আগেই বংশী চুন্নীর বাথরুমের মধ্যে দিয়ে ওর ঘরে উপস্থিত হয়েছিল। অতি লঘু পদশব্দ, কিন্তু জাগ্রত চুন্নীর কানে তা এড়ায় নি। সে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে বেড্-সুইচ্টা টিপে দিলে। উজ্জ্বল আলো গিয়ে বংশীর মুখে পড়ল, তার হাতে তোয়ালে আর তুলো—চুন্নীর মুখ বাঁধবার সরঞ্জাম।

এতদিন পরে—কিন্তু, চুন্নী দেখেই চিনতে পারলে।

'বংশী তুমি ?'

আলো জ্বলবার বিস্ময় মুহূর্তমধ্যে সামলে নিয়ে বংশী ওকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছিল। অকস্মাৎ এই আত্মীয়তা-সূচক সম্বোধনে সে আবার বিস্ময়ের আঘাত পেলে। তার চোখের বিহ্বলতা লক্ষ্য ক'রে চুন্‌রী ব্যাকুল হয়ে ব'লে উঠল, 'বংশী আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি চুন্‌রী।'

'চুন্‌রী ?'

বিস্ময়ের ও বিস্মৃতির পরপার থেকে দু'টি সজল কৃতজ্ঞ চোখ ভেসে এল ওর মনের মধ্যে।

কিন্তু, এদিকে তখন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। চুন্‌রীর পাশের ঘরেই থাকেন ওর মনিব-পত্নী। চুন্‌রীর প্রথম ডাকেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মধ্যরাত্রে চুন্‌রীর বিস্মিত সম্বোধনে তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন। আর সেই চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল সাহেবের। টাকা থাকে তাঁর ঘরে, সেইজন্যে রিভলভারও থাকে বালিশের নিচে। গুর্খাদের আয়ত্ত ক'রে গুণ্ডার দল তাঁর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি উঠে বসেছেন। গুড়ুম ক'রে বার-দুই শব্দ হ'ল। অস্ফুট আর্তনাদ ও চিৎকার। হৈ-চৈ—চারদিকে সবাই জেগে উঠেছে—ঘরের মধ্যে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে বংশী ও বিছানায় ব'সে চুন্‌রী তাই শুনছে, দু'জনেই যেন স্তম্ভিত।

কিন্তু, সংবিৎ ফিরে এল প্রথম চুন্‌রীরই। সে এতক্ষণ ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে পেরেছে। চট ক'রে আলোটা নিভিয়ে চুপিচুপি কণ্ঠস্বরেই একটু জোর দিয়ে সে বললে, 'পালাও, পালাও !'

বংশীও তখন নিজের বিপদ বুঝেছে। সে যে পথে এসেছিল, সেই পথেই পালিয়ে গেল। বাথরুমের দরজা যখন পার হয়েছে, তখন ছুটে এসে চুন্‌রী ওর হাতে নিজের গলার সোনার হারটা গুঁজে দিয়ে ব'লে দিলে, 'আজ রাত্রেই যতদূরে হয় চ'লে যেও—আর একমিনিটও দেরি ক'রো না !'

ততক্ষণে লোকজন ওর ঘরে এসে পড়েছে। চুন্‌রী বললে, 'যে এসেছিল, জোর ক'রে আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'চেনো ওকে ?'

চুন্‌রী বললে, 'না।'

তাঁর স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যেন কী নামে ডাকলে একটা ?'

চুন্‌রী লাল হয়ে উঠল। কিন্তু, তবু বললে, 'আমি কী স্বপন দেখেছিলুম,

তাই ডেকেছি হয় তো—কাকে মনে ক'রে !'

এইখানেই দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।

রঘু মারা গিয়েছিল। কিন্তু, অন্য লোকের সাহায্যে যার যারা সে দলে ছিল, নাম জানতে অসুবিধে হ'ল না। বিশেষ ক'রে বংশী ফেরার হ'তে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন চুন্‌রী সাহেবের কাছে নিভৃতে বংশীর কাহিনী খুলে বললে। সে কাহিনী শুনেই হোক্‌ আর চুন্‌রীর চোখের জল দেখেই হোক—সাহেব বংশীর পরোয়ানাটা চেপে দিলেন। চুন্‌রী নিশ্চিন্ত হ'ল, কিন্তু আর একটি লোক এই ছোট্ট গর্ভাঙ্কের সাক্ষী রইল আড়াল থেকে—সে সাহেবের ছেলে দুর্গাপ্রসাদ।

এধারে ভয়ের প্রথম বিহ্বলতায় বংশী পালিয়েছে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। কিন্তু, খানিক পরে মাথা যখন ঠাণ্ডা হ'ল, তখন সে ভেবে দেখলে যে, সে একবস্ত্রে এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে আর কিছুই নেই। চুন্‌রীর হারটা তার ঠিক বিক্রি করতে ইচ্ছে হ'ল না। এই একটা রাতে তার যেন সব ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে গেছে। সাহেবের উচ্চশিক্ষিতা সেক্রেটারীকে সে দূর থেকে সম্ভ্রম ও ঈর্ষাই ক'রে এসেছে, সে যে চুন্‌রী হ'তে পারে তা কোনোদিনই ভাবে নি। আজ অত্যন্ত এক লজ্জাকর ঘটনার মধ্যে সহসা সে আবিষ্কার করল যে, সে-ই মেয়েটিই চুন্‌রী এবং সে কুলি বংশীকে আজও ভোলে নি! শুধু তাই নয়—হয়তো সে আজও তাকে স্নেহই করে, নইলে অত অল্প সময়ের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে নিজের গলা থেকে অমন ক'রে হার খুলে হাতে গুঁজে দিত না।

আর সে! সে যে ইতিমধ্যে কত নীচে নেমে এসেছে, চুন্‌রীর মত মেয়ের বিশ্বাস ও স্নেহের কত অনুপযুক্ত, তাই মনে ক'রে লজ্জায় ওর মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে হ'ল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, চুন্‌রীর স্নেহের দান সে বুকে ক'রে রেখেই দেবে—বিক্রি করবে না কিছুতেই।

কিন্তু, এধারে ওর হাতে একটি পয়সাও নেই। দু'দিন ধ'রে ওর পালাবার দিকেই নজর ছিল বেশী, উপার্জনের কথা ভাবতে পারে নি। ক্ষুধায় পেটে যন্ত্রণা শুরু হ'ল। ভিক্ষার চেষ্টা করলে, কিন্তু ওর যৌবনপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে কেউই ওকে ভিক্ষা দিলে না। তখন বাধ্য হয়ে তৃতীয় দিনের দিন সেই হারই সে বিক্রি করতে গেল। বিধি বাম, ওর আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে সোনার হারের এমনই গরমিল যে, পোদ্দার সন্দেহ ক'রে পুলিশে খবর দিলে। পুলিশের কাছে

বংশী না পারলে নিজের পরিচয় দিতে, না পারলে চুন্‌রীর কথা জানাতে। প্রথমটা পারলে না ডাকাতি পরোয়ানার ভয়ে—সে জানত না যে, তার নামে পরোয়ানা নেই—আর দ্বিতীয়টা পারলে না এইজন্যে যে, পুলিশ চুন্‌রীকে কোর্টে টেনে এনে তার অন্তরের গোপন কৃতজ্ঞতাটুকুকে বিকৃত, কুৎসিত ক'রে তুলবে এই কল্পনা ক'রে। যা হবার ওর ওপর দিয়েই হোক—চুন্‌রী পবিত্র থাক, নিশ্চিন্ত থাক। সুতরাং, 'আমি চুরি করি নি' এ ছাড়া একটি কথাও সে বলতে পারলে না। ফলে, ওর মাস-ছয়েকের জেল হয়ে গেল।

চুন্‌রী এই ঘটনার কথা কিছুই জানতে পারলে না বটে, কিন্তু আর একজন বহু চেষ্টা ক'রে সে সংবাদ গ্রহণ করলে। দুর্গাপ্রসাদ ডাকাতির দু'তিন দিন পরেই চুন্‌রীকে নিভৃতে পেয়ে আবেগের সঙ্গে প্রণয়-নিবেদন করতে গেল, কিন্তু চুন্‌রী ওকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলে যে, সে অপরকে ভালোবাসে, আর কাউকে দেহ বা মন দান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দশ বৎসর আগের বালক রক্ষাকর্তাকে সে সারা মন দিয়ে পূজা করতে করতে কখন যে যৌবনে দয়িতের আসন দিয়েছে তা সে নিজেই জানতে পারে নি। কিন্তু, আজ সে বুঝেছে যে, সত্যিই তার পক্ষে আর কাউকে ভালোবাসা বা আর কারুর ঘর করা সম্ভব নয়।

দুর্গাপ্রসাদ যে এ প্রত্যাখ্যানে খুশী হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য। সে ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে প্রাণপণে চতুর্দিকে লোক লাগিয়ে দিলে বংশীর খবরের জন্য এবং তার কারাবাসের খবর পেয়ে প্রদীপ্ত মুখে গিয়ে চুন্‌রীকে সংবাদ দিলে, 'তোমার বংশী সোনার হার চুরি ক'রে জেলে গেছে!'

বংশীর নাম দুর্গাপ্রসাদের মুখে শুনে প্রথমটা ও বিবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু, দুর্গাপ্রসাদের হিতে বিপরীতই হ'ল। বংশী যে জেলে গেছে তবু ওর নাম করে নি, ওকে নানারকম কুৎসার জালে জড়ায় নি, এই মনে ক'রে প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভ'রে উঠল। সে তখনই প্রস্তুত হ'ল পুলিশের কাছে গিয়ে সত্য কথা বলবার জন্য।

কিন্তু, দুর্গাপ্রসাদ কঠিন বিদ্রূপের স্বরে বললে, 'ও হার তুমি দিয়েছ একথা যখন পুলিশকে জানাবে, তখন কবে, কখন, ও কেন দিয়েছ, সে প্রশ্ন তারা করবে না তো ঠাকুরুন? তখন তুমি সত্যি কথা না বললেও হয়তো অপরকে বলতে হবে। তোমার সত্য-নিষ্ঠার নেশা আমাকেও লেগেছে কিনা!... তখন আবার ছ'মাসের জায়গায় ছ'বছর না হয়ে যায়, তাই ভাবছি!'

চুন্‌রী ভয়ে ও ঘৃণায় কাঠ হয়ে উঠল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দুর্গাপ্রসাদের

উদ্দেশ্যই সফল হ'ল—বংশীর কল্যাণ-কামনা ক'রেই ও তাকে উদ্ধার করতে যেতে পারলে না। তবে আর একটা দিকে ও মনস্থির ক'রে ফেললে। এখানে থাকবে না সে কিছুতেই—এ আশ্রয় ছাড়তে হবে, গোপনে। সে ধীরে ধীরে তার পোস্ট-অফিসের সঞ্চিত টাকা তুলে আনলে, অন্যান্য জিনিসপত্রও গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু, হঠাৎ দুর্গাপ্রসাদের মায়ের অসুখ গেল বেড়ে। যাঁরা এতদিন কন্যা-স্নেহে পালন করেছেন তাঁদের দুর্দিনে সে ছেড়ে যেতে পারলে না। 'যাই যাই' ক'রেও মাস পাঁচেক কেটে গেল—চুন্‌রী জানতেও পারলে না যে, বংশীকে ইতিমধ্যেই জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

বংশী জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে, তা জেলে ব'সেই স্থির ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু, যাবার আগে একবার গোপনে চুন্‌রীকে না দেখে সে কিছুতেই দূরে চ'লে যেতে পারলে না। এই ক'মাস জেলে সে দিনরাত চুন্‌রীর কথাই ভেবেছে—ফলে, যে চুন্‌রীকে দীর্ঘদিন ভুলে ছিল তাকেই সে আজ তার অন্তরে বসিয়েছে প্রেমের আসনে।

গোপনে, সবার চক্ষু এড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়ায় ক্লান্ত, উপবাসক্ষিন্ন বংশী যখন সাহেবের বাংলোর বাগানে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন সেখানে এক বিচিত্র নাটকের অভিনয় চলেছে। অনেক দিন পরে মেমসাহেব একটু সুস্থ আছেন ব'লে চুন্‌রী বাগানে বেরিয়েছিল, নিভৃতে একটু নিজেকে নিয়ে থাকবে ব'লে। দুর্গাপ্রসাদও এমনিই একটা অবসর খুঁজছিল—তার কামনা তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে। সে পেছনে পেছনে গিয়ে হঠাৎ চুন্‌রীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'আর কেন? সে জেল-ফরত আসামীর মায়া এখনও কি কাটাতে পার নি?'

চুন্‌রীর দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল। সে বললে, 'এর আগে আপনার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। আপনার বাবা দুঃখ পাবেন ব'লেই জানাই নি—কিন্তু, ফের যদি বিরক্ত করেন তো জানাতে বাধ্য হব।'

দুর্গাপ্রসাদ একটু দমে গেল। এবার তার কণ্ঠে মিনতির সুর। বললে, 'দেখ, এমনি তোমার অপমান বোধ হয় তো আমি তোমাকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত আছি। এর চেয়ে আর তুমি কী চাও?'

চুন্‌রী জবাব দিলে, 'আর আপনার বিয়ে করবার প্রস্তাবেও যদি আমি অপমান বোধ করি?'

দুর্গাপ্রসাদের মুখ লাল হয়ে উঠল। বললে, 'মিশনারীদের কুড়োনো মেয়ে,

এত স্পর্ধা তোমার ?'

সে সবেগে ওর একটা হাত চেপে ধরলে। বললে, 'যেমন তুমি, তোমার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করাই দরকার।'

তার আকস্মিক আকর্ষণে চুন্‌রী একেবারে ওর বুকের ওপর এসে পড়েছিল। সে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তুমি, তোমার এত সাহস!'

দুর্গাপ্রসাদ বিদ্রূপের সুরে জবাব দিলে, 'এতদিন ছেড়ে দিয়েই আহাম্মুকি করেছি, আর নয়—।'

ঠিক সেই সময়েই পাশ থেকে বংশীর অব্যর্থ ঘুষি এসে পড়ল ওর রগে—দুই চোখে অন্ধকার দেখে ও বাগানের মধ্যে প'ড়ে গেল। চুন্‌রী বললে, 'বংশী তুমি! তুমি মুক্তি পেয়েছ—?'

বংশী ওর দু'টি হাত ধ'রে জবাব দিলে, 'হঁা চুন্‌রী। পেয়েছি। আমি বিদেশ যাচ্ছিলুম, টাকা রোজগার করতে, আর, আর সেই সঙ্গে মানুষ হ'তে—। যাবার আগে একবার তোমাকে শেষ দেখা দেখে যাব আড়াল থেকে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু, আর তো তোমাকে এখানে রেখে যেতে পারি না। চল চুন্‌রী এই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।'

চুন্‌রী ঘাড় নাড়লে। বললে, 'এখান থেকে যদি আমি তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, তুমি কিছুতেই মাথা তুলতে পারবে না, মানুষ হ'তে পারবে না। তার চেয়ে তুমি যাও তোমার পথে, আমার জন্যে ভেব না, আমি ঠিক নিজেকে রক্ষা করতে পারব। যখন জেনেছি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তখন আর আমার কিছু ভয় নেই। সেই ভালোবাসাই আমাকে রক্ষা করবে!'

ওর মুখের দিকে চেয়ে কী বুঝলে বংশী তা সে-ই জানে। সে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'তোমার ইচ্ছা! তাহ'লে যাই চুন্‌রী।'

চুন্‌রী বললে, 'এক মিনিট দাঁড়াও।'

সে ছুটে চ'লে গেল নিজের ঘরে। মুহূর্ত মধ্যে ফিরে এসে ওর হাতে এক-তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে বললে, 'এ টাকা তোমার জন্যেই তুলে রেখেছিলুম, তোমার কাছেই যাব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু, তার দরকার হ'ল না। এ তুমি নিতে দ্বিধা ক'রো না। এই দিয়েই ব্যবসা কর, বড় হও। না, না, আমায় ভিক্ষা দাও এটুকু, এ তোমায় নিতে হবেই।'

ব্যাকুল হয়ে বংশী বললে, 'কিন্তু আবার কবে, কোথায় তোমার দেখা পাব ?'

চুন্‌রী কোনো নামই ভেবে না পেয়ে বললে, 'যেখানেই থাকি না কেন, আজ থেকে দু'বৎসর পরে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে তোমার পায়ের তলায় গিয়ে দাঁড়াব। এই দু'বছরই তোমায় সময় দিলুম—মানুষ হবার।'

বংশী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিরহিণী চুন্‌রী জানতেও পারলে না যে ইতিমধ্যেই মূর্ছাহত দুর্গাপ্রসাদের জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং শেষের কথাগুলি সে শুনেছে—

এইখানেই তৃতীয় অঙ্ক শেষ হ'ল।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দুর্গাপ্রসাদের মা ও বাবা দু'জনেই মারা গেছেন ছ'মাসের মধ্যে। চুন্‌রী এর পর থেকে নিজেকে এমন ভাবেই সাবধানে রেখেছিল যে, দুর্গাপ্রসাদ তার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায় নি। ওর বাবা মারা যেতেই মিশনের সাহায্যে সরকারী ইস্কুলে চাকরি নিয়ে চুন্‌রী চ'লে গেছে পাটনায়—সম্পূর্ণরূপে দুর্গাপ্রসাদের আয়ত্তের বাইরে।

কিন্তু, তবু দুর্গাপ্রসাদ ভোলে নি। ওর বাবা মরে যেতে ও-ই সমস্তর মালিক। চুন্‌রী চ'লে যাবার পর সেই অধিকারে সে পুলিশকে জানিয়েছিল বংশীর কথা।. অর্থাৎ, সেদিনের ডাকাতিতে যে সে-ও ছিল এইটে জানিয়ে কিছু অর্থের বিনিময়ে ওর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সেই দিনটির, যেদিন বংশী নিশ্চয় চুন্‌রীর আশায় কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে অপেক্ষা করবে।

এধারে বংশী চুন্‌রীর টাকা সম্বল ক'রে চ'লে এসেছে এটোয়াতে। সেখানে প্রথমে শুরু করে চালডালের ব্যবসা। দিনে মুদির দোকান চালায়, আর রাত্রে এক ইস্কুলের ছাত্রকে পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে লেখাপড়া শেখে। মুদির দোকান থেকে ঘিয়ের ব্যবসা। ওর সততা ও সহৃদয়তায় ব্যবসা জমে উঠতে দেরি হ'ল না। এই প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, কর্মঠ যুবককে সকলেই সাহায্য করে—নানাবিধ সৎকার্যের নায়ক ব'লে ছোকরারা ওকে ক'রে নিয়েছে নিজেদের সর্দার মান্য করে দেবতার মত। বংশী অন্তরে-বাইরে চেষ্টা করছে চুন্‌রীর উপযুক্ত হবার।

দু'বৎসরের শেষে ঠিক সেই দিন সন্ধ্যায় বংশী এসে দাঁড়াল দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে। চুন্‌রী এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বংশীর মুখের দিকে চেয়েই চুন্‌রী বুঝতে পারল যে, তার প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সত্যিই বংশী আজ মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছে। আনন্দে ও গর্বে ওর বুক ভ'রে গেল।

বংশী হাত ধ'রে প্রণতাকে তুলে বললে, 'চল চুন্‌রী আমার ঘরে। হয়তো সে ঘর এখনও তোমার উপযুক্ত হয় নি। কিন্তু, চেষ্টা করেছি প্রাণপণে—এ তুমি বিশ্বাস কর।'

চুন্‌রী আনন্দের অশ্রু মুছে বললে, 'দয়া ক'রে যদি সেখানে স্থান দাও তো বুঝব স্বর্গ এগিয়ে এল আমার হাতের কাছে—।'

সেই দিনই রাত্রে ওরা এটোয়া যাত্রা করল। দুর্গাপ্রসাদ পরোয়ানা ও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ছায়ার মত অনুসরণ করছে ওদের, পরিপূর্ণ আনন্দের মুখে প্রতিশোধ নেওয়া চাই ওর।

চুন্‌রী ক্রীশ্চান, বংশী হিন্দু। দু'জনেই জাতি-গোত্রহীন। সুতরাং, আর্য-সমাজী মতে বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু, বিবাহের দিনটিতেই ধূমকেতুর মত দুর্গাপ্রসাদের আবির্ভাব হ'ল, সঙ্গে পরোয়ানা।...

চুন্‌রী মূর্ছিতা হয়ে পড়ছে দেখে ওকে বুকে টেনে নিয়ে বংশী বললে, 'ভয় কি চুন্‌রী! এ ভালোই হ'ল। পাপ তো করেছিলুম ঠিকই, তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাওয়াই দরকার। একেবারে নির্মল হয়ে তোমার কাছে আসব। তুমি রইলে, আমার ব্যবসা ও অনাথ-আশ্রমটি দেখো—'

চুন্‌রী উত্তেজিত হয়ে বললে, 'কিন্তু, তুমি তো ডাকাতি করতে যাও নি, তুমি গিয়েছিলে আমার ঘরে। আমি আদালতে সেই কথাই বলব—বলব তুমি আমার কাছে এসেছিলে রাত্রে—তোমার প্রণয়িনীর কাছে।'

শিউরে উঠে বংশী বললে, 'ছি-ছি, চুন্‌রী, আমাকে বাঁচাবার জন্যে তোমাকে লোকের উপহাসাস্পদ করব! কলঙ্কের কালি লেপে দেব তোমার মুখে? সে হয় না। তাছাড়া মিথ্যে কথা আর বলব না...এ আর কতদিনই বা, এতদিনই যখন সইলে, না হয় বড়জোর দুটো বছর—সইতে পারবে না?'

বংশী চ'লে গেল। কিন্তু, ওখান থেকে চ'লে আসবার পর দুর্গাপ্রসাদের এই প্রথম মনে হ'ল এ প্রতিহিংসার মূল্য কী? চুন্‌রীকে তো পাওয়া গেল না, সে তো আরও দূরে চ'লে গেল। তবে মিছিমিছি এত কাণ্ডর কী দরকার ছিল—হিংসার তপস্যা তো ঘৃণাই এনে দিলে!

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে সে সেইদিনই বাড়ি ফেরবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু, বংশীর ভক্ত যে যুবকের দল, তারা ছাড়লে না। তারা সকলেই প্রায়

অশিক্ষিত, বন্য, সবে বংশী তাদের দেশের সেবায় নিযুক্ত ক'রে মার্জিত ক'রে তুলছিল, এখনও তারা মহৎভাবে ক্ষমা করতে শেখে নি। পথে গাড়ি থামিয়ে দুর্গাপ্রসাদকে টেনে বার ক'রে লাঞ্ছনা করলে ঢের, তারপর টেনে আনলে বংশীর বাড়িতে চুন্‌রীর কাছে। চুন্‌রী দেখে শিউরে উঠল, বললে, 'ছি, ছি, করেছ কী? তোমাদের বংশী জানতে পারলে লজ্জায় মরে যাবে যে। ঘৃণার প্রতিশোধ কি হত্যায় হয়? ও নিজেই একদিন বুঝত ওর অন্যায়, সেইদিনই এর শোধ উঠত।'

সে নিজে এসে অপ্রতিভ ভক্তদের কাছ থেকে দুর্গাপ্রসাদকে ভেতরে নিয়ে গেল। দু'-এক জায়গায় কেটে গিয়েছিল, সেগুলো নিজে হাতে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। সস্নেহ সেবায় সুস্থ ক'রে তুলতে দুর্গাপ্রসাদের মাথা আরও নিচু হয়ে গেল লজ্জায়। বেচারী বেশী কিছু বলতে পারলে না, শুধু বললে, 'বাবা তোমাকে নিজের মেয়ের মত দেখতেন, সেই কথা স্মরণ ক'রে যদি পার তো আমাকে পাপিষ্ঠ ভাই ব'লে মনে ক'রো, তাহ'লে হয়তো একদিন ক্ষমা করতে পারবে।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর একটা কাজ বাকি আছে, এখনই সেটা সারতে হবে—।'

সে তখনই চ'লে গেল। চুন্‌রীর বুক উঠল কেঁপে, তবু সে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করল না যে, কাজটা কী।

গভীররাত্রে বংশীকে সঙ্গে ক'রে আবার সে ফিরে এল। চুন্‌রীর কাছে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'আমিই কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম, আবার আমিই ফিরিয়ে দিলুম, তাতে যদি অপরাধ কিছু কমে।'

চুন্‌রী ওর হাত দু'টি ধ'রে বললে, 'কিছু অপরাধ তো তুমি কর নি ভাই। তোমার জন্যই তো আজ আমি বুঝতে পারলুম আমার বংশী কত বড়। এর মূল্য তো কম নয়।'

বংশীর নীরব মার্জনা আর চুন্‌রীর স্নেহ মাথা পেতে নিয়ে দুর্গাপ্রসাদ বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হতভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে শুধু চুন্‌রীর চক্ষু হয়ে উঠল সজল।

দাদা আমাদের দান গ্রহণ করেন না, ধার করেন।

দাদা, অর্থাৎ শৈলেশ্বর চক্রবর্তী পঞ্চাশ পার হইয়াছেন। বেঁটে-খাটো গোল-গাল ঢিলা চেহারা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, প্রকাণ্ড টাক এবং ছোট চোখ। এত ছোট যে, মনে হয় সৃষ্টিকর্তা ঐ ইন্দ্রিয়টি দিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পরে তাড়াতাড়িতে নরুন দিয়া একটু চিরিয়া দিয়াছেন। দাদার সংসারে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের দরুন বিধবা শালী এবং দুই পক্ষের ডজনখানেক ছেলেমেয়ে বর্তমান। মাথা গুঁজিবার মত পৈতৃক দেড়খানি ঘর আছে, তাহাতেই চলে। আর কিছুই নাই, ধার করেন।

এই ধার করার একটু ইতিহাস আছে। গ্রামে মড়া ফেলিতে হইলে দাদাকে প্রয়োজন হয়, ঝি-বৌয়ের ব্যথা উঠিলে দাই ডাকিতে দাদাই গমন করেন, কাহারও অসুখ করিলে রাত জাগেন আমাদের দাদাই। সুতরাং, এই উপকারী মানুষটিকে সাহায্য করিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু, দাদার ভয়ঙ্কর আত্মসম্মান-বোধ, তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে চাহিতেন না।

'শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আজ না হয় গরিবই হয়েছে, কিন্তু এখনও তো তার পৈতৃক ভিটে আর দু'বিঘে ধান জমি আছে, দান সে কারুর কাছ থেকে জীবনে একপয়সা কখনও নেয় নি, আর বেঁচে থাকতে নেবেও না!'

কিন্তু, ঐ দু'বিঘে ধানজমিতে তাঁহার চলিত না, আমাদের কাছেই আসিতে হইত, কাহারও কাছে দু'টাকা কাহারও কাছে একটাকা এ-প্রায়ই তিনি চাহিয়া লইতেন। তবে সে ধার। দস্তুরমত হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া তবে ঐ অর্থ তিনি গ্রহণ করিতেন। ঐ ঋণ যে কবে শোধ হইবে তাহা অন্তর্যামীই জানিতেন, তবে মানুষটাকে খুশী করিবার জন্য আমরা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইতাম ও বাড়ির মধ্যে গিয়া আগুনে পোড়াইয়া দিতাম। দাদা কিন্তু সর্বদাই আশ্বাস দিতেন, 'কিচ্ছু ভেবনা ভায়া, মরবার আগে ঋণ আমি শোধ দিয়েই মরব। ঋণ নিয়ে মরে নরকস্থ হব না। তবে সময়টা কিনা বড্ডই খারাপ পড়েছে তাই—'

আমরাও সায় দিতাম, 'তা বৈকি দাদা, আপনার কাছে টাকা, এ তো

লোহার সিন্দুকে রইল।'

এহেন দাদাকে একদিন দান গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই ইতিহাসই আজ বলিতে বসিয়াছি।

আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যু হয় কলিকাতায়। তাঁহার স্ত্রী আগেই স্বর্গস্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং, পিতৃ-মাতৃহীন তরুণ জমিদার সহসা একদিন আজন্ম কলিকাতা বাসের মায়া কাটাইয়া একা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার অবর্তমানে কলিকাতায় বাস তাঁহার অসম্ভব জানাইয়া, সেখানকার চাকর দাসী কর্মচারী সকলকে জবাব দিয়া, বাড়িটি পাঁচশত টাকায় একজন সাহেবকে ভাড়া দিয়া, চিরকালের মতই দেশে আসিলেন। নায়েব গোমস্তা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বহুকালের আবর্জনা সব স্থানভ্রষ্ট হইল এবং রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া বাড়িটা বাসোপযোগী করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে, জমিদার কাহাকেও সংবাদ না দিয়া একটি মাত্র পুরাতন ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং একটা মানুষের পিছনে এক কুড়ি দাস-দাসী রাখা নিষ্প্রয়োজন স্থির করিয়া একটি পাচক ও দুইটি দাসী ছাড়া সবাইকে অগ্রিম মাহিনা দিয়া বিদায় করিলেন।

জমিদার আসিয়াছেন এত কাল পরে। তাঁহাকে একটা নজর দেওয়া প্রয়োজন স্থির করিয়া প্রথম দিনই অপরাহ্ণে আমি ও পাড়ার প্রধান ব্যক্তি বিষ্ণু চাটুজ্জে মহাশয় নজরের টাকা লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলাম। আমাদের মুখে সব হাল শুনিয়া পরদিন আর সকলে যাইবে ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জমিদার শুনিয়াছিলাম বি-এ পাস। চেহারা দেখিলাম বেশ সুশ্রী ও নম্র। প্রণাম করিয়া একেবারে পায়ের ধূলা লইয়া ছেলেটি বলিল, 'আপনাদের চরণ দর্শন করতে আমারই প্রথমে যাওয়া উচিত ছিল। আজই এসেছি, বড্ড শরীর খারাপ ব'লে যাওয়া হ'ল না, অপরাধ হয়ে গেল। যাক, আপনারা যে আমাকে পর ভাবেন নি এতে বড় আনন্দ হ'ল।'

আমরা একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলাম। সেকি কথা, সেকি কথা, ইত্যাদি।

তারপর নজরের টাকা কয়টি রাখিতেই বলিল, 'এ কিসের টাকা?'

আমি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম, চাটুজ্জে মহাশয় উত্তর দিলেন, 'আপনার যৎসামান্য নজর।'

ছেলেটি ভীষণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, কহিল, 'দেখুন আপনারা এনেছেন

এখন ফিরিয়ে দিলে আপনাদের অপমান হবে ব'লে আমি নিচ্ছি, কিন্তু আমি সত্যিই কারুর কাছ থেকে নজর নিতে পারব না।' তারপর চাকরকে ডাকাইয়া আমাদের জন্য দুই থালা জলখাবার আনিতে বলিয়া কহিল, 'আর অমনি নায়েব-মশাইকে ব'লে দিবি তিনি যেন সব গ্রামেই লোক পাঠিয়ে ব'লে দেন যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তাঁরা যেন নজর হিসেবে কিছু না নিয়ে আসেন।'

তারপর এখানকার গল্প শুনিয়া, প্রত্যেকটি প্রজার আদ্যোপান্ত পরিচয় লইয়া আমাদের প্রচুর জল খাওয়াইয়া যখন বিদায় করিলেন, তখন রাত্রি অনেকটা হইয়া গিয়াছে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম অদ্ভুত ব্যাপার। জমিদার-মহাশয় প্রণামী পাঠাইয়াছেন ইতিমধ্যে—একখানি নূতন থালায় মিষ্টান্ন, একজোড়া ধুতি চাদর এবং ঐ নজরের টাকা কয়টি। মনে মনে খুশী হইলাম, বড় কষ্টের টাকা।

ইহার কয়েকদিন পর শুনিলাম জমিদারবাবু অসুস্থ। সুতরাং, কেহ আর দেখা করিতে গেল না—বিশেষ খবরও রাখি নাই। চার-পাঁচ দিন পরে আবার বাল্য-বন্ধু যোগেনের সঙ্গে জমিদারকে একটু আপ্যায়িত করিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

বড়-বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া শুনিলাম খবর খারাপ, জমিদারবাবু অত্যন্ত অসুস্থ। ভীষণ জ্বর—প্রলাপ বকিতেছেন। ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গেলাম। কিন্তু, আরও বিস্ময় আমাদের কপালে ছিল, দেখি আমাদের দাদা রোগীর শিয়রে বসিয়া মাথায় বরফ ধরিয়া আছেন এবং দাদার কন্যা মেঝেতে বসিয়া বেদানার রস প্রস্তুত করিতেছেন।

দাদা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'এস ভায়া, এস। বাবুর বড় অসুখ। সেদিন বাজার যাচ্ছি, দেখি বুড়ো চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তারের বাড়ি যাচ্ছে, বলে খোকাদাদার বড় অসুখ। বাজার যাওয়া হ'ল না। ছুটে এলাম, দেখি ঝিয়ের দ্বারা সেবা ঠিক হয় না, আমার গিন্নীরও অসুখ, তাই বাধ্য হয়ে মেয়েটাকেই আনতে হ'ল।……দেখ না, এতদিন বাদে দেশে এলেন, তা এসেই এক ফ্যাসাদ।'

আমরা দাদার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া গেলাম, যোগেন স্পষ্টই কহিল, 'তুমি দাদা গাঁয়ের মান রাখলে।'

তারপর আমরা সকলেই প্রত্যহ খবর লইতাম। আমলা-গোমস্তারা সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল। কিন্তু, কাজ প্রকৃতপক্ষে দাদাই করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারই সেবা-যত্নে ছেলেটি সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

একটু সুস্থ হইলে দাদা কন্যাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও দুই-চারি দিন বাদে গৃহে ফিরিলেন। ইন্দু নিরাময় হইয়া দাদাকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব করিলে, দাদা সগর্বে 'শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, মরিয়া গেলেও কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিবে না'—জানাইয়া চলিয়া আসেন। এমন কি ধার করিতেও কোনদিন আর যান নাই।

ইহার মাস-ছয়েক পরে দাদার কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এই সময়ে কিছু সাহায্য দাদাকে লইতেই হইবে এই আশ্বাস আমরা ইন্দুকে দিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু, সে গুড়ে বালি দিয়া সর্বস্ব বন্ধক রাখিয়া বিবাহের বরপণ বাবদ একশত এক টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ একশত, এই একুনে দুই শত এক টাকা সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইলেন। আমরা তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম, 'আমাদের জানালেন না কেন দাদা? টাকাটা কি আমরাই ধার দিতে পারতুম না? গেলেন ও গাঁয়ে ধার করতে?'

দাদা বলিলেন, 'তোমাদের কাছ থেকে এত ধার করেছি ভাই, তাই দিতে পারছি না, আবার কত বলি।'

'এ টাকাটা জমিদারের কাছ থেকে নিতে পারতেন তো?'

দাদা লজ্জিত হইয়া চুপি চুপি কহিলেন, 'মনে করবে, এই মতলবেই তখন সেবা করেছিলুম। না না ভায়া, তার চেয়ে এই ভালো।'

বিবাহের দিন আসিল। যথাসময়ে আমরাও গুটিগুটি উপস্থিত হইলাম। ইন্দুও বিমর্ষ মুখে আসিয়া হাজির হইল। ইঁহাদের কোনোরূপ প্রত্যুপকার করিতে না পারায় সে সত্যই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু, বর আসিতে আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

কালো, শুষ্ক, একহারা হাড়-বার-করা চেহারা। মুখ কঠিন এবং বিশ্রী। সমস্ত প্রকার নেশা তাহাদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সভায় বসিয়া বাপের সামনেই বিড়ি ধরাইল। শুনিলাম, পাত্র লিলুয়ার কারখানায় মোটা রকম চাকুরি করে, মাসে প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা উপার্জন হয়। আমরা ভবিতব্য ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলাম। শুভকর্মের আয়োজন হইতে লাগিল।

বর সভায় আসিতেই কিন্তু এক গোল বাধিল। কন্যাকে দেখিয়াই বরের বাপ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'থামুন মশায়, থামুন। হাতে বালা কৈ?'

দাদা কাঁদো-কাঁদো মুখে সামনে আসিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, 'বালা

দেবার কথা ছিল বটে, কিন্তু যোগাড় ক'রে উঠতে পারি নি। ওর হাতের রুলি দিয়েই সম্প্রদান হোক, এর পর বরং—'

বরকর্তা চেঁচাইয়া কহিলেন, 'বটে! জোচ্চুরি করতে এসেছ আমার কাছে? ছ'ভরির বালা দেবার কথা, সে জায়গায় গালা পোরা একভরি রুলি দিয়ে সম্প্রদান হবে? টাকা বার কর, কিংবা বালা—ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না।'

সবাই বোঝাইল, হাতে পায়ে ধরিল, কিন্তু কর্তা অটল। সেই এককথা, ছ'ভরি সোনা ও মজুরিসুদ্ধ দেড়শ' টাকা না পাইলে তিনি এখনই পাত্র উঠাইবেন। ঐ কালপেঁচা ছাড়া আরও ঢের মেয়ে ভূভারতে আছে!

নিরুপায় দাদা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া কহিলেন, 'বাবা আমার তো আর কোনো সঙ্গতি কোনো উপায় নেই। একসময় সাহায্য করতে চেয়েছিলে এখন যদি এইটে দান কর।'

ইন্দু ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল, 'দান করবার মত টাকা তো আমার নেই—।'

আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সবাই স্তব্ধ, দাদার মুখ এতটুকু হইয়া উঠিল। কিন্তু, পরক্ষণেই সবিস্ময়ে দেখিলাম ইন্দু হেঁট হইয়া দাদার পদধূলি লইতে লইতে বলিতেছে, 'কিন্তু, আমি আমাকে দান করতে পারি। আপনাদেরই স্বঘর, দেখুন।'

আমরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলাম, দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'এ সৌভাগ্য কি আমার হবে বাবা? রাজ্যেশ্বর জামাই হবে? এ যে ভাবতেও পারছি না।'

লজ্জায় ভয়ে মৃতপ্রায় আড়ষ্ট মেয়েটার দিকে চাহিয়া ইন্দু কহিল, 'একসময়ে যে আমার বাড়িতে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছিল আমি তাকেই চাইছি—মাথায় ক'রে নিয়ে আবার তাকে সেই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

বরপক্ষ এতটা ভাবে নাই। অতি লোভে সব যায় দেখিয়া নরম হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদের প্রায় মারিয়া তাড়াইয়া দিলাম। ইন্দু কাপড় ছাড়িয়া পিঁড়িতে বসিয়া গেল।

শুভকর্ম নির্বিবাদে মিটিল।

## ম্যয় ভুখা হুঁ

দক্ষিণ কলিকাতার প্রশস্ততম রাজপথ যেখানে আর একটি রাজপথে আসিয়া মিশিয়াছে, সেইখানে, সেই রাস্তারই গগনচুম্বী সৌধ-শ্রেণীর ছায়ায় সারি-সারি তাহাদের রান্না চাপিয়াছে। ইঁটপাতা উনান, আর ছোট-ছোট ডিজেল, এইমাত্র তাহাদের রান্নার সরঞ্জাম। এই পোড়া ডিজেলগুলিই, রান্না শেষ হইলে, আবার রাস্তার পাশে-পাশে, ছোট গাছগুলির ডালে তোলা থাকিবে। পরের দিন, যদি চাল মেলে তো পুনরায় যে-যাহার হাঁড়ি চিনিয়া নামাইয়া লইবে।

ক্ষ্যান্তর চাল মেলে নাই। কালও না, তাহার আগের দিনও না। সারারাত ধরিয়া লাইনে বসিয়া থাকিয়াও সে চাল থাকিতে থাকিতে কণ্ট্রোলের দোকানটিতে পৌঁছাইতে পারে নাই—সে দোকানের সামনে পৌঁছিবার বহু পূর্বেই নির্দিষ্ট চাল শেষ হইয়া গিয়াছে। দুইদিন উপবাসে তো গিয়াছেই, তাহার আগেও ভাত মেলে নাই দুইদিন। যদিও বৃহস্পতিবার দিন দুই সের চাল লইয়া দেশে ফিরিয়াছিল, সে চাল মহাজন কাড়িয়া লইয়াছেন নামিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—দুই সের চাল লইয়া দুই আনা পয়সা মাত্র দিয়াছেন। চার সের চাল দিতে পারিলে চার আনা পয়সা ছাড়াও তাহার খোরাকির চাল মিলিত, কিন্তু তাহা দিতে পারে নাই। দুই আনার মুড়ি ও চিনাবাদামে সেদিন কাটিয়াছে—তাহার পর এই দু'দিন তো নিরম্বু উপবাস গিয়াছে বলিতে গেলে। পরশু তবু শুধু জল খাইয়াছিল খানিকটা করিয়া, কাল তাহাও পারে নাই। খালি পেটে জল খাওয়া যায় না—গা কেমন করে।

অবশ্য, উপবাস সে নিজে খুবই করিতে পারে, ক্রমাগত উপবাস করিয়া ওটা তাহার সহিয়াই গিয়াছে, কিন্তু কষ্ট হয় বাচ্ছা দুইটির জন্য। ছোটটি দুগ্ধপোষ্য, সে মাই পায় না, মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়া দেখে আর ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদে, বড়টি প্রথমে কাঁদিত, এখন আর কাঁদে না—কেমন যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুধু বলে, 'মা, একটু কোলে কর্ না—'

দু'টির কোনোটিই বাঁচিবে না, তাহা ক্ষ্যান্ত জানে, শুধু শুধু তাহাকে জ্বালাইতে আসে। অথচ, একেবারে মরিতেছে দেখিয়াই বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কী

করিয়া? মধ্যে মধ্যে সমস্ত রাগটা গিয়া পড়ে তাহাদেরই উপর, 'মর মর, তোরা মর,—হাড় জুড়োয় তাহ'লে।...এত ছেলেমেয়ে মরছে, তোরা মরতে পারিস না?'

কিন্তু, তাহারা মরে না, ক্ষুধার তাড়নায় তেমনিই চিঁ চিঁ করিয়া কাঁদে, আর ক্ষ্যান্তকে বিরক্ত করে।

তাহার কোঁচড়ের কাপড়ে অবশ্য নগদ দেড়টি টাকা বাঁধা আছে, কিন্তু বাবা—মনে করিতেও ক্ষ্যান্ত শিহরিয়া ওঠে—সে মহাজনের টাকা, পুরা চার সের চালের দাম। সে টাকা ভাঙ্গিয়া খাইতে ক্ষ্যান্তর সাহসে কুলায় না। উঃ—যা লোক লালাটা, কুৎসিত ভাষায় অপমান তো করিবেই, মারধোর করিতেও ইতস্তত করিবে না। নিজের ঘরের ঘটি-বাটি, কাপড়-চোপড় সব বেচিয়া খাইয়াছে সে, এখন একমাত্র ভরসা এই হিন্দুস্থানী দোকানদারটা। সে তাহাদের গ্রামের প্রায় সকলেরই চালের দাম যোগায়। বন্দোবস্ত ঐ একই, বালিগঞ্জে আসিয়া চাল লইয়া ফিরিয়া গেলে সেরকরা চারপয়সা পারিশ্রমিক এবং খোরাকির চাল। তা-ও অন্তত চার সের চাল চাই। যে সব মেয়েছেলেদের বয়স অল্প, তাহারা আরও কিছু বেশী পায়। কিন্তু, সে অন্য ব্যবস্থা, তাহাতে ক্ষ্যান্ত রাজি নয়।

কেহ কেহ আবার লালার পয়সাতে চাল কিনিয়া এখানে বেশী দামে বেচে, আবার চাল কেনে, আবার বেচে, এমনি ভাবে চার-পাঁচদিন কাটাইয়া দেশে ফেরে, কিন্তু ক্ষ্যান্তর সাহসে কুলায় না। ইতিমধ্যে কণ্ট্রোলের চাল বেচিবার জন্য দুই-তিনজনকে পুলিশে ধরিয়াছে—তাহা সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে। তাহার ভয় যদি তাহার ছেলেদের বাহিরে রাখিয়া তাহাকে জেলে দেয়?...না, তাহার চেয়ে উপবাসই ভালো।

বড় ছেলেটা আঁচল ধরিয়া টানিল, 'মা, পেট ব্যথা করতেছে বড্ড!'

ক্ষুধা বলিতে পারে না, বলে পেট ব্যথা করছে—। ক্ষ্যান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাহিল। সব কয়টি মুখই অপরিচিত, তবে তাহাদের লাইন হইতেই আসে, এই পর্যন্ত। ট্রেনে দেখা হয়।...জানে আশা নাই, তবু সাহসে ভর করিয়া কাছে যায়, 'ও দিদি, আমার জন্যে চাই নে, এই ছেলেটাকে দিবি এক গাল? শুধু জলখাবার মত? বড্ড কাঁদতেছে!'

যাহার কাছে আবেদন জানানো হইল, সে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়া উঠিল, 'আ মর—আমি চাল অমনি পেয়েছি কিনা, তাই ওঁকে দিতে হবে।

ছাখ্ দেখি দিদি, ছুঁড়ীর কথা শোন্ দেখি। সারারাত ধন্না দিয়ে ব'সে থেকে এই ক'টি চাল পেয়েছি, আবার রাত ধন্না দিলে তবে যদি চারটি পাই—। বাড়ির লোক উপোস ক'রে ব'সে আছে, হা-পিত্যেশ ক'রে—কবে চাল নে যাব, তবে দু'টি পেটে পড়বে।...আমার আর খয়রাত করবার লোক নেই কিনা!'

আশেপাশের সকলেই সায় দিল। কেহ বা দুইদিন পরে ভাত চাপাইয়াছে, কেহ বা আরও বেশী। একটি দানাও ইহার মধ্য হইতে খোয়াইতে রাজি নয়। একজন দূর হইতেই গালাগালি দিল, 'সর্ না চোখখাগী—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর দিচ্ছিস কেন?—'

ক্ষ্যান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দূরে সরিয়া যায়। কাল ট্রেনে আসিবার সময় পায়ে চোট খাইয়াছিল, তাহার ব্যথা এখনও কমে নাই। চোট না খাওয়াই আশ্চর্য, যা ভিড় গাড়িতে! উঠিবার সময় তো জ্ঞান থাকে না, সংকীর্ণ দ্বারপথে কুড়ি-পঁচিশটা করিয়া লোক পেষাপেষি করিয়া তাল পাকাইতে পাকাইতে কোনোমতে ভিতরে ঢোকে। তখন কাহার হাত গেল কি কাহার পা ভাঙ্গিল মনে করিয়া রাখা সম্ভব নয়। আবার ইহার উপরই কাল যাদবপুর স্টেশন হইতে হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে—মুখপোড়া কোম্পানি একগাদা করিয়া টিকিটবাবু বসাইয়াছে, ঢাকুরিয়া কি বালিগঞ্জে নামিবার উপায় নাই। সকলকেই দুইটা স্টেশন আগে নামিয়া হাঁটিতে হইয়াছে, যাইবার সময়ও হয়তো সেই ব্যবস্থা থাকিবে।

ক্ষ্যান্ত অন্যমনস্ক হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মোড়ে আসিয়া পড়িল। সেই সময়ই একটা বাস্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লোক তো অনেক আছে, ভিক্ষা চাহিবে? দোষ কি? ভিক্ষা সে করে নাই কখনও, এত দুঃখেও লজ্জা করে।

সে কোনোমতে মরীয়া হইয়া হাত পাতিল, 'দু'-দিন খাওয়া হয় নি বাবু, একটা পয়সা ছেলেটার হাতে দাও, ক্ষিদেয় মরে গেল ছেলেটা—'

প্রবেশপথের সামনেই যে বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'কী ভিখিরীই যে বেড়েছে মোহিতবাবু, কী বলব।'

তাহার পর মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'মাপ কর বাবা, এগিয়ে যাও!'

ক্ষ্যান্ত তবু নাকে কাঁদে, 'ছেলেটার দিকে চাও বাবা, ক্ষিদেয় নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। একটা পয়সা দাও, যাহোক্ কিছু খাওয়াই—'

'মাপ কর বাবা, বলছি তো—!'

*বাস্ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু, ঠিক ছাড়িবার মুখে কে একজন ঠক্ করিয়া একটা*

ডবল-পয়সা ছুঁড়িয়া দিল। ক্ষ্যান্তর অভ্যাস নাই, সে লুফিতে পারিল না, ডবল-পয়সাটা গড়াইয়া পড়িল পেভ্‌মেণ্টের উপর। এতক্ষণ ক্ষ্যান্ত দেখিতে পায় নাই, সেখানে আর একটি স্ত্রীলোক বসিয়াছিল; হয়তো বয়স তাহার অল্পই, কিন্তু আজ আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কঙ্কালসার, মাথার চুলগুলি জট পাকাইয়া গিয়াছে—কতকগুলো ন্যাক্‌ড়ার ফালি গেরো বাঁধিয়া কোনোমতে জড়ানো—কোলের কাছে বানর-শিশুর মত ক্ষুদ্র একটি শিশু মাটির উপরই পড়িয়া ধুঁকিতেছে, সমস্ত দেহটা তাহার অপুষ্ট ও বিকৃত। ছেলেটার সর্বাঙ্গে মাছি বসিতেছে, চোখে মুখে সর্বত্র। তাহার মা মধ্যে মধ্যে সেগুলি তাড়াইতেছে ও অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে। ডবল-পয়সাটা ঠক্ করিয়া বাঁধানো শানের উপর পড়িয়া গড়াইয়া গেল একেবারে তাহারই পায়ের কাছে।

'এই আমার পয়সা দে—' ক্ষ্যান্ত বাঘের মত লাফাইয়া পড়ে।

সে পয়সাটার উপর বিদ্যুৎগতিতে পা চালাইয়া দিয়াছিল। প্রতিবাদের স্বরে বলে, 'বা-রে, আমাকেই তো বাবু দিলে, আমি ভিক্ষে চাইছি কখন থেকে—'

ক্ষ্যান্ত গালি দিয়া উঠিল, 'বাবু দিয়েছে, ওর সাতপুরুষের বাবু!...দে বলছি হারামজাদী, আমি কত ক'রে আদায় করলুম, ওকে দেবার জন্যে!'

তবু সে ছাড়িল না। গালাগালিটা দুই তরফেই শুরু হইল, পরে হাতাহাতি। ক্ষ্যান্তর সহিত সে জোরে পারিল না—পয়সাটা হস্তগত করিয়া ক্ষ্যান্ত বীরদর্পে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছেলের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। সে মেয়েটি অসহায়ভাবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল আর মধ্যে মধ্যে ক্ষ্যান্তর উদ্দেশ্যে অশ্লীলভাবে গালি দিতে লাগিল।

ক্ষ্যান্তর সেদিকে কান ছিল না। হয়তো পয়সা দুইটি উহারই, কিন্তু ক্ষ্যান্তরও চাই যে!...দুইটি পয়সা পাইয়া তাহার উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছিল, সে আবার একটা ট্রামের কাছে গিয়া হাত পাতিল, কিন্তু আরও দুই-তিনটি ভিখারী একসঙ্গে আসিয়া পড়ায় বিশেষ সুবিধা হইল না। কেহই কিছু পাইল না।

'আ মর্—আপদগুলো আবার কোথা থেকে এসে জুটল— '

সে আর একটু আগাইয়া গেল। কিন্তু, সেখানে ট্রাম-বাস্ দাঁড়ায় না। চলন্ত গাড়িতে ভিক্ষা ভালো করিয়া চাওয়াই যায় না, দিবে কে? খানিকটা পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সে যখন আবার মোড়ে ফিরিয়া আসিল, তখন রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে ভিখিরীর, সেই কঙ্কালসার মেয়েটিও ছেলেটাকে

কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ক্ষ্যান্তকে দেখিয়া গালাগালি করিয়া উঠিল।

ক্ষ্যান্তও আর সেখানে দাঁড়াইল না। বড়ছেলেটা ক্রমাগত বলিতেছে, 'মা পেট বড্ড ব্যথা করতেছে—'

কিন্তু, দুই পয়সায় কীই বা খাওয়ানো যায়। অনেক ভাবিয়া সে একটা ছাতুর দোকানে গেল—'দে বাবা দু' পয়সার ছাতু—যা হোক্!'

ছাতুওয়ালা দুই পয়সার ছাতু দিতে চায় না। বারো আনা সের ছাতুর, দুই পয়সার ছাতু কতটুকু পাইবে—? সে জানে যে, এই সব খরিদ্দারকে দুই পয়সার ছাতু বেচিতে তাহার দশটি মিনিট সময় অন্তত অপব্যয় হইবে! কিন্তু, ক্ষ্যান্ত নাছোড়বান্দা—'দে বাবা, যা হোক্ দে। যা দিবি তাই নোব—'

তখন বিরক্ত হইয়া ছাতুওয়ালা একটা শালপাতার ঠোঙায় করিয়া দুটিখানি ছাতু দিল—সামান্যই, একটা ছেলের জলযোগও চলে না তাহাতে, আরও কম। কিন্তু, তাহার জন্য বাদানুবাদ করিয়া লাভ নাই তাহা ক্ষ্যান্ত জানিত—সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছাতুর ঠোঙা ও খানিকটা নুন-লঙ্কা সংগ্রহ করিয়া রাস্তার কলের দিকে চলিল। বড়ছেলেটার দেরি সয় না, সে শুক্‌না ছাতুই খাইতে চায়। ক্ষ্যান্ত ঝঙ্কার দিয়া ওঠে তাহার রকম-সকম দেখিয়া, 'আ খেলে যা! তর্ সয়না ওর— রাক্কোস্।—আমাকেই খা চিবিয়ে, যদি তাতে ক্ষিদে মেটে!'

ছেলেটা বকুনি খাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে গালি-গালাজও চলিল মায়ের উদ্দেশ্যে। ক্ষ্যান্ত অবশ্য সেদিকে কর্ণপাত করিল না, সে একটা শরবতের দোকানের সামনে হইতে একটা কানাভাঙ্গা ভাঁড় কুড়াইয়া লইয়া কলের পাশেই ছাতু মাখিতে বসিল। যতটা জল মেশানো যায় সেই সামান্য ছাতুতে সে তাহার অনেক বেশীই মিশাইল, তাহার পর দুই ছেলের মুখেই অল্প অল্প করিয়া দিতে লাগিল। অন্তরের তাগিদে কখন যে অভ্যস্ত হাত নিজের মুখেও উঠিয়াছে তাহা সে টের পায় নাই, চৈতন্য হইল বড়ছেলেটার অনুযোগে, 'তুই নিজেই তো সব খাচ্ছিস মা, তাহ'লে আমরা কী খাব?'

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সে যেন একটু অপ্রস্তুতই হইল, কিন্তু ছেলেকেও বকিতে ছাড়িল না, 'হ্যাঁ রে রাক্কোস, দু'বার আঙুলটা জিভে ঠেকিয়েছি কি না অমনি সব খাওয়া হ'ল!···বেশ করব খাব, শুধু তোমাদের পেটে দিলেই চলবে সব? আমি বাঁচব কী ক'রে!'

কিন্তু, নিজে সে প্রাণ ধরিয়া খাইতে পারে না। ছেলেদেরই খাওয়াইয়া নিজে

শুধু ভাঁড়টা ধুইয়া একভাঁড় জল খায়। তাহাতে শুধু ক্ষুধা বাড়িয়াই যায়, পেটে কী এক রকমের যন্ত্রণা হইতে থাকে।

রাস্তার ওপাশের ভোজন-পর্ব তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু পারুলের মা বাজারের জঞ্জাল গাদা হইতে কতকগুলি পচা পুঁই ও নটের ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহাই কিছু কিছু বাদ দিয়া যতটা পাওয়া গিয়াছিল সমস্তটা সিদ্ধ করিয়া নুন-লঙ্কা দিয়া খাইতে বসিয়াছিল। ক্ষ্যান্ত দূর হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়াই সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়াছিল, এখনও কাছে আসিয়া করুণকণ্ঠে কহিল, 'দিদি দুটো ডাঁটা দিবি রে, ছেলেটাকে? বড্ড বায়না করতেছে! না হয় আধ-চিবুনো ক'রে দে!'

পারুলের মা লোক ভালো, সে বেশ বড় করিয়াই একগোছা ডাঁটা তুলিয়া দেয়। ক্ষ্যান্ত সেইখানেই পা ছড়াইয়া বসিয়া আঁচলের মধ্যে ডাঁটাগুলি রাখিয়া ছেলেকে একটা একটা করিয়া বাহির করিয়া দিতে থাকে। এবার আর নিজের মুখে তুলিতে ভরসা হয় না, পারুলের মা কী মনে করিবে! কিন্তু, একটু পরে পারুলের মা-ই বলে, 'তুইও দুটো চিবো না ক্ষেন্তি, না হয় আর দু'-গাছা দেব এখন...'

কিন্তু, এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জোটে। একটা কঙ্কালসার লোক ওপাশের ডাস্টবিনে বসিয়া বসিয়া ডাঁটার ছিবড়া, মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, সে এইবার ইহাদের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল। তাহার দাবি প্রবল নয়, বস্তুত তাহার কোনো দাবিই নাই, ক্ষ্যান্তরা যে ডাঁটাগুলি চিবাইয়া ফেলিতেছিল সেইগুলিই সে আবার চিবাইতে চাহে মাত্র। কিন্তু, ক্ষ্যান্ত তবু তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ওঠে, কারণ তাহার কাণ্ড দেখিয়া পারুলের মা তাহাকেও একগোছা ডাঁটা তুলিয়া দিল। ক্ষ্যান্ত মনে মনে হিসাব করে, ঐ ডাঁটাগুলি—এ হারামজাদা না জুটিলে—তাহারই কাছে আসিত!...সে নিষ্ফল ক্রোধে লোকটার পানে অগ্নি-দৃষ্টিতে চায়।

সন্ধ্যার অনেক আগেই কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে 'কিউ' হইতে থাকে। এখন হইতে বসিয়া থাকিলে তবে যদি কাল সকালে চাল পাওয়া যায়। ক্ষ্যান্তও গিয়া দাঁড়াইল, আজ সে অনেকটা আগে বসিতে পারিয়াছে, মহাজনের চালটা বোধ হয় পাওয়া যাইবে। ক্ষ্যান্ত আর পারুলের মা, পাশাপাশি বসিয়া গল্প করে। দুইদিন উপবাসের পর পেট ভরিয়া ডাঁটা খাইয়া পারুলের মার পেট

কামড়াইতেছে, মাঝে মাঝে সে দুই হাতে পেট চাপিয়া ধরিয়া বিবর্ণ মুখে পেটের যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল।

ওপাশের মাড়োয়ারী 'লালা'র দোকানের লোকটা নিঃশব্দে আসিয়া ক্ষ্যান্তর পাশে দাঁড়াইল। এই লোকটা কয়দিন ধরিয়াই ক্ষ্যান্তর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সুবিধামত একদিনও সে কথাটা পাড়িতে পারে নাই, আজ কাছে আসিয়া উবু হইয়া বসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, 'তোমাকে লালা একবার ডেকেছে!'

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ক্ষ্যান্ত প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

'কী জানি, সে তুমি যেয়েই শুধিও, গেলেই জানতে পারবে।'

ক্ষ্যান্ত ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'মুখে আগুন তোমার, আর মুখে আগুন লালার, আমি ও সব শুনতে-টুনতে পারব না।'

লোকটা তবু তাতে না, তেমনি চাপা গলাতেই ফিস্-ফিস্ করিয়া বলে, 'এখানে তো রোজই দাঁড়িয়ে থাকতেছ, চাল কী মেলে?...একদানাও না। লালার লোকের দরকার একটা, তাই সে খোশামুদি করতেছে—থাক না গিয়ে খাওয়া-পরার দুঃখু থাকবে না, মাস-মাস মাইনে ব'লেও দু'-এক টাকা পাবে। আর কাজও এমন কিছু নয়...।'

কিন্তু ক্ষ্যান্ত তাহাতেও গলে না, গলার সুর আর এক পরদা চড়াইয়া বলে, 'যা যা—তোর লালাকে চাল জমিয়ে রাখতে বল্ গে। আমার দরকার নেই অমন খাওয়ায় আর অমন মাইনেয়...'

লোকটা বেগতিক দেখিয়া উঠিয়া পড়ে। কিন্তু, একেবারে ফিরিয়া যায় না, লাইনের শেষে একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে এক বুড়ীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সেইখানে গিয়া জাঁকাইয়া বসে।......কী কথা হয় ফিস্-ফিস্ করিয়া তাহা শোনা যায় না, কিন্তু ক্ষ্যান্ত লক্ষ্য করে, লোকটা চলিয়া যাইবার একটু পরে মেয়েটাও উঠিয়া রাস্তার ওপারে চলিয়া যায়।...

পারুলের মা-ও বোধ করি লক্ষ্য করিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, 'মুখে আগুন!'

ক্ষ্যান্ত সেই কথারই সুরে গলা নামাইয়া কহিল, 'ছ'টাকা ক'রে নাকি ঐ লালাটা আগে চাল কিনে রেখেছিল গো দিদি, সেই চাল পঁয়ত্রিশ টাকায় বেচছে আর মেয়েলোকের সর্বনাশ ক'রে বেড়াচ্ছে, এত পাপ সইবে ওর?...'

ক্ষ্যান্তর পেটে তখন আগুন জ্বলিতেছিল, সে খানিকটা পরে চুপিচুপি

পারুলের মাকে কহিল, 'আমার এই কানিখানা পেতে জায়গাটা রাখবি দিদি, একটুখানি ?'

এ প্রথা এখানে চলে। অনেকেই মধ্যে মধ্যে বাহিরে যায়, ছেঁড়া গামছা বা ন্যাকড়া পাতিয়া রাখিয়া—তাহাতেই তাহার জায়গা চিহ্নিত থাকে। পারুলের মায়ের বিশেষ আপত্তি ছিল না, সে কহিল, 'কোথা যাবি রে ?'

'বড্ড পেটটা জলতেছে, দেখি যদি ভিক্ষে পাই—আর দুটো পয়সা পেলেও একটু ছাতু কিনি !'

'তা যা তাহ'লে, বেশী আত করিস নি কিন্তু—'

ক্ষ্যান্ত ছেলের হাত ধরিয়া হাঁটিতে শুরু করে। ট্রামের এ মোড়টাতে বেশী ভিখারীর ভিড়, স্টেশনের ধারে গেলে লোক বেশী পাওয়া যায়। ভিখারীর উপদ্রবও কম। সে স্টেশনেই যাইবে।

'জীবনে মরে যাই রে বাবা, ও বাবা, একটা পয়সা দে বাবা ! পায়ে পড়তিছি গো বাবা, ধরম বাপ বলতিছি তোমায়। সন্তানের জীবনটা রক্ষা কর গো বাবা। জীবনে মরে যাব গো বাবা…'

ইনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে ভিখারীর দল ভিক্ষা চাহিতেছে, ক্ষ্যান্তর অনভ্যস্ত কণ্ঠে যেন সে সব কথা বাহির হইতে চায় না। চারিদিকের অস্থিচর্মসার, কঙ্কালবিশিষ্ট প্রেতমূর্তির মত মানুষের আর্তকণ্ঠ ঠেলিয়া তাহার গলার স্বর পৌঁছায়ও না পথচারীদের কর্ণে। কিন্তু, তবু ক্ষ্যান্তর সেদিন অদৃষ্ট ভালোই ছিল, সে মিনিট-পনেরোর মধ্যেই দুইটি ডবল-পয়সা পাইল। ছেলেটা লোভে অধীর হইয়া উঠিয়াছে তখনই, সে মাকে টানিতে চায় ছাতু-মুড়িওয়ালার দোকানের দিকে। কিন্তু, ক্ষ্যান্তরও তখন আশা বাড়িয়া গিয়াছে, সে ধমক দিয়া উঠিল, 'অমন অস্থির করলে এক্কেবারে খুন ক'রে ফেলব ব'লে দিচ্ছি। দেখি যদি আর ক'টা পয়সা পাই তাহ'লে এক পো চাল কিনে নে গিয়ে পারুলের মার হাঁড়িতে ফুটিয়ে নেব। ছাতু খেয়ে কী হবে ?…'

ভাতের কথা কানে যাইতে ছেলেটা চুপ করিল। কিন্তু, পয়সা আর ক্ষ্যান্ত বিশেষ পাইল না, আরও প্রায় দশ বারো মিনিট চিৎকার করিয়া আর দুইটি পয়সা। সে ততক্ষণে স্টেশনের কাছেই উপস্থিত হইয়াছে, দূর হইতে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল। ওখানে লোকগুলি দাঁড়াইয়াই আছে, হয়তো তাহার আবেদন শুনিতেও পারে। কান্নাটা শুনাইতে পারিলেও কিছু সুবিধা হয়।

স্টেশনের প্রবেশপথেই দু'টি মড়া পড়িয়া আছে। এ আজকাল নিত্যকার ঘটনা। যাহারা অন্নের সন্ধানে আসে, তাহাদের অনেকেরই শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হয়। ক্ষ্যান্ত মিনিট-দুই কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা বৃদ্ধের শব, —এমন ভাবেই দেহ শীর্ণ হইয়া হাড়ের সহিত চামড়া জড়াইয়া গিয়াছে যে, চিনিবার উপায় নাই সে পুরুষ কি নারী—খানিকটা রক্ত বমন করিয়া পথেই পড়িয়া মরিয়াছে। দ্বিতীয় মৃতদেহটি শিশুর, কোন্ অভাগিনী মা হয়তো সন্তানের মৃতদেহ বহনের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পথে নামাইয়া দিয়া গিয়াছে!

সেই মৃতদেহ দুইটির পাশেই আর একটি জননী নির্বিকার চিত্তে গুটি-দুই পুত্রকন্যার সঙ্গে বসিয়া চিনাবাদাম খাইতেছে। মৃত্যু আর তাহাদের মনে কোনো বিভীষিকারই সঞ্চার করে না।...সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষ্যান্ত যেন শিহরিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ছোটছেলেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বড়ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।...

কিন্তু, প্ল্যাটফর্মে যে ভিড় দেখিয়া সে প্রলুব্ধ হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই তাহার মত নিরন্ন। কেহ চাউলের সন্ধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কেহ ফিরিয়া যাইতেছে। ভিখারীরও অভাব নাই। বাবু যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও চিন্তাক্লিষ্ট, শ্রান্ত, বিরক্ত। ভিক্ষা চাহিয়া বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না, তবু ক্ষ্যান্ত ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কণ্ঠে অনভ্যস্ত কাকুতি, 'ক্ষিধের জ্বালায় বাচ্ছা দুটো মরে যাচ্ছে গো বাবা—জীবনটা বাঁচাও শুধু—ধরম বাপ বলেছি গো বাবা—' ইত্যাদি।

চলিতে চলিতে সে প্ল্যাটফর্মের একেবারে অপরপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। এখানে ভিড় অনেকটা কম। একটু ফাঁকা দেখিয়া ক্ষ্যান্ত আসিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল, উপবাসী দেহ তাহার যেন চলিতে চায় না। বিশেষ করিয়া তাহার উপর এই চিৎকার।

কিন্তু, একটুখানি বসিয়াই অদূরে যেন পরিচিত একটা মানুষের আবছায়া দেহভঙ্গিটা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। আগের ট্রেনে কণ্ট্রোলের ভিড় অনেকটা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই খাওয়া চিনাবাদামের খোসা প্ল্যাটফর্মের পাথরের উপর পুরু হইয়া জমিয়াছে। একটি লোক উবু হইয়া বসিয়া একমনে সেই খোসাগুলি ঘাঁটিতেছে—যদি তাহার মধ্যে এক-আধটা দানা পড়িয়া থাকে, এই

আশাতে! মধ্যে মধ্যে এক-একটা পাইতেছেও সে—

লোকটি পিছন ফিরিয়া আছে, তবু ক্ষ্যান্তর চিনিতে বিলম্ব হইল না। দ্রুত কাছে গিয়া কাঁধে ঠেলা দিয়া কহিল, 'শুনতেছ, ঐ ত্যাখ, আমি ক্ষ্যান্ত—'

লোকটা চোখ মেলিয়া যেন বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর চিনিতে পারিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'ঐ ত্যাখ, শুধু শুধু কাঁদতেছ কেন? চুপ কর, কথা শোন আমার!'

স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াইতে না পারিবার লজ্জা তখন তাহার কাছে যেন নিজের ক্ষুধার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিল, 'ওরে, এ তোদের কী হাল হয়েছে রে, এ ত্যাখবার আগে মিত্যু হ'ল না কেন রে!'

ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি নিজের শতচ্ছিন্ন বসনপ্রান্ত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। কহিল, 'তুমি কাজ কোথাও পেলে না, হ্যাঁ খোকার বাপ?···হোথা সে কলে গিয়েছিলে?'

'রোজই যাই। খালি কাল থেকে খুব জ্বরটা হয়েছে ব'লে আর যেতে পারি নি।···খাওয়াও হয় নি পরশু থেকে কিছু। বড় পেটটা জ্বল্‌তেচে তাই—'

ক্ষ্যান্ত আঁচল হইতে ছ'টা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, 'এই পয়সা ক'টা নিয়ে গিয়ে একটু ছাতু কিনে খাওগে—ঐ মোড়ে দোকান আছে—'

লোকটি পয়সা মুঠা করিয়া ধরিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, 'আমাকে পয়সা ক'টা দিয়ে দিলি, তারপর তোরা—?'

'আমরা আজ চারটি ভাত পেয়েছিলুম।···এখন তাহ'লে যাইগো খোকার বাপ, আবার সেই কণ্ট্রোলে দাঁড়াতে হবে—'

বলিয়া, পাছে ছেলেটা চেঁচামেচি করিয়া আসল কথা ফাঁস করিয়া দেয় এই ভয়ে, ছেলেটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।*

* শ্রাবণ—১৩৫০-এ লিখিত

## অন্তরাগ

উড়িষ্যার এক শহরে পৌঁছে এক নব পরিচিত বন্ধুর বাড়ি অতিথি হলাম। বন্ধু অমিয়বাবুর বাবা বড় উকিল, বাড়িটিও সেই পরিমাণে বিরাট। অনেকখানি বাগান চারদিকে, তারই মধ্যে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। একেবারে নতুন বাড়ি, আগাগোড়া আধুনিক বন্দোবস্ত। অতিথির জন্য একটি পৃথক ঘরই আছে, খাট, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিল, টেবিল-ল্যাম্প, আলো—সুসজ্জিত। সঙ্গেই বাথরুম। ঘরের সামনে একটু বারান্দা—সেটিও যেন মূল বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুত বাড়ির দিকে পেছন-ফেরা সেটা। বারান্দার সামনে একফালি নিজস্ব বাগান, পাঁচিল—পাঁচিলের কোল বেয়ে চওড়া একটা নালা—আর ওপাশে অনেকখানিব্যাপী এক আমবাগান। গরমের দিন—সিঁদুরে রঙের আমে বোঝাই হয়ে আছে গাছগুলি। বহুকালের বড় বড় গাছ—তার ফলে জায়গাটা ছায়ামধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে, সেদিকে চাইলে আরাম লাগে।

অমিয়বাবুর এই ঘরটি আমার বড় ভালো লাগল। একটা দোর খুললেই সমস্ত বাড়িটার সঙ্গে যোগাযোগ হ'তে পারে—দোরটা বন্ধ করলেই সম্পূর্ণ পৃথক একটি জগৎ। একেবারে নির্জন। শহরের বাড়ি, ওদিকে দাঁড়ালেই জনতা ও গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়—অথচ, এই বারান্দাটা এমন একান্তভাবেই উত্তরদিকের এই আমবাগানের দিকে ফেরান যে, একটি কোণ ছাড়া শহরের কোনো অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। সম্বলপুর শহর যেন দূর থেকে এই বাগানটিকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে, এই ভূখণ্ডটি রয়ে গেছে—বোধ করি একশ' বছর আগেকার পৃথিবীতে। ভারি ভালো লাগল আমার জায়গাটা। বিশেষত, সারারাত অগ্নি-বৃষ্টির পর ভোরে যখন ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করত, তখন সেই নির্জন বারান্দায় চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম বহুক্ষণ ধ'রে। দূরে শহরটা জেগে উঠত একটু একটু ক'রে তার আভাস পেতাম। কিন্তু, আমার সামনের সেই আমবাগানে একটি মানুষের পদশব্দও জাগত না। নির্জন নিস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন সেই বাগান একটি রহস্যভরা অস্তিত্ব নিয়ে শান্ত হয়ে ব'সে থাকত আমার মুখোমুখি। রাত চারটের আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। তখন থেকেই বেরিয়ে এসে বসতাম। ছ'টা নাগাদ

চাকরে চা দিয়ে যেত একবার—চা খেতাম সেখানে ব'সেই। একেবারে আটটা নাগাদ বন্ধুবর এসে তাড়া লাগালে তবে উঠে স্নান করতে যেতাম। সন্ধ্যার আগেও যখন ছায়া ঘনিয়ে আসত আবার তখন যেন নতুন আর এক রূপ ধরত বাগানটা। কিন্তু, সেটা দেখবার বিশেষ অবসর মিলত না। সভাসমিতি, নিমন্ত্রণ, শহর-ভ্রমণ, কাছাকাছি বিখ্যাতস্থানগুলি দেখা—একটা-না-একটা ব্যবস্থা ক'রেই রাখতেন অমিয়বাবু। আমি ঘুরতাম, কিন্তু মনটা প'ড়ে থাকত সেই আমবাগানে ও সেই বারান্দায়। বাগানটা আমাকে এমনি পেয়ে বসেছিল!

প্রথম দিন লক্ষ্য করি নি, তার কারণ সকালে পৌছে খানিকটা হৈ-হৈয়ের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে,—দ্বিতীয় দিনেই প্রথম নিরিবিলি বসবার সুযোগ পেলাম। আমবাগানটি শুধুই বাগান নয়, সেটি গোরস্থানও বটে এবং সঙ্গে সঙ্গে, গাছভর্তি পাকা আম থাকা সত্ত্বেও ছেলের দল আমতলায় এসে জড়ো হয় নি কেন, তার কৈফিয়তটাও পেয়ে গেলাম।

পুরানো গোরস্থান। গুটি-পাঁচেক মাত্র বাঁধানো সমাধির অস্তিত্ব আছে। আর গুটি কতক ভাঙ্গাচোরা ছু'চারখানা ইট বা পাথর বহন ক'রে কোনোমতে নিজেদের চিহ্নমাত্র বজায় রেখেছে। কয়েকটা জায়গায় মাটি ঈষৎ উঁচু হয়ে আছে এখনও—হয়তো ওগুলোর নিচেও নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে খোঁজ করলে। বহুকালের বারিবর্ষণে বাকি সব মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেছে, বিরাট আমগাছগুলি তাদের গুঁড়ি বিস্তৃত ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে হয়তো বা। আজ আর ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কোন্‌খানে সমাধি আছে, কোন্‌খানে নেই।

অমিয়বাবুকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম ডানদিকের ঐ ছোট পাহাড়টা ঘেঁষে এককালে এখানে ফৌজের ছাউনি ছিল। তারই স্মৃতি বহন করছে ঐ পল্‌টন-কুয়া নামে মাঠের মধ্যেকার বড় ইঁদারাটা। একশ' বছর আগে, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, এখানে ইংরেজ-ফৌজেরও সমাবেশ হয়েছিল। সেই ফৌজের আমলেই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের গোরস্থান ছিল এইখানে। অনেকগুলো ভেঙ্গে চুরে গেছে, কেউ কেউ সে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে বাড়িঘরও ক'রে ফেলেছেন—এই সামান্য জায়গাটুকু আজও আছে। তবে এখন আর এখানে কেউ গোর দেয় না, এখন গোরস্থান হিসেবে অন্য জমি ব্যবহার করা হয়।

বিকেলে একটু বেলা থাকতেই, অর্থাৎ কাছারির ফেরত উকিলবাবুরা বাড়ি পৌছবার আগেই, একা বেরিয়ে পড়লাম। আমবাগানে ঢুকে বেড়াতে লাগলাম সেই সমাধিগুলির মধ্যে। অপূর্ব একরকম মনের ভাব হ'তে লাগল। মনে

হ'ল কারা এরা, কবে এসেছিল এই পৃথিবীতে—কত কী ক'রে, কত অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ বুকে নিয়ে, আবার পৃথিবী থেকে চ'লে গেছে। হয়তো আজও এদের কিছু বলবার আছে, সেই অকথিত কথা এইখানে সামান্য এই ক'খানি ইষ্টকখণ্ডের মধ্যে গুমরে মরছে।

ঘুরতে ঘুরতে একটি সমাধির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বিরাট আমগাছের ঠিক নিচে সমাধিটা, এখনও অটুট আছে। কিন্তু, বিস্ময় সে জন্যে নয়, তার ওপরে ঘন একটি মাকড়সার জালের আস্তরণ, এমনভাবে সেটি বিভিন্ন গাছের ডালে আটকে বোনা হয়েছে যে, দেখাচ্ছে যেন একটি চাঁদোয়ার মতই। শুধু তাই নয়, মাকড়সা জাল বোনে গোল ক'রে—এটি চতুষ্কোণ। চারকোণ মাকড়সার জাল এই প্রথম দেখলাম। কোনো প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কাছাকাছি থাকলে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতাম যে, এটা স্বাভাবিক কি না।

চারদিকে ফিরে ফিরে দেখলাম, আর কোনো সমাধির ওপরে তো এরকম জাল নেই। হয়তো গাছের খাঁজে কোথাও একটু-আধটু থাকতে পারে—কিন্তু এভাবে? না, আর নেই।

কী খেয়াল হ'ল, হাতে ছড়ি ছিল—ছড়ির ডগা দিয়ে জালটা ছিঁড়ে দিলাম। বেশ ভালো ক'রেই ছিঁড়লাম। কোথাও তার কোনো অস্তিত্ব রইল না। মাকড়সাটা আগেই কোথায় চ'লে গিয়েছিল—তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

তারপর অবশ্য কথাটা আর মনে ছিল না। দূরবর্তী এক প্রাচীন শিবমন্দির দেখে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলাম। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখনও সে নির্জন মন্দির এবং তার সংলগ্ন বিচিত্র কুণ্ডটির কথাই মনে পড়েছিল। সঙ্গে ছিলেন একজন স্থানীয় এম্-এল্-এ, তিনি গাড়িতে যেতে আসতে এখানকার নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী শোনাচ্ছিলেন—মন সেই রসেই ডুবে ছিল।

যত রাতেই শুই—গরমের জন্যই হোক, অথবা এখানে তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত ফরসা হয়ে যাবার জন্যই হোক—ঠিক সওয়া চারটেয় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উত্তপ্ত ঘরের বিজলীপাখা বন্ধ ক'রে বাইরের ভোরাই ঠাণ্ডা বাতাসে এসে বসলাম। তখনও চারদিক নির্জন, দূরে, বহুদূরে ক্ষীণ আর্তনাদ তুলে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। কোনাকুনি শহরের যে পথটুকু দেখা যায়—সে পথও সম্পূর্ণ জনবিরল। শুধু গাছে গাছে নানা স্বরে নানা ভাষায় অসংখ্য পাখি ডাকছে। সে ঐকতানে স্নায়ু সজাগ হয় না, বরং যেন মুগ্ধ হয়ে আসে। সেই দিকে কান পেতে

থাকতে থাকতে ভোরাই মিষ্টি বাতাসে চোখ দু'টি আমারও তন্দ্রায় বুজে আসছিল। এমন সময় হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম।

ওকি! কাল সেই সমাধিটার ওপর থেকে লূতাতন্তুর যে চন্দ্রাতপ আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে দিয়েছি, আজ আবার তা পূর্ণ-গৌরবে অবস্থান করছে। শেষরাত্রের শিশির প'ড়ে আজ তা এখান থেকেই স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আবার এক একটি ঘনীভূত শিশির-বিন্দু মুক্তোর মতই জ্বল্ জ্বল্ করছে তার মধ্যে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

সেই চতুষ্কোণ চন্দ্রাতপ। সদ্যনির্মিত ব'লে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এমনই সূক্ষ্ম কারিগরি যে, শিশির না জমলে হয়তো এখান থেকে দেখাই যেত না।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে ব'সে রইলাম। মাকড়সাটাকে তো কাল কোথাও দেখি নি। কোথা থেকে আবার এল এবং এমন নিখুঁতভাবে এই জালটি রাতারাতি বুনল। ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম, আর কোনো সমাধির ওপর এরকম জাল নেই। কোনো কোনো গাছের ওপরের ডালে দু'-একটা বিশ্রী ধূম-মলিন পুরানো জাল আছে বটে, কিন্তু কাল বিকেলে তাও দেখা যায় নি। ভোরাই শিশিরের দৌলতে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু, এমন পরিপাটী কোনোটাই নয়। আজ আরও একটা জিনিস দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, সমাধি-বেদীটি ঠিক যতটা লম্বা এবং চওড়া, চন্দ্রাতপটিও তাই।

একটু পরেই অমিয়বাবু স্বয়ং আমার 'বেড্-টী'র কাপ হাতে ক'রে এসে বসলেন। কথাটা তাঁকে বললাম আজ। তিনি তো স্তম্ভিত! স্পষ্টই স্বীকার করলেন, তাঁরা কোনোদিনই এটা লক্ষ্য করেন নি। এতকাল এইখানে বাস করেছেন—এ বাড়ি নতুন হ'লেও দু'তিন বছর তো হয়েই গেছে—অথচ, কোনো-দিন এই বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে নি তাঁর, এও এক আশ্চর্য ব্যাপার। লক্ষ্য তো করেনই নি—এখনও বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না, বললেন, 'ওটা একটা প্রাকৃতিক খেয়াল মাত্র। মাকড়সাটার খেয়াল। অথবা, ওখানে ওর ঐরকম জাল বুনলেই সুবিধে হয় তাই—'

আমি কিন্তু অত সহজে ভুললাম না। সেদিন বেলা চারটে নাগাদ উঠে বাগানে বেড়াতে গিয়ে লাঠির ডগা দিয়ে ছিঁড়ে দিলাম জালটা। বেশ ভালো ক'রে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলাম।

সেদিন কথাটা মাথায় ছিল। চাঁদনী রাত, রাত্রেই শোবার আগে অমিয়বাবুকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলাম, তিনি রাজি হলেন না। বললেন, তাঁর মা আর স্ত্রী

তাহ'লে রক্ষা রাখবেন না। মায়ের এক ছেলে তিনি—আবার নববিবাহিত। কথাটা বুঝলাম। কিন্তু আমাকেও তিনি যেতে দিতে রাজি হলেন না। বললেন, 'ভূত না মানুন মশাই, আশা করি সাপ মানেন। এই রাত্তিরে আর বাহাদুরি করতে গিয়ে কাজ নেই—। প'ড়ো ডাঙ্গা জমি—সাপখোপের হেড্-কোয়ার্টার।' সুতরাং, তখন যাওয়া হ'ল না। তবে কথাটা ভুলি নি। উত্তেজনায় ভালো ক'রে ঘুমোতে পারলাম না। স্বপ্নেও দেখলাম বিরাট এক মাকড়সা কঠিন জালে আমার সর্বাঙ্গ জড়াচ্ছে—

চারটেরও আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল পরদিন। একরকম ছুটেই বাইরে চ'লে এলাম।······ঐতো পরিষ্কার চাঁদোয়াখানি ফুলছে বাতাসে, শিশিরে তেমনি ঘনীভূত ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আশেপাশে আর কোথাও না, অন্য কোনো সমাধি-বেদীর উপরে নেই সে জাল—

সকালে জলখাবার খেতে ব'সে অমিয়বাবুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ সমাধিটা কার—কিছু জানেন নাকি—?' ভদ্রলোক খুব নাম-করা উকিল। হার্ড ফ্যাক্টস্ বা কঠিন তথ্য নিয়ে তাঁর কারবার, স্বপ্নবিলাস বা কল্পনা ধারে-কাছে থাকলে কখনই এত পয়সা করতে পারতেন না, তিনি হেসে বললেন, 'ওসব উদ্‌ভুট্টি কথা নিয়ে মাথা ঘামালে তো আমার চলবে না মশাই, আমার অত সময় কোথায়! আপনারা লেখক-মানুষ, সবরকম তুচ্ছ কথা নিয়ে সময় নষ্ট করাই আপনাদের সাজে!'

অমিয়বাবুকে বারবার অনুরোধ করলাম যে, এই বিষয়ে কিছু জানা যায় এমন কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—কিন্তু, তিনিও ব্যস্ত মানুষ, এসব খেয়াল রাখতে গেলে তাঁর চলে না। অথচ, দিনের পর দিন দেখতে লাগলাম সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এমন কি, সাড়ে পাঁচটার সময় জাল ছিঁড়ে দিয়ে সাতটার সময় টর্চ হাতে ক'রে গিয়ে দেখেছি জাল তৈরি হয়ে গেছে।

অবশেষে নিজেই খুঁজে বার করলাম লোক।

সেই এম্-এল্-এ বন্ধুটিই সন্ধান দিলেন। এখানকার স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যিনি বৃদ্ধ পূজারী, তাঁর বাবা এখনও জীবিত আছেন। অন্তত একশ' দশ বছর বয়স তাঁর। মিউটিনির আমলে—যখন ঐ গোরস্থান ব্যবহৃত হ'ত—তখন তাঁর বেশ জ্ঞান হয়েছে। তাছাড়া, পরে লোক-মুখেও কিছু শোনবার সুযোগ মিলতে পারে। নিচের দিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে ব'লে উঠতে পারেন না, কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি নাকি এখনও অটুট আছে তাঁর।

বন্ধুটি পরের দিন সেই পূজারীর কাছে নিয়ে যেতে রাজিও হলেন। দিনের আলোয় নাকি তিনি চোখ চাইতে পারেন না—কথা হ'ল রাত্রে আমাকে নিয়ে যাবেন। গেলাম রাত্রে। মহানদীর কাছে একটি ব্রাহ্মণ-পল্লী। অধিকাংশ বাড়িই পাকা গাঁথুনি কিন্তু খড়ের চাল, তা আবার অত্যন্ত নিচু। জানালার বালাই বিশেষ নেই, কোনো কোনো বাড়িতে ছোট্ট কুলুঙ্গীর মত একটু গবাক্ষ আছে, তাইতেই বোধ করি ওঁদের চ'লে যায়। বেশী হাওয়া সম্ভবত ওঁদের পছন্দ নয়।

এমনি একটি বাড়ির বাতাসহীন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একটা ছোট্ট পিদিম মিটমিট্ ক'রে জ্বলছে এককোণে, তাতে কিছুই ভালো ক'রে দেখা যায় না। বরং, একটা রহস্যময় ভয়াবহ আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেই আলোতে। শুধু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখলাম। মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে ব'সে আছেন একটি বৃদ্ধ। যে বালকটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সে-ই ওঁর পা দু'টি মুড়ে দিয়ে গেল। ওঁর নিজের কোনো শক্তি নেই। সারা ঘর থেকে ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ আসছে, তার সঙ্গে চুয়াযুক্ত গুণ্ডির গন্ধ। বৃদ্ধ দন্তহীন মাড়িতে অবিরত পান চিবুচ্ছেন। আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় তোলবার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কে?' আমার বন্ধু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলেন। আমিও তাঁকে প্রণাম ক'রে মাদুরে বসলাম। অসহ্য গরম—কিন্তু, সে সব গ্রাহ্য করতে গেলে চলবে না, বন্ধুর অভিজ্ঞতা আছে, তিনি দেখলাম পকেটে ক'রে একটি ভাঁজ-করা ছোট্ট পাখা এনেছেন।

পূজারীজীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। দেখলাম, সত্যিই বৃদ্ধের চিন্তা ও ধারণাশক্তি এখনও বেশ পরিষ্কার রয়েছে। তিনি আমার প্রশ্নটা শুনে খানিকটা চোখ বুজে ব'সে থেকে বললেন, 'ও, বুঝেছি—আপনি কোন্‌টার কথা বলছেন।... বাবু, আপনাকে আজ আমি একথার উত্তর দেব না। আজ বৈশাখী-পূর্ণিমা, এখন বোধ হয় রাত আটটা বাজে—আপনি এখনই চ'লে যান! রাত ন'টার সময় দ্বিতীয় প্রহর পড়বার ঠিক মুখে ঐ সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন।...তারপর কাল আসবেন। আমার কাহিনী শুনতে গেলে আপনি ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবেন না! এদিন সহজে পাবেন না, দৈবাৎ আজ এখানে হাজির আছেন। বছরে এই একটি দিনেই এ ঘটনা ঘটে—'

তখনই উঠে পড়লাম। আটটা তখন বেজেই গেছে—সৌভাগ্যক্রমে আমার বন্ধু তাঁর গাড়ি এনেছিলেন, তাই কোনোমতে ন'টার আগেই অমিয়বাবুর বাড়ি

পৌঁছলাম। ওড়িয়া বন্ধু সঙ্গে রইলেন, তিনি অমিয়বাবুকে ডেকে নিতে চাইছিলেন, আমি বারণ করলাম। কী দরকার—মায়ের এক ছেলে, তাঁকে এসব ঝামেলার মধ্যে টেনে কাজ নেই!

সঙ্গে টর্চ ছিল না, কিন্তু সেজন্য আজ আর অসুবিধা নেই, চাঁদনী রাত, ফুট্ ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। ঘন-পল্লব আমগাছের ছায়া এক এক জায়গায় খুব নিবিড় হ'লেও পথ দেখে চলতে কোনো অসুবিধা হ'ল না।

সমাধিটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম—ঠিক ন'টা। কিন্তু কৈ, কিছুইতো নেই! কোনো রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর অনুভূতি তো হচ্ছে না। বন্ধুর দিকে চাইলাম। তিনি চুপিচুপি বললেন, 'এখনও তিন মিনিট বাকি আছে। আপনার ঘড়ি বোধ হয় ফাস্ট আছে একটু—'

তা হবে! মনে পড়ল ইদানীং দৈনিক আধ মিনিট ক'রে ফাস্ট যাচ্ছে বটে। মেলানোও হয় নি ক'দিন—

তিন মিনিট নয়, আরও মিনিট পাঁচেক পরে টের পেলাম ব্যাপারটা।

অকস্মাৎ মনে হ'ল ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঠিক সাধারণ ধূপ নয়; কস্তুরী-চন্দন-লবান দেওয়া ধুনোর মতই সুবাস কতকটা। আরও একটু পরে পেলাম ফুলের গন্ধ, রাশি রাশি চাঁপা ও বেলফুল। তার সঙ্গে মৃদু চন্দনের সৌরভ। মনে হ'ল কোনো দেবমন্দিরে উপস্থিত হয়েছি পূজার সময়।

অবাক হয়ে গেলাম আমরা দু'জনেই। জনমানব নেই ধারে কাছে। একটা কোনো জীবিত প্রাণী পর্যন্ত নজরে পড়ে না। অথচ, এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে?…বন্ধুর মুখ শুকিয়ে উঠল, তিনি চাপা অথচ কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'চলুন চ'লে যাই—এসব ব্যাপার ভালো না—'

ভয় যে আমারও একেবারে হচ্ছিল না তা নয়—কিন্তু, ঘাড় ঘুরিয়ে অদূরে বিদ্যুতালোকিত কোলাহল-মুখর শহরের দিকে চেয়ে মনে বল আনলাম। পাশেই অমিয়বাবুদের বাড়ি, লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাছাড়া আমরা দু'জনে আছি, এত ভয়ই বা কি। আমি বন্ধুর হাতটা চেপে ধ'রে আর একটু থেকে যাবার ইঙ্গিত করলাম।…

আর মিনিট তিন চার, তারপর আমরা দু'জনেই শুনতে পেলাম একটা চাপা অথচ তীব্র আর্তনাদ। না—নারীকণ্ঠের নয়, পুরুষ কণ্ঠেরই। মুহূর্তখানেক—তারপরই সব চুপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন নিমেষে মিশিয়ে গেল সে ফুল আর ধূপের গন্ধ। তার জায়গায় রৌদ্রদগ্ধ মাটি ও শুকনো আমপাতার গন্ধ।…

আর সেটা ভালো ক'রে বোঝবার আগেই অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস উঠল— সর্ সর্ ক'রে আওয়াজ উঠল স্খলিত শুকনো আমপাতার রাশির মধ্যে, টুপটাপ ক'রে ঝ'রে পড়ল পাকা আম দু'-চারটে—

আমার বন্ধু আর ইতস্তত করলেন না। আমার হাত ধ'রে প্রাণপণে টানতে টানতে দৌড় দিলেন। একেবারে অমিয়বাবুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে একটা বেতের চেয়ারে ব'সে প'ড়ে শুধু বললেন, 'জল, একটু জল!' গরমের দিনে বাগানে বসবার জন্যে বিকেলে এই চেয়ারগুলো নিয়মিত পাতা হয় ভাগ্যে—আমারও আর দাঁড়াবার মত অবস্থা ছিল না।

পরের দিন সন্ধ্যা না পড়তে পড়তে পূজারীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। তিনি সব শুনে হাসলেন একটু। তারপর কাহিনীটা বললেন। এ ঘটনা ঘটে আঠারশ' সাতান্ন সালে, তিনি তখন বালক মাত্র। তাঁর কিছু মনে নেই। এটা পরবর্তী কালে তিনি শোনেন তাঁর মার কাছ থেকে। সত্য মিথ্যা তিনি কিছু জানেন না, তবে খানিকটা যে সত্য তার প্রমাণ তো আমরাই পেয়ে এসেছি।

কাহিনীটা এই :

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও তেলেঙ্গী সিপাইরা যখন এসে ঐ পাহাড়ের কোলে ছাউনি ফেলে তখন এখানে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। ধান-চাল-খাদ্য-খাবার তো কারুর রাখবার জো ছিলই না—মান ইজ্জত প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। যাদের পয়সা ছিল বা পালাবার জায়গা ছিল তারা সবাই গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলে, কিন্তু যারা উপায়হীন তারা এখানেই থেকে আতঙ্কে প্রহর গুনতে লাগল। প্রতিদিনই একটা-না-একটা অত্যাচারের কাহিনী কানে আসে—অথচ, তার কোনো প্রতিকার নেই। প্রতিকার বা প্রতিবাদ করবে এমন সাহস কার? ইংরেজরা তখন ক্ষেপে উঠেছে, এদেশের প্রতিটি লোকের ওপর তাদের বিজাতীয় আক্রোশ জেগেছে তখন!

সবচেয়ে বিপদ হ'ল এই পূজারী-পল্লীর। প্রতিটি পরিবারেই সেবার পালা পড়ে ঘুরে-ঘুরে। দেবীর নিত্য-সেবা বন্ধ রেখে পালাবে কে? তবে তাঁরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেন, সন্ধ্যের আগেই মন্দির বন্ধ ক'রে এসে ঘরে ঢুকতেন যে-যার—তারপর কোনো কারণেই আর বেরোতেন না।

এরই মধ্যে এক ঘটনা ঘটল। তাঁদের এই পূজারীবংশের একটি মেয়ের

এখানেই বিয়ে হয়েছিল। তার শ্বশুরবাড়ির কাছেই পড়েছিল ছাউনি। অত কাছে আর কেউই থাকতে সাহস করে নি, সকলেই প্রায় অন্য কোথাও-না-কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল কোনো উপায় ছিল না মালতীর। তার বৃদ্ধ শ্বশুর একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে সুদ্ধ কোথায় কে আশ্রয় দেবে? তাছাড়া, তাঁর মাথাতেও কেমন একটু গোলমাল হয়েছিল, বাড়ি থেকে নড়াতে গেলে তিনি কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ করতেন। সুতরাং, মালতীর যাওয়া হয় নি।

তবু তারা খুব সাবধানেই ছিল বৈকি! মালতী দিবালোকে বাড়ির উঠানে পর্যন্ত বার হ'ত না। তাকে ঘরের মধ্যে স্নানের জল ও পাকের জোগাড় পৌঁছে দিত তার স্বামী। মালতী এদেশের হিসেবে রীতিমত সুশ্রী ছিল, সেইজন্য আরও এত সতর্কতা।

কিন্তু, অদৃষ্টের এমনিই বিড়ম্বনা, একদিন মালতীকে একাই বেরোতে হ'ল শুধু উঠোনে নয়, একেবারে রাস্তায়। ওর স্বামী মাঠ থেকে ফিরে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ঘরে আর কোনো লোক নেই, শ্বশুর পঙ্গু, অসমর্থ। কে বৈদ্য ডাকে? ধারে-কাছে তেমন কোনো বৈদ্যও নেই। যারা ছিল সবাই পলাতক। মালতীর মনে পড়ল ছাউনিতে মিলিটারি সার্জন আছে একজন—গোরা-ডাক্তার—যদি তার হাতে পায়ে পড়া যায়, দয়া কি হবে না?

তখন অত ভাববার সময় নেই, বিবেচনারও নয়। মালতী পাগলের মত রাস্তায় বার হয়ে দৌড়াতে লাগল ছাউনির দিকে।

কিন্তু, ছাউনি পর্যন্ত যাবার আগেই এক ঘটনা ঘটল। মহম্মদ ইসমাইল নামে এক তেলেঙ্গী সিপাই আর গাফ নামে (নামটা ঠিক মনে নেই পূজারীর, তবে ঐরকমই হবে) একজন ফিরিঙ্গী গোরা—ছাউনি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল, ঐ পথে চুপিচুপি ফিরছিল তারা। সেদিনও বৈশাখী-পূর্ণিমা। মদোন্মত্ত ফৌজী সিপাই নির্জন পথে সুশ্রী তরুণীকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। দু'জনে দুটো হাত ধ'রে নিয়ে চলল অপেক্ষাকৃত নিরালা বনছায়ার উদ্দেশে—মালতী কান্নাকাটি কাকুতি-মিনতি ঢের করল। গোরা গাফ তার কথা বুঝল না। কিন্তু, ইসমাইল বুঝল। অসুস্থ স্বামীকে ফেলে সতী নারী উন্মাদিনীর মত, বলতে গেলে বাঘের গুহায় যাচ্ছিল, কথাটা শুনে নরম হ'ল তার মন। অবশেষে দুর্দান্ত গাফ যখন মালতীর প্রতি চরম অত্যাচারে উদ্যত হ'ল, সে তখন ইস্‌মাইলের পায়ে প'ড়ে বললে, 'তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোটবোন, আমাকে বাঁচাও।' তখন সে আর স্থির থাকতে পারলে না। তারও ঘরে একটি ছোটবোন ছিল,

সে তাকে ভালোও বাসত। সে গাফের হাত ধ'রে বললে, 'ব্যস্ খবরদার। ছেড়ে দাও ওকে।'

গাফের সেদিন নেশার মাত্রা বেশী হয়েছিল। চোলাই-করা দেশী মদ, তার সঙ্গে এদেশের লোকেরা চড়াদামে সাহেবদের কাছে বেচবে ব'লে গাছগাছড়ার রস মিশিয়ে দিত—তার নেশা তখন গাফের মাথায় উঠেছে! সে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে উঠল।

ইসমাইল কিন্তু তাতেও তাতে নি। সে গাফকে বুঝিয়ে বলতে গেল। যখন কিছুতেই পারল না তখন জড়িয়ে ধ'রে রেখে বললে, 'বোন তুমি পালাও, দৌড়ও। বাড়ি ফিরে যাও তোমার। ছাউনিতে যাবার চেষ্টা ক'রো না আর।' মালতী দৌড়তে লাগল। তবে সে বেশী দূর যাবার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। এক ঝটকায় গাফ ইসমাইলের হাত ছাড়িয়ে নিয়েই কোমর থেকে তলোয়ারখানা বার ক'রে—ইসমাইল ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝবার আগেই, বসিয়ে দিলে ওর বুকে। একটি মাত্র আর্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেল বেচারী।

ঝোঁকের মাথায় অথবা নেশার ঝোঁকে মেরে ফেলেছিল গাফ। কিন্তু, তার পরই প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল। সে আর মালতীকে ধরবার চেষ্টাও করলে না। তার নিজেরই প্রাণ বাঁচানো সমস্যা। সে-ও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলে।

মালতীর নিজের ভয় তো ছিলই, তার ওপর চোখের সামনে এই হত্যাকাণ্ড দেখে বিহ্বল অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কোনোমতে অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এল। সৌভাগ্যের বিষয় তার স্বামীর তখন আপনিই জ্ঞান হয়েছে, সে সুস্থও হয়েছে। স্বামীর বিষয় নিশ্চিন্ত হয়ে মালতীর অন্য কথাটা বেশী ক'রে মনে হ'তে লাগল। বেচারী ইসমাইল তার জন্যই প্রাণটা দিলে। তার সত্যিকারের দাদা হ'লেও তাকে বাঁচাতে এমন ভাবে প্রাণ দিত কিনা সন্দেহ! সে কিছুতেই ভুলতে পারলে না সেদিনের ঘটনা, সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে থাকত, আড়ালে একা থাকলেই চোখের জল ফেলত।

মালতী সেদিন কোথায় গিয়েছিল অত রাত্রে, ডাক্তারের খোঁজে গিয়ে থাকলে ডাক্তার আনলে না কেন—একথা তার স্বামী ও শ্বশুর দু'জনেই বারবার প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু মালতী ভয়ে তাদের কাছে সত্য কথাটা বলে নি। এটা সহজাত ভয়—কী দরকার খুন-খারাপির ব্যাপারে নিজেকে জড়ানোর। বিশেষত, ইসমাইলের রহস্যজনক হত্যার কথাটা তখন চারদিকেই আলোড়িত হচ্ছে মালতী একেবারে ও কথাটা মুখেই আনলে না।

একবছর ঘুরে গেল, আবার এল বৈশাখী-পূর্ণিমা। মালতী আর স্থির থাকতে পারলে না। ইসমাইলের সমাধি কোথায় দেওয়া হয়েছিল তা সে লক্ষ্য করেছিল, কতদিন গোপনে গিয়ে ফুল দিয়েও এসেছে সেখানে। সেদিন রাত্রে স্বামীকে পূজো দেবার ছুতোয় দূরে শিবের মন্দিরে পাঠিয়ে একা ফুল, চন্দন, ধূনো নিয়ে গিয়েছিল ঐ সমাধিটিতে পূজো করতে বা স্মরণ করতে। ফুল দিয়ে সমাধি সাজিয়ে ধূপধুনো দিয়ে আলো জ্বেলে যেমন ফিরবে, দেখা হয়ে গেল ওর এক দূর সম্পর্কে নন্দাইয়ের সঙ্গে। তিনি নির্জন গোরস্থানে একা স্ত্রীলোককে ঢুকতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে পিছু পিছু এসেছিলেন—সবই লক্ষ্য করেছেন।

এর ফল যা হবার তা হ'ল। কথাটা জ্ঞাতি-মহলে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানের সমাধিতে ফুল আলো দিয়ে যে পূজো করে, সে নিশ্চয় মুসলমানী—তার আর জাত কি থাকতে পারে? ঘোঁট হ'তে হ'তে, ঠিক হ'ল যে, ওকে ত্যাগ করতে হবে, আর ত্যাগ যদি না করা হয় তো তাঁরা, অর্থাৎ জ্ঞাতিরা, ওর স্বামী-শ্বশুরকে একঘরে করবেন। স্বামীরও একটা চাপা বিদ্বেষ এবং প্রকাশ্য সংশয় ছিল। তিনি ত্যাগ করতে রাজি হলেন।

দেখা গেল, সেদিন মালতীর আশ্রয় নেবার মত স্থান এই এতবড় শহরে আর কোথাও নেই—এক বেশ্যাপল্লী ছাড়া। সে ওদের বাগানে একা কুটীর বেঁধে থাকতে চাইলে, স্বামী সে অনুমতিও দিলেন না। অগত্যা যা স্বাভাবিক মালতী তাই করল! দূর থেকে তাদের বংশের ইষ্টদেবীকে প্রণাম জানিয়ে মহানদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই থেকে আজও প্রতি বৈশাখী-পূর্ণিমার ঠিক দ্বিতীয় প্রহরের মুখে ঐখানে ফুল, চন্দন ও ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। আর শোনা যায় আহতের একটা চাপা আর্তনাদ। আর, একটি ক'রে মাকড়সা চিরকাল ধ'রে শহীদের সমাধির উপর ঐ লূতাতন্তুর চন্দ্রাতপ রচনা ক'রে রাখে—কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না।

প্রথম থেকেই ওর ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছিল। আমি হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে বাস্‌-এ চড়বার পর তিনবার না চারবার ও টিকিট চেয়ে গেল, কিন্তু একবারও—আমরা যেদিকে বসেছিলুম, সেদিকে, অর্থাৎ পিছনের দিকে, কারুর কাছে টিকিট চাইলে না। সোজা এগিয়ে যায় সেই মাথার দিকে—ওখানেই চারটে সীটের আটজন লোকের কাছে টিকিট চায়—আবার ফিরে আসে। কোনো দিকে তাকায় না—দৃক্‌পাত করে না! ফলে, একেবারে সামনের সীটের এক বুড়ো ভদ্রলোক তো একবার রেগেই উঠলেন, 'কতবার টিকিট চাইবে, সেই থেকে তো বার পঁচিশেক হ'ল। একই লোক ব'সে আছে সেটা কি এখনও মনে পড়ছে না—এতবার দেখেও!'

কণ্ডাক্টরটিও বিড় বিড় ক'রে কী বকতে বকতে চ'লে গেল। সেটা ক্ষমা-প্রার্থনা, অথবা বিরক্তি-প্রকাশ তা বোঝা গেল না।

এরপরই উঠল চেকার—অর্থাৎ, জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে। তখনও দেখা গেল যে, আমাদের পিছনে এক রো আর সামনের তিন চার রো—কারুর টিকিট নেওয়া হয় নি। কেউ আসছে কলেজ স্ট্রীট থেকে, কেউ বা বৌবাজার থেকে। খান দু'-তিন তিন-আনার টিকিট চাইতেই ইন্সপেক্টর বা চেকার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, 'এতক্ষণ কী করছিলেন মশাই, এতগুলো তিন-আনার টিকিট? কী বললেন, আপনার চোদ্দ পয়সা! বলিহারি!'

এসব ক্ষেত্রে সব কণ্ডাক্টরই সাফাই গায়, 'আমি তো চেয়ে চেয়ে গেছি, ওঁরা না দিলে কী করব।' কিন্তু, এ লোকটি সেদিক দিয়েই গেল না। মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল চেকারের মুখের দিকে।

কিন্তু, এইখানেই শেষ নয়, আমি যে আধুলি দিয়েছিলুম তার ফেরত পেলুম, তের আনা। আট আনা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'আমি তো আধুলি দিয়েছিলুম!'

'ও মাপ করবেন। টাকা উনি দিয়েছিলেন'—ব'লে আমার পাশের ভদ্রলোকের হাতে তের আনা গুঁজে দিলে লোকটি।

'সে কি কথা! আমারও যে আধুলি, আর সে আধুলি তো আমার হাতেই

এখনও মুঠো করা রয়েছে, আপনাকে তো এখনও দিই নি!'

'কী হয়েছে আপনার বলুন তো!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক।

তার কোনো উত্তর দেবার আগেই—এইমাত্র-পাওয়া আধুলিটা ঠকাস্ ক'রে কোথায় প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে খুঁজতে গিয়ে চামড়ার ব্যাগটা থেকে আরও কতকগুলি রেজ্‌গি গেল প'ড়ে—ঝন্ ঝন্ ক'রে। ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এবং অন্য দু'চারজন যাত্রী—সাহায্য ক'রে যতগুলো পারলেন খুঁজে দিলেন। কিন্তু, ক্যাশ যদি বা উদ্ধার হ'ল, দাঁড়িয়ে উঠে টিকিট দিতে গিয়ে দেখা গেল ছ'-পয়সার টিকিটের বাণ্ডিলটা কোথায় উধাও হয়েছে।

এতক্ষণে ওর মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলুম। অল্পবয়সী তরুণ ছেলে, একহারা চেহারা, অথচ ঠিক রোগা নয়—বরং ওরই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ দেখায় যেন। মোটের উপর সুশ্রী বলতেও বাধত না, যদি না মুখখানা তিন চারদিনের দাড়ি-গোঁফে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকত। তাছাড়া, চোখের কোলে সুগভীর কালি, প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল—সব মিলিয়ে ওকে রীতিমত অসুস্থই দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি শুধু মূঢ় নয়, কতকটা উদ্‌ভ্রান্তও বটে।

আমার পাশের ভদ্রলোকও বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন—তিনি অর্ধস্বগতোক্তির মত বললেন, 'ওঁর বোধ হয় শরীরটাও ভালো নেই।'

কণ্ডাক্টর যেন চম্‌কে চাইল তাঁর দিকে, নিমেষের জন্য তার মূঢ় দৃষ্টিতে দীপ্তি ফিরে এল—মনে হ'ল আঁধারে কূল দেখতে পেলে সে।

সে একবার অসহায়ভাবে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'সত্যিই শরীরটা বড় খারাপ লাগছে!'

'সিক রিপোর্ট ক'রে চ'লে যান নি কেন?' ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন।

দেশপ্রিয় পার্কে এসে থামতেই আমি বাস্ থেকে নেমে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্ডাক্টরটিও নেমে এল। প্রথমটা ভেবেছিলুম টাইম নিতে নেমেছে, কিন্তু গুম্‌টির কাছাকাছি যেতেই কানে এল, 'দেখুন রায়বাবু, শরীরটা বড়ই খারাপ লাগছে, আমাকে রিলিফ দেবেন?'

'বেশ তো, ক্যাশ গুনে দিয়ে ব্যাগ জমা রেখে চ'লে যান। কিসে যাবেন, এই বাসেই যাবেন তো? না, আট নম্বরে? আপনি যাদবপুর থাকেন না?'

'না, আমি শ্যামবাজারের বাসে উঠব—আজকাল ঐ দিকেই থাকি।'

কৌতূহল প্রবল হ'ল। গল্প লেখকের কৌতূহল। আমি পাশের ভদ্রলোকের

সঙ্গে একমত হই নি। আমি বেশ বুঝেছিলুম—খারাপ হয়েছে শরীর নয়, মন। একশ' চার জ্বর নিয়েও ডিউটি দিতে দেখেছি, কিন্তু তাতে এত অন্যমনস্কতা দেখি নি কখনও। এ রকম উদ্‌ভ্রান্ত ও মূঢ় দৃষ্টি তো নয়ই।

বেশ বুঝতে পারলুম কোনো একটা বড় রকমের মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু, এতটা উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলার মত কী ঘটতে পারে?

অপেক্ষা করলুম একটু। এমন কোনো কাজও ছিল না হাতে। বাড়ি ফেরা তো, যখন হোক, ফিরলেই হবে। আর এই তো মোটে আটটা।

ছোকরা ক্যাশ আর টিকিট জমা দিয়ে স'রে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল খানিকটা—ওপারে যাবার কোনো চেষ্টাই করল না। আশান্বিত হয়ে উঠলুম, অর্থাৎ এখনই শ্যামবাজারের বাস্ ধরবে না।

তেমনিই মূঢ় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর জনস্রোতের দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে থেকে একসময় যেন চম্‌কে উঠল, হয়তো মনে পড়ল গুম্‌টির রায়বাবুর কথা।

যদি দেখতে পান তো কী মনে করবেন ভদ্রলোক! তাড়াতাড়ি খানিকটা পূর্বমুখে এগিয়ে গিয়ে পার্কের গেটটার সামনে আর একবার থম্‌কে দাঁড়াল। কোথায় যাবে মনস্থির করতে পারছে না—বাড়ি যাবার ইচ্ছা আদৌ প্রবল নয়। আমার অনুমানই সমর্থিত হ'ল—ব্যাধি শরীরে নয়, মনে। দেহ অসুস্থ হ'লে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

খানিকটা অমনি দাঁড়িয়ে থাকবার পর একটু ইতস্তত ক'রে সে পার্কেই ঢুকে পড়ল। ভেতরে গিয়ে ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে একটু ঘুরল—সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন-ভাবে, তারপর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন কোণ বেছে নিয়ে ঘাসের ওপরই এলিয়ে শুয়ে পড়ল, আকাশের দিকে চেয়ে।

আমি দূর থেকে এতক্ষণ ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলুম। এইবার সুযোগ পেয়ে কাছে গিয়ে ঠিক ওর পাশটিতে ব'সে পড়লুম। ও চম্‌কে উঠল, একটু বোধ হয় বিরক্তও হ'ল এই ঘনিষ্ঠতায়।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'দেখুন, আমি ঐ বাসে ছিলুম।'

'কো-কোন্ বাসে?' কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে।

'এইমাত্র যে বাস্ থেকে এলেন। আমিও ছিলুম, প্যাসেঞ্জার একজন। আমাকেই আপনি আধুলি নিয়ে টাকার রেজ্‌গি দিয়েছিলেন!'

'ও!' নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর এল। সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এটাও ছিল যে

বেশ তো, বাস্ তো ছেড়েছি, আর কেন? স'রে পড় দিকি বাপু!

'আচ্ছা, কী হয়েছে আপনার, বলুন তো ঠিক ক'রে।'

'শরীরটা খারাপ লাগছে।' বিরক্ত, ঈষৎ যেন রুষ্টও শোনাল, কণ্ঠস্বর।

'তা তো আপনি ওখানেও বললেন। কিন্তু, তাই কি ঠিক? সেরকম অসুখ করলে বাড়িই চ'লে যেতেন। অত দাঁড়িয়ে ভাবতেন না! আমার বিশ্বাস মনের মধ্যেই আপনার একটা কী প্রলয় কাণ্ড ঘটেছে—ঠিক কিনা বলুন?'

'কী হবে আপনাকে ব'লে? কে আপনি? আপনাকে তো আমি চিনি না!'

বেশ একটু রূঢ় হয়ে ওঠে। রাস্তার উজ্জ্বল আলোর আভায় আমাকে ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করে।

'বলাটা আপনারই প্রয়োজন, যতক্ষণ না বলতে পারছেন ততক্ষণ আপনার শান্তি নেই। আর সেরকম বলবার মত লোকও আপনার নেই তা বুঝতে পারছি, নইলে আপনি সেখানে না গিয়ে মাঠে এসে শুয়ে পড়তেন না। বাড়িও ছেড়েছেন মনে হচ্ছে—থাকতেন যাদবপুর—চ'লে গেছেন শ্যামবাজারে। আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে বলুন দিকি!'

'আপনি কি গোয়েন্দা?' কেমন যেন ভয়ে ভয়ে উঠে বসে সে।

'না, গোয়েন্দা নই, সাহিত্যিক। তাদের কৌতূহল পরের তাগিদে—আমার কৌতূহল সাহিত্যের তাগিদে। তফাত এই!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, 'ঠিক বলছেন? শুধুই কৌতূহল? অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই?'

'ঠিক বলছি, দরকার হয় তো দিব্যি গেলে বলতে পারি।'

'তাহ'লে শুনুন। আপনাকেই বলব সব খুলে। কাউকে বলতে না পারলে আমার আর চলছে না, সত্যিই।'

একটু একটু ক'রে খাপছাড়া এলোমেলো ভাবে বেরিয়ে এল সমস্ত বিবরণ। তার মধ্যে যে ঠিক পারম্পর্যও রইল না, তা বলাই বাহুল্য। বহু কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, জেরা ক'রে জানতে হ'ল। কাহিনী যখন শেষ হ'ল তখন যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই:

ছেলেটির নাম অশোক। বাড়ি ওদের পূর্ববঙ্গে। সংসারের অবস্থা খুব ভালো না হ'লেও পড়াশুনো করত, বাংলা যখন ভাগ হ'ল তখন সবে ইণ্টার-

মিডিয়েট পাস ক'রে সে বি-এস্-সি তে ভর্তি হয়েছে। তারপর আর পড়াশুনো সম্ভব হয় নি। ওদের গ্রামে ঠিক কিছু হয় নি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে টিক্তে পারবে না ওরা—তা আগেই অনুমান করেছিল। শহর ছেড়ে, পড়াশুনো ছেড়ে, গ্রামে গিয়ে বসতে হ'ল। কারণ প্রতিদিনই আতঙ্ক, প্রতিদিনই নতুন গুজব। বাড়ির ছেলেরা বাড়িতে না থাকলে মেয়েরা থাকে কী ক'রে? বৌদি ছিলেন, বয়স্কা বোন ছিল—মা কাকী পিসি তো ছিলই। দাদা রংপুরে চাকরি করতেন, তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়, বাবা বুড়োমানুষ, সুতরাং অশোক আর তার ছোটভাইকেই দেশে গিয়ে বসতে হ'ল।

তারপর ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে এমন কাণ্ড শুরু হ'ল চারদিকে যে, আর দেশে থাকা সম্ভব হ'ল না। শোনা গেল যে, এর পর আর আসাই যাবে না। প'ড়ে রইল জমি-জমা গরু-বাছুর, ঘরের টিনগুলো পর্যন্ত বিক্রি ক'রে আসা গেল না। তবে ওর বাবার বন্ধু হবিব মিঞার ছেলে আনোয়ার দয়া ক'রে এসে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাওয়াতে সামান্য কিছু গহনাপত্র টাকাকড়ি নিয়ে আসা গিয়েছিল। ওরা আশা করেছিল পরিবারবর্গ নিরাপদে কলকাতায় এসে পৌঁচেছে জানলে দাদা আর চাকরিটা ছাড়বে না। কিন্তু, শিয়ালদা স্টেশনে যে কয়দিন থাকতে হয়েছিল তারই মধ্যে দাদাও এসে জুটলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে।

এর পরের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই যে, ওরা যাদবপুরের কাছাকাছি একটু জমিতে ছিটে-বাঁশের দু'খানা ঘর তুলে নিয়েছে এবং দাদা অন্য কোথাও কোনো কাজ জোটাতে না পেরে এক বাজারে ফলের দোকান দিয়েছেন। ওদের পড়াশুনোর কথা ওঠেই না—কারণ, সামান্য যা-কিছু আনতে পেরেছিল ওরা, তা একবছর ব'সে খেতে এবং ঘর তুলতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বৌদির হাতের শেষ বালাজোড়া বেচে দাদা দোকান দিয়েছেন। যাই হোক্—অশোক এ চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল বছর খানেকের মধ্যেই, তাই রক্ষা, কোনোমতে সংসার চলছে। ছোটভাই অরুণ—সম্প্রতি এক কারখানায় ঢুকেছে, অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে।

অর্থাৎ, এইবার একটু সুখের না হোক—স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবার কথা।

এমন সময় এসে জুটল দীপ্তি—কোথা থেকে অতর্কিতে।

মাস আষ্টেক আগেকার কথা। গাড়ি এসে গড়িয়াহাট ডিপোয় থেমেছে—অশোক একটা সীটে ব'সেই ক্যাশটা মোটামুটি একবার মিলিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সামনের সীটে তখনও একটি তরুণী মেয়ে ব'সে আছে—বেশ

সুশ্রী চেহারা, হাতে বই খাতা, বেশভূষার মধ্যে মহার্ঘতা না থাকলেও রুচির পরিচয় আছে; এক কথায় শিক্ষিত ও সম্পন্ন ঘরের মেয়ে—ওরই দিকে স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

হিসেব গোলমাল হয়ে গেল নিমেষে।

'আপনি নামবেন না?' প্রশ্ন করে অশোক।

'না।' বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ—দ্বিধা কি সঙ্কোচের নাম-গন্ধ নেই। আমার নামার কথা দেশপ্রিয় পার্কে। আমি ল্যান্সডাউন অঞ্চলে থাকি—'

'তবে?'

'অন্যমনস্ক হয়ে চ'লে এসছি। তাতে কি, আবার ফিরে যাব।'

রাত তখন ন'-টা। সামনে আরও তিনখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে উঠল অশোক, 'আপনি নেমে ঐ আগেকার গাড়িতে গেলেন না কেন? এটার বেরুতে অনেক দেরি হবে। অন্তত আধঘণ্টা।'

'থাক্ গে, আমি আর উঠতে পাচ্ছি না। একসময় যাবে তো! অবশ্য আপনার অসুবিধা হয় তো আলাদা কথা।'

'না না—আমার অসুবিধা কী?' লজ্জিত হয়ে অশোক হিসাবে মন দেয়। ড্রাইভার বসেছিলেন আলো নিবিয়ে দেবেন ব'লে, তিনি একটু মুচকি হেসে ওপাশ দিয়ে নেমে গেলেন অসংখ্য চায়ের দোকানের একটিতে—আলুর দম পাউরুটি আর চা খাবেন ব'লে।

অশোক ক্যাশগুলো আবার থলিতে ও পকেটে পুরল। টিকিটগুলো আর একবার মিলিয়ে নিলে। এইবার ওর নেমে যাবার পালা। গুমটিতে যেতে হবে। চা একটু খেয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। ক্ষুধাও পেয়েছে। শ্যামবাজারে খাবার সুবিধে হয় না। এখানেই ভালো।

সে একবার মেয়েটির দিকে চাইলে।

মেয়েটি তেমনি নির্নিমেষ নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাতলা দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য প্রসন্নতা।

ওর চোখে চোখ পড়তেই বললে, 'বসুন না একটু।'

'এটা একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি, নইলে—'

'একটু পরেই যাবেন। এখনও তো দেরি আছে। এঁরা আলো নিভোবেন নাকি?'

'না—না। অসিতদা নেমে গেছেন। বসুন আপনি।'

তারপর মেয়েটি একে একে ছোট ছোট নানা প্রশ্ন করে। ওর নামধাম, সাধারণত কখন ডিউটি পড়ে, আসছে কাল ক'টা থেকে ক'টা—কোন্ লাইন। ওর নম্বর কত ইত্যাদি। খুব যে আগ্রহ আছে তা প্রশ্ন করবার ভঙ্গিতে মনে হয় না। মনে হয় সময় কাটানোর জন্য অলস প্রশ্ন এগুলো।

ওর নামধামও অশোকের জানতে ইচ্ছা হয় বৈকি। কিন্তু, সঙ্কোচে বাধে। অপরিচিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী মেয়েকে 'আপনার নাম কী' প্রশ্ন করা যায়? বিশেষত, ওর মত লোকের কাছে সেটা ধৃষ্টতা।

অবশেষে আগের বাস্‌টাও যখন ছেড়ে চ'লে গেল, তখন হঠাৎ একসময় মেয়েটি বললে, 'আপনাকে যখন এত কথা জিজ্ঞাসা করলুম তখন নিজের পরিচয়ও কিছু দেওয়া দরকার—আমার নাম দীপ্তি লাহিড়ী। আমার বাবা অ্যাটর্নী।·· আবার আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?'

'সেটা আগে থাকতে কী ক'রে বলি বলুন। এর পরে দেখা হোক্।' মুচকি হেসে বলে অশোক।

'বা-রে, বেশ তো কইতে পারেন। এতক্ষণ কেমন ভালোমানুষের মত হাঁ-না জবাব দিচ্ছিলেন!'

'আপনাদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলাও যে আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। আমরা সামান্য কণ্ডাক্টর বই তো নই। প্যাসেঞ্জারের কাছে আমরা মানুষের চেয়ে ছোট কোনো জীব।'

দীপ্তি উত্তেজিত ভাবে কী একটা প্রতিবাদ করতে গেল, কিন্তু সেই সময়ই দু'টি মহিলা এসে উঠলেন। ওদিকে ড্রাইভার অসিতবাবু এলেন গাড়িখানাকে এগিয়ে নেবার জন্য। অশোককেও নেমে যেতে হ'ল টাইমবাবুর কাছে। আর কোনো কথাই হ'ল না।

অশোক মনে মনে চটেই গেল মেয়েটির ওপর—কী দরকার ছিল এমন ভাবে ব'সে থাকার! মাঝখান থেকে ওর চা খাওয়াই হ'ল না। পেটে যেন কুকুর কামড়াচ্ছে—এত ক্ষুধা।

দেখতে দেখতে বাস্ ভ'রে উঠল। আর কথা কওয়ার সময় হ'ল না। একেবারে ল্যান্সডাউনের মোড়ে নেমে যাওয়ার সময় শুধু মেয়েটি একবার ওর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে খুব মিষ্টি হেসে গেল।

সেদিন রাত্রে কি দীপ্তির কথা ওর খুব মনে পড়ছিল? খুব মনে হয় নি

নিশ্চয়ই। সে অবসর কোথায়? রাত বারোটার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে শুতে শুতে একটা হয়েছে। তখন শারীরিক ক্লান্তিতে সমস্ত স্নায়ু আপনিই অবশ হয়ে এসেছে—একবার হয়তো মনে হয়েছিল মিষ্টি একখানা মুখ, পাতলা লাল দু'টি ঠোঁটে ঈষৎ একটু হাসির ভঙ্গি। রাগও হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে—অশোকদের জীবন নিয়ে এসব অলস কৌতূহল ঐ ধনী দুলালীদের কেন?

পরের দিন সকালে উঠেও সহস্র সাংসারিক কাজের মধ্যে একবার মনে পড়েছিল কিংবা পড়ে নি। বাসের পাটাতনে পা দিলে তো পৃথিবীটাই ভুলে যেতে হয়—তা সুশ্রী তরুণী মেয়ে!

কিন্তু, হঠাৎ ও চমকে উঠল, রাত ন'টা নাগাদ যখন ওর বাস্ থেকে গড়িয়া-হাটের গোলপার্কের কাছে একটি ছাড়া সব যাত্রী নেমে গেল—তখন সেই একটির দিকে চেয়ে।

দীপ্তি লাহিড়ী! ঠিক তো!

কৌতুকভরা চাপাহাসি ওর ঠোঁটের কোণে, চোখের চাহনিতে।

'একি! আজও অন্যমনস্ক হয়ে নাকি? না এদিকেই যাবেন?' প্রশ্নে একটু খোঁচা ছিল অশোকের।

'যাক্। চিনতে পেরেছেন তাহ'লে? বাঁচলুম।'

'কিন্তু, আমার কথার তো জবাব পেলাম না!' সাহস কি বেড়েই যায় অশোকের?

'হ্যাঁ—অন্যমনস্ক তো বটেই! তবে, সে অন্য। আপাতত আমার জন এবং এক। স্থির ও ধ্রুব।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না অশোক। অত বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই, কলেজে পড়ার স্মৃতি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। দু'চারখানা সাহিত্য-গ্রন্থ তখন যা পড়েছিল—এখন পড়বার সময়ও নেই, সুযোগও নেই।

সেদিন কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না—গাড়ি ছিল না আগে।

'এত তাড়াতাড়ি! কী মুস্কিল!'

হাত-ঘড়িটা তুলে দেখে ন'টা দশ। আপন মনেই বলে, 'এতরাত্রে আর শ্যামবাজার যাওয়া সম্ভব নয়। কাল ক'টায় ডিউটি আপনার? এই সময়েই তো?'

'কেন বলুন তো?'

চাপা গলায় দীপ্তি তর্জন করে, 'ব'লে ফেলুন না তাড়াতাড়ি—দেখছেন না

লোক আসছে।'

'হ্যাঁ—আফ্‌টারনুন ডিউটি।'

'ঠিক আছে।...'

পরের দিন ওর কথাটা ভোলে নি কিন্তু অশোক। সকালেও মনে পড়েছিল বারকতক। কালও কেন এল মেয়েটি? কাকে দরকার? কার কথা বলছিল? তবে কি—? না, তা বিশ্বাস হয় না অশোকের। এটুকু সহজ বুদ্ধি আছে ওর। ঐ রকম মেয়ে—কলেজে পড়া নিশ্চয়ই, সুশ্রী, শিক্ষিতা—অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, আর সে একটা বাসের কণ্ডাক্টর! নিশ্চয়ই অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসে সে। ওকে তরুণ পেয়ে একটুখানি কৌতুক করে শুধু, একটু নাচাতে চায়। ভাবে বোকা বোকা লোক, এতেই চরিতার্থ হয়ে যাবে। সময়ক্ষেপের প্রয়োজন শুধু তার অশোককে নিয়ে।

তবু মনে পড়ে বৈকি!...

আসমানী রঙের শাড়ি আর লাল ব্লাউজে ওর দেহের স্বাভাবিক কান্তি যেন উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছিল, এলোখোঁপাতে ছিল দু'টি রজনীগন্ধা ফুল। নামবার সময় তার একটি প'ড়ে গিয়েছিল—এক ফাঁকে সযত্নে কুড়িয়ে নিয়েছিল অশোক।...

সেদিন সন্ধ্যার সময় যতবার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে—তাকিয়ে দেখছে অশোক যাত্রীদের দিকে। না—তার অনুমান ভুল নয়, সাড়ে আটটা বরাবর ওদের বাস্ যখন ল্যান্সডাউনের মোড় অতিক্রম করছে তখনই দেখতে পেয়েছে সে, একটু দূরে স্ট্যাণ্ডের কাছে আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—শাদা শাড়ি ও মেরুন রঙের সিল্কের ব্লাউজ তার পরনে। ভালো দেখা যায় না—তবু চিনতে পারে সে। মেয়েটিও খুব সহজ ভাবে কোনো দিকে না তাকিয়ে বাসে এসে ওঠে।

গড়িয়াহাটে এসে থামতে অশোক আর বিরক্তি চাপতে পারে না। বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'কৈ, নামলেন না?'

'নামব ব'লে তো উঠি নি।' বেশ আরাম ক'রে পা দুটো সামনে ছড়িয়ে বসে দীপ্তি, 'আজ সামনে দু'খানা গাড়ি আছে। অনেক সময় পাব।'

ড্রাইভার হারানদা নেমে যেতে যেতে বলে, 'আলো জ্বালাই রইল অশোক, তোর তো দেরি হবে!'

ওপরের কণ্ডাক্টর হিসেব মিলাবে ব'লে আসছিল, দীপ্তিকে দেখে মুচ্‌কি হেসে সামনের বাসে গিয়ে ব'সে ক্যাশ গুনতে লাগল। দৃষ্টিটা কিন্তু এদিকে।

অশোকের কান মাথা গরম হয়ে উঠল। সে-ও নেমে পড়বার উপক্রম করলে।

'ওকি, চললেন কোথায় ?' বেশ সহজ সুরেই বলে দীপ্তি।

'ওদিকে যাচ্ছি, বিনয়দার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

'বা-রে! আমি বুঝি একা থাকব ?'

'সে আপনার খুশি। আমি কী করব বলুন ?'

'বসুন দিকি লক্ষ্মী হয়ে। ঐখানে ব'সেই টাকা গুনুন।' আদেশের ভঙ্গি ওর।

হতাশ হয়ে ব'সে পড়ে অশোক, 'এ কী শুরু করেছেন বলুন তো!...আমার বাসেই ওঠেন কেন বেছে বেছে,—এরা যে এখনই হাসাহাসি শুরু করেছে!'

'করুক না। তরুণ ছেলের পক্ষে তো এ দুর্নাম গৌরবের!'

'গরিবের ছেলের পক্ষে নয়।' একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে অশোক।

দীপ্তি কিন্তু অপ্রস্তুত হ'ল না, সে-ও সমান তেজের সঙ্গেই জবাব দিলে, 'বয়স যাদের অল্প তাদের জীবনকে টাকার হিসেবে মাপা যায় না।'

'অল্প বয়সের সে তেজ ততক্ষণই ভালো মানায়, যতক্ষণ না পেটের প্রশ্ন ওঠে। ক্ষুধার কাছে কিছুই বড় নয়।'

'এখানে সে প্রশ্ন উঠছে কি ? পেটের জন্য পরিশ্রম যারা করে, তাদের কি আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভদ্র হওয়া সম্ভব নয় ?' দীপ্তির কণ্ঠস্বরে অনুযোগ ফুটে ওঠে।

অশোক অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে। যদিচ নিজেই অনুভব করে যে, অপ্রস্তুত হবার তার কোনো কারণ নেই। সে কিছুই অন্যায় করে নি। সত্যিই—ধনীর সন্তানের পক্ষে যা কৌতুক তাদের কাছে তা মারাত্মক। তাদের জীবনে এ স্মরণীয় বিলাসের অবসর নেই। বাজে খরচ করার মত এত সময় তাদের নেই। কিন্তু, তবু কিছুই যেন বলতে পারে না। দীপ্তির মত মেয়ের সঙ্গে সমানে তর্ক করার মত দুঃসাহস তার নেই। তার অবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা, পদবী—কোনোটাই ওর সমান নয়। এইখানেই ওর জিত!

সে চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে দেখে দীপ্তি বললে, 'কৈ আপনি হিসেব মিলোবেন না ?'

'পরে মিলোব! সংক্ষেপে উত্তর দেয় অশোক।

'আচ্ছা, আচ্ছা। আমি নেমে যাচ্ছি।' দীপ্তি ওঠবার ভঙ্গি করে।

'না, না—বসুন না।' আকস্মিক আকুল আমন্ত্রণ বেরিয়ে আসে অশোকের কণ্ঠ থেকে—নিজের অজ্ঞাতসারেই।

'কী দরকার আপনার কাজের ক্ষতি ক'রে!' সূক্ষ্ম অভিমান ওর গলার আওয়াজে।

'না, না—কাজ সারছি আমি।'

'আচ্ছা, কালও কি আপনার ইভনিং ডিউটি?'

'না, কাল মর্নিং। রাত চারটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে লেকে এসে গাড়ি ধরতে হবে। পাক্কা তিন মাইল হাঁটা।'

'তারপর? ফিরবেন কখন?'

'বাড়ি পৌঁছতে আড়াইটে তিনটে। তাও যদি একটু দেরি হয়ে যায়, ফার্স্ট কার না পাই তো আরও দেরি।'

'যাক্‌গে—তাহ'লে বিকেলে তো ছুটি আছে। কাল সন্ধ্যেয় ছ'টার সময় দেশপ্রিয় পার্কের গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকবে। ঠিক আসবেন কিন্তু!'

বিস্মিত অশোক প্রশ্ন-প্রতিবাদ মিলিয়ে কী একটা বলতে গেল, দীপ্তি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, নেমে যাবার সময় ব'লে গেল, 'দু'জনে একটু বেড়াতে যাব। তাতে আর ক্ষতি কী? সে তো আপনাব কাজের সময়ের বাইরে।'

উত্তর বা প্রতিবাদের অপেক্ষা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে সামনের বাসে উঠল।

না গিয়ে পারলে না অশোক। অমোঘ, অপ্রতিহত আকর্ষণ, নানা প্রশ্ন জাগে মনে—দীপ্তির এ খেয়ালের অর্থ কী? কী খেলা খেলতে চায় সে ওকে নিয়ে? সংশয় ও উদ্বেগে ওর মন কণ্টকিত হয়ে যায়—তবু নিজেকে সে খেলার বাইরে রাখতে পারে না—পারে না সাবধান হ'তে।

ঠিক ছ'টায় পৌঁছে ও দেখলে দীপ্তি দাঁড়িয়ে আছে। দীপ্তি একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিল, অশোক বেঁকে দাঁড়াল। বেড়াতে যেতে হয় তো সে তার সাধ্যমত যানবাহনেই যাবে। ট্যাক্সিভাড়া দিতেও পারবে না—দীপ্তিকেও দিতে দেবে না।

অগত্যা দীপ্তি ট্রামে চড়ে। বসে পাশাপাশি। যৌবন-তপ্ত দেহের সামান্য স্পর্শ পায় অশোক। সে স্পর্শ স্যাম্পেনের নেশার মত মাথায় চড়ে একটু একটু ক'রে। কথার ফাঁকে যেন অন্যমনস্কভাবেই আতপ্ত কোমল হাত একখানা বার-বার এসে পড়ে ওর হাতের মধ্যে। অশোক একসময় চরম সাহসে ভর ক'রে সে হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে। ফিরিয়ে নেয় না দীপ্তি। তবু অশোকের

নিজের লজ্জা করে। সামান্য ধুতি ও শার্ট—নিজের যা বেশভূষা! তার পাশে দীপ্তির শাদা জর্জেটের শাড়ি, নিতান্তই বেমানান!

গঙ্গার ধারে দোতলার ভাসন্ত রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে দু'জনে—সামনা-সামনি। ওদের পাশেই গঙ্গা—এই হোটেলের আলো তার জলে নাচছে। দূরে বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে—তাদের বিজলী আলোর পাশাপাশি অসংখ্য ডিঙ্গি নৌকোর হ্যারিকেন থেকে আলো এসে পড়ছে ওদের আলোর পাশে। হু-হু ক'রে হাওয়া বইছে, সজল মিষ্টি হাওয়া। তাতে দীপ্তির চুল উড়ছে—উড়ছে অশোকের ললাটের চুল। দৃষ্টি হয়ে এসেছে মদির। খাবার সামনে প'ড়ে ঠাণ্ডা হয়, চা জল হয়ে যায়—ওরা তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। লজ্জিত ও সচেতন হয়ে চোখ সরিয়ে নেয়—লম্বা বারান্দার অন্য অধিবাসীদের ওপর থেকে দৃষ্টিহীন সে চোখ ফিরে এসে আবার পরস্পরের সঙ্গে মেলে। একটু ক্ষীণ হাসি হাসে দু'জনেই; অপ্রতিভের হাসি। অনেকরাত্রে দু'জনেই নিঃশব্দেই বাড়ি ফেরে। হঠাৎ যেন দু'জনেরই কথার উৎস গেছে ফুরিয়ে।

এরপর থেকে সাক্ষাৎ ঘটে নিয়মিত সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—নিজেদের কাজের ফাঁকে সুযোগটা মিলিয়ে নেয়। জানাজানি একটু হয়—হাসাহাসিও। কিন্তু ক্রমশ অশোকও হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এমন কি এক-একদিন ওর বাসে চেপে গড়িয়াহাট আসে দীপ্তি—আবার হয়তো ফিরে যায় শ্যামবাজার পর্যন্ত। কাজের মধ্যেই হয়তো মুহূর্তের জন্য চোখে চোখ মেলে—তা-ই লাভ!

মাস দুই আগে দীপ্তিই প্রস্তাব করলে, 'এস, আমরা বিয়ে করি।'

চম্‌কে ওঠে অশোক। ধক্ ধক্ করে বুকের মধ্যে, শুকনো মুখে বলে, 'পাগল নাকি! তুমি লাহিড়ী, আমি মণ্ডল। তোমার বাবা কী বলবেন?'

'রেজেস্ট্রি ক'রে বিয়ে হবে। আমার বয়স একুশ হয়ে গেছে তা জানো? অন্তত ইউনিভার্সিটি এজ্। বাবার মত না নিলেও চলবে।'

'আমার বাড়িতে আপত্তি করবে। বাপের অমতে মেয়েকে ঘরে আনা—।'

'আমরা দু'জনেই তো কূলের নোঙর ছিঁড়ে অকূলে ভাসছি। কী হবে বাড়ির কথা ভেবে!'

'তোমাকে খাওয়াব কী? মাইনে যা পাই তাতে ক'দিন চলবে?'

'যেমন ক'রে হোক চালাব। আমি রান্না করব, আমি বাসন মাজব। তোমার জন্যে করছি মনে হ'লে কোনো কাজই আমার আটকাবে না। না, তুমি হেসো না—ঠিক পারব।'

হাসে না অশোক, গম্ভীর হয়েই যায় বরং। এ সম্ভাবনা কখনও ভাবে নি। দু'দিনের খেলা ভেবে স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। শুধু সংযত রেখেছিল খেলাটাকে মানসিক সীমার মধ্যেই।

বলে, 'বাড়িতে তো কিছু দিতে হবে আমাকে?'

'কেন?' তীব্রকণ্ঠে বলে দীপ্তি, 'তোমার দাদা আর ভাই দু'জনেই রোজগার করছেন। তুমি আর কত স্যাক্রিফাইস্ করবে? এবার না হয় নিজের দিকেই তাকালে। নিজের নীড় বাঁধবার দিকে মন দাও। আর নিতান্ত না চালাতে পার, আমি তো লেখাপড়া শিখেছি—বি. এ. পাসও করেছি, আমি পারব না একটা চাকরি জোটাতে?'

ইচ্ছার অগ্নিতে প্রলোভনের ঘৃতাহুতি পড়ে। প্রত্যহ একই কথা বলে দীপ্তি। ভবিষ্যতের সোনার ছবি আঁকে। দীপ্তির মত মেয়ে তাকে রেঁধে খাওয়াবে, তার সেবা করবে? সে কি সম্ভব? ঐ দুর্লভ তনুলতা তারই শয্যায় পাশে শুয়ে থাকবে? তার সামান্য শয্যায়? এ যে কল্পনাতীত সৌভাগ্য!

তবু সে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। দারিদ্র্যের ছবিকে যতটা সম্ভব বাস্তবের তুলিতে ভয়াবহ ক'রে তোলে। বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এ বিবাহে ওরা কেউ-ই সম্ভবত সুখী হ'তে পারবে না। কিন্তু, দীপ্তি যেন কোনো কথাই শুনতে চায় না।

অবশেষে একদিন বেলা দুটোর সময় ডিপোতে রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখে দীপ্তি দাঁড়িয়ে আছে।

সোজা কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি চিরকালের মত। ভেবে দেখলুম ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে আর কোনোদিনই তোমাকে রাজি করানো যাবে না। আজ আর ডিউটিতে গিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘর খোঁজগে। সন্ধ্যের মধ্যে ঘরকন্না পাততে হবে। যাও, যাও—আর দাঁড়িয়ো না।'

নিমেষে ঘেমে ওঠে অশোক, 'কিন্তু বিয়ে—'

'সে তো নোটিস না কী দিতে হয়। সে কাল দুপুরে গিয়ে জেনে নেব'খন্। তুমি দু'দিন ছুটি নেবে। এখন আগে তো ঘর খুঁজে বের কর। পথে পথে কতক্ষণ ঘুরব?'

তবু অশোক ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কী পাগলামি করছ দীপ্তি, ঘরে ফিরে যাও। এভাবে হবে না। সবটাই খেয়াল নয়। তাছাড়া, ঘর কোথায় পাব এত তাড়া-

তাড়ি ? পয়সা-কড়িও তেমন হাতে নেই।'

দীপ্তি ব্যাগ খুলে চল্লিশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই টাকাটা হাতে ছিল, নিয়ে এসেছি। আপাতত একটা ঘর দেখগে। চিঠি লিখে রেখে ঘর থেকে বেরিয়েছি, সে চিঠি এতক্ষণে ওঁরা হয়তো পেয়েছেন। আর ফেরা যায় না। এখন যদি তুমি গ্রহণ না কর আমাকে তো, আজই আত্মহত্যা করতে হবে।'

এরপর তরুণ ছেলে আর কী করতে পারে ?

সারাদিন ঘুরে শোভাবাজারের দিকে এক বস্তিতে একখানা ঘর পাওয়া গেল। মেঝে দেওয়াল পাকা, খোলার চাল। তাই বারো টাকা ভাড়া—দু'মাসের ভাড়া অগ্রিম।

সামান্য বিছানা, ঘরকন্নার সামান্য দু'একটা তৈজসপত্র—দীপ্তির জন্য একসেট শাড়ি সায়া ইত্যাদি কিনে রেখে যখন দীপ্তির খোঁজে গঙ্গার ধারে এল তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

অশোক বললে, 'এখনও ভেবে ছাখ দীপ্তি।'

ওর হাত ধ'রে ওর ওপরেই নিজের ভার যেন এলিয়ে দিয়ে দীপ্তি বললে, 'অনেক ভেবেছি, আর নয়। আজ থেকে তুমি ভাববে! চল আমাদের বাড়ি যাই।'

অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি পেরিয়ে সেই স্যাঁৎসেঁতে দুর্গন্ধময় বস্তির মধ্যে প'ড়ে অবশেষে যখন ওদের ঘরের তালা খুলে অশোক বললে, 'এস', তখন কিন্তু দীপ্তি থম্‌কে দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ। এই প্রথম সে বাস্তবের সামনে দাঁড়াল—মুখোমুখি।

ঘরে হ্যারিকেনের আলো জেলে রেখেই বেরিয়েছিল অশোক। সস্তা দামের দেশী হ্যারিকেন। তার একদিকের পল্‌তেতে কালি প'ড়ে ইতিমধ্যেই মলিন আলো মলিনতর হয়ে এসেছে—কেরোসিনের গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল ঘরের অপর্যাপ্ত আসবাব। দু'-একটা অ্যালুমিনিয়ম আর এনামেলের বাসন, আমকাঠের চৌকিতে একটা পাতলা বিছানা, জলের বালতি, মগ—বিছানার ওপরই শাড়ি সায়াগুলো প'ড়ে আছে।

'কৈ, এস। ভয় পাচ্ছে নাকি ?'

দীপ্তি এসে ক্লান্তভাবে বিছানাটায় ব'সে প'ড়ে বললে, 'এই ঘর তুমি খুঁজে

বার করলে! পাকাবাড়িতে ঘর পেলে না?'

'সে কি আজকালকার দিনে অত সহজ! চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা ঘরের ভাড়া, সেলামী অ্যাড্‌ভান্স! তাও জামিন চায়। অপরিচিত লোককে কেউ ভরসা ক'রে এক কথায় বাড়ি ভাড়া দেয়? এই তাই দু'-মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে। তোমার চল্লিশ ছাড়া আরও চল্লিশ ধার করেছিলুম, সব খতম।'

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে ব'সে থেকে দীপ্তি আবারও প্রশ্ন করলে, 'বাথরুম নেই বোধ হয়?'

'বাথরুম? বস্তিতে! কলই নেই। রাস্তার কল থেকে ঝিকে দিয়ে জল আনাতে হবে, এই ভিতরের রকে ব'সে কাজ সেরো। ঝি যতদিন না পাই—আমিই জল তুলে দেব।'

কাঠ হয়ে যায় যেন দীপ্তি। ভেতরের দিকে অসংখ্য আরও ঘর—তাতে অগণিত ভাড়াটে। রান্নার গন্ধে ধোঁয়ায় ও নানাবিধ দুর্গন্ধে বাতাস যেন ভারী। কোলাহলও কম নয়। একটু পরে বলে, তুমি কাল-পরশুর মধ্যে একটা ভদ্র বাড়িতে ঘর দেখে নাও। হারটা তো আছে গলায়, বিক্রি ক'রে অ্যাড্‌ভান্স দেব। খাই না খাই—থাকাটার জন্য ভদ্র পরিবেশ দরকার।'

'কিন্তু, সে যে অনেক টাকা দীপু। তারপর খরচ জোগাব কোথা থেকে?'

'সে আমিই ব্যবস্থা ক'রে নেব।'

'আচ্ছা সে হবে। এখন ঐ বালতিতে জল আছে, তাকে সাবান স্নো সব আছে। তুমি একটু সুস্থ হও—আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি। এখন তো আর রান্না সম্ভব নয়।'

সেদিন রাত্রে দু'জনে পাশাপাশিই শুল। কিন্তু, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা কেউ-ই করলে না। বিয়ে এখনও হয় নি ব'লে অশোকের সঙ্কোচ। আর দীপ্তি? সে বোধ হয় ঠিক এ স্বপ্ন দেখে নি। তার মন অসাড় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। ধনীর মেয়ে, খেয়াল হওয়া মাত্র মেটাতে সে অভ্যস্ত—অশোককে পাবার খেয়ালে বাধা পড়াতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছিল, কিন্তু তাই ব'লে—! সব ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকা দরকার।

পরের দিনও রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হ'ল না। সারা সকাল ঘর খুঁজে বেড়াল অশোক। দু'-তিনটে সন্ধান পাওয়া গেল এই মাত্র। একটায় ডিউটি—অশোক বললে, 'মিছিমিছি কামাই ক'রে লাভ কী? এখানে যখন ঘরকন্না পাতবেই না তখন ভালো ঘর পেলেই ছুটি নেব। বিয়ে-থার ব্যাপারও আছে—তখন ছুটি

নেওয়াই ভালো।'

সে ডিউটিতে চ'লে গেল।

দীপ্তি স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সেই নিরানন্দ বুকচাপা ঘরে একা। এতক্ষণে বাড়ি থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। তাই রাস্তায় বেরুতে ভরসা হ'ল না।

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছিল ঠিকই! যাঁর টাকা আছে তাঁর এসব ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও আছে। খুঁজতে খুঁজতে বাসের গুম্‌টিতে এসে খবর মিলল—মেয়েটির সঙ্গে বর্ণনাতেও মিলে গেল। অশোক মণ্ডল! মিঃ লাহিড়ী ছুটে গেলেন ওদের বাড়িতে—শুনলেন সেখানেও সে অনুপস্থিত, সেদিন ডিউটিতে আসে নি। দুই আর দুইয়ে যে চার হয়, সে বিষয়ে মিঃ লাহিড়ী নিঃসন্দেহ হলেন।

কিন্তু, গেল কোথায়? পুলিশই পরামর্শ দিলে চুপ ক'রে থাকতে। ডিউটিতে এলেই জানা যাবে। ডিউটি শেষ হ'লে পিছু নেওয়া কিছু শক্ত নয়। মিঃ লাহিড়ী কথাটা বুঝলেন।

গভীর রাত্রে অশোক এসে দোরে ধাক্কা দিতে দীপ্তি নিঃশব্দে এসে দোর খুলে দিলে। অভ্যর্থনার একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না। হ্যারিকেনটা সকালে মোছা হয় নি, দীপ্তি জানে না মুছতে। পাশের ঘরের কাকে ডেকে শুধু জ্বালিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু, কালিতে কালিতে এখন সে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু তারই ক্ষীণ আলোতে অশোক বুঝতে পারলে দীপ্তি বহুক্ষণ ধ'রেই কাঁদছিল। সমস্ত মনটা তারও বিরক্তিতে ভ'রে গেল। সে একটু রূঢ় কণ্ঠেই বললে, 'এ আমি আগেই জানতুম—তাই সহজে রাজি হই নি। খেলা তো ঢের হয়েছে, এবার আর কি, ধনী-দুহিতা ঘরে ফিরে যাও। আমারই শুধু ইহকাল পরকাল মাটি হয়ে গেল, কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

ফলে দীপ্তির কান্না বেড়েই গেল। এই অপ্রিয় এবং অরুচিকর নাটক কতক্ষণ চলত তা জানি না—কিন্তু, ঠিক এই সময়ই মিঃ লাহিড়ী এসে প্রবেশ করলেন সদলবলে—আরও নাটকীয় ভাবে।……

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। অশোক আজও তা বলতে পারলে না ভালো ক'রে—সে নিদারুণ অপমানের কাহিনী। গলা বুজে আসতে লাগল বারবার।

দীপ্তি ছুটে এসে পড়েছিল বাবার পায়ে তা মনে আছে। বোধ হয় ক্ষমাও চেয়েছিল। বলেছিল, 'আমাকে বাঁচাও বাবা—এখানে আর একদিন থাকলে মরে যাব আমি!'

মিঃ লাহিড়ীর কটূক্তি ও অপমানকর বাক্যবাণ অনুমেয়। তিনি অশোককে ধ'রে হাজতে নিয়ে যাবার জন্যই জেদ করেছিলেন, শুধু সঙ্গের পুলিশ-কর্মচারী যখন মনে করিয়ে দিলেন, তাতে কেলেঙ্কারিটা বেশ ক'রে ছড়িয়ে পড়বে এবং অশোকের সহকর্মীদের কাছে যতদূর শোনা গেছে তাতে মিঃ লাহিড়ীর কন্যার আগ্রহই বেশী ছিল—সে ক্ষেত্রে অশোকের শাস্তি হবার কোনো কারণ নেই। তখন অগত্যা তিনি নিরস্ত হলেন। আবার প্রচুর কটূক্তি ক'রে নানারকম ভাবে শাসিয়ে কন্যাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। অশোকের ভাগ্যে প'ড়ে রইল সেই প্রায়-অন্ধকার ঘর এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ।……

কাহিনী শেষ ক'রে এই বয়সেও হু হু ক'রে কেঁদে ফেললে অশোক।

আমি অনেক ক'রে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। সে তো খেলাতেই এসেছিল, ভালোবেসে তো আসে নি। অশোক তো তা আগেই বুঝেছিল, সতর্ক হ'তেও চেয়েছিল। পারে নি সেটা নিতান্ত বয়সের দোষ। ঐ বয়সে বুঝি পারা যায়ও না। তবু যখন সে এ কথা জানে যে, দীপ্তি তাকে কোনোদিনই ভালোবাসে নি, ভালোবাসতও না, তখন আর দুঃখ ক'রে লাভ কী? এ বরং ভালোই হ'ল—যদি সত্যি-সত্যিই ঐ মেয়ের সঙ্গে তার আগে বিয়ে হয়ে যেত, এই স্বপ্নভঙ্গের আগে, আরও সাংঘাতিক অবস্থা হ'ত অশোকের। সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে, আরও বেশী ক্ষতি যে হয় নি—এই জন্যেই তার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অনেক বোঝালুম, অনেক আশা দিলুম। পরামর্শ দিলুম ও-বাসা এবং তার স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে। মা ভাই কিছুই মনে রাখবেন না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সহকর্মীদের মধ্যে যারা জানত তাদের টিটকারিও এ ক'দিন সহ্য ক'রে যখন প্রায় ভুলিয়ে এনেছে—তখন আত্মীয়দের সামনে যেতে ভয় কী? 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিয়ার আপ!' পিঠ চাপ্‌ড়ে শেষ সান্ত্বনা দিই।

পাথরের মূর্তির মত ব'সে ব'সে সব শুনছিল অশোক। এবার আস্তে আস্তে কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত বললে, 'কিন্তু আমি—আমি যে এতদিনে তাকে

ভালোবেসে ফেলেছি! তাকে হারিয়ে আমার জীবনের যে আর কোনো অর্থ-ই খুঁজে পাচ্ছি না। এমন ভাবে কী ক'রে বাঁচব বলতে পারেন?'

এইবার আমিও স্তব্ধ হয়ে গেলুম!

## অনর্থক

গরমের ছুটির আগে থেকেই কথাটা চলছিল। কথায় কথায় যারা শিলং কি দার্জিলিং-এর গল্প করতে পারে তেমন 'শাহান শা' ধরনের কেউ আমাদের দলে ছিল না—সুতরাং, অমুকের বাগান-বাড়ি কি অমুকের দেশ—এই প্ল্যান করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায়ও ছিল না।

একটি মাত্র ধনীসন্তান আমাদের দলে আড্ডা দিত, সে হচ্ছে আমাদের ঠাকুরদা, মৈনাক দত্তের নাতির নাতি, মলয় দত্ত। অবশ্য ওদেরও এখন পড়তি দশা, আগেকার বোল-বোলাও আর নেই, তবু 'যাতে যাতে ভি রহ্ যাতা'—আমাদের চেয়ে ঢের ভালো অবস্থা। ট্রামে বাসে ক'রেই কলেজে আসত, কিন্তু প্রতিদিন আমাদের চা খাওয়াতে খরচ হয়ে যেত দু'তিন টাকা। ইদানীং আমরা তার আমন্ত্রণেরও অপেক্ষা করতুম না। চা ইত্যাদি খেয়ে ক্যানটিনের ছেলেটাকে ব'লে আসতুম—'ঠাকুরদা দেবে।' কলেজের শেষে যখন বিল আসত তখন বেচারী এক-একদিন বেশ বিপন্ন মুখেই বলত—'করেছিস কী রে—তিনটাকা ছ' আনা শুধু চায়ের বিল! না, না—এমন করিস নি। ফেল হয়ে যাব!' তারপর হয়তো দুটো টাকা পকেট থেকে বার ক'রে দিয়ে বলতো, 'এইনে বাবা এখন দুটো টাকা, বাকিটা কাল দেব!' ক্যান্‌টিনের বয়টা খুশী নিয়ে যেত।

ভারি দিলখোলা লোক ছিল ঠাকুরদা। এক-একদিন সব খরচ ক'রে যাবার সময় ছ'টা পয়সা ট্রামভাড়া আমাদের কারুর কাছ থেকে ধার ক'রে নিয়ে যেত।

বিরাট দেহ ছিল। পাহাড়ের মত—লম্বা চওড়া। আমরা ঠাট্টা ক'রে বলতুম—মলয়, না হিমালয়! মৈনাকের নাতি নয়—মৈনাকের বাপ! বয়সও একটু বেশী আমাদের চেয়ে, তাই ঠাকুরদা নামটা সবদিক দিয়েই খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন ঠাকুরদাই কথাটা তুললে, 'যাবি মৈনাক দত্তের বাগান-বাড়িতে একদিন? চ'না, বেশ ফিস্ট ক'রে আসা যাবে। এইতো কাছেই, কলকাতা থেকে মাইল-আষ্টেকের মধ্যে!'

শশধর বললে, 'রেখে দে বাবা তোর মৈনাক দত্তের বাগানবাড়ি। ও আমি বাস্‌-এ ক'রে যেতে যেতে অনেকদিন দেখেছি—পোড়ো বাগানবাড়ি—ভূতের বাসা!'

ঠাকুরদা গরম হয়ে উঠে বললে, 'পোড়ো বাগানবাড়ি! ইস্‌! জানিস এখনও তিনটে মালী আছে মাইনে করা।'

মনীশ বললে, 'অতবড় বাড়িতে তিনটে মালী কী হবে বাবা? আর, বাড়িটা তো বোধ হয় ভেঙ্গে প'ড়ে যাবে এইবার, কতকাল মেরামত হয় নি।'

এবার একটু আহত হ'ল ঠাকুরদা, বললে, 'নারে না—ভেতরটা বেশ ভালোই আছে, in good repair, বাইরেটায় অবশ্য হাত দেওয়া যায় নি। দিলে অন্তত দশটি হাজার টাকা খরচা। বাইশটা শরিক আমরা—জানিস তো? আমার বাবারা খুড়তুতো জাঠতুতো ধ'রে বাইশ ভাই! কে ঘাড় পাতবে বল্‌?'

আমি তখন কথাটা চাপা দিয়ে দিলুম, 'তা বেশ তো, যেতেই হয় তো সামার-ভেকেশনে যাব। বরং দুটো তিনটে দিন থাকব। গঙ্গার ধারে তো—অত গরম হবে না।'

ঠাকুরদা খুশী হয়ে বললে, 'সে বেশ তো। আমি বাবাকে ব'লে একটা রাঁধুনী আর একটা চাকরের ব্যবস্থা করব। কোনো অসুবিধা হবে না। বাসনকোসন, কাঁচের বাসন, সবই তো ওখানে আছে!'

সুনীল ফোড়ন কাটলে, 'তা আর নেই! তোমার পূর্বপুরুষরা ইত্যাদি নিয়ে যখন বাগানবাড়িতে নিয়মিত যেতেন—তখন সবই তো লাগত! সেই সব remnants প'ড়ে আছে আর কি!'

ঠাকুরদার মুখটা রাঙ্গা হয়ে উঠল।

গরমের ছুটির আগের দিনটিতে কথা উঠল আবার।

ঠাকুরদা বললে, 'কী রে তাহ'লে কবে যাবি তোরা?'

'কোথায় রে?' অনেকে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। তারা একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলে।

'বাঃ—ভুলে ব'সে আছিস এরি মধ্যে ? সেই আমাদের বাগানবাড়ি ?'

কথাটা মনে পড়ল। তখনই 'লন্'-এ গোল হয়ে ব'সে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। স্নীলের দেখলুম যাবার তত ইচ্ছা নেই, ওর বাবা আবার ওকে কোথাও ছাড়তে চান না। কিন্তু, আমাদের মিলিত ইচ্ছার সামনে ঘাড় পাততে হ'ল স্থির হ'ল যে, ৫ই জুন আমরা ওখানে যাব এবং তিনদিন থাকব। ঠাকুরদা গাড়ির ব্যবস্থা করবে—ঐদিন সকালে আমরা কলেজের গেটেই অপেক্ষা করব।

অতগুলি ছেলে—জড়ো হওয়া বড় সহজ কথা নয়। অবশেষে একসময় যখন সত্যিই রওনা হলুম তখন দশটা বেজে গেছে—শেষ জ্যৈষ্ঠের আকাশ থেকে আগুন ঝ'রে পড়ছে। অত গরমে ওখানে যাওয়া—ইলেকট্রিক নেই, পাখা নেই—অনেকেরই মন দমে গিয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত যখন বাগানের ভেতরে গিয়ে গাড়ি থামল তখন মন্দ লাগল না। গাছের ছায়া, ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া—গঙ্গা কাছেই তো—শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

বাড়িটাও বেশ। বাইরে থেকে যতটা পুরানো দেখায়—আসলে তত পুরানো নয়। ভেতরটা খুব সম্প্রতিই বোধ হয় মেরামত হয়েছে—বেশ ঝক্ঝকে পরিষ্কার।

প্রকাণ্ড বাড়ি। গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই মস্তবড় হল্ বিলিতী কায়দায় হল্ থেকেই বিরাট চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে—ওপরের বারান্দায়—তু'দিকে সেই বারান্দা ধ'রেই অসংখ্য ঘরের সার! সব ঘরেই খাট আর গদির ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া পুরানো কার্পেট, গদি-আঁটা চেয়ার, টানা-পাখা, ঝাড়ের আলো—কিছুরই অভাব নেই—তবে সবগুলিই একটু পুরানো আর অল্প পরিমাণে ধূলিমলিন। কিন্তু, কীই বা করা যাবে ?

আমাদের ভালোই লাগল মোটামুটি। ওপরেই সামনের তুটো ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঠাকুর-চাকর আগেই এসে গিয়েছিল নামা-মাত্র শরবতের গ্লাসে ট্রে সাজিয়ে এনে চাকর দাঁড়াল। হ্যাঁ—রাজকীয় আতিথেয়তার কিছু এখনও আছে তাহ'লে!

আমরা সবাই মিলে শরবত পান শেষ ক'রে হৈ-হল্লা করতে করতে ওপরে উঠলুম। সিঁড়িটা এসে ওপরের বারান্দায় যেখানে পড়েছে—সেটাও বেশ চওড়া হলের মত—সেখানে পৌছে হঠাৎ সবাই থম্কে দাঁড়িয়ে গেলুম। সামনেই সাবেকী আমলের প্রকাণ্ড এক অয়েল-পেন্টিং—লাইফ-সাইজ নয়, তার চেয়েও অনেক বড়। চোগাচাপকান-পরা বিরাট এক ভদ্রলোক ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে চেয়ে

আছেন সোজা আমাদের দিকে। যেন আমাদের ধৃষ্টতায় তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন!

সবাই যেন কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছি। ঠাকুরদা ভারী মানুষ, পিছু পিছু আসছিল, সে এইবার তাড়াতাড়ি সামনে এসে বললে—'ইনিই মৈনাক দত্ত—আমাদের পূর্বপুরুষ।'

'ও, তাই নাকি!' কে যেন বললে, 'আমাদের জ্যোতিষের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য আছে, না?'

আরে! তাই তো!

এতক্ষণ তো এটা আমাদের নজরে পড়ে নি।

সত্যিই। জ্যোতিষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে একটু। জ্যোতিষও অমনি লম্বা-চওড়া—অমনি বড় বড় ডাগর চোখ, প্রশস্ত ললাট। চশমাটা বাদ দিলে বেশ একটু মিল পাওয়া যায় সত্যিই! জ্যোতিষের অমনি ভুরু কুঁচকে চাওয়া অভ্যাস আছে।

যাই হোক—আবার আমরা হৈ চৈ করতে করতে ওপরে উঠে গেলুম। তারপর স্নানাহার এবং আড্ডার মধ্যে কথাটা ভুলেই গেলুম।

পরামর্শটা দিলে মনীশ।

ঠাকুরদা তখন কী একটা কাজে নিচে গেছে: আমরা ব'সে চা খাচ্ছি বিকেলের দিকে, হঠাৎ গলাটা নামিয়ে মনীশ বললে, 'এই, ঠাকুরদাকে একটু ভয় দেখাবি?'

'কী ক'রে রে, কী ক'রে?'

উৎসাহে সকলেরই চোখ জ্বলে উঠেছে।

'আমাদের জ্যোতিষকে যদি মৈনাক দত্ত সাজানো যায়? অমনি পোশাক-টোশাক প'রে, ধর যদি রাত দশটার সময় নিঃশব্দে নামে সিঁড়ি দিয়ে, আবছা অন্ধকার তো—আর সেই সময় যদি কোনো একটা ছুতোয় ঠাকুরদাকে ঐ নিচের হলে এনে দাঁড় করানো যায়—ব্যাপারটা কী রকম হবে বুঝতে পারছিস?'

'ফাইন, ফাইন! মার্ভলাস্!' সবাই চেঁচিয়ে উঠি।

'কিন্তু, সাজপোশাক?'

সুনীল আশ্বাস দেয়, 'আমাদের বাড়িতে এ সব আছে। আমাদেরও তো খুব পুরানো ফ্যামিলি। বাবাকে লুকিয়ে একদিনের জন্যে বার ক'রে আনতে হবে।'

জ্যোতিষের থিয়েটার করা অভ্যাস আছে। সে তেতে উঠল, 'অমনি মেক্-আপের দু'একটা জিনিস, আনতে পারবি তো ?'

'খুব, খুব !'

ঠিক হ'ল পরের দিন দুপুরে কোনো এক ছুতোয় স্থনীল বাস্-এ ক'রে কলকাতায় যাবে এবং মালপত্র নিয়ে সন্ধ্যের পর কোনো এক ফাঁকে ঢুকে পড়বে। তারপর একেবারে ঐ কোণের ঘরটাতে সব থাকবে ঠিক করা, জ্যোতিষ সময় মত গিয়ে সেজে নেবে।

আনন্দে উত্তেজনায় আমাদের বুক কাঁপতে লাগল।

পরের দিন প্ল্যানমতই কাজ এগোল ঠিক ঠিক।

সাড়ে সাতটার ভেতর স্থনীল ফিরে এল। পোশাক যা এনেছে—একেবারে হুবহু মৈনাক দত্তের মত। মায় ঘড়ির মোটা গার্ডচেনটা পর্যন্ত ভুল হয় নি ওর। মেক্-আপের কিছু কিছু সাজ-সরঞ্জামও এসে গেছে।

ঠাকুরদা ওকে বাইরে থেকে আসতে দেখে অবাক হ'ল না। কারণ, আমরা আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে, বাপের আদুরে ছেলে স্থনীল বাবাকে দেখা দিতে গেছে একবার। এই শর্তেই নাকি ও এসেছিল।

খুব ঠাট্টা করতে লাগল ঠাকুরদা, 'যা যা কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খেগে যা—আদুরে খোকা !'

আগেকার শেখানো-পড়ানো মত রাত আটটার সময় জ্যোতিষ হঠাৎ ব'লে বসল, 'তোরা গল্প কর্, আমি ভাই একটু চট্ ক'রে ঘুরে আসছি !'

'সে কী রে কোথায় যাবি ?' আমরা যেন অবাক—এমন ভাব দেখালুম।

'এই কাছেই মাইল-খানেকের মধ্যে আমার মাসির বাড়ি। বহুকাল আসা হয় নি। চট্ ক'রে ঘুরে আসছি।'

আমরা বাধা দিলুম খুব। ঠাকুরদা রাগ করতে লাগল। 'তোরা বড় বেরসিক। দুপুরে স্থনীলটা কোথা ডুব মারল, এখন আবার জ্যোতিষটা—এমন করলে আড্ডা জমে না।'

'এই যাব আর আসব।' জ্যোতিষ পীড়াপীড়ি করে।

আরও খানিকটা পরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে দেওয়া হ'ল জ্যোতিষকে। সাড়ে আটটার পর জ্যোতিষ রওনা হ'ল। এসবই আমাদের গড়াপেটা ছিল, জ্যোতিষ আমাদের দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কাছেই কোথাও অপেক্ষা করবে—

তারপর পথ খোলা পেলেই একসময় এসে নিঃশব্দে উঠে যাবে কোণের সেই ঘরে। সেখানে মোমবাতি দেশলাই আয়না—সব প্রস্তুত আছে। জ্যোতিষের পকেটে টর্চও আছে।

জ্যোতিষ চ'লে যেতেই আমরা ধরলুম, 'চল ঠাকুরদা গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাই—'

'চল।' ঠাকুরদার মহা উৎসাহ।

বেড়ানো শেষ ক'রে ঘড়ির হিসাব মতই আমরা ফিরে এলুম। আসল বাড়িটার পাশে রান্না-মহল, ঠাকুর-চাকররা সেখানে রান্নায় ব্যস্ত। হলের দরজা খোলা—আমাদেরই জন্য। হলের মাঝের ঝাড়টা জ্বালানো হয় নি—একপাশে একটা দেওয়াল-গিরির আলো জ্বলছে। আলো বেশ জোর—কিন্তু, অতবড় হলঘরখানায় সে আর কতটুকু? অধিকাংশই আবছা অন্ধকার হয়ে রয়েছে। বেরোবার সময় আবার মনীশ আলোটাকে এমন কায়দা ক'রে রেখে গেছে যাতে ওরই মধ্যে একটু যা আলো সিঁড়িটাতেই পড়ে।...

আমরা এমন ভাবেই সময়টা ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম যে, আমরা ঠিক গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়িয়েছি, আর দূরে কোনো বাগানবাড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজতে শুরু হ'ল।

আমরা পূর্বপরামর্শমত হলের দোরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালুম। শশধর বললে, 'জ্যোতিষটার তো এখনও পাত্তা নেই। কী হবে—এই গরমে ঘরে গিয়ে এখন থেকে? তার চেয়ে আয় বাইরের চাতালে ব'সে তাস খেলি একটু!'

'মন্দ নয়। মন্দ নয়! বেশ বলেছ, মাইরি!' সবাই আমরা সমর্থন জানাই। সুনীল বলে, 'ঠাকুরদা, আমার ব্যাগে তাসটা আছে, নিয়ে এস না ভাই—'

ঠাকুরদা একবার আধো-অন্ধকার ওপরটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি একা যাব? তোরা কেউ চ'না—'

'কেন, তোমার কি ভয় কচ্ছে? ভয় করে তো বল, আমিই যাচ্ছি।' চিম্‌টি কেটে বললে মনীশ।

'না না, ভয় কেন! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—'

ঠাকুরদা একা হলে গিয়ে ঢুকল। আমরা সবাই অন্ধকারে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক সেই সময় ওপরের দিক থেকে সিঁড়ির মুখে কার জুতোর আওয়াজ উঠল, মস্‌ মস মস্‌!

সবাই তাকিয়ে দেখলুম।

বাহবা বা, বাহাদুর ছেলে বটে জ্যোতিষ!

কী সেজেছে মশাই—একেবারে সেই ছবির মৈনাক দত্ত! হুবহু। যেন মনে হচ্ছে ঐ ছবিটাই নেমে আসছে জীবন্ত হয়ে। আর তেমনি ভারিক্কী চলনটাও অভ্যাস করেছে তো ছোকরা! বলিহারি!

মুহূর্তকয়েক সেদিকে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল ঠাকুরদা। যেন পাথরই হয়ে গিয়েছে।

আর জ্যোতিষ নামতে লাগল—মস্ মস্ মস্—

তারপরই গাঁ গাঁ ক'রে একটা বিকট চিৎকার করতে করতে ঠাকুরদা এক-লাফে বাইরে এসে রাস্তার ওপরই প্রচণ্ড শব্দ ক'রে পড়ল—অজ্ঞান হয়ে!

আমরা ঠিক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। বিষম অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধ'রে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

বিপদের ওপর বিপদ। ওর ঐ বিকট আর্তনাদে ঠাকুর-চাকররা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল রান্নামহল থেকে।

ততক্ষণে মৈনাক দত্ত ওরফে জ্যোতিষ হল্ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চলেছেন!...

জ্যোতিষের দোষ নেই, অভিনয়টা সে নিখুঁত করতে চায়। কিন্তু, আমাদের মনে হ'ল, আর কি দরকার ছিল এত বাড়াবাড়ি করবার?

বাইরের গাড়িবারান্দায় একটা মিটমিটে তেলের আলো ঝুলছিল, চাকরের হাতেও ছিল একটা লণ্ঠন। আগেকার ঐ চিৎকার এবং বর্তমানে সামনের এই মূর্তি—দেখে তারাও অদ্ভুত একটা শব্দ করতে করতে ছুটল ফটকের দিকে। বোধ হয় রাত থাকতে এই ভূতুড়ে বাড়িতে তারা আর ফিরবে না!

চোখে আমরা—যাকে বলে অন্ধকার দেখলুম পুরোপুরি।

সুনীল মনীশকে গাল দিতে লাগল, 'তোর পরামর্শেই তো এই কাণ্ডটি ঘটল!'

আমি তাড়াতাড়ি তাকে থামাই।

'ওরে সে সব পরে হবে। এখন এদিকে ছাখ্।'

সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে এনে ঠাকুরদাকে হলের মেঝেতেই ফেললুম, শশধর রান্নাঘর থেকে জল নিয়ে এল, চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগলুম। রান্নাঘর থেকেই একটা পাখা সংগ্রহ ক'রে আনলে মনীশ। ভাগ্যে আমার পকেটে একটা

টর্চ ছিল। ঠাকুররা তো আলো নিয়েই পালিয়েছে! যাই হোক মালীগুলো থাকে বাগানের এককোণে। হৈ চৈ শুনে তারা এসে পড়ল এই রক্ষে। তাদের আর আসল কথাটা বলা হ'ল না। কোনোমতে দু'পাঁচটা মিছে কথা ব'লে ঠাণ্ডা করা হ'ল। তাদেরই একজন ছুটল ঠাকুর-চাকরকে খুঁজে আনতে।

প্রচুর জল এবং বাতাসের পর ঠাকুরদা একসময় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকাল···

তখন ওকে উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

আর একটু প্রকৃতিস্থ হ'তে আমাদের অপরাধ স্বীকার করা হ'ল। ঠাকুরদা তো প্রথমে খুব চ'টে উঠল, যা-তা ক'রে বকলে, বললে, 'ছাখ্ দিকি—আমার যদি হার্টফেল করত? এমন চ্যাংড়ামি মানুষে করে!'

আমরা বললুম, 'তুমি যে এমন সাহসী বীরপুরুষ তা কেমন ক'রে জানব বল।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। অমন অবস্থায় পড়লে সবাই সমান বীরপুরুষ। আমার জানা আছে।··· দাঁড়া, জ্যোতিষ ইষ্টুপিডটা আসুক—দেখাচ্ছি মজা তাকে!' এবার সে হেসে ফেললে। অর্থাৎ, রাগ নেই বুঝলুম। বাঁচা গেল।

কিন্তু, সত্যিই তো—জ্যোতিষটা গেল কোথায়?

ঠাকুরদার কথায় মনে পড়ল আমাদের।

সেই যে বাগানের পথে অন্ধকারে কোথায় বেরিয়ে গেল—কৈ, আর তো ফিরল না! সে বোধ হয় লজ্জায় ফিরছে না তাহ'লে।

ঠাকুরদা বললে, 'কোন্ ফাঁকে হয়তো ফিরে এসেছে ছাখ্—মেকাপ ধুচ্ছে!'

'না-না! আমরা তো সমস্তক্ষণ দোর জোড়া ক'রে ব'সে। যাবে কোথা দিয়ে।'

তা বটে! কিন্তু, গেল কোথায়? রাত-বিরেতে অন্ধকারে? ঠাকুরদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

শেষে মালী দুটোকে পাঠানো হ'ল বাগানে খুঁজতে। আলো নিয়ে তারা দু'জনে দু'দিকে গেল। বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল মৈনাক দত্তের মত চোগাচাপকান দেখে যেন ভয় না পায়।

তারপর আমরা সবাই ঠাকুরদাকে ধ'রে ধ'রে ওপরে তুললুম। হাত পা ছড়ে গিয়েছিল বেচারীর, ঠোঁটের একটা দিক ফুলে উঠেছে। 'ফার্স্ট এড্' দেওয়া দরকার।

কিন্তু, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই সকলকার নজরে পড়ল, ওপাশের কোণের ঘরে একটা আলোর শিখা বাতাসে কাঁপছে। দেখেছ ছোকরার কাণ্ড! বাতিটা নিভিয়ে যায় নি।

ঠাকুরদা মনীশকে বললে, 'যা বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আয়।'

মনীশ নিশ্চিন্ত ভাবেই গেল আলো নেভাতে, কিন্তু দোরের কাছে পৌঁছেই সে-ও একটা চিৎকার দিয়ে উঠল।

আবার চিৎকার!

আমরা সবাই ছুটে গেলুম। তবে দোরের সামনে যেতেই যা চোখে পড়ল তাতে চিৎকার দেবারই কথা।

মস্তবড় বাতিটা এখনও জ্বলে শেষ হয় নি। তারই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা।

পোশাক, মেকাপের সরঞ্জাম, চারদিকে ছড়ানো—তারই মধ্যে খালি গায়ে জ্যোতিষ ঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে রয়েছে।

এ কী কাণ্ড!

ভয় দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই ভয় পেয়ে গেল?

শশধর গম্ভীর ভাবে বললে, 'অমন হয়। অভিনয় করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছে একেবারে আর কি!'

'কিন্তু, এল কোথা দিয়ে?' সুনীল প্রশ্ন করে।

তাইতো!

শেষে ঠাকুরদাই বুঝিয়ে দেয়, 'কখন কোন্ ফাঁকে উঠে এসেছে। তোরা হয়তো লক্ষ্য করিস নি, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলি। পায়ে তো জুতো নেই দেখছি। জুতো খুলে হাতে ক'রে এসেছে হয়তো। তাই আওয়াজ পাস নি।'

সে যাই হোক—আমরা কুঁজো থেকে জল নিয়ে ওর মুখে চোখে ছেটাতে লাগলুম। মনীশ বাতাস করতে লাগল।

অনেকক্ষণ সময় লাগল জ্যোতিষের জ্ঞান হ'তে।

ঠাকুরদা উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার বলতে লাগল, 'ছাখ দিকি কী কাণ্ড! এমন ইয়ার্কি করার দরকারটা কী!'

যেন ভয় পেয়ে শিউরে উঠল একবার জ্যোতিষ।

'কি রে, ভয় কী, ভয় কী? এই তো আমরা।'

'আঃ।' আরামের নিশ্বাস ফেললে সে এবার।

আর একটু সুস্থ হ'তে প্রশ্ন করলুম, 'তুই এলি কখন—কোথা দিয়ে ?'

'সে তো তখনই, তোরা তখন গঙ্গার দিকে সবে রওনা হয়েছিস।'

'না না—সে আসা নয়—মানে এসে আবার পোশাক-টোশাক ছাড়লি কখন ?'

'কৈ, আর কোথাও যাই নি তো !'

আবারও শিউরে উঠল জ্যোতিষ। সেই সঙ্গে আমরাও।

'তার মানে ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে সে যেন মনে মনে খানিকটা বল সঞ্চয় করলে, 'এসে তো খানিকটা ও ঘরে শুয়ে বই পড়লুম। পড়তে পড়তে দেরি হয়ে গেছে—যখন খেয়াল হ'ল তখন পৌনে দশটা বাজে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সবে জামাটামা খুলে প্যান্টটা নিয়ে বসেছি—বারান্দায় জুতোর শব্দ। তোরা কেউ ফিরছিস মনে ক'রে অতটা গ্রাহ্য করি নি। ভাবলুম যে, আমাকে হয়তো তাড়া দিতে এসেছিস কেউ, কি, দেখতে এসেছিস আমার কত দেরি, তাই ওদিকে না চেয়েই জোরে জোরে হাত চালাচ্ছি। শব্দটি এসে এই দোরের বাইরে থামল, দোরটাও কে খুললে—টের পাচ্ছি, কিন্তু মুখ তুলি নি।... একটু পরে হুঁশ হ'ল। দোরটা খুলল, অথচ কেউ ঘরে ঢুকলও না, কিংবা কথাও বলল না—কী ব্যাপার ? তখন পেছন ফিরে চাইলুম—'

'তারপর ?' কম্পিত কণ্ঠ আমার—তা নিজেই বুঝতে পারলুম।

'তারপর যা দেখলুম'—জ্যোতিষেরও গলা কাঁপছে, 'দেখলুম ঐ ছবির মৈনাক দত্ত আমার সামনে, দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে, মুখে কুটিল একটা হাসি। হুবহু ঐ মূর্তি, ছবিতে যেমন আঁকা আছে।...তারপর আর কিছু জানি না—একেবারে তোদের দেখছি।'

ঠাকুরদা একটা গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে দ্বিতীয়বার মূর্ছিত হয়ে পড়ল। *

* এক অধ্যাপক-বন্ধুর কাছে শোনা একটি সত্য ঘটনা থেকে গল্পটির উৎপত্তি

# ভৈরবী

বোম্বাই মেলে কাশী যাচ্ছিলাম। মোগলসরাইতে গাড়ি বদল করতে হয় বটে —তবু এই গাড়িতে যাওয়াই সুবিধা, মানে যদি থার্ডক্লাসে যেতে হয়। কারণ, এই একমাত্র গাড়ি ঐ লাইনের—যাতে গান্ধী-ক্লাসে ( বা একশ' এগারো—যাই নাম দিন— ) একটু জায়গা মেলে—কারণ, তার আগেই ঐ লাইনে পর পর অনেকগুলি দ্রুতগামী ট্রেন যায়। অত শেষের গাড়ি পর্যন্ত ব'সে থাকবার ধৈর্য আছে ক'জনের? তাছাড়া, চুপিচুপি বলি—দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কম—নয় কি? আগে সার সার অতগুলি গাড়ি যায়, যা-কিছু বিপদ-আপদ তাদের ওপর দিয়েই ঘটতে পারে। এ গাড়িতে ভিড় হয়—মোগলসরাইয়ের পর থেকে—কিন্তু, সে আমার ভাববার কথা নয়।

এখন যা বলছিলাম,—। গাড়িতে তো উঠলাম, অভ্যাস মত ওপরের আসনে বিছানা বিছিয়ে একটা গোয়েন্দা-কাহিনী নিয়ে আরাম ক'রে শুয়েও পড়লাম। কারণ, যদিচ তখন কামরা একেবারে খালি—কিন্তু, দীর্ঘদিনের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় এইটুকু শিক্ষা হয়েছে যে, 'বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং—থার্ডক্লাস প্যাসেঞ্জারেষু!' কখন কোথা থেকে যে হুপ ক'রে ভিড় ঠেলা দেয় তা কেউ বলতে পারে না।

আর হ'লও তাই।

যখন আর মাত্র দশটি মিনিট বাকি তখন একদল বিকানীর-প্রবাসী ( কলকাতায় যাঁদের জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে তাঁদের কি বিকানীরবাসী বলা উচিত! )-ভাই বিচিত্র মোটঘাট, গাঁজার কল্কে, লোটা মাটি প্রভৃতি যথারীতি নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে উঠলেন এবং দু'খানি বেঞ্চি মালে ও মানুষে ভরিয়ে ফেললেন। তার আগেই একটি বাঙালী ছোকরা এবং এক গুজরাটী ক্রোড়পতি ( সারা ভারতে তাঁর মোট সাতটি জুয়েলারী দোকান! ) বৃদ্ধ এসেছিলেন। কিন্তু, তাতেও হ'ল না—একেবারে শেষ দু'মিনিট থাকতে এক শিখ সর্দার ও তাঁর বিহারী ভৃত্য প্রকাণ্ড কয়েকটি কাপড়ের 'গাঁট' নিয়ে উঠে গাড়ি ঠেসে ফেললেন।

এবারের যাত্রাটা শুভ হয় নি—শুয়ে শুয়ে সেই কথাটাই চিন্তা করছি এমন সময় সর্দারজী ও তাঁর মালবহনকারী গুটি-পাঁচেক মুটের বচসা ছাপিয়ে একটি

মিষ্ট-গম্ভীর নারীকণ্ঠ কানে এল, 'আরে এই—রাস্তা ছোড় দেও বেটা!'

বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখলাম—নারীই বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী! রক্তাম্বরা, ত্রিশূলধারিণী, রুদ্রাক্ষ-কণ্ঠমালা-শোভিতা—যাকে বলে রীতিমত ভৈরবী-মূর্তি। এককালে রূপসীও ছিলেন—যৌবন অতিক্রম ক'রে আসা সত্ত্বেও সে প্রমাণ তাঁর দেহ থেকে একেবারে লোপ পায় নি।

এক বিকানীরওয়ালা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিলেন—তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালেন, 'মাতাজী—উধার যাইয়ে, জানানা কামরামে, হিঁয়া জায়গা কঁহা?'

অনাবশ্যক বোধেই হয়তো মাতাজী সে কথার উত্তর দিলেন না! নীরবে তাঁর দীর্ঘ আয়ত চোখের দৃষ্টিতে একটি চরম উপেক্ষা হেনে তিনি একরকম তাকে ঠেলেই গাড়িতে উঠে পড়লেন। অবশ্য তখন আর সময়ও ছিল না—তিনি ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মুটেগুলো নামল চল্‌তি গাড়ি থেকেই।

ভৈরবী ভেতরে ঢুকে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। কঠিন, শীতল দৃষ্টি। তারপর ঘটোৎকচের মত 'কুরু কুল চেপে' পড়লেন, অর্থাৎ সর্দারজীর কাপড়ের মোট ডিঙ্গিয়ে বিকানীরওয়ালাদের দিকে চ'লে গেলেন এবং বেশ মিষ্ট-গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'ভাই, জেরা জায়গা দেও তো—হঠো জেরা।'

একজন একটু প্রতিবাদ করতে গেলেন ওর ভেতর থেকে, বেশ রূঢ় ভাবেই, 'উধার যাইয়ে না মাতাজী—উধার আদমী কম হ্যায়!'

'কেঁও—ইধার ভি তো বহুত জায়গা হ্যায়! হঠো— ইধার বৈঠ্‌নে দেও—'

এই ব'লে তিনি এমন ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরলেন যে, কতকটা ভয়ে ভয়েই ও বেঞ্চের অধিবাসীরা স'রে বসল। মাতাজী দরজার কাছে জানালার ধারের বেঞ্চের আরামপ্রদ কোণটি দখল ক'রে বসলেন।...

বসলেন তিনি গাড়ির আরোহীদের দিকে পিছন ফিরেই, জানালার দিকে মুখ ক'রে। আমার আস্তানা থেকে তাঁকে দেখা গেলেও আলো-আঁধারী হচ্ছিল, মুখটা ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছিল না।—তাছাড়া, মুখ তিনি তখন বাইরের দিকেই ফিরিয়ে। তবু কৌতূহল দমন করা কঠিন ব'লে প্রাণপণে তাঁর দিকেই চেয়ে ছিলাম। ফলে, তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সোজা আমার দিকে চাইতে একটু অপ্রস্তুত হয়েই পড়লাম বৈকি!

তিনি কিন্তু ওসব কিছু গ্রাহ্য করলেন না। আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার

বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'এটা রাঁচির গাড়ি তো?'

চমকে উঠে ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না, না—আপনি বিষম ভুল করেছেন। রাঁচির গাড়ি ছাড়ে ন' নম্বর থেকে, আর একটু পরে—ন'টা পঞ্চাশ বোধ হয়। এ যে আপনার বোম্বাই মেল! কী সর্বনাশ! বড্ড ভুল করেছেন তো!'

সহযাত্রীদের কেউ কেউ মূল্যবান উপদেশ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন, কিন্তু সবাইকে নিরস্ত ক'রে শান্তকণ্ঠে ভৈরবী বললেন, 'বম্বে মেল তা আমি জানি, কিন্তু এক চেকারবাবু তো বললেন, এতেও যাওয়া যাবে!'

বললাম, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য যাবে। হাজারীবাগ রোডে নেমে বাসে যেতে পারবেন—'

'তাতেই হবে। ও গাড়িতেও আমি গেছি অনেকবার। সে-ও তো মুরীতে নেমে বাসে যাওয়া—।'

বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত কণ্ঠস্বর।

এতখানি উদ্বেগ এবং জ্ঞান কাজে লাগল না ব'লেই বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করলাম। বললাম, 'কিন্তু, অনর্থক এতে ঘুর হবে একটু। এ পথটা বেশী।'

'তা হোক্ গে। আমায় তো আর ভাড়া দিতে হবে না। আমার অত হিসেবে দরকার কী!'

তারপর কতকটা যেন অকারণেই বললেন, 'আমার কোথাও ভাড়া লাগে না।'

'কেন?' মুখ থেকে প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

এবার তাঁর বিস্মিত হবার পালা। তিনি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেন, 'কেন কি? আমি যে সন্ন্যাসিনী। আমার কাছে ভাড়া চাইবে কে? আর, চাইলেই বা আমি দেব কেন?'

তা বটে! এ অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর নেই। অগত্যা চুপ ক'রে রইলাম।

ভৈরবীর সঙ্গে আর কোনো মাল ছিল না—শুধু কাঁধে একটি ঝুলি ছাড়া। এবার তিনি সেই ঝুলি নিয়ে পড়লেন। তা থেকে বেরোল ওড়িয়াদের মত একটি পানের বটুয়া। তা থেকে পান-চুন-খয়েরের একটা কৌটো, সুপুরির পুঁটুলি, দোক্তা এবং জাঁতি। বেশ পরিপাটী ক'রে ব'সে ব'সে ধীরেসুস্থে পান সাজলেন তিনি। তারপর আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'খাবেন নাকি বাবা একটা পান?'

সবিনয়ে জানালাম, 'পান-দোষ আমার নেই!'

'তা সে একরকম ভালো বাবা, এ ছাই-ভস্ম অভ্যেস না করাই ভালো।'

এই ব'লে তিনি যে ক'টি খিলি সেজেছিলেন তার সব ক'টিই একসঙ্গে বদন-বিবরে প্রেরণ ক'রে তার সঙ্গে বেশ জমিয়ে চুন-দোক্তা গালে ফেলে পানের পাট সেরে ফেললেন এবং গলা থেকে একটি মালা খুলে জপ করতে লাগলেন।

গাড়ির বাকি যাত্রীরা যেন এতক্ষণ কতকটা বিস্ময়াহত ভাবেই স্তব্ধ হয়ে ঐ দিকে চেয়েছিলেন। ভৈরবী মালা-জপে মন দিতে এবার সকলে একটু সহজ হলেন। শুরু হ'ল আলাপ এবং গুঞ্জন। বিকানীরওয়ালারা ছোট কল্‌কে এবং ভিজে ন্যাকড়া বার করলেন। ওঁদেরই একজন কানে পৈতে গুঁজে বাথরুমে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক বালতি জল এবং একরাশ মাটি নিয়ে গাড়ির ভেতরই বন্যা বইয়ে দিলেন। সেই উপলক্ষ্য ক'রে সর্দারজীর সঙ্গে একচোট কলহও বেধে উঠল। কারণ, তাঁর কাপড়ের গাঁট সবই মেঝেতে—ভিজলে বহু টাকা লোকসান হবে। এই সব কোলাহলের মধ্যে আগাথা ক্রিস্টীর রোমাঞ্চকর 'থ্রিলার'-এ মনটা দোল খেতে খেতে গাড়ি একসময় বর্ধমানে এসে গেল। সুখের কথা, এ গাড়িতে কেউ উঠল না—নামলও না। বর্ধমান ছাড়বার পর একসময় হাত থেকে বইখানা খ'সে পড়ল—অর্থাৎ, তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম।

একেবারে আবার সচেতন হলাম আসানসোলে আসতে। টিকেট-চেকার উঠেছেন—তাঁরই ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্‌ল। টিকেট দেখিয়ে আবার চোখ বোজবার কথা। কিন্তু, প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। সর্দারজী, যিনি অন্তত মন-দশবারো কাপড়ের গাঁট নিয়ে উঠেছেন গাড়িতে, তাঁর টিকেট নেই,—না তাঁর, না তাঁর চাকরের। মালের ভাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

চেকার-মশায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পকেট থেকে টেব্‌ল্ বার ক'রে ভাড়া হিসেব করলেন—তারপর টাকাটা চেয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। সর্দারজীও কেমন একরকম ক'রে তাকালেন। তারপর বললেন, 'পাশের গাড়িতে আমার জান-পছানা লোক আছে, তার কাছ থেকে চেয়ে দেব চলুন!'

চেকার এবার বাকি যাত্রীদের দিকে মন দিলেন। ভৈরবীর কাছেও গিয়ে দাঁড়ালেন। ভৈরবী তখনও জপ ক'রে চলেছেন। তিনি চেকারের কথার উত্তর দিলেন না—তাকালেনও না—যেমন জপ করছিলেন, তেমনি আত্মস্থ ভাবে জপ ক'রে চললেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চেকারবাবুটি স'রে

পড়লেন। হয়তো বা ত্রিশূলের দিকে তাকিয়েই জোর তাগাদা দেবার সাহস হ'ল না। তাছাড়া, গাড়ি ছাড়বার সময়ও আসন্ন—চুনোপুঁটির দিকে মন দিলে রুই-কাতলা ফস্‌কায়!

সর্দারজী এবং চেকারবাবুটি নেমে গেলেন। একটু পরেই সর্দার আবার হাসি মুখে ফিরে এলেন এবং সগর্বে একবার চারদিক তাকিয়ে নিরীহ বাঙালী ছোকরাটিকে আরও কোণ-ঠাসা ক'রে নিজের বিছানা বিছিয়ে নিলেন। একটু হেসে চাকরের দিকে ফিরে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই—এবার নিশ্চিন্ত। গয়া পর্যন্ত আর কেউ জ্বালাতন করবার রইল না। আর গয়া পৌঁছতে পারলে তো কথাই নেই। সেখানে রোখে কে!

এতক্ষণে বোধ করি ভৈরবীরও মালাজপা শেষ হয়েছে। তিনি মালাটি কপালে ছুঁইয়ে গলায় প'রে নিলেন, তারপর আবারও ঝুলি থেকে পানের সরঞ্জাম বার ক'রে পান সাজতে বসলেন। আমি সেদিকে চেয়ে আছি বুঝেই বোধ করি সহসা মুখ তুলে বললেন, 'লাখ লাখ টাকার কারবার করছেন বাবুরা, তাঁরা রেলের ভাড়া দেবেন না—দু'পয়সা ঘুষ দিয়ে সারবেন; সন্নিসী-ফকিরের কাছে হাত পেতে টিকিট চাইতে লজ্জাও করে না। কী বলব, জপে ছিলুম তাই—নইলে বাবার নাম ভুলিয়ে দিতুম অমন চেকারের। ওর ঘুষ নিয়ে কোম্পানির সবনাশ করা বার ক'রে দিতুম!'

এই ব'লে তিনি এমন এক উগ্র দৃষ্টিতে সর্দারজীর দিকে তাকালেন যে, সে ভদ্রলোকের এতক্ষণের গর্বোদ্ধত হাসি নিমেষে মিলিয়ে মুখ কালি হয়ে উঠল। তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নামিয়ে নিজের ডান হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইতিপূর্বে তাঁর পাশের বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে দু'-একটি কথা থেকেই বুঝেছি যে, তিনি বাংলা ভালো বলতে না পারলেও বোঝেন বেশ।

পান-দোক্তার পাট চুকিয়ে ভৈরবী বেশ শব্দ ক'রে একটি হাই তুললেন। তারপরই এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। বিকানীরওয়ালাদের কয়েকটি ভারী ভারী মাল সরিয়ে তার ওপর ওদেরই বিছানার বাণ্ডিলগুলো সাজিয়ে বেশ সমান একটি জায়গা ক'রে নিলেন এবং একরকম হাত দিয়ে ঠেলেই পাশের একটি তরুণকে সরিয়ে দেহের অর্ধেককে বেঞ্চে ও বাকি অর্ধেককে মালের ওপর প্রসারিত ক'রে বেশ আরামে শুয়ে পড়লেন এবং শুয়েই চোখ বুঝলেন। গাড়ির অন্য সকলের মুখভাব কেমন হ'ল তা দেখবার চেষ্টাও করলেন না—শুধু শোবার আগে একবার উদাত্ত কণ্ঠে ডাকলেন, 'তারা, তারা—মা, মাগো।'

বিকানীর-ওয়ালারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, একবার আমাদের দিকেও। কিন্তু, তাতে যে কোনো লাভ নেই, তা তাঁরাও বুঝলেন। কতকটা হতাশ হয়েই বাকি স্থানটুকু অবশিষ্ট মালে ভরিয়ে আরাম করবার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদের যে মাল ভৈরবী দখল ক'রে নিয়েছেন তার জন্যও দাবি জানাতে সাহস হ'ল না—কারণ, যদিও প্রায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ভৈরবীর নিশ্বাস ভারী ও নিয়মিত হয়ে এসেছে, তবু তাঁর হাতের ত্রিশূলটি কিন্তু শিথিল হয় নি, বজ্রমুষ্টিতেই যেন বাগিয়ে ধ'রে আছেন!

তারপরও বহুক্ষণ জেগে রইলাম। গোমোতে গাড়ি এল, ছেড়ে গেল। ভৈরবীর একটু একটু নাক ডাকতেও শুরু করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু, তাঁর হাতের সে বজ্রমুষ্টি একবারও শিথিল হ'ল না—ত্রিশূল উদ্যতই রইল।

হয়তো একটু তন্দ্রাই এসেছিল। একসময় চমকে উঠে দেখি একটা বড় স্টেশনে গাড়ি এসেছে। কানে গেল পোর্টার হাঁকছে—'হাজারীবাগ রোড্। হা-জা-রী-বা-গ রো-ড্।'

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল ভৈরবীর কথা। তাঁর তো এইখানে নামবার কথা।

চেয়ে দেখি তিনি উঠেছেন নিজেই। কিন্তু, তাঁর নামবার কোনো চেষ্টা বা ব্যস্ততা নেই। নিদ্রালু চোখদু'টি মেলে প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে ব'সে আছেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'কৈ আপনি নামলেন না? এই তো হাজারীবাগ।'

তিনি যেন কেমন একটু উদাস দৃষ্টিতেই তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'না। থাকৃগে। একেবারে বাবার চরণে গিয়েই পড়ি!...আমিও কাশী যাব স্থির করলাম আপনার সঙ্গে।'

আমার মুখে কি কোনো আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল? অথবা, সে ভাব—গাড়ির ঐ স্বল্পালোকে অতদূর থেকে তাঁর তন্দ্রাতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল? কে জানে!

তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ভয় নেই। আমার জন্য বিব্রত হ'তে হবে না আপনাকে। আমার সেইখানেই গুরুধাম। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আশ্রয় গুরুর আশ্রয়ই আছে। এমনি সঙ্গে যাব।'

লজ্জিত হয়ে কী একটা বাজে জবাবদিহি করবার চেষ্টা করতে করতে চুপ ক'রে গেলাম।

ভৈরবী আর শুলেন না। আমারও ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না। তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে দেখলাম ভৈরবী একভাবে স্থির হয়ে ব'সে আছেন বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে। এক হাতে ত্রিশূলটা তেমনি খাড়া ভাবে ধরা—আর একটা হাত নিজের গলায় ঝোলানো রুদ্রাক্ষের মালাটায়। জপ করছেন কি না ঠিক বোঝা গেল না।

গয়া এল ভোর পাঁচটায়। তখনও আবছা অন্ধকার। সর্দারজী কোলাহল করতে করতে মালপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। এইখানেই তাঁর কারবার। যাবার সময় আমাদের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে নমস্কার ক'রে যেতে ভুল হ'ল না তাঁর।

নেমে মুখে-হাতে জল দিয়ে চা খেলাম। মনে পড়ল ভৈরবীর পান খাওয়ার কথা। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খাবেন ?'

তিনি এত গোলমালেও কেমন একটু যেন আত্মস্থ হয়েছিলেন। আমার প্রশ্নে একটু চম্‌কেই উঠলেন যেন।

'চা ? তা দিন বাবা। এটা হ'ল ব্রাহ্মমুহূর্ত। এখন খেলে দোষ নেই। বেলায় আর খাওয়া হবে না। যাচ্ছিই যখন, তখন মনিকর্ণিকায় একটা ডুব না দিয়ে—বাবার মাথায় জল না দিয়ে কিছু খাই কী ক'রে ?'

চা নিয়ে অবশ্য ঝুলিতে হাত পুরলেন পয়সার জন্য, আমি শশব্যস্তে নিরস্ত করলাম।

'আমাদের তো এই-ই অভ্যাস বাবা। পরের পয়সাতেই তো দিন কাটে।' মুচকি হাসলেন একটু।

মোগলসরাইতে নামতেই দেখি সামনে পাঞ্জাব-মেল দাঁড়িয়ে। গাড়িটা আজ আশ্চর্য-রকম খালি। আমার সঙ্গেও বিশেষ মাল ছিল না, ভৈরবীর তো ঐ এক ঝুলি ভরসা। দু'জনে ধীরে সুস্থে গিয়ে সামনের একটা খালি গাড়িতে উঠলাম। একেবারে খালি বেঞ্চি পেয়ে ভৈরবী পা ছড়িয়ে জুত ক'রে পান সাজতে বসলেন।

এতক্ষণ ধ'রে কৌতূহলটা মনকে খোঁচাচ্ছিল, নিরিবিলি পেয়ে সেইটেই বেরিয়ে এল, 'রাঁচিতে কোথায় যাচ্ছিলেন ?' ভৈরবী চিল্‌তে-করা পানের ওপর লঘুহস্তে চুনের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে স্থির হয়ে গেলেন, কেমন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'শুনবেন বাবা ? এমন কিছু নয়। নিতান্তই ভেতরের কথা ব'লে একটু সঙ্কোচ হয় বলতে।'

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'থাক্‌গে তবে। শুনেই বা কী হবে, আমারই অন্যায় কৌতূহল।'

'না-না—তেমন কিছু নয়। আসলে কি জানেন, রাঁচিতে আমার একটি আশ্রম ছিল। বছর-দুই ওখানে ছিলাম—তারই মধ্যে আমি আর স্বামীজী মিলে আশ্রমটি তৈরি করি। একটি মন্দিরও আছে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের। আশ্রমের খরচ চালানোর জন্যে কিছু কিছু জমি-জিরাতও যোগাড় করেছিলাম চেয়ে-চিন্তে। রাঁচি শহর থেকে মাইল চারেকের ভিতরেই, জমিজমা যা-কিছু—তাও সব ঐ কাছাকাছি। ভারি সুবিধে। এমন আশ্রম আরও আছে বাবা আমাদের। স্বামীজীর শখই হ'ল ঐ! আশ্রম করেন, ট্রাস্টি ঠিক করেন, পূজারী এনে বসান—তারপর একসময় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আর একটা নতুন জায়গায় এসে বসেন। তা এই রাঁচি-আশ্রমটি বাবা আমারই শখের। বলতে গেলে ওর যা-কিছু সব আমিই করেছি। শিষ্যসেবকের কাছ থেকে টাকা যোগাড়, মন্দির করানো, দেব-প্রতিষ্ঠা—মায় জমিজমা—সব। কাল খবর পেলাম, পূজারী কেঁদে কেটে চিঠি লিখেছে, এক জমিদার কোথা থেকে এসে আমার আশ্রমের সব জমি খাস ব'লে দখল ক'রে নিয়েছে। পূজারীকে ওদিকে ঘেঁষতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। চিঠি পেয়ে স্বামীজীকে বললাম, চল যাই। তিনি নির্বিকার। বললেন, কেন?… কেন কী গো। এর একটা বিহিত করবে না? তিনি বললেন, পূজারীর ঐ জীবিকা, ট্রাস্টিরা আছেন, সর্বোপরি বাবা রুদ্রেশ্বর আছেন। তাঁরা যদি কিছু না করেন—আমার কী গরজ? আমি ফেলে দেওয়া থুথু আর চাটি না। যা পেছনে ফেলে এসেছি তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই।…তিনি তো ঐ ব'লে খালাস বাবা! আমার কিন্তু ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। যে ব্যাটা দখল করেছে তার ওখানে এক ছটাক জমি নেই, মন্দির হবার সময় সে একটা পয়সা দেয় নি। অমনি অমনি পরের জিনিস ভোগ করবে?…যত ভাবি তত মাথা গরম হয়ে যায়। রেগে বললাম, তবে তুমি থাক—আমি যাব। বললেন, গিয়ে কী করবে? মামলা? আমি বললাম, আইন-আদালত আমি বুঝি না—আমার এই ত্রিশূল আছে, একেবারে সোজা বাবা রুদ্রেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেব—ব্যাটা যদি বেশি চালাকি করে! উনি শুধু হাসলেন একটু, বললেন, এই পোশাকেই যাবে নাকি? আমি আরও রেগে গেলাম। এসব অবান্তর কথা ব'লে মনে হ'ল। একাই বেরিয়ে পড়লাম—তক্ষুনি।'

'তারপর?' সাগ্রহে প্রশ্ন করি, 'তা হ'লে নামলেন না কেন?'

'কী জানেন বাবা, বেরিয়ে এসে পর্যন্ত ওঁর ঐ শেষের হাসিটা আর প্রশ্নটা কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। কেন ও কথাটা বললেন উনি, হাসিরই বা অর্থ কী? মনকে যত বোঝাই যে, ওটা নেহাতই কথার কথা—ওটা কিছু নয়—কেমন যেন একটা অস্বস্তি হ'তে থাকে মনে মনে। শেষ পর্যন্ত জোর ক'রে ঘুমোলাম। আমাদের ওসব একটু-আধটু অভ্যেস আছে বাবা, দরকার হ'লে একমাস না ঘুমিয়েও বেশ থাকতে পারি—আবার ইচ্ছে হ'লে একমিনিটের মধ্যে যে কোনো অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তে পারি—কতকগুলো আসন আছে, খুব সহজ, যাতে স্নায়ুকে ইচ্ছাধীন ক'রে ফেলা যায়।—যাই হোক, ঘুম এল বটে ঠিক, কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঐ স্বপ্ন দেখি, উনি যেন হেসে বলছেন, এই পোশাকেই যাবে নাকি? হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ততক্ষণে জবাব পেয়ে গেছি মনে মনে—সত্যিই তো, এ যে সন্ন্যাসিনীর পোশাক। এখনও এত অধিকার-বোধ, সম্পত্তির ওপর এত মায়া—তাহ'লে সন্ন্যাস নেওয়ার অর্থ কী? এই পোশাক প'রে যাব বিষয়ের দখল নিতে? ছিঃ! মনে হ'ল যদি বাবা রুদ্রেশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে তো তাঁর বিষয়ের ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আর, তা যদি না থাকে তো তাঁর নামে এ ভড়ং ক'রে বেড়াই কেন? তাঁর নামে এমন ক'রে পরের জমি নেওয়া তো আমার উচিত হয় নি তাহ'লে—আমিই তো অন্যায় দখল করেছিলাম! কথাটা মনে হ'তে বড় লজ্জা করতে লাগল। তাই আর নামলাম না। বরং মনে হ'ল মনিকর্ণিকায় ডুব দিয়ে, বাবাকে দর্শন ক'রে একটু প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাই এই বিষয়-লালসার!'

চুপ ক'রে রইলাম। ভৈরবীর আঙুলেও ইতিমধ্যে চুন শুকিয়ে উঠেছিল তিনি আরও একটু স্থির হয়ে ব'সে থেকে নতুন ক'রে পান সাজায় মন দিলেন।

কথাটা হাল্‌কা ক'রে দেওয়া দরকার। কী বলি—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল। বললাম, 'আচ্ছা, আপনি অত অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন, কিন্তু হাতের ত্রিশূলটি তো ঠিক ছিল। সব স্নায়ু শিথিল না হ'লে ঘুম আসে না শুনেছি—কিন্তু মুঠোটা অমন শক্ত রইল কী ক'রে?'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'বহুদিনের অভ্যাসে অমন হয়েছে বাবা। ত নইলে কি পথে-ঘাটে একা মেয়েছেলে ঘুরে বেড়াতে পারি! স্বামীজী তো যখন যেখানে থাকেন বড় একটা নড়েন না—আমিই ঘুরে বেড়াই!'

ততক্ষণে গঙ্গার পোলে গাড়ি উঠেছে। চোখের সামনে ফুটে উঠেছে অ চন্দ্রাকৃতি বারাণসীর অপূর্ব দৃশ্য। ভৈরবী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন-

হয়তো বা বাবা বিশ্বনাথেরই উদ্দেশে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে নেমে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'আমি এখন যাব সোজা মনিকর্ণিকা—স্নান সেরে বাবাকে দর্শন ক'রে একসময় গুরুধামে গিয়ে উঠব।'

'গুরুধাম কোথায় আপনার ?'

'আউদগর্বিতে।'

আমিই একধার থেকে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে গেছি—উনি কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটাও প্রশ্ন করেন নি। নিজের কাছেই এটা খারাপ লাগছিল বোধ হয়। তাই খাপছাড়া ভাবে নিজেই ব'লে ফেললাম, 'আমি যাব ঐ ভেলুপুরায়, ওখানে আমার পিসিমা থাকেন।'

উনি শুধু বললেন, 'অ।...ঘাটেই দেখা হবে। কাশীতে তো আর দেখা হওয়ার অসুবিধে নেই।'

ওভারব্রীজ পেরিয়ে এসে রিক্সায় ওঠবার সময় আবার আমিই প্রশ্ন করলাম, 'ফিরবেন কবে কলকাতায় ?'

বিচিত্র ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু। দৃষ্টিটা কেমন যেন করুণ বোধ হ'ল। বললেন, 'কে জানে কবে ফিরব। ফিরব কি না তাই বা কে জানে! সব যেন ওলট্ পাল্ট হয়ে গেছে ওঁর ঐ কথাটায়। আচ্ছা, আসি বাবা।'

একখানা রিক্সায় চেপে আমার আগেই তিনি রওনা হয়ে গেলেন।

## অদৃষ্টের খেলা

অজয়ের জীবনদর্শন আর পাঁচটা মানুষ থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে বলত, "silly goat"দের মত শুধু দিনরাত টাকার পেছনে ঘুরে বেড়িয়েই যদি জীবনটা কেটে গেল তো জীবনে ভোগ করলে কী ?"

তার উত্তরে হয়তো উত্ত্যক্ত হয়ে বন্ধু জগদীশ বা পচা এক একদিন ব'লে ফেলত, 'তুই তো একটা পর্যন্ত ঘুমোস প্রত্যহ—তারপরও নড়তে চাসনা কোথাও, তুই-ই বা জীবনটা কী ভোগ করলি ?'

'যার যা ভোগ করার আইডিয়া দাদা—ছুটোছুটি ক'রে বেড়ালেই কি হ'ল? যে দেখতে জানে সে ঘরে ব'সেই দুনিয়া দেখে, তোদেরই তো রবিঠাকুর ব'লে গেছে—বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ ঘুরে—কী যেন?...দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু, দেখা হয় নাই নয়ন মেলিয়া, ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশিরবিন্দু।'

'রবিঠাকুর থাক। অন্তত ওঁকে তুই বাদ দে।' নীরস কণ্ঠে পচা বলে।

অজয়ের মামা রায়সাহেব হরিহর মুখুজ্জে ধনী ব্যক্তি। কাজকর্ম কিছুই করেন না—করতে হয় না। স্ত্রী নেই—সুতরাং, বই এবং গড়গড়া ভরসা। ইদানীং একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে, বই লেখার বাতিক। দশবছর ধ'রে তিনশ' পৃষ্ঠার বই লিখেছেন—"বাংলার জাতীয় জীবনে কীট-পতঙ্গাদি ইতর প্রাণীর প্রভাব।" সেইটে ছাপা নিয়ে তিনি সম্প্রতি কয়েক মাস ব্যস্ত। সংসার কিছুই দেখেন না—তাঁর বিশ্বাস তাঁর ভাগ্নে অজয় সে কর্তব্যটা পালন করে।

কিন্তু, অজয়ের বয়স যতই কম হোক, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কম নয়। সে জানে যে—ঝি-চাকর নিয়ে যখন কারবার তখন চুরি বন্ধ করা যাবে না, তার চেয়ে ওদের সঙ্গে একটা রফা ক'রে নেওয়াই ভালো। সে প্রকারান্তরে ওদের ব'লেই দিয়েছে যে, 'তোমাদের ওপর নজর রাখতে চাই না, মোদ্দা আমার আর মামার দিকটায় তোমরা একটু নজর রেখো। আর পুকুরচুরিটা ক'রো না—।'

তা তারা নজর রাখে। বেশী ক'রে যত্ন করে অজয়কেই। কারণ, তাকে হাতে না রাখলে বিপদের সম্ভাবনা। ফলে, অজয় নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে। ঘুম ভাঙে তার কোনোদিন এগারোটায়, কোনোদিন বা বারোটায়। তারপর কাপ-তিনেক চা ও জলখাবার খেয়ে স্নান করতে যায় চারটেয়। পাঁচটায় ভাত খেয়ে দিবানিদ্রা দেয় ঘণ্টাখানেক। তারপর একটু বেরোয়। কোনোদিন সিনেমায় যায়, কোনোদিন বা পচার বৈঠকখানায় গিয়ে আড্ডা জমায়। পচা নতুন উকিল—নেহাত শ্বশুরের জোর থাকায় দু'-একজন মক্কেল আসে মধ্যে মধ্যে। তবু আড্ডার অসুবিধা হয় না। ওখান থেকে ফিরে রাত্রির আহার সারে সে রাত বারোটার মধ্যেই। তারপর দুটো-তিনটে পর্যন্ত বই প'ড়ে ঘুমোতে যায়। এই হ'ল ওর জীবনের বাঁধা নিস্তরঙ্গ রুটিন।

জগদীশ বলে, 'কুড়ের বাদশা!'

অজয় বলে, 'শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলতে পার। এই কুঁড়েমিই আমার জীবন-দর্শন।'

জগদীশ চটে গিয়ে বলে, 'খুব দর্শন! যে দেশে লোক উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও একবেলা খেতে পায় না—সেই দেশে এই কুঁড়েমি—এ তো ক্রিমিন্যাল অফেন্স!'

অজয় বলে, 'তুই আইন পড়েছিস পচা, কিন্তু লজিক জানিসনে। যে দেশে লোকে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও একবেলা খেতে পায় না, সে দেশে আমি যদি আরও খানিকটা পরিশ্রম করি তাহ'লে তাদের ভাত কি আরও কম পড়বে না। বড়লোক হয় গরিবকে মেরেই—এটা তো বিশ্বাস করিস?...মামা একগাদা টাকা জমিয়ে রেখেছে, তার ওপর আমিও যদি আর খানিকটা জমাই, গরিবদের কি উপকারে আসবে বলতে পারিস। বরং একজায়গায় স্ট্যাগ্‌নেটেড হয়ে যাবে। তার চেয়ে মামা মরে গেলে সে টাকাটা আমি দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গ করব, সেটা ভালো হবে না?'

'ও, দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গ করবে? সাধু সংকল্প। কিভাবে সেটা হবে?'

'কেন, দু'হাতে ওড়াব! তাহ'লেই দেশবাসীর টাকা দেশবাসীর কাছে চ'লে যাবে!'

'দ্যাখ্‌—এসব কথা নিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিহাস করিস নি। কী কষ্ট করতে হয় আমাদের একমুষ্টি অন্নের জন্যে—'

'তা করতে হয়। সে ভাই আমি খুব মানছি। বিশেষত তোকে একমুষ্টি অন্নের জন্য শ্বশুর-কন্যা তথা শ্বশুরের যেভাবে মন জোগাতে হয়, সে বড় কম নয়। আমি তো ভাই পারতুম না! কবে শ্বশুর একটা মক্কেল দেবে তার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকা—। তবে হ্যাঁ, কষ্টের কথা যদি বললি, আমিই কি কম কষ্ট করছি!'

রাগে বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হ'লেও শেষ পর্যন্ত জগদীশের কৌতূহলই প্রবল হয়। অনিচ্ছাতেও ব'লে ফেলে, 'কি রকম?'

'দ্যাখ্‌—টাকা রোজগারের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। এর চেয়ে তীব্র বাসনা মানুষের আর কিছুই থাকতে পারে না। সেই প্রবৃত্তিকে আমি কী কষ্টে দমন ক'রে ব'সে আছি বল্‌ দিকি? ইচ্ছে করলেই, মামার পয়সায় ব্যবসা ক'রে বড়লোক হ'তে পারি। কিন্তু, পাছে দেশের নিপীড়িত জনসাধারণকে বঞ্চিত করতে হয় এই ভয়ে—'

জগদীশ রাগ ক'রে বলে, 'তুই সহজে বাড়ি যাবি, না ছাতাপেটা করতে হবে?'

'দাদা, সব ফিলজফির সেরা ওটা। তা মানতেই হবে। বাহুবলের কাছে আর কিছুই নেই। অগত্যা উঠি। পৃথিবীতে ভালো কথা কি কোথাও বলবার জো আছে! শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।'

কিন্তু, তাছাড়াও বিঘ্ন ঢের। একদিন এতটুকু অসতর্কতায় একটা অঘটন ঘটে গেল। মামা প্রুফ দেখতে গিয়ে কী একটা নতুন বানানে ঠেকে গেলেন। হাতের কাছে 'চলন্তিকা' নেই। টেলিফোন করতে গিয়ে দেখেন টেলিফোন খারাপ। তখন চললেন অজয়ের খোঁজে। এখনই যদি গিয়ে কোথাও থেকে অভিধানটা কিনে আনতে পারে।

ও হরি! এ কি! ওর যে দোর বন্ধ।

চাকর অবিনাশকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁরে অবে, অজয়ের দোর বন্ধ কেন?'

'আজ্ঞে দাদাবাবু ঘুমুচ্ছেন!'

'এরই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে? তা দিনের বেলায় ঘুম—দোর বন্ধ ক'রে কেন? ছেলে-পিলে নেই যে ব্যাঘাত ঘটাবে—

'আজ্ঞে এটা ওনার আত্তিরের ঘুম!'

'রাত্তিরের ঘুম! তার মানে? তার মানে কি তুই বলতে চাস—এখনও ওঠে নি।'

'আজ্ঞে না।'

হরিহর ঘড়ির দিকে তাকালেন, একটা বাজতে দশ!

ঈষৎ ব্যাকুলকণ্ঠেই বললেন, 'আর তোরা এখনও ডাকিস নি, কি আমায় খবর দিস নি! অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায়নি তো? কাল কি অসুখ-বিসুখের কথা কিছু বলেছিল? মানে শরীর খারাপ-টারাপ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহ'লেও এতক্ষণ একটা খোঁজ করা উচিত ছিল। ডাক ডাক—দরজায় ঘা দে—'

হরিহর ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবিনাশ কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন!

'আজ্ঞে, ডাকলে উনি আগ করেন যে!'

'রাগ করেন? তার মানে? রোজই এমনি ঘুমোয় নাকি হতভাগা—?'

'আজ্ঞে তা পেরায় দিনই—'

'এই একটা পর্যন্ত !'

'কোনোদিন এগারোটা, কোনোদিন বা একটা, যিদিন যেমন !'

হরিহর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দুমদুম ক'রে দরজায় ঘা দেন 'অজয়, অজয় ! এই হারামজাদা—'

অজয় চম্‌কে উঠে শশব্যস্তে বেরিয়ে আসে 'মামা, ডাকছেন ?'

'মামা ডাকছেন ! বাঁদর, গাধা কম্‌নেকার। এত বড় ছেলে হয়েছেন একপয়সা রোজগারের চেষ্টা নেই—বেলা একটা পর্যন্ত ঘুম ! একেবারে এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ ? এমন হয়েছে আমাকে কেউ বলেও নি। আশ্চর্য !'

আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অজয় হতভম্ব হয়ে গেছে। তাছাড়া মামা কোনোদিনই এদিকে আসেন না। এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে আমতা আমতা ক'রে বলে, 'না মানে এই—।'

'বুঝেছি ! আরও এক ঝুড়ি মিছেকথা বলতে হবে—এই তো ! শোন্, আমি মনস্থির করেছি। আসছে মাসের প্রথমেই যে দিন আছে সেই দিনই তোর বিয়ে দেব—'

'বিয়ে ?' অজয় আকাশ থেকে পড়ে। তাছাড়া বেলা পর্যন্ত ঘুমোবার সঙ্গে বিবাহের যোগাযোগটা কী, ঠিক বুঝতে পারে না।

'হ্যাঁ হ্যাঁ—বিয়ে। কেন, কথাটা কি কখনও শোন নি নাকি ?···না, বিয়ের বয়স তোমার হয় নি ?' ঈষৎ বিদ্রূপ ক'রেই বলেন মামা।'

'না, তা নয়। তবে—।'

'তবে কিরে হতভাগা ? তবে কি ? আমি বলছি বিয়ে, ব্যস্ বিয়ে। করতেই হবে। ঘাড়ে চাপ না পড়লে রেস্‌পন্‌সিবিলিটি জ্ঞান হবে না, আর তা না হ'লে কাজকর্ম কোনোদিনই কিছু করবে না। যত লক্ষ্মীছাড়া ছ্যাবলা ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে বেড়ানো তোমার বন্ধ করতে হবে একেবারে। ওতে জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।'

'কিন্তু মামা—আপনি—'

'চোপরাও ! আমি বলছি, আবার তার ওপর কথা কি রে ? বলছি বিয়ে করতে হবে—করবি। বাপের সুপুত্তুর হয়ে সুড়সুড় ক'রে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসবি। মেয়েও আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। খাসা মেয়ে।'

অজয় বোকার মত তাকিয়ে থাকে। এত দ্রুত অগ্রসর হওয়া তার বুদ্ধির অগম্য।

'ভাবছিস মেয়ে পেলুম কোথা? সব আছে, শুধু মাথাটা খাটালেই হয়। ব্রেণটা হ'ল একটা পিজন-হোল্—খোপে-খোপে সব তোলা আছে। এই মনে হচ্ছে কিছু মনে নেই, ঠিক খোপটিতে হাত দাও—একেবারে হুড় হুড় ক'রে সব বেরিয়ে আসবে, with reference to the context! তবে হ্যাঁ, আমার মত মেথডিক্যাল হওয়া চাই। ঠিক মত সাজিয়ে রাখবে, ঠিকমত বার করবে। যেমন মনস্থির করলুম বিয়ে, অমনি ব্রেনকে রেফার করলুম, মেয়ে? মেয়ে কৈ? ব্রেন জিজ্ঞাসা করলে—কী রকম মেয়ে চাই! বললুম, খুব শক্ত মেয়ে—বেরিয়ে এল রেকর্ডিং ফাইল থেকে। আমারই বন্ধু আছেন। প্রফেসার ফণী রায়ের মেয়ে—অম্বালিকা। এম্-এ পাস মেয়ে, একটা বইও লিখেছে "ভারতের জাতীয়-জীবনে অ-ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব ও ভাব-সংঘর্ষ।" খাসা বই পড়ি নি, কিন্তু বইয়ের নাম শুনেই মনে হচ্ছে ভালো বই!"

অজয়ের গলা দিয়ে কাতর স্বর বেরোল, অর্ধস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠল—'ও বাবা!'

সেটাকে প্রশংসাসূচক কিছু ধ'রে নিয়ে বিজয়-গর্বে হরিহর বললেন, 'বোঝ বাবা! হরিহর মুখুজ্জে সোজা ছেলে নয়। সব রেডি। আমি এখনই গিয়ে ফণীকে টেলিফোন করছি। আজই বরং মেয়েটাকে নিয়ে আসুক একবার সন্ধ্যাবেলা। আর আমি বইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি অবেকে দিয়ে—একটু নেড়েচেড়ে ছাখ।'

বাদানুবাদের অবসর মাত্র না দিয়ে রায়সাহেব ব্যস্তভাবে চ'লে গেলেন।

অজয়ের আর কোনো কাজেই উৎসাহ রইল না। এমন কি চা-ও যেন বিস্বাদ লাগল মুখে। এ কী দুর্দৈব। কোথাও কিছু নেই, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বিয়ের খবর! তাও কি না এম্-এ পাস মেয়েকে। এম্-এ পাসেও আপত্তি নেই, কিন্তু যে মেয়ে ঐ কিম্ভূতকিমাকার নামের বই লিখতে পারে—তার সঙ্গে আজীবন কাটাতে হবে? সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠল অজয়ের কথাটা ভাবতেই।

একটু পরেই অবিনাশ বইখানা দিয়ে গেল। বেশ মোটাসোটা ভারী বই। ছোট অক্ষরে ঠাস-ছাপা। আর, তেমনি কী অসংখ্য কোটেশান। অজয় বেশ চেঁচিয়েই ব'লে উঠল, "কী জ্যাঠা মেয়ে রে বাবা!"

অবিনাশ বললে, 'আজ্ঞে?'

'কিছু না—তুই যা। আজ আর আমি কিছু খাব না—ঠাকুরকে ব'লে দিগে যা—'

'আপনি খাবে না কিছু ? কেন দাদাবাবু ?'

'খাব না—আমার খুশি। তুই যা দিকি। দিক্ করিস নি মেলা।

'আর যদি বড়বাবু শুধোয় ?'

'বলবি যে, মরে গেছে দাদাবাবু। নইলে বলিস বরং শ্বশুরবাড়ি গেছে—'

অবিনাশ চ'লে গেলে অজয় বইয়ের মাঝখান থেকে একটা পাতা খুলে ফেললে—কিন্তু, চোখে যা পড়ল তাতে বুক শুকিয়ে গেল। উঠে তাড়াতাড়ি ক'রে গিয়ে পুরো একগ্লাস জল খেয়ে ফেলে তবে সুস্থ হ'ল খানিকটা।

সন্ধ্যার আগেই ফণী রায় মেয়েকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। বরং বলা যায় অম্বালিকাই তার বাপকে সঙ্গে ক'রে এল। লম্বা চেহারা, টক্ টক্ ক'রে চলে, কাটা কাটা কথা বলে। একেবারে মেম-সাহেবী মেজাজ !

তাকে দেখেই অজয় আর একটা অর্ধ-স্বগতোক্তি করলে, 'ও বাবা !'

কিন্তু, অম্বালিকা বেশ সপ্রতিভ।

কাছে এসে হাত তুলে একটু নমস্কারের ভঙ্গি ক'রে বললে, 'কাকাবাবু টেলিফোনে আমাকে সব কথাই বলেছেন। তা আমার আপত্তি নেই বিশেষ। আমিও এমনি একটি পাত্রই খুঁজছিলুম—আত্মিক প্রভাবের দ্বারা স্ত্রীরা স্বামীকে নিজেদের মত ক'রে গড়ে নিতে পারে কি না এই একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করব—আমার অনেকদিনের ইচ্ছা। আপনার বিবরণ শুনে মনে হ'ল আপনি সেদিক দিয়ে আইডিয়াল একেবারে। ভদ্রবংশে জন্ম, খাওয়া-পরার জন্য খাটতে হয় না ব'লে অলস এবং আরামপ্রিয়, অথচ নিরীহ। এমনিই দরকার। কাকাবাবুকে আমি ব'লে দিয়েছি, দি সুনার দি বেটার। সবটা যখন গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে, তখন মিছিমিছি সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।'

'ও বাবা !' কাতরভাবে চায় অজয়, 'আজ্ঞে, আমাকে দিয়ে কি সুবিধে হবে আপনার ?'

'তবে এতক্ষণ এত কথা বললুম কী ? এক কথা একশ'বার বললে এনার্জি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, তবে শুনুন—আপনাকে ইতিমধ্যে তৈরি হ'তে হবে খানিকটা—রোজ ছ'টায় উঠবেন, আরও ভোরে ওঠা উচিত, কিন্তু প্রথমেই অতটা পেরে উঠবেন না তো ! ছ'টায় উঠবেন, আমি কাকাবাবুকে ব'লে দিয়েছি একটা এলার্ম-ঘড়ি কিনতে, চাকরদেরও ধমকে দিয়ে যাব যাতে ঠিক সময়ে ডেকে দেয়। মিনিট পনেরো ব্যায়াম ক'রে নেবেন—হ্যাঁ ব্যায়াম,—ওটা চাই। তারপর দশটায় স্নান ক'রে খেয়ে নেবেন, তার পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে

পড়াশুনো করবেন। অবশ্য কাকাবাবুর, মানে আপনার মামার, লাইব্রেরিও মন্দ নয়। হাউএভার, চারটে পর্যন্ত পড়বেন। বিকেলে একটু বেড়াবেন। দেড় ঘণ্টার বেশী আড্ডা আমি অ্যালাউ করব না। তাছাড়া, রোজ আমার ঐ বইটা এক চ্যাপ্টার ক'রে পড়বেন। লাইফটা যে সীরিয়াস জিনিস সে সম্বন্ধে ও থেকেই একটা আবছা জ্ঞান পাবেন, আর কিছু বুঝুন বা না বুঝুন। আপাতত এই থাক্—বাকি যা ডিটেল্‌ড্ প্রোগ্রাম আমি এসে ক'রে দেব, বিয়ের পর। চল বাবা—'

ফণী রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহ'লে বাবাজী কাল আমাদের ওখানেই বৈকালিক চা-টা খেও। রেখার গর্ভধারিণী একবার দেখতেও পাবেন তাহ'লে—'

'রেখা ?' বিস্মিত অজয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা।

অম্বালিকা বাবার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলে, 'ওঁরা আমার নাম রাখেন রেখা। সে নাম আমিই পাল্‌টে নিয়েছি। সিলি নাম ওসব। অম্বালিকা নামের মধ্যে একটা স্ট্রেংথ্ আছে—তাই না ? তাছাড়া, ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে কোথায় যেন একটা কী সম্পর্ক আছে ! অম্বিকেই রাখব ভেবেছিলুম কিন্তু আমাদের কলেজের কেরানী ছিল অম্বিকে চক্রবর্তী—তাই ওটা পছন্দ হ'ল না। এস বাবা।'

রাত্রে জগদীশের অফিসঘরে গিয়ে যখন ঝুপ ক'রে ব'সে পড়ল অজয়, তখন ওর মুখের চেহারা দেখে চম্‌কে উঠল সে।

'কী হয়েছে রে ? অমন শুকিয়ে উঠলি কী ক'রে একদিনে ? মুখ যে কালি হয়ে গেছে !'

'আর কী হয়েছে ! কী হ'তে বাকি আছে তাই বল্ !'

অজয় সব কথা খুলে বলে !

'বেশ তো, মন্দ কী ? এম্-এ পাস মেয়ে রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারবে। দেখতেও মন্দ নয় বলছিস।'

'ওরে বাবা—দেখিস নি তাই বলছিস। ওর চেয়ে রেসের ঘোড়াকে বিয়ে করা ঢের সোজা ! তারাও তো রোজগার ক'রে খাওয়ায়। সে তো মেয়ে নয়—মানোয়ারী গোরা !'

'কেন—কেন, হ'ল কী ? বিয়ের আগে আইবুড়ো মেয়েদের অমন অনেক ভিরকুটি দেখা যায় !'

'সে রকম মেয়ে নয় বাবা—এই বই যে লিখতে পারে সে মেয়ে স্বামীকে অর্ধেক রাত্রে খুন করবে এই আমি ব'লে দিলুম। শুনবি, কী লিখেছে—?'

অজয় বইয়ের একটা জায়গা খুলে পড়তে শুরু করে, "আত্মার বাহ্যিক সত্তা স্বভাবতই জড়-চৈতন্যের বশীভূত। সেজন্য পণ্ডিতেরা যাহাকে খণ্ড-চৈতন্য বলিয়াছেন তাহাকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া তাহার প্রভাবের উর্ধ্বে ওঠাই মানবের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতদুদ্দেশ্যে মহর্ষি চার্বাক যাহা বলেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য—।"

'চুপ কর্ চুপ কর্—আমার পেট গুলিয়ে উঠেছে।' ব্যাকুল কণ্ঠে জগদীশ ব'লে ওঠে।

'তবে!' যেন একরকম বিজয়গর্বে বলে অজয়, 'খুব যে সৎপরামর্শ দিচ্ছিলি! নে বে কর, এই মেয়েকে!'

'তাইতো! কী করা যায় এখন?' চিন্তিত কণ্ঠে বলে জগদীশ।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকে। অজয় খুবই ম্রিয়মাণ। খানিক পরে জগদীশ লাফিয়ে ওঠে—'হয়েছে। প্ল্যান খেলেছে মাথায়।'

'কী রকম, কী রকম?'

'শোন্ তাহ'লে বলি,' গলাটা নামিয়ে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলে জগদীশ, 'তোকে পাগলের ভান করতে হবে।'

'পাগল?'

'হ্যাঁ—ওসব লেখাপড়া জানা মেয়ে, ওরা মাতালকে তত ভয় করে না, যত করে পাগলকে।'

'তারপর? মামা যদি ধ'রে পাগলা-গারদে দেয়?'

'তত পাগলামি করবি কেন? এমন একটু-আধটু করবি যাতে মেয়েটা ভয় পেয়ে যায়—অথচ, তুই মামার কাছে স্রেফ্ উড়িয়ে দিতে পারিস—'

'তাইতো! তুই যে আবার বেশী ক'রে ভাবিয়ে দিলি! দেখি—'

অজয় চিন্তিতমুখেই উঠে দাঁড়ায়।

'বোস্ বোস্—প্যাজের বড়া খাবি না? বৌ ভাজছে।'

'স্ত্রীলোকের হাতের কোনো জিনিস আমি স্পর্শ করব না। আমি সন্ন্যাসী হব!' মুখটা গোঁজ ক'রে অজয় বেরিয়ে যায়।

ফণী রায়ের বাড়ি বালিগঞ্জে। বেশ একটু ফাঁকার ওপরেই। বাগানও

আছে খানিকটা।

অম্বালিকা একটু ফাঁক পেয়েই অজয়কে বাগানে টেনে নিয়ে যায়—'শুনুন, একটু কথা আছে।'

যতটা সম্ভব বোকা বোকা মুখ ক'রে চায় অজয়। একটু হাসেও হি-হি ক'রে—

'ও কি, এখনই অত হাসি কেন। বিয়ে তো হয় নি।' ব'লে ফেলেই অম্বালিকা গম্ভীর হয়।

'ক'টায় উঠেছেন আজ?'

'ঘুম ভেঙেছে ছ'টায়, মামার চিৎকারে। তাই শয্যাত্যাগ করতে হয়েছে সকাল সকাল। সাড়ে আটটার মধ্যেই।'

'ওকি! সব মাটি! ব্যায়াম করেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী কী করলেন।'

'নিচে নেমেছি ধরুন বার দুই, উঠতেও হয়েছে একবার। তারপর ধরুন বাথরুমে যাওয়া, দু'বার মামার কাছে যাওয়া—'

'সিলি! ওতে কখনও ব্যায়াম হয়? পনেরো মিনিট ধ'রে ফ্রি হ্যাণ্ড জার্ক্স্। আচ্ছা, আমি বই পাঠিয়ে দেব। আমার বইটা পড়েছেন?'

'বড্ড ব্যথা হয়েছে দাঁতে। দু'দিন যাক্—'

'দাঁতের ব্যথার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

'বড্ড শক্ত যে! এর পর ঐ বই পড়তে গেলে একটা দাঁতও থাকত না।'

'ননসেন্স্। আবার ঠাট্টা। ওসব চলবে না। আমি ওসব অর্থহীন ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করি না। বিয়ের পরে আরও সোবার হ'তে হবে আপনাকে। বিয়ে হ'লেই যে স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা করতে হবে এমন কোনো মানে নেই।'

'অ! আচ্ছা।' ভালো মানুষের মত সায় দেয় অজয়।

'হ্যাঁ। আপনাকে দেখছি আরও কড়া হাতে কণ্ট্রোল করতে হবে।'

'ও বাবা!'

'চলুন। বাবা বোধ হয় এতক্ষণে খুঁজছেন আমাদের। চা আমাদের স্ট্রিক্‌টলি অ্যাট্ ফাইভ খাওয়া হয়।'

'চলুন।' যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় অজয়—'শুনুন একটা কথা।'

'কী আবার? বলুন, বলুন। বেয়ারলি আর পাঁচমিনিট সময় আছে।'

কাছে এসে গলাটা একটু নামিয়ে অজয় বলে, 'আপনাকে আমার একটা খুব বড় দেখে চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে।'

'তার মানে? পাগল নাকি আপনি।' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে অম্বালিকার।

হি হি করে হাসে অজয় খানিকটা। তারপর বলে, 'নিদেন কানটায় একটা কামড় দিই না?'

'মাই গড্! বাবা—ও বাবা—' তিন লাফে অম্বালিকা ভেতরে চ'লে যায়।

রাত্রে হরিহর অজয়কে ডেকে পাঠান, 'এর মানে কী?'

'কী মামা?'

টেবিলে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে হরিহর বলেন, 'এর মানে কী তাই আমি জানতে চাই। কী সব বাঁদরামি ক'রে এসেছিস সেখানে!'

'কৈ—কিছু তো মনে পড়ছে না মামা।' শান্ত ও সরলভাবেই বলে অজয়।

'তুই নাকি মেয়েটাকে কামড়ে দিতে গিয়েছিলি?'

'আমি? মেয়েটাকে? মানে, ঐ কনেকে। তাই কি কখনও সম্ভব মামা? এমনি মিছেকথা বলে নাকি মেয়েটা? এধারে তো খুব গম্ভীর। তাহ'লে তো দেখছি মুস্কিলের ব্যাপার!'

'হুঁ। মিছেকথা কে বলছে তার ঠিক কি? ফণী ফোন করছিল এই মাত্র। তার বিশ্বাস তোর মাথা খারাপ আছে। আমি অবিশ্যি ছ্যার ছ্যার ক'রে খুব শুনিয়ে দিয়েছি খানিকটা। আমাকে বলে ফ্যামিলিতে পাগলামির ইতিহাস আছে কি না! আমাকে! কী সাহস!......হাউএভার—তার চ্যালেঞ্জও আমি অ্যাক্‌সেপ্ট করেছি—কে ওর শালা আছে ডাক্তার, সে নাকি এই সবই দেখে—তাকে পাঠাবে কাল বিকেল চারটেয় তোর সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবে। খুব সাবধান, বেশ ভদ্রভাবে বিহেভ্ করবি।'

পরের দিন ঠিক বেলা চারটের সময় ডাক্তার ব্যানার্জী এলেন, কাঁটায় কাঁটায় চলেন তিনি—পাক্‌কা সাহেব। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'তবু ত্রিশ সেকেণ্ড লেট হয়ে গেল। গাড়ির সামনে একটা ষাঁড় পড়েছিল কিনা।'

অজয় স্মিতহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। ডাক্তার ব'সে প'ড়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'তারপর কেমন আছেন আপনি? আচ্ছা, আপনার মধ্যে কি অমনি ইচ্ছা করে নাকি? কাউকে কামড়াতে?'

'কৈ না তো!'

'না—দেখুন স্যানিটি আর ইন্‌স্যানিটির মধ্যে লাইনটা এত সূক্ষ্ম! আমরা তো এই কাজই করছি কিনা দিনরাত। কোথায় যে কার কী স্ক্রু ঢিলে থাকে! দেখুন না, কত লোক অনায়াসে বাঘ মেরে আসছে জঙ্গলে গিয়ে, অথচ হয়তো একটা মাকড়সা দেখলে মূর্ছা যায়। এমনি আপনি বেশ আছেন—কিন্তু, মুখের কাছে কারুর কান দেখলেই কামড়াতে ইচ্ছে করে। আজকাল পারফেক্টলি সেন্ মানুষ পাওয়াই শক্ত। কোথাও না কোথাও একটু ঢিলে আছেই। আমরা তো মশাই এই নিয়েই নাড়াচাড়া করছি। এক এক সময় মনে হয় আমরা এই দু'-চার জন মানসিক ব্যাধির ডাক্তার ছাড়া প্রকৃতিস্থ লোক কোথাও আছে কিনা সন্দেহ!'

'আজ্ঞে, তাহ'লে আর অত মাথাই বা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'না, তবু। ওরই মধ্যে—একটু বেছে নিতে হবে বৈকি! ওটা হেরিডেটরি হ'লেই মুস্কিল। এমনি আপনার নার্ভ্‌স্ কেমন?'

'ভালোই—এই দেখুন না,' প্রশান্ত মুখে অজয় পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা জ্যান্ত টিকটিকি বার করে—'এই তো আমি এ জন্তুটাকে কত সহজে ধ'রে রয়েছি, আমার নার্ভ তো একটুও বিচলিত হচ্ছে না, অথচ যদি আপনার জামার মধ্যে ছেড়ে দিই—'বলতে বলতেই ওঁর ওয়েস্টকোটের পকেটের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দেয় অজয়।

'আঁ—আঁ' ক'রে চেঁচিয়ে লাফিয়ে যেন ছিট্‌কে ওঠেন ডাক্তার ব্যানার্জী। যেন নেচে নেন একপাক!

'ননসেন্স, অ্যাবোমিনেব্‌ল্, হি ইজ এ ম্যাডম্যান, অ্যাজ ম্যাড্ অ্যাজ হ্যাটার!' বলতে বলতে সোজা গিয়ে ঢোকেন হরিহরের লাইব্রেরি ঘরে।

অজয় মনে মনে ধন্যবাদ দেয় বন্ধু জগদীশকে। টিকটিকি দেখলে ডাক্তার ক্ষেপে যান এ খবরটা জগদীশই দিয়েছিল ওকে।

কিন্তু, অম্বালিকার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও এদিকে ফল শুভ হ'ল না। হরিহর রেগে মুখ লাল ক'রে এসে অজস্র গালাগালি দিয়ে বললেন, 'তুই আমার নাম ডুবিয়েছিস, আমার গালে চুন-কালি দিয়েছিস। ...তোর মুখ দেখাও পাপ। দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম। নেহাত জান্নু মরবার সময় তোর ভার দিয়ে গিয়েছিল ব'লেই এবারও মাপ করলুম। কিন্তু, এক শর্তে। তিন মাস

সময় দিলুম—এর মধ্যে হয় কিছু রোজগার ক'রে প্রমাণ করবি তোর যোগ্যতা, নইলে একটি সৎ আর ভদ্রবংশের মেয়ে দেখে বিয়ে করবি। ব্যস্, আমার যে কথা সেই কাজ—তা তো জানিসই!'

অজয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চাকরি করার মত লেখাপড়া সে শিখেছে। কিন্তু, সে মেজাজ ওর নয়। অফিসে গিয়ে দশটা-পাঁচটা বসা অসম্ভব।

পচা বললে, 'তবে বিয়েই কর। সে ঢের সোজা।'

'দূর বোকা। তুই কিছু জানিস না। সে আরও ঢের হাঙ্গামা। তাছাড়া, তখন প্রাণের দায়ে যেমন ক'রে হোক টাকা রোজগার করতে হবে। হয়তো বা চাকরি করতে হবে শেষ পর্যন্ত। মামা-ব্যাটা সেই ফাঁদেই জড়াতে চায় দেখছিস না।'

'তবে?'

'টাকা থাকলে ব্যবসা করতুম।'

'পারতিস?'

'খুব। ও আর এমন কি হাঙ্গামা। কিন্তু, টাকাই নেই যে। এমন হবে জানলে কি মামার টাকাই কিছু ঝেড়ে রাখতে পারতুম না। তখন গা-ই করি নি। হাত-খরচ ব'লেও কিছু নিই নি কখনও। জানতুম যে, যখন যা চাইব তা তো পাবই!'

'এখন?'

'না—এখন আর চাওয়া যায় না। প্রেস্টিজে বাধে।'

'ব্যবসা করব বললেও দেবে না?'

'সে তো নয়ই। মামা বলে ব্যবসার তুই জানিস কী? ওকালতি শিখতে হয়, ডাক্তারি শিখতে হয়, আর ব্যবসার কিছু শেখার নেই? সব বৃত্তিরই খানিকটা শিক্ষা আছে।'

'তা নেহাত মন্দ বলে নি—যাই বলিস।' প্রশংসার সুরেই বলে জগদীশ।

'কিন্তু, তাতে আমার সুবিধে কী বলতে পারিস? আমি এখন কী করি?'

চিন্তিত কণ্ঠে জগদীশ বলে, 'আর তো কোনো পথ দেখি না। এক উপায় আছে, বীরেন চাটুজ্জ্যের রোল্স্-এর তলায় পড়া।'

হঠাৎ যেন লাফিয়ে ওঠে অজয়, 'ঠিক বলেছিস্—কেল্লা মার দিয়া। একখানা ভাঙা গাড়ি সস্তায় দেখতে পারিস? কিছু খরচ ক'রে দু'চার দিনের জন্য

চলনসই ক'রে নেওয়া যায় ?'

'কেন বল্ তো ?'

'বলছি। মোটরের নিচে পড়াটা সেকেলে হয়ে গেছে। অন্য একটা মতলব ভেঁজেছি। শোন্ তবে—'

অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনে পরামর্শ করে। জগদীশের বাড়ির পাশেই এক হিন্দুস্থানী গোয়ালা একশ' টাকায় একটা ভাঙা গাড়ি কিনে রেখেছিল। সে সেটা পাঁচ-ছ' দিনের জন্য হাতছাড়া করতে রাজি হ'ল। কথা হ'ল যে, এখন এরা গাড়িটা সারিয়ে রঙ করিয়ে নেবে এবং চলনসইও করবে। সে খরচা এদের। কিন্তু, কথা রইল যদি কোনো অ্যাক্সিডেণ্টে গাড়ি জখম হয় তো তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ করতে হবে না। সে বাবদ পঞ্চাশ টাকা তাকে একেবারে অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হ'ল।

গাড়ি মেরামত করতে আর দিন-তিনেক সময় লাগল। তারপর একদিন কোনোমতে সেটা নিয়ে ভোরবেলা অজয় বেরিয়ে পড়ল লেকের দিকে। প্রতিদিন ভোরবেলা পাঁচটার সময় স্যার বীরেনের একমাত্র নাতি সুধাংশু আসে লেকে বেড়াতে—একা। লেকের যেদিকটা নির্জন সেইদিকে নিজের টু-সীটারখানা নিয়ে বার-কতক পাক দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। এ সব খোঁজ-খবর অজয় আগেই নিয়ে রেখেছিল।

তারপর দৈবাৎ একটা বাঁকের মুখে অজয়ের গাড়ির সঙ্গে সুধাংশুর গাড়ির ধাক্কা লাগতে কতক্ষণ ?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে বললে, 'সরি, মাপ করবেন।'

অজয় গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'দোষ আমারই—মাপ চাওয়া আমারই উচিত। আমিই রং সাইডে আসতে চেষ্টা করেছিলুম।'

'না না—আমারই একটু দেখা উচিত ছিল বৈকি !'

এইভাবে খানিকটা বিনয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলার পর সুধাংশু বললে, 'তারপর ওটার অবস্থা কী ?'

হাসি হাসি মুখে মাথা নেড়ে অজয় বললে, 'না, ও আর চলবে না। দেখি, আমি বাসে ফিরে যাচ্ছি—পথে একটা ফোন ক'রে দিই এ-এ-বি কে। আর উপায় কী ?'

আপনি ,থাকেন কোথায় !' সুধাংশু জিজ্ঞাসা করে।

'এই আলিপুরের দিকে।'

'আরে আমরাও যে ঐ দিকে থাকি। চলুন, পৌঁছে দিই।'

'না—না। থাক্‌গে—বাসেই যাচ্ছি—' ইত্যাদি যথারীতি শিষ্টাচারের পর অজয় ওর গাড়িতে উঠে বসল।

সুধাংশুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সুধাংশু বলে, 'চলুন, একটু চা খেয়ে যাবেন।'

অজয় বিনয় ক'রে বলে 'আর কত অপরাধ বাড়াব।'

'ছি ছি—কী যে বলেন।'

চা খেতে খেতে সুধাংশু ওর দু'চারটে খবর জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির ঠিকানা নেয়। বলা বাহুল্য বেপরোয়া মিছে কথা ব'লে যায় অজয়। একথা সেকথার পর সুধাংশু বলে, 'দাদুর সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না অজয়। সে কি ঠিক শুনছে? এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

মুখে বলে, 'সে সৌভাগ্য কি হবে আমার।'

প্রকাণ্ড বড়লোক আর প্রকাণ্ড শিল্পপতি হ'লেও স্যার বীরেনের কথাবার্তা ভালোই। অজয়কে বললেন, 'সুধা বুঝি তোমার গাড়িটা ভেঙে দিয়েছে বাবা।'

'না না—সে দোষ আমারই।'

দু'-চারটে খুচরো আলাপের পর স্যার বীরেন প্রশ্ন করেন, 'বাবা কী কর?'

'আজ্ঞে, কিছুই করি না। তবে করবার জন্যই চেষ্টা করছি।'

'কী চাও, চাকরি-বাকরি?'

'আজ্ঞে না। সে ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। আমি চাই ব্যবসা করতে। তার জন্যে যদি কোথাও শিক্ষানবিশী করতে হয় তো তাও রাজি।'

'মূলধন আছে?'

'আজ্ঞে না। তবে খাটতে পারব।'

'হুঁ। আচ্ছা বাবা, কাল আমার অফিসে একবার যেও—ঠিক সাড়ে দশটায়।'

লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে আর নাচতে নাচতে অজয় ফিরল। জগদীশও সব শুনে আনন্দ প্রকাশ করল খুব। অজয় বললে, 'দেখলি অজয় চাটুজ্জের বুদ্ধি আছে কিনা!……বাবা এক চালে বাজিমাত!'

পরের দিন বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ারও কোনো অসুবিধা হ'ল না। দেখা গেল তিনি ব'লেই রেখেছিলেন বেয়ারাকে। অজয় যেতে স্যার বীরেন ওর হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, 'আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চের ম্যানেজার শ্যামবাবুর নামে এই চিঠি দিলুম। তিনিই হয়তো তোমাকে কোনো ওপ্‌নিং-এর সন্ধান দিতে পারবেন। কালই চ'লে যেও। আচ্ছা—'

তিনি আবার তাঁর ফাইলে মনঃসংযোগ করলেন। অজয় তো প্রস্তুতই। সে সেই দিনই দিল্লী মেলে রওনা হয়ে গেল।

গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়, কিন্তু অজয় নিজের বুদ্ধি-কৌশলে বেশ জায়গা ক'রে নিলে। দিল্লী পৌঁছল বিকালের দিকে। জগদীশ ও-কে একটা সস্তার হোটেলের সন্ধান দিয়েছিল, সেইখানে গিয়েই উঠল। স্নান ক'রে একটু চাঁদনি-চক অঞ্চলে ঘুরেটুরে বেড়াল। কিন্তু, রাত্রে ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না—আশা ও আশঙ্কায়!

পরের দিন অফিসে গিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক করিডোরে ব'সে থাকবার পর ডাক পড়ল অজয়ের।

'কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি নাকি বড়সাহেবের কাছ থেকে চিঠি এনেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সগর্বে বলে অজয়।

'কিসের চিঠি?'

'এই যে। খুলে দেখুন না।'

খাম খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে দু'খানা চিঠি—দু'খানাই খামে মোড়া; একখানাতে শ্যামবাবুর নাম লেখা, আর একখানাতে অজয়ের।

অজয়কে আবার চিঠি কেন? কেমন যেন খট্‌কা লাগে অজয়ের। সে কম্পিত হাতে চিঠিখানা খুলে ফেলে—

লিখেছে সুধাংশু;—'এইবার নিয়ে বহুবার হ'ল কিনা! এ আমরা জানি। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে দাদুর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা আপনি নিয়ে ছাব্বিশ জন করেছে। আপনি যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় ও নামে কেউ থাকে না। মোটরগাড়িখানাও আপনার নয় তা খবর নিয়েছি—প্রায় সব খবরই সংগ্রহ করেছি। এসব ব্যাপারে আমাদের যে কতকটা সুবিধা আছে তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? অন্য লোক হ'লে গ্রাহ্যই করতুম না, কিন্তু আপনার অভিনয়টা ভালো লাগল ব'লেই ডেকে এনেছিলুম বাড়িতে। আমারই একান্ত অনুরোধে দাদু আপনার সঙ্গে এ অভিনয়টুকু করতে রাজি হয়েছিলেন। আশা করি, এই

ব্যাপারে আপনার এ শিক্ষাটুকু হ'ল যে বড়লোকদের আর অতটা বোকা ভাববেন না।

অজয়ের মনে হ'তে লাগল পায়ের নিচে থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে।

শ্যামবাবু মুখ তুলে বললেন, 'আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন তো, আমার চিঠিতে শুধু লেখা আছে যে, পত্রবাহককে কলকাতা পর্যন্ত ফিরে আসার গাড়ি-ভাড়াটা দিয়ে দেবেন।'

মুহূর্তের মধ্যে অজয় সামলে নিলে নিজেকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ একটা খুব কনফিডেন্সিয়াল কাজ। এর সব বিবরণ আপনাকে দিতে পারব না।

শ্যামবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। শুষ্কস্বরে বললেন, 'তা কত দিতে হবে আপনাকে?'

'তাইতো, আমার উপর যা ইন্সট্রাকশান—এখান থেকে যেতে হবে অমৃতসর, সেখানে থেকে বিকানীর, ভবনগর, আমেদাবাদ বোম্বাই হয়ে ব্যাঙ্গালোর, সেখান থেকে ত্রিচি হয়ে মাদ্রাজ—তারপর কলকাতা। একটু হিসেব ক'রে দেখতে হবে। ব্র্যাডশ আছে?'

'আপনি আমাদের ট্রান্সপোর্ট ক্লার্কের কাছে যান, সেখান থেকে ব্র্যাডশ দেখে যত টাকা হয় হিসেব মত ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। আমি ব'লে দিচ্ছি—'

ভারত-পরিক্রমার ফার্স্টক্লাস গাড়ি-ভাড়া হিসেব ক'রে প্রায় সাড়ে সাত-শ'টাকা নিয়ে অজয় বাড়ি ফিরে এল।

দিন-তিনেক পরে সুধাংশু ফোন করলে, 'না, আপনারই জিত! দাদু আপনার বুদ্ধির খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন যে, আমাদের বাড়ি আপনার অবাধ নিমন্ত্রণ রইল। আর যদি সত্যিই ব্যবসা শিখতে চান, তবে আমাদের অফিসে এসে ব'সে থাকতে পারেন চোখ এবং কান খুলে—পারেন কিছু শিখবেন। তবে এ তো বড় বড় ব্যাপার, ক্যাপিটাল চাই। চাকরি চান তো তাও পেতে পারেন।'

দুই বন্ধুতে মিলে আবারও পরামর্শ-সভা বসল। জগদীশ বললে, 'মামাকে বল্—স্যার বীরেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তিনি তোকে অফিসে যেতে বলেছেন। শুনলে মামা খুশীই হবেন। চাইকি এর পর ক্যাপিটালেরও অভাব হবে না।'

অজয় বললে, 'না। ছাখ, মামার সাহায্য না নিয়েও যে কিছু করতে পারি, সেইটে প্রমাণ করব। আমি চাকরিই করব। ওরা যদি চাকরি দেয় তো খুব একটা সামান্য চাকরি হবে না নিশ্চয়ই—'

অজয় চাকরিই নিলে। এধারে সুধাংশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পেকে উঠল। বাড়িতে যাতায়াত। কিন্তু, একদিন দেখা গেল সুধাংশুর একটি বোন আছে—এবং সেই আদুরে মেয়েটি অজয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়তে চায়। অগত্যা একদিন অজয়কে ডুব মারতে হ'ল। কারণ, অজয়ও ইতিমধ্যে প্রেমে পড়েছিল—এক টেলিফোন-গার্লের সঙ্গে দিল্লী থেকে আসতে আসতে পথের আলাপ হয়েছিল। সে মেয়েটি বৈশ্য, তাকে বিয়ে করতে মামা মত দেবেন না নিশ্চয়। অথচ, এধারে তিন মাস মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, মামা সত্যিই এককথার মানুষ!

অজয় জগদীশের শরণাপন্ন হ'ল—'কা করা যায় বল্!'

জগদীশ অনেক ভেবে বললে, 'ঐ মেয়েটাকে—মানে তোর প্রিয় বকুলমালাকে মামার নজরে ফেলাতে হবে।'

'তার মানে?'

'কোনোমতে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যদি ওঁর নজরে পড়তে পারে তাহ'লে আর ভাবনা নেই। তখন সহজেই রাজি হবেন। এখন এমন বিয়ে তো কতই হচ্ছে।"

'কিন্তু, সেটা কী ক'রে হবে?'

'সে হবে। তোর মামার সেই বইটা বেরিয়েছে না?'

'হ্যাঁ।'

'তবে ঠিক আছে। আমি একটা চিঠির মুশাবিদা ক'রে দিই—সেই চিঠিট তুই বকুলকে দিয়ে কপি করিয়ে পাঠিয়ে দে দিকি।'

জগদীশ অজয় তথা বকুলকে যে চিঠি দিল তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই যে, হরিহর বাবুর বই প'ড়ে বকুল মুগ্ধ। সে একবার ওঁকে দর্শন করতে পেলে ধন্য হয়ে যায় বই থেকে দু'চারটে লাইনও সে চিঠিতে তুলে দেওয়া হ'ল, অর্থাৎ কত ভালো ক'রে পড়েছে তারই নমুনা-স্বরূপ।

পরের দিনই চিঠির জবাব এল। হরিহরের চাকর নিজে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দিয়ে গেল। যে কোনো সময় বকুলমালা যেতে পারেন—তাহ'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন রায়সাহেব হরিহর মুখুজ্জে।

জগদীশ বললে, 'হুর্‌রা।'

অজয় বললে, 'তোর কি বুদ্ধি মাইরি!' সে আবেগে জড়িয়েই ধরলে বন্ধুকে।

'কী খাওয়াচ্ছিস বল্!'

'শুভ কাজ মিটে যাক। তোকে গ্রেট্-ইস্টার্ণে একদিন ভালো ক'রে ডিনার দেব।'

দিন সাতেক পরে একদিন হঠাৎ অজয় একটা স্যুটকেস হাতে ক'রে এসে উঠল জগদীশের বাড়ি। মুখ অন্ধকার।

'কি রে, ব্যাপার কী?'

'চ'লে এলাম—ফর গুড্!'

'তার মানে?'

অনেকক্ষণ কোনো কথা কইলে না অজয়, গুম্ খেয়ে ব'সে রইল। তারপর আরও খানিকটা সাধাসাধির পর বললে, 'স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করবে না, সর্বদা তার কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকবে—এই শিক্ষা আজ হ'ল আর কি!'

'কেন?' বকুলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?'

আনন্দলেশহীন একরকমের শুকনো হাসি হেসে বললে, 'ঝগড়া? আমার মত সামান্য লোকের সঙ্গে ঝগড়া করার আর তার প্রয়োজন নেই। তিনি এখন আমার গুরুজন!'

'তার মানে?' জগদীশ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায়।

'মামার সঙ্গে আজ তার বিয়ে।'

'মামা! বুড়ো রায়সাহেব?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। রায়সাহেব হরিহর মুখুজ্জে।'

'তার মানে?'

'তার মানে রায়সাহেবের পয়সা আছে। তাঁকে বিয়ে করা মানে এখনই সে সবের মালিক হওয়া। আর আমি, ভ্যাগাবণ্ড্! মামা মলে তাঁর বিষয় পাব—ইতিমধ্যে আর কিছু হ'লে তা থেকে বঞ্চিতও হ'তে পারি।'

'তা, তুই কী করলি?'

'স্যুটকেস হাতে ক'রে বেরিয়ে এসেছি। আর কী করব।'

'বিনা প্রতিবাদে?'

'একবার তার বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখা করে নি। ব'লে পাঠালে সময় নেই।'

'এখন কী করবি?'

'মুটেগিরি, ভিক্ষে—মামারবাড়ি চাকরি করা ছাড়া সব কিছু··· আর এমনিও, মামা না হয় মামী তাড়াত।'

বিকেলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অজয় গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে দেখলে এক বামপন্থী দলের কী একটা মিটিং হচ্ছে এক জায়গায়। খানিকটা মনোযোগ দিয়ে শুনলে সে, তারপর হঠাৎ তারই ফাঁকে উঠে এক প্রচণ্ড বক্তৃতা করলে। প্রসঙ্গটা ছিল কোন্ কারখানার শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমাবার বিষয়—সেখান থেকে অজয় অনায়াসে বড়লোকদের বিশেষত অলস ধনী লোকদের প্রসঙ্গে চ'লে গেল এবং মনের ঝাল মিটিয়ে মামাকে গালাগালি দিলে।

যে নেতা সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি খুব খুশী হয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। সভার শেষে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য যে কলেক্‌শন হ'ল, তাতে অজয়ই টাকা তুলল সব চেয়ে বেশী। বাড়ি ফিরে দেখলে, সেই টাকা থেকেই নেতা তাঁর বাজার খরচ এবং গয়লার টাকা মেটালেন। আগে যে গয়লা দুধ দিত, সে সাত মাসের টাকা পায় নি—সে আসাতে নেতা তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ক্যাপিটালিস্ট, বুর্জোয়া ইত্যাদি গালাগাল শুনে সে বেচারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। নেতার স্ত্রীও কোথা থেকে বক্তৃতা সেরে ফিরলেন রাত্রে। কিন্তু, বাইরের শ্রমিকদের ছুটি নিয়ে যতই আন্দোলন করুন, বাড়ির চাকর একদিন ছুটি চাওয়ায় অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন। অজয় তাকে আড়ালে ডেকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে শুনলে, আট মাসের মাইনে এঁদের হাতে—পালাবে কী নিয়ে?

গৃহিণী প্রথমে অতিথি জুটিয়ে আনায় স্বামীর উপর খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু অজয় তোষামোদে তাঁকে খুব খুশী ক'রে তুললে, তার ওপর স্বামী যখন গোপনে শুনিয়ে দিলেন যে, আজকের টাকার অধিকাংশই অজয়ের রোজগার—তখন বেশী ক'রে যত্ন করতে লাগলেন।

কথায় কথায় অজয় আবিষ্কার করল যে, এদের সঙ্গে কোনো পার্টিরই কোনো সম্পর্ক নেই—সবটাই ছদ্মবেশ।

পরের দিন মিটিংএ টাকা কলেক্‌শন করার পর প্রায় শ' দেড়েক টাকা নিয়ে অজয় স'রে পড়ল।···

পচার বাড়িতেই থাকে বটে, কিন্তু অজয় বুঝতে পারে যে, ওর অসুবিধা হচ্ছে। পচা পরামর্শ দেয় যে, সরকারী কনট্রাক্ট দু'-একটা যোগাড় কর। কে এক মিসেস্ চাউড্রি আছেন, তাঁর সরকারী মহলে অগাধ প্রতিপত্তি—তাঁকে কিছু টাকা দিলে সুবিধে হ'তে পারে।

মিসেস্ চাউড্রিকে খুঁজে বার করে অজয়। তিনি বলেন, 'কোন্ মিনিস্ট্রী? ইরিগেশন্, হ্যাঁ—হবে। হাজার টাকা লাগবে। ক্যাশ প্লীজ্। টাকা দিয়ে যাবেন, তিন দিন পরে খবর।'

অজয়ের হাতে যা ছিল আর জগদীশ যা পারল যোগাড় ক'রে দিলে। হাজার টাকা গুনে দিয়ে এল। মিসেস্ চৌধুরী কোমলকণ্ঠে বললেন, 'চীফ্ও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। বলেন তো ওখানেও কিছু করতে পারি—তিন হাজার লাগবে!'

তিন দিন পর গিয়ে শুনলে, মিসেস্ চৌধুরী ইউনেস্কোর কী একটা প্রতিনিধি হয়ে বিলেত গেছেন। ওর জন্যে একটা খাম আছে। খামখানা খুলে দেখলে এক সওদাগরী অফিসে পঞ্চান্ন টাকা মাইনের একটা অস্থায়ী চাকরির নিয়োগ-পত্র —ওর নামে।

অজয় আর পচার বাড়ি ফিরল না। অবশিষ্ট যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে রুদ্রাক্ষ মালা একছড়া এবং গেরীমাটি সংগ্রহ ক'রে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। সন্ন্যাসী বা জ্যোতিষী,—এখন এই একটি মাত্র পথই খোলা আছে। সংসার যখন তাকে এমন ক'রে ঠকালে, সে-ই বা ঠকাবে না কেন? সন্ন্যাসী সেজে একদিন বকুলমালার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবে—আজ থেকে এই হবে ওর জীবনের ব্রত।*

* একটি চিত্রনাট্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী-রূপ। স্থানে স্থানে বিলাতী গল্পের প্রভাব আছে।

## ছায়ার মায়া

কলকাতার জল কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না—স্থির করলুম কয়েকদিন কোথাও ঘুরে আসব। ভায়া পরামর্শ দিলেন, বিন্ধ্যাচল তো তোমাকে বেশ স্যুট্ করে, সেখানেই কেন যাও না।

কথাটা মন্দ লাগল না। কিন্তু, বিন্ধ্যাচলে যে বাড়িতে প্রত্যেকবার যাই, সেটাতে ইলেক্‌ট্রিসিটি নেই। এই পচা গরমে পাখা ছাড়া চলবে না। ভেবেচিন্তে পাণ্ডাকে চিঠি লিখলুম, বিজলী আছে এমন বাড়ি ঠিক কর। গিয়ে পাখা ভাড়া করা যাবে।

সাতদিন পরে পাণ্ডার কাছ থেকে উত্তর পেলুম।—বাবুজী যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনটিই পাওয়া গেছে মির্জাপুর শহরে, গঙ্গার ওপর। বিজলী তো আছেই—আলো পাংখা সব লাগানোই আছে। সাহেবের বাড়ি—ফার্নিচার ভি সব আছে। কোনো তক্‌লিফ হবে না—বাবুজী এসে পৌছলেই হয়। কেরায়া ভি বহুত সস্তা—মোটে তিশ রূপৈয়া।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল।

দিলুম টেলিগ্রাফ-মনিঅর্ডারে ত্রিশটি টাকা পাঠিয়ে, তারপর এক শুভদিন দেখে ট্রেনে চ'ড়ে বসলুম। সঙ্গে রইল এক ঠাকুর, একটি চাকর এবং ভাগ্নীজামাই হরিদাস। হরিদাস অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসেছিল—প্রস্তাবটা করতেই রাজি হয়ে গেল। একটি সঙ্গী পেয়ে আমিও বেঁচে গেলুম হরিদাস সিগারেট খায় না—সুতরাং মামা-শ্বশুরের সঙ্গে যেতে তার আপত্তি নেই

পৌছে দেখলুম সে এক বিরাট কাণ্ড। কতকালের প্রকাণ্ড বাড়ি। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাগানের ভিতর দোতলা মস্ত বাড়ি। কিন্তু, সে দোতলা চারতলার সমান। এক একটি তলা বোধ হয় বিশ ফুট উঁচু, কিংবা আরও বেশি। বাড়িটার সবই বড় বড়। ঢালাই লোহার ফটক দুটো যেন দৈত্যপুরীর কপাট। বিপুল সিঁড়ি। দরজা জানালাগুলো দশ ফুট ক'রে উঁচু। এক একটা ঘর—কুড়ি ফুট লম্বা, ষোল ফুট চওড়া। নিচের তলায় খান-পাঁচেক ঘর—ওপর তলায় খান তিনেক। এ ছাড়া নিচে ভেতর দিকে চাকর-বাকরদের জন্য আউট-হাউস আছে—সেখানেও সার সার ঘর। সবগুলো খোলা হাঁ-হাঁ করছে। ভেতরে জমে-ওঠা জঙ্গলের গাদায় গাছ গজিয়ে গেছে সে সব ঘরে।

'এত বড় বাড়িটার মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া?' পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উত্তর দিলেন যে, এখানে কে আর এত টাকা দিয়ে ভাড়া নিচ্ছে! যে আসে তারই দু'-একটা ঘর দরকার হয়। কাজেই, ভাড়া কমাতে হয়। ভাড়াটে যদি আরও আসে, তাহ'লে তাদের নিচের তলায় বসিয়ে দেবেন। আমাদের জন্য ওপর তলা তিনি ধুইয়ে সাফ করিয়ে রেখেছেন। নিচে

তলাও ঝাড়ু দেওয়া আছে—কিন্তু, আমাদের তো আর দরকার হবে না।

ওপর তলায় পৌঁছে বেশ আনন্দ হ'ল। বড় বড় ঘর। তাতে দামী মেহগ্নি খাট—গদিপাতা। পাখা আছে, আলো আছে। ওয়ার্ডরোব, দাঁড়া-আয়না, টেবিল-চেয়ার। বাথরুমে সাহেবী প্রথা। বাথটব অবধি আছে।

'কার বাড়ি এটা পাণ্ডাজী?' হরিদাস প্রশ্ন করলে।

'বাড়ি তো বাবুজী এক সাহেবের।' পাণ্ডাজী সবিস্তারে বললেন যে, আগে এখানে নীলকুঠির এক সাহেব থাকত। তারপর তার ছেলের কাছ থেকে কেনে আর এক সাহেব। ওর ছিল কার্পেট-গালিচার কারবার, সে আবার নতুন ক'রে বাড়িটাকে তৈরি করে। তারপর বিহারে যেবার ভূকম্প হয়, সাহেবের বিবি ছেলেমেয়ে সে সময় সব ছিল ওর শ্বশুরবাড়ি মজঃফরপুরে। একমিনিটে সব খতম—সেই খবর পেয়ে সাহেব ছুটল সেখানে—আর ফিরল না। ওখান থেকে সোজা বিলেত চ'লে গেল। পাণ্ডাজী বললেন—'এই বাড়ির আউর এই কারবারের জিম্মেদারি দিয়ে গেল ওর ভাতিজাকে। সে সাহেবের বহুৎ ভারী কারবার আছে—ইলাহাবাদে, জৌনপুরে, চুনারে—সে এ বাড়ি নিয়ে কী করবে? এখানের চাবি দিয়ে রেখেছে পুলিশের দারোগার কাছে। কেউ কিরায়ামে নেয় তো দেয়—নইলে, প'ড়েই থাকে।'

মোটামুটি বাড়িটা ভালোই। চারধারে বিস্তৃত বারান্দা। ইজি-চেয়ার আছে, ব'সে ব'সে গঙ্গা দেখার খুব সুবিধা। আমি তো তখনই ব'সে পড়লুম। হরিদাস আর পাণ্ডা মিলে বাজার-হাট করলে—একটা স্থানীয় চাকরও ঠিক হ'ল—জল তোলার জন্যে। কলকাতার 'বাবু-চাকর' এই সিঁড়ি ভেঙ্গে জল তুলতে পারবে না।

এককথায় গৃহস্থালি পেতে বসা গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েছি সকাল ক'রেই, কিন্তু ঘুম আসছে না। তার প্রধান কারণ—দুপুরে একটু দিবানিদ্রা হয়েছে, তার ওপর শুয়েছি রাত ন'টায়—কলকাতায় তখন সন্ধ্যা রাত। রাত বারোটার কম বাড়িতে কোনো-দিনই শোওয়া হয় না। সুতরাং, ঘুম আসাটাই বিচিত্র। তার ওপর অসহ্য গুমোট। পাখাগুলো বহুদিনের অব্যবহারে প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। তেল যে তাতে কতকাল পড়ে নি তার ঠিক নেই। কাজেই, পাখা ঘুরছে মন্থরতম গতিতে, তাতে কিছু ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ আওয়াজ হ'লেও হাওয়া হচ্ছে না কিছুমাত্র।

ঘামে এখনই মাথার বালিশ ভিজে উঠেছে। শুধু এপাশ-ওপাশ করছি।

সবচেয়ে বিপদ এই—হরিদাস দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এইটে আরও অসহ্য। আপনার ঘুম হচ্ছে না—অথচ, পাশেই একজনের নাকের ডাক নিয়মিত ছন্দে গর্জন ক'রে চলেছে—এ কতক্ষণ সহ্য করতে পারেন?

বিরক্ত হয়ে উঠে বসলুম।

বাইরে যাকে বলে নিঃসীম অন্ধকার। কালো মেঘের স্তূপ ঝুঁকে পড়েছে গঙ্গার ওপর। ফলে, গঙ্গার জলও কালো হয়ে উঠেছে—সবটা জড়িয়ে একটা একাকার কালিমা, সামান্য হাওয়াও নেই কোথাও।

ওপরের তিনটে ঘরের এক প্রান্তের ঘরটা আমরা নিয়েছিলুম—আর এক প্রান্তের ঘরে ছিল ঠাকুর ও চাকর। মাঝের ঘরটা খালিই পড়েছিল। একেবারে খালি নয় ঠিক—বাক্স, স্যুটকেস ইত্যাদি মালপত্রগুলো রাখা হয়েছিল। কিন্তু, এ ঘর থেকে ও ঘর অবধি মাঝের দরজাগুলো খোলাই ছিল। ফলে, ও-পাশের ঘর থেকে ঠাকুরদের নিয়মিত নিশ্বাস পড়ার শব্দও নিস্তব্ধ আবহাওয়া ভেদ ক'রে এখানে এসে পৌঁছচ্ছিল।

এককথায় সবাই ঘুমোচ্ছে, আমি ছাড়া।

বিরক্তিতে মন ভ'রে গেল। স্লিপিং-ট্যাবলেট বা ঘুমের বড়ি সঙ্গেই আছে অবশ্য—কলকাতাতে তো ওটি নিত্যসঙ্গী। কিন্তু, এখানে ওটা ব্যবহার করব না প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা গেল না দেখছি। এমন ক'রে জেগে থাকার জন্য এখানে আসি নি—

বালিশের নিচে থেকে হাতড়ে ট্যাবলেটের শিশিটা বার করলুম। জল পাশেই আছে টুলের ওপর। কিন্তু, বড়িটা বার ক'রে নিয়ে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াব, এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মাঝের দুটো কম্যুনিকেটিং দোরই খোলা ছিল সম্পূর্ণ—হঠাৎ সেই চারখানা পাল্লা বিরাট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল—এবং এক মুহূর্ত পরেই আবার নিঃশব্দে খুলে গেল।

কী রকম হ'ল? কোথাও একবিন্দু বাতাস নেই, গঙ্গার বুকে জমাট মেঘ, গাছের পাতার ডগাটুকু পযন্ত কাঁপছে না। তাছাড়া মাঝের ঘরটার বাইরের দিকের—অর্থাৎ, দালান এবং বারান্দা দু'দিকেরই—কপাট বন্ধ, হাওয়া তো কোথাও থেকে আসবার কথা নয়! হাওয়া নেইও—তবে এ বন্ধ হ'ল কোথা থেকে, বন্ধ করলে কে!

সে প্রচণ্ড আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। হরিদাস ঘুমের ঘোরে

'চোর চোর' ব'লে লাফিয়ে উঠেছে। ওধারে ঠাকুরের কণ্ঠে বহুদিন পরে মাতৃভাষা ধ্বনিত হয়েছে— 'আউ! হেলা কঁড় ?'

আমি অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টর্চ জ্বেলে উঠে দাঁড়িয়েছি। ছুটে গিয়ে আলোটাও জ্বেলে দিলুম। পনেরো বাতির আলো মিটমিট করতে লাগল অত বড় ঘরটায়—কিন্তু তা হোক, সবই দেখা যাচ্ছে অন্তত।

এর পর আমরা চারটি প্রাণী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম সব। তিনটে ঘরের কাবার্ড খুলে, ওয়ার্ডরোব খুলে খুলে দেখলুম, খাটের তলা, বাথরুম—সব। দালানের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরের বারান্দা বানরের ভয়ে মজবুত এক্সপ্যাণ্ডেড্ মেটালের জাল দিয়ে ঢাকা। কোথাও থেকে বাইরের কোনো লোক আসবার সম্ভাবনা নেই। তবে এতবড় দরজার ভারী ভারী দু' ইঞ্চি পুরু কাঠের পাল্লা বন্ধ করলে কে—আবার তৎক্ষণাৎ খুললেই বা কে ? খুব বেশী রকম ঝড় না উঠলে এমনটা হবার কথা নয়—অথচ, বাতাস তো একেবারেই নেই। আর বাতাস এলে অন্য জানলাগুলোও তো বন্ধ হ'তে পারত!

কোনো মীমাংসাই হ'ল না। অনেকক্ষণ ধ'রে গুলতানি সার হ'ল শুধু। আমার তরুণ জামাতাবাবাজী হুকুম করলেন ঠাকুর-চাকরকে, 'তোরা বরং এই ঘরে এসে শো।'

তারা ঠিক অবশ্য অতটা করলে না—আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় বিছানা এনে শুল।

কিন্তু, পরের দিন ভোরবেলা উঠে আর সন্দেহ রইল না যে, কোনো লোকই এসেছিল আগের দিন রাত্রে। কারণ, আমার বাথরুমের ঠিক মাঝখানে একরাশ ময়লা বা পুরীষ!

প্রথমে ভেবেছিলুম আমার মূর্তিমানরাই কেউ ঘুমের ঘোরে উঠে এ কার্য করেছে, কিন্তু তারা নানারকম কঠিন শপথ ক'রে অস্বীকার করলে। তাছাড়া, ওধারের ঘরের সঙ্গেও বাথরুম আছে। আমি বারবার সকলকে ব'লে দিয়েছি আমার বাথরুম যেন কেউ না ব্যবহার করে। তৎসত্ত্বেও এই কাণ্ড করবে, এমন সাহস কারও নেই। তাছাড়া, আমার তো সমস্ত রাত ভালো ক'রে ঘুমই হয় নি—ওরা কেউ উঠলে আমি টের পেতুম।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। একেই তো এই প্রকাণ্ড হানাবাড়িটায় এসে পর্যন্ত মনটা কেমন ভারী ভারী লাগছে—সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন

বুকচাপ, তার ওপর এসব কী কাণ্ড !···

সেদিন রাত্রে বাথরুমে চাবি দিয়ে শুলুম। মাঝের ঘরের দরজার কপাটগুলো ছিটকিনি দিয়ে আটকে দিলুম। সতর্কতার কোনো ত্রুটি কোথাও রইল না। সেদিন ঘুমও এসে গেল সকাল সকাল—

অকস্মাৎ কিন্তু আবার সেই শব্দ !

দড়াম—দড়াম—

চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছিট্‌কিনি লাগিয়েছি আমি নিজের হাতে—মজবুত ছিট্‌কিনি, সে খুললে কে ? আজও তো হাওয়া নেই। কাল পাখাটা সামান্য ঘুরছিল আজ সেটুকুও নেই। সন্ধ্যা থেকে অচল হয়ে রয়েছে।

তবে ?

সকলেই উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে। আজও তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল—কিন্তু, সে কতকটা কলের মতই। কারণ, সকলেই জানে যে, বাইরের লোক কেউ নয়, বাইরের লোক আসবার উপায় নেই—

মুখ শুকিয়ে উঠেছে আজ সকলেরই। হরিদাসের পা দুটো অল্প কাঁপছে তা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। ঠাকুরের চোখে-মুখে তো স্পষ্টই বিদ্রোহের ভাব। আমি বেগতিক বুঝে আগেই বললুম, 'মাঝের ঘরের এই দরজাগুলোও বন্ধ ক'রে দাও, আর তোমরাও এই ঘরে এসে শোও।'

বাকি রাতটুকু কারুরই ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না। ভোরবেলাই উঠে পড়লুম, প্রাতঃকৃত্য সেরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাব ব'লে।

কিন্তু, বাথরুমের চাবি খুলে ভিতরে গিয়ে দেখি—ঠিক আগের দিনের মত সেই একই জায়গায়—ময়লা ! চাবিটা তখনও আমার হাতেই ধরা আছে। সারারাত বালিশের তলায় ছিল।

হরিদাস বললে, 'মামাবাবু চলুন, আজই একটা অন্য বাড়ি দেখে উঠে যাই।'

আমি বললুম, 'দ্যাখো তুমি আমি দু'জনেই সায়েন্সের ছাত্র। আমরা যদি এইভাবে সামান্য কারণে পালাই তো লোকে বলবে কী ? বিজ্ঞানপাঠকে ধিক্কার দেবে যে ! আমাদের এত দিনের শিক্ষা সংস্কৃতি তবে কী কাজে লাগল ?'

অগত্যা হরিদাস চুপ ক'রে রইল বটে, কিন্তু মনে মনে যে খুব জোর পেলে না—তা তার মুখ দেখেই বুঝলুম।

সন্ধ্যের সময় পাণ্ডাজী এলেন।

'বাবুজী, কোই তকলীফ্ তো নেহি হোতা হ্যায় ?'

একটু চটেই ছিলুম। বললুম, 'ঠাকুর, খুব বাড়ি দিয়েছ। তোমার খুব দয়া। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।'

পাণ্ডাজী একটু যেন কেমন ভাবেই প্রথম প্রশ্নটা করেছিলেন। এখন আমার কথা শুনে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল, 'কেঁও বাবুজী, কেয়া বাত হ্যায় ? এয়সা কোই ডর-উর তো নেই লাগতা ?'

তৎক্ষণাৎ চেপে ধরলে হরিদাস, 'কেন, তুমি ভয়ের কথা জিজ্ঞেস করছ ? কী ব্যাপার বল তো ?'

'নেহি নেহি বাবুজী—এয়সা কোই খাস বাত নেহি হ্যায় ! অমি ভাবল কি এত্তা বড় বাড়ি আছে, আর বাবুদের ভি আদমী কম—ডর তো লাগতেই পারে !'

প্রশ্ন করলুম, 'ঠিক ক'রে বল দেখি ঠাকুর—কোনো ভয়ডর সত্যিই আছে কি না !'

'না, না, কুছুনা, কুছুনা, এমন বাড়ি আপনাকে হামি দেব ? বিন্ধ্যবাসিনী জানেন, আমি আপনাদের জন্য কেতো ভাওনা রাখি।'

'তাহ'লে ঠাকুর এসব কা ব্যাপার বল তো !'

খুলে বললুম ঘটনাটা।

শুনতে শুনতে পাণ্ডাঠাকুর একটু স'রে বসলেন কাছাকাছি—সেটাও লক্ষ্য করলুম। তারপর উত্তর করলেন, 'নেহি নেহি বাবুজী, ইসব ভ্রান্তি হ্যায়। এ রোকম কভি কভি হোতা হ্যায় বাবুসাহেব। লেকিন কুছ ডর নেহি—গঙ্গামায়ীকা ইলাকা হ্যায়, বিন্ধ্যবাসিনী মাতাকী আস্থান—হিঁয়া কুছ ডর নেহি। জয় রামজীকি।'

ব'লেই তিনি উঠে পড়লেন। হরিদাস বসতে বললেও তিনি বসলেন না—বললেন, জরুরী কাজ মনে প'ড়ে গেছে, বসবার উপায় নেই। তারপর আমাদের সমবেত নমস্কারান্তে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতটা তুলে 'জয় সীতারাম, জয় সীতারাম' বলতে বলতে নেমে গেলেন।

তখন বারান্দায় বসেছিলুম। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। পরিষ্কার আলোয় দেখলুম, পাণ্ডাজীর পিছু পিছু কথা কইতে কইতে যাচ্ছে আমাদের চাকর হারু।

ফিরে এলে, এমনি অলস কৌতূহলেই প্রশ্ন করলুম, 'তোর আবার পাণ্ডাজীকে

কী দরকার হ'ল রে?'

সে হেসে বললে, 'আমার কেন দরকার হবে বাবু। দরকার ঠাকুর-মশাইয়েরই। সিঁড়ির মুখে আমাকে পাকড়াও করলেন। বললেন, 'জিরাসা ফটক তক্ পঁওছায় দেও, বহুত ডর লাগতা।'

হরিদাস তো চটে আগুন, বলে—'কাল এলে ওর টিকি কেটে ছেড়ে দেব ভণ্ড জোচ্চোর কোথাকার। জেনেশুনে একটা ভুতুড়ে বাড়িতে তুলে দিয়েছে—আবার মুখের সামনে সাওখুড়ি দ্যাখো না!'

অতি কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করি।

সেদিন রাত্রে আর দরজার আওয়াজ হ'ল না। কারণ, মধ্যের ঘর একেবারে বন্ধ ক'রে শুয়েছি, দুটো দোরেই তালা দেওয়া। কিন্তু, তবু মাঝ রাতে কেন জানি না—ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে প্রাকৃতিক কার্য সেরে এসে শুলুম—কিন্তু, আর কিছুতেই ঘুম এল না। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো, এখন আর ঘুমের ওষুধ খাবার মানে হয় না! জেগেই রইলুম।

একটু পরে মনে হ'ল দূর থেকে কী এক ধরনের সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। খুব মৃদু—কিন্তু, অস্পষ্ট নয়। ক্রমে আর একটু জোর হ'ল। কে যেন নাচছে কোথায়—ঘুঙুর পায়ে—তার সঙ্গে সারেঙ্গ-তবলার সঙ্গত চলছে—ভালো লাগল খুব। কান পেতে শুনতে লাগলুম।

বেশ নাচছে তালে তালে। অতি মধুর লাগল আওয়াজটা।

এত রাতে নাচগান হচ্ছে কোথায়?

বেরিয়ে বারান্দায় এলুম—শব্দটা আরও মৃদু হয়ে গেল। না, পাড়ায় কোথাও নয়।

ভেতরের দালানে এসে দাঁড়াতে কিছুটা জোর হ'ল বরং।

আরে—এ যেন মনে হচ্ছে আমাদের ভেতরের বাগানেই কোথাও নাচগান হচ্ছে—

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই তো। কুয়াতলা, নিচের খোলা বাথরুম, বাঁধানো চাতাল সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাচগান তো দূরের কথা—মানুষেরই চিহ্ন নেই কোথাও। ও-পাশের আউট-হাউসগুলো তেমনি ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে হা-হা করছে, সেখানেও জনমানবের অস্তিত্ব নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

অথচ, বেশ মনে হচ্ছে ঐ নিচে থেকেই—

আস্তে আস্তে দালানের খিল খুলে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে পড়লুম। খোলা সিঁড়ি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। একটুও ভয় হ'ল না তখন। শুধু কৌতূহল আর ঐ মধুর শব্দের দিকে একটা অদম্য আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে তখন।

নেমে এসে বাগানে পড়লুম।

ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে শব্দটা। যেন মনে হচ্ছে ঐ নিমগাছের পাশের বাঁধানো চবুতারাটা থেকেই শব্দটা আসছে। যেন ঐখানেই নাচছে কেউ—

আরও কাছে এলুম।

সঙ্গীতে ডুবে যাচ্ছি। মধুর সঙ্গীত আর লঘুপায়ের নাচ। অশ্রান্ত, অক্লান্ত সে নাচ। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত তার লয়—কিন্তু, থামছে না কখনই। সারেঙ্গ-তবলারও যেমন বিশ্রাম নেই, তেম্‌নি ঘুঙুরেরও না।

অভিভূতের মত এগিয়ে গেলুম বাঁধানো চাতালটার কাছে।

হ্যাঁ, এইখানেই তো। এই চাতালেই নাচ হচ্ছে। মনে হ'ল আমার সামনেই নাচছে কেউ। তাকে ছুঁতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না, একথাও ক্রমশ যেন ভুলে গেলুম। মনে হ'ল ঐ তো ওর পেশোয়াজের প্রান্ত উড়ছে আমার চোখের সামনে, ঐ তো শুনতে পাচ্ছি তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ার শব্দ। এমন কি আমারই আশেপাশে ব'সে যারা তবলা ঠুকছে বা সারেঙ্গে ছড়ি টানছে তাদের ক্লান্ত দ্রুত নিশ্বাসও শুনতে পাচ্ছি। যেন তাদের উপস্থিতির উষ্ণতাও অনুভব করছি—

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলুম জানি না—হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠতে যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

একি, কত রাত হ'ল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত চারটে বাজে। উঠে পড়লুম তাড়াতাড়ি। এখন যেন কেমন গা-টা ছম্‌ ছম্‌ করছে। খোলা আউট-হাউসগুলোর দিকে চেয়ে মনে হ'ল কারা যেন ওখান থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে নিঃশব্দে—হিংস্র দৃষ্টি মেলে—

একরকম ছুটেই ওপরে চ'লে এসে দালানের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলুম।

চম্‌কে উঠে হরিদাস তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'কে?'

উত্তর দিলুম, 'কেউ না, আমি!'

পরের দিন সকালেও কথাটা কাউকে বললুম না। মনে মনে ঠিক করলুম, সে রাত্রেও যদি ঐ রকম শুনি তো এদের ডেকে শোনাব।

কিন্তু, তার আগেই সন্ধ্যারাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না, হারুকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস গিয়েছিল বাজারে—ঠাকুর রান্না করছে, আমি আস্তে আস্তে নেমে এসে সেই বাঁধানো চাতালের কাছে দাঁড়ালুম। সে সময়ই কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা—এইটে পরীক্ষা ক'রে দেখাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, কিছুই শোনা গেল না—বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও না।

শোনা কিছু গেল না বটে, কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। আকাশ নির্মেঘ, শুক্লাচতুর্দশীর চাঁদ বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে ইতিমধ্যেই। পরিষ্কার ফুটফুটে জ্যোৎস্না! কোথাও মেঘের কোনো চিহ্নও নেই। তবু মনে হ'ল যে, আমার মাথায় এবং চারপাশে কিসের একটা ছায়া। যেন একটুকরো মেঘ ঠিক আমার মাথা আর চাঁদের মাঝে আড়াল রচনা ক'রে রেখেছে। অথবা, একটা চাঁদোয়া কি তেরপল খাটানো হয়েছে আমার মাথার ঠিক ওপরে।

অকস্মাৎ একটা দারুণ আতঙ্ক অনুভব করলুম, যা এ ক'দিন একদম করি নি। এমন ভয় পেয়ে গেলুম যে, ভরসা ক'রে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতেও পারলুম না। অবশ্য দেখার দরকারও ছিল না—কারণ, সামনে পিছনে যেদিকে তাকাচ্ছি চক্‌চকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না—কোথাও মেঘ নেই। খামকা আমারই মাথার ওপর ঐ মেঘটি এসে স্থির হয়ে থাকবে—এ কখনও সম্ভব নয়।

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। পা দুটোও যেন এবার ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল, আর এতটুকু জোর নেই।

স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম ইষ্টমন্ত্র—সব যেন গুলিয়ে গেল। কোনোমতে সীতারাম নাম মনে এল। অস্ফুট কণ্ঠে একবার উচ্চারণ ক'রে—দু'-এক পা পিছিয়ে এলুম। ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে স'রে এল। আমি আর আমার চারপাশে তিনহাত ক'রে মাত্র স্থানে সেই ছায়া।

এবার একটু দ্রুতই পিছিয়ে এলুম।

ছায়াও ঠিক সেই গতিতে সরছে—

মনে হ'ল মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে কে যেন বরফ জল ঢেলে দিচ্ছে। পায়ে আর একটুও বল নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—

কিন্তু, যেতেই হবে এখান থেকে। কে জানে হয়তো এখনই ঐ পদার্থটা আমার ওপর প'ড়ে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেবে। চিরকালের মতই নড়াচড়া

বন্ধ হয়ে যাবে—

মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—

ইষ্টমন্ত্রটা মনে প'ড়ে গেছে। মা বাঁচাও, মা রক্ষা কর—

একটু যেন পায়ে জোর এল। কিন্তু, পিছু হঠতে হঠতে এ কোথায় এসে পড়েছি? ওপরের সিঁড়ি তো ওদিকটায়—?

তখন আর ভাববার সময় নেই। টলতে টলতে হাতড়াতে হাতড়াতে দু'বছরের শিশুর মত দৌড়তে লাগলুম সোজা ফটকের দিকে।

কী সর্বনাশ! ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে আসে যে।

আমিও যত জোরে দৌড়ই ওটাও তত জোরে চলে—সেই আমাকে ঘিরে আছে অশরীরী বা শরীরী কোনো ছায়া।

অনেকদিন আগে এক মার্কিন ছায়াছবিতে প্রকাণ্ড ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষা বাদুড় দেখেছিলুম—তেমনিই কোনো ভ্যাম্পায়ার আমাকে তাগ করছে না তো?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে যেন ঠিক্‌রে ফটকের বাইরে রাস্তায় এসে পড়লুম।

আঃ! কী শান্তি!

ছায়াটা আর নেই।

আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই এক মুসলমানের দোকান ছিল। তামাক, টিকিয়া, পাতা, কাঠ, কাঠ-কয়লা, কিছু মাটির বাসন এমনি রকমারি জিনিস বিক্রি করত। সন্ধ্যাবেলা খদ্দের বিশেষ থাকত না ব'লে দোকানের সামনে খাটিয়াটি পেতে ব'সে গুড়গুড়িতে তামাক টানত।

তখন আর আমার একমুহূর্তও দাঁড়াবার অবস্থা নেই। চলবার শক্তি তো নেই-ই। কোনোমতে এসে ধপাস্ ক'রে ব'সে পড়লুম সেই বুড়োরই চারপাইয়ের একধারে।

বৃদ্ধ কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হ'ল না। বরং সস্নেহ সহানুভূতির সুরেই বলল, 'কেঁও বাবুজী, ডর লাগ গিয়া—কেয়া?'

'হাঁ, বড়ে মিঞা, বহুত।...জেরা, জেরা পানি পিলাইয়ে গা?'

'জী হাঁ, বহুত খুশি সে! লেকিন্ বাবুজী, ম্যয় মুসলমান হুঁ!'

'উস্‌মে কেয়া? পানিকা ভি ধরম হ্যায়?' কোনোমতে বলি। গলা এমন

শুকিয়ে গেছে যে,—কথা কওয়াও যাচ্ছে না।

বদ্‌না নয়—ঝক্‌ঝকে মাজা লোটাতেই জল এনে খাওয়ালে বড় মিঞা। তারপর পাশে ব'সে বললে, 'বাবুজী, আপ্‌কা বহুত তন্দুরস্তি হায়। আপকে পহ্‌লে আউর কোই এক রোজ ভি হুঁয়া ঠাহর্‌নে নেহি সকা।'

'লেকিন বাত কেয়া হায় বড়ে মিঞা—উও কোঠিমে কৈ দানো হায় কেয়া?'

'জরুর! ইয়ে বাত তো সবকোই জানতা হায়। কোই কোই পরদেশী কভি লে লেতা, বেচারে। লেকিন হিঁয়া কো কই আদমী রাতমে উহ্‌ ফটককে অন্দর নেহি জায়গা! সচ্‌ বাবুজী!'

ততক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছি। বড় মিঞাকেই চেপে ধরলুম। ব্যাপারটা কী জানা দরকার।

বড মিঞা মুহূর্তকয়েক নিঃশব্দে গুড়গুড়িতে টান দেবার পর সেটা নামিয়ে রেখে যা বললেন, তার অন্বার্থ হচ্ছে এই :

বহুদিন আগে যখন নীলকুঠির সাহেব এ বাড়িতে থাকত—তখনকার ঘটনা। তখন এই আস্‌গার মিঞা খুব শিশু—এখন ওঁর চার কুড়ি বয়স হয়েছে। ঘটনাটি তিনি শুনেছেন তার বাপজানের কাছ থেকে।

সাহেব বড মাতাল ছিল, আর দুদান্ত বদ্‌মেজাজী। ওর জরু বিরক্ত হয়ে একদিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলাইত চ'লে গিয়েছিল আর ফেরে নি। সাহেব একাই থাকত। মাঝে মাঝে নাচওয়ালী আনাত দু'-একটা কিংবা রেণ্ডি—সারারাত হল্লা করত।

একবার কার মুখে প্রশংসা শুনে লক্ষ্ণৌ থেকে আনালে জহুরাবাইকে। জহুরাবাই অনেক সাধ্য-সাধনায় দৈনিক হাজার টাকার কড়ারে এল তিন দিনের জন্য।

প্রথম দিনটা গেল। দ্বিতীয় দিনে সাহেব ওর দিকে হাত বাড়াল। জহুরা বাই পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'খবরদার সাহেব। আমি সে নাচওয়ালী নই। নাচ দেখাবারই কথা আমার সঙ্গে—অন্য কোনো কথা নেই।'

সাহেব বললে, 'বেশ, সে কথা এখন হোক। কত টাকা চাই?'

জহুরা বললে, 'দশ হাজার টাকা দিলেও না। তার জন্য অন্য মেয়েমানুষ আছে। তাদের আনিয়ে নাও।'

তারপর সাধ্য-সাধনা। সাহেব চেকবই এনে বললে, 'বল, কত টাকা দিতে হবে।'

জহুরাবাই অচল অটল। তার সঙ্গে যেটুকু কথা আছে তার বেশি সে পারবে না।

তৃতীয় দিনে সাহেব—ঐ যে বাঁধানো চত্বরটা—ঐখানে নাচের মজলিস বস্‌লে। দর্শক একা সাহেব—ফটক সন্ধ্যা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ আসতে পারবে না। ব'সে ব'সে নাচ দেখছে আর বোতলের পর বোতল মদ খাচ্ছে। শেষে রাত বারোটার সময় জহুরাবাই হাতজোড় ক'রে ছুটি চাইল।

সাহেব অকস্মাৎ দু'হাতে দুটো পিস্তল বার করলে। বললে, 'উঁহু, কন্‌ট্রাক্ট ইজ কন্‌ট্রাক্ট—তিন রাত তোমার নাচবার কথা। কোনো সময়ের হিসেব তো ছিল না। আজ সারারাত তোমাকে নাচতে হবে। কাক ডাকলে তবে ছুটি। থেমেছ কি গুলী করব।'

ওদের মুখ শুকিয়ে উঠল। কিন্তু, অতিরিক্ত মদ্যপানে সাহেবের চোখ দুটো লাল, মুখখানা দানবের মত বীভৎস হয়ে উঠেছে। হাতে গুলীঠাসা পিস্তল—কারুরই থামতে সাহস হ'ল না। বাইজীও নেচে যায়, তবলচি সারেঙ্গীও বাজিয়ে যায়। আর, একাগ্র উগ্র দৃষ্টিতে স্থির হয়ে ব'সে সেই নাচ দেখে সাহেব, হাতে সেই উদ্যত পিস্তল।

একবার ক্লান্তিতে পা আপনিই থেমে গিয়েছিল, সাহেব সঙ্গে সঙ্গে এমন গুলী ছুঁড়লে, একটা বাইজীর কানের কেরাপাত নিয়ে চ'লে গেল—আর একটা গেল সারেঙ্গীর টুপী ফুটো ক'রে। হা-হা ক'রে হেসে উঠল সাহেব পিশাচের মত।

'চালাও চালাও, নইলে বুঝেছ তো আমার হাতের টিপ? গুলী ঠাসা আছে পিস্তলে। মদ খেলে আমার হাতের টিপ খোলে ভালো।'

আবারও সেই হা-হা হাসি।

অগত্যা নাচতে হয়।

অবশেষে সত্যিই মাথার ওপর কাক ডেকে উঠতে সাহেব উঠে দাঁড়াল। বাইজীও থামল। কিন্তু, এতক্ষণ যেন কিসের ঘোরে নাচছিল, থামার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল—একেবারে খতম! ঐ অবস্থা দেখেও কিন্তু সারেঙ্গী তবল্‌চিরা আর দাঁড়ায় নি। সোজা উঠে, পাঁচিল টপ্‌কে পথে নেমে দৌড়ে পালিয়েছিল, একদম ইস্টিশন।

তখনও আলো ফোটবার একটু দেরি ছিল। সাহেবের হুকুমে সাহেবের মগ আরদালী ঐখানে মাটি দিয়ে দিলে মেয়েটাকে।...

এই পর্যন্ত ব'লে বড় মিঞা থামল।

আমি বললুম, 'তারপর ?'

তারপর আর কি! কথাটা নিয়ে কানাঘুষো আরম্ভ হ'ল। পুলিশে খবর নিতে শুরু করল। বেগতিক দেখে সাহেব একদিন গলায় ঐ পিস্তলটা লাগিয়েই আত্মহত্যা করলে।

তারপর অনেকদিন বাড়ি খালি পড়েছিল—পঞ্চাশ-ষাট বছর। বাড়িঘর ভেঙে প'ড়ে গেল। গাছপালা বনজঙ্গলে ঢেকে গেল সবটা। তারপর এল এই গালিচাওয়ালা ডানকার্ক সাহেব। সে ও-সব মানত না। জলের দামে জমিটা কিনে নতুন ক'রে সবটা তৈরি করালে, মনের মত ক'রে সাজিয়ে নিজে এসে উঠল। কিন্তু, কিছুদিন পরেই মেমসাহেব আর টিকতে পারল না। নানারকম উপদ্রব হ'তে লাগল। মেমসাহেব পাদরী আনালে, কত ভজন গান-টান হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু না। শেষে সাহেব মেমে ভীষণ ঝগড়া। সাহেব বলে, 'মানুষকে কখনও ভয় করলুম না, ভূতকে ভয় করব ? নেভার!' মেম বললে, 'তুমি থাকো তবে—আমি চললুম!' মেমসাহেব চ'লে গেল বাপের বাড়ি মুজঃফরপুরে। ব্যস্—হ'ল ভূকম্প, সব শেষ হয়ে গেল। সাহেবও সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চ'লে গেল।

'সেই থেকে প'ড়েই আছে বাবুজী। কে বাস করবে এখানে ? অজানতে কেউ যদি ভাড়া নেয়—একরাত পরেই পালায়। এই যা আপনিই দেখলুম তিন চার দিন কাটালেন। কিন্তু, আর থাকবেন না হুজুর, ভালোয় ভালোয় কালই চ'লে যান অন্য কোথাও। বাড়ির অভাব কী ?'

হরিদাস বাজার ক'রে ফিরেছে তখন—তাকেও ডেকে আস্‌গার মিঞা সদুপদেশ দিয়ে দিলেন। হরিদাস আমার মুখে সব ঘটনা শুনে বললে, 'কোনো-মতে রাতটা এই পথেই কাটাব মামা—ও বাড়ি আর ঢুকচি নি। কাল সকালে অন্য বাড়ি দেখে মালপত্র নিয়ে চ'লে যাওয়া যাবে।'

অতি কষ্টে বুঝিয়ে তাদের নিয়ে বাড়িতে ঢুকলুম। কিন্তু, সেদিন সারারাত কারুরই ঘুম হ'ল না।

## দোজবরে

নলিনীর যখন বিয়ে হয়েছিল মায়া তখন খুবই ছোট, মোটে বছর দশেকের মেয়ে। তবু সে নাকসিঁটকে বলেছিল, 'নলিনীদিটা যেন কী, আমি হ'লে বরং গলায় দড়ি দিতুম—তবু এমন বিয়ে করতুম না।'

তার কারণও ছিল।

মায়ার মা তরঙ্গিণীরও কতকটা এই ধরনের মনোভাব ছিল। তিনি কথায় কথায় বলতেন, 'যাই বল বাপু, বিয়ে মানুষের একবারই হয়, ভাবসাব হ'ল একটু একটু ক'রে,—নতুন দুটো মানুষ একটু একটু ক'রে পুরনো হ'ল দু'জনার কাছেই, দু'জনেই দু'জনকে চিনল, তারপর ধীরে ধীরে এক হয়ে গেল—অন্তত মনের দিক দিয়ে—এই হ'ল বিয়ে। এই যে সব দু'বার তিনবার বিয়ে করে—এসব কি আর বিয়ে? রামোঃ!'

কেউ হয়তো বললে, 'না ন'দি, তুমি একেবারে জিনিসটা উড়িয়ে দিতে পার না। ধর, একটা লোক ছাব্বিশ বছরে বিয়ে করলে—আঠাশ বছরে তার বৌ মরে গেল। সে আর বিয়ে করবে না? সারা জীবনটা তার সামনে প'ড়ে রইল।'

তরঙ্গিণী জবাব দিতেন, 'হ্যাঁ, তার হয়তো বিয়ে করাটা দরকার, কিন্তু মেয়েদের কথা ভাব দিকি! যত কম দিনই ঘর করুক—বর কেবলই মনে মনে মিলিয়ে দেখে সেই আগের বৌয়ের সঙ্গে—খুঁত খুঁত করে। সে বৌয়ের দোষ-গুলো তখন গুণ হয়ে ওঠে। মনে করে, এ ঠিক তেমন হ'ল না। আর বৌটারও পোড়াকপাল, যত যত্ন-আত্তিই করুক না কেন বর—ভাববে সেই সতীনকেই বেশী ভালোবাসত, এখনও হয়তো মনে মনে তাকেই ভালোবাসে। কিছুতেই মেয়েটা স্বস্তি পায় না। না ভাই, যত কম দিনের জন্যেই হোক্, আগে একটি বিয়ে করা থাকলে যেন মনের মধ্যে দেওয়াল প'ড়ে যায়।'

একটু থেমে হয়তো আবারও বলতেন, 'সোনার গয়নাই বল আর রাজ-অট্টালিকাই বল, বরই যদি নিজস্ব না হ'ল তো কী সুখ, আমার মনে হয় বড়-লোকের ঘরে তেজবরে দোজবরে পড়ার চেয়ে গরিব চাষীর ঘরে পড়াও ঢের ভালো।'

এ সব-কথাই মায়া শুনেছে ছেলেবেলা থেকে, তাই নলিনীর বিয়েতে সে যে অমন মন্তব্যটা করবে সেটাই স্বাভাবিক, ভালো ক'রে সাংসারিক জ্ঞান হবার আগেই বারবার শোনা-কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নলিনীর বিয়েতে সকলেই—পাড়াসুদ্ধ ছি ছি করছিল। কাজেই, ছোটমুখে বড় কথা হ'লেও খুব বেমানান শোনায় নি কথাগুলো। পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে নলিনী, ওর রূপে নাকি অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠত। ছি ছি, ওর বাবা করলে কী, অমন মেয়েটাকে শেষ অবধি দিলে কিনা দোজবরের হাতে।

পাড়ার লোকের এই সম্মিলিত ধিক্কার নলিনীর বাবা সতীশবাবুর কানেও উঠেছিল বৈকি! তিনি ব্যাকুলভাবে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর যে অবস্থা তাতে হয়তো অমন সোনার প্রতিমা মেয়েকে কোনো মাতাল লম্পটের হাতে দিতে হ'ত। হয়তো এমন ঘরে পড়ত যেখানে দু'-বেলা দু'-মুঠো পেট ভ'রে খেতেও পেত না। এখানে আর যাই হোক্, খাওয়া-পরার কোনো অভাব থাকবে না। দোজবরে বটে, দশ বছরের একটা বড় মেয়ে আছে—এটাও ঠিক—কিন্তু, চল্লিশ বছর বয়সটা ঠিক বুড়োর বয়স নয়, তাছাড়া অত ঐশ্বর্য—নলিনী বলতে গেলে রাজার ঘরে পড়ল। আট বছরের উমা যে বুড়ো শিবের হাতে পড়েছিলেন, তাঁর ভাগ্য কি যে কোনো হিন্দু মেয়ের কাম্য নয়!

কিন্তু, এসব সত্ত্বেও পাড়ায় টিটিক্কার বড় কম প'ড়ে যায় নি। পাড়ার ছোকরার দল—সত্য কথা বলতে কি—শেষ দু'-তিন দিন ভালো ক'রে কেউ খায় নি; তখনকার দিন ব'লে বিয়েটা নির্বিঘ্নে হ'তে পেরেছিল, এখনকার দিন হ'লে জামাইকে শেষ পর্যন্ত মুখচুন ক'রে ফিরে যেতে হ'ত।

তবে সে ধিক্কার এবং পরিতাপের কথাটা মায়ার যেমন মনে আছে, তেমনি আর একটি কথাও কিন্তু সে ভোলে নি।

নলিনীর ধুলোপায়ে-দিন করতে আসবার স্মৃতিটা মনের মধ্যে আজও ওর উজ্জ্বল হয়ে আছে। দিনের বেলা সে দেখে নি। সন্ধ্যেবেলা নলিনীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তার মা এসেছিলেন ওদের বাড়ি। সতেরো বছর মাত্র বয়স, কিন্তু এখনকার অধিকাংশ মেয়ের মত বান্‌খুরে ছিল না সে—বেশ বাড়নসা গড়নে রূপটা তার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আর, সেইজন্যেই বোধ হয়—অলঙ্কার এবং শাড়ির ঝলমলানিটাও অত বেশী ক'রে চোখে পড়েছিল। আজও সে ছবিটা মনে আছে মায়ার—। সেকেলে ডবল-উইকের টেবিল-ল্যাম্পের আলো, তবু

তাতেই মাথার হীরের টায়রা এবং গলায় চুনি-পান্নার নেকলেস যেন জ্বলে উঠেছিল। শঙ্খ-কণ্ঠে মুক্তোর 'কলার'-এ অমন আভা জীবনে কখনও দেখে নি সে।...তার সঙ্গে ছিল জড়োয়া ব্রেসলেট ও নতুন কাজ-করা চওড়া সোনার চুড়ি। সেদিন নলিনীর দিকে চেয়ে চোখ ঝল্‌সেই গিয়েছিল মায়ার। ঐ অল্প বয়সেই মনে হয়েছিল এই গহনা এবং এ বেনারসী শাড়ি ছাড়া এ দেহে কিছু মানাত না। আর শাড়ি-গহনারও এর চেয়ে সদ্গতি আর কিছু হ'তে পারে না— এই দেহে উঠেই তারা সার্থক হয়েছে, তাদের যোগ্য মূল্য পেয়েছে।

এমন কি তরঙ্গিণীও—ওরা প্রণাম ক'রে জল খেয়ে চ'লে যেতে—একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'নাঃ, ও বাড়ির বট্‌ঠাকুরের দোজবরের হাতে মেয়ে দেওয়া সার্থক হয়েছে। নিতান্ত যদি দিতেই হয় তো এই রকম—'

কিন্তু, সে দীর্ঘকালের কথা।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, কবে কখন সকলের অগোচরে মায়ার দেহখানি পুষ্পিত হয়ে উঠেছে নবীন কৈশোরে, কখন তাতে আরও দু'টি তিনটি বসন্ত প্রথম যৌবনের ঐশ্বর্যসম্ভার এনে যোগ করেছে,—আবার কেমন ক'রে একটির পর একটি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এনে দিয়েছে রুক্ষতা ও কাঠিন্য—দশ বছরের মেয়ে বাইশ বছরে এসে পড়েছে—তা বাঙালীর একান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের দুঃখ-দারিদ্র্য বিব্রত ক'টি নরনারী লক্ষ্যও করে নি। এমন কি মায়া নিজেও না—

এর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে ঢের। মায়ার বাবা মারা গিয়েছেন। ওর দিদির বিয়েতে তিনি বিপুল দেনা করেছিলেন, তা প্রায় কিছুই শোধ দিয়ে যেতে পারেন নি। ওর দু'টি দাদাই চাকরিতে ঢুকেছে বটে, কিন্তু তাদের আর আয় কী? এরই মধ্যে ওর বড়ভায়ের বিয়ে দিতেও হয়েছে—তারও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে দু'-তিনটি। অর্থাৎ, সংসারে টানাটানি বেড়েই গেছে, কমে নি একটুও।

সুতরাং, এর ভেতর মায়ার বিয়ের কথা তুলবে এমন পাগল কে আছে!

মা এক-আধদিন বড়ছেলের কাছে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু, সাহস ক'রে বেশীদূর এগোতে পারেন নি। সে চোখ পাকিয়ে জবাব দিয়েছে 'তুমি থামো! এক বোনের বিয়ের দেনা আগে শোধ করি, তবে তো আর এক বোনের বিয়ের কথা ভাবব! তোমার লজ্জা করে না একটু, ও-কথা মুখে আনতে! আমার মাথার ওপর একটি আইবুড়ো বোন আর একটি বোনের বিয়ের দেনা চাপিয়ে তিনি তো স'রে পড়লেন! আমরা কার ওপর চাপাব বল?'

তবু হয়তো অনেক সাহসে ভর ক'রে এবং উদ্গত অশ্রু সংবরণ ক'রে মা বলতে চেষ্টা করেছেন, 'না,—এখন থেকে খোঁজ-খবর করলে হ'ত। বর চাইলেই যে তখুনি পাওয়া যাবে এমন তো কোনো কথা নেই।'

'কিন্তু, পাবার জন্যেই তো লোকে খোঁজ-খবর করে। যদি বর পাওয়া যায়ই—ধর, কেউ ওকে পছন্দই করলে—তখন কী করব? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? না মা ওসব ধাষ্টামো আমাদের দ্বারা চলবে না। আমাদের আত্মসম্মান-বোধ আছে!'

অগত্যা, এখানেই ইতি।

মায়া শুধু উদয়াস্ত খেটে যায় সংসারে। প্রতিদিনের চা-জলখাবার করা, বিছানা-মাদুর তোলা, যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ, রান্নার যোগাড় দেওয়া—কখনও কখনও মার অসুখ করলে রান্নাবাড়া করা—ভাইপো-ভাইঝিদের নাওয়ানো খাওয়ানো,—ইত্যাদি সহস্র কাজের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল সে যে, তাকে যে কোনোদিন বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ি পাঠাতে হবে, এই বাঁধা জীবনযাত্রায় আসবে পরিবর্তন—তা কেউ ভাবতেই পারে না। লেখাপড়া তো ওর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু অর্থাভাবে ততটা নয়, যতটা সময়াভাবে। একটি ঠিকে ঝি আছে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যায়, তার বেশী খরচ করার সামর্থ্য নেই এদের, বাকি সব কাজই নিজেদের ক'রে নিতে হয়। মার শরীর অপটু হয়ে আসছে দিন দিন, শুধু ব'সে ব'সে রান্নাবান্না করা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে পারেন না। বৌদির কোলে ছোট ছেলে, একটি না একটি থাকেই,—সুতরাং, মায়া ছাড়া গতি কী? মায়া এ সংসারেরই অঙ্গ, তার কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে—একথা কেউ যেন কল্পনাই করতে পারে না।

আর, কেউ পারে না ব'লেই বোধ হয় কাজটা মায়ার নিজেকেই করতে হয়।

একদিন সে দাদা অরুণের শ্রুতিসীমার মধ্যেই মাকে শুনিয়ে বলে, 'মা—এখানে শুনেছি নারী-কর্ম-মন্দিরে দুপুরবেলা মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে। আমি মনে করছি ভর্তি হব! দুপুরে অতটা কাজ থাকে না,—ঘণ্টা-দুই সময় ক'রে নিতে পারা যাবে!'

মা উত্তর দেবার আগেই অরুণ কথা কইলে। সে ব'সে দাড়ি কামাচ্ছিল, হঠাৎ ক্ষুরটা নামিয়ে বললে, 'তার মানে?'

'যা হয় কিছু-একটা করতে তো হবে। মা-আর ক'দিন? চিরদিন কি আর ভাই খেতে দেবে? লেখাপড়া শিখলুম না—কিছু একটা কাজ শিখতে হবে তো।'

'ওমা, তাই ব'লে—' এবার মা-ই কথা বলেন 'তাই ব'লে অত বড় সোমত্ত মেয়ে কোথায় কী কাজ শিখতে যাবি? আজ বাদে কাল বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে—শেষে কি একটা ভাংচি পড়বে?'

'আঃ। ওসব থাক্ না মা। বিয়ে যে হওয়া আমার সম্ভব নয় তা তুমিও জানো, আমিও জানি। এরপর কিছু একটা শেখারও বয়স থাকবে না। তুমি মারা গেলে, ধর যদি বৌদিদের সঙ্গে না-ই বনে—তখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাসীবৃত্তি করতে হবে তো?'

বৌদি ওপাশ থেকে ফিস্ ফিস্ ক'রে অরুণকে বললে, 'হ'ল তো! কবে থেকে বলছি যে, বোনের একটা গতি কর। এবার নিজে মুখে নোটিস দিলে তো! অত বড় বোন থাকতে মানুষ কেমন ক'রে নিশ্চিন্তি হয়ে ব'সে থাকে তা বুঝি না!'

অরুণ গম্ভীরভাবে বললে, 'নিশ্চিন্ত কেউই থাকে না। কিন্তু, চিন্তা করা ছাড়া যে আর কিছুই করবার নেই, তা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমাদের তো এই অবস্থা—টাকা ছাড়া কি আর বোন পার হবে? বাবা তো একরাশ দেনা ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেন নি—পার করব কী দিয়ে? তবু তো নিজে দুটো টিউশানি করছি। ভোলাটা যদি আর কিছু বেশী দিত, তাহ'লেও এতদিনে দেনা খানিকটা হাল্‌কা হয়ে আসত। বাবু তো ঐ অফিসে যাওয়া-আসা ছাড়া আর কিছু করবেন না—সকাল-সন্ধ্যে আড্ডা আর আড্ডা।'

বৌদি বললে, 'তা বাপু এত বড় বোন থাকতে তোমার নিজের বিয়ে করা ঠিক হয় নি! জানই তো আরও জড়িয়ে পড়বে।'

'সে ঐ মাকে বল গে। উনিই তখন সংসারে লোক না এলে চলবে না—ব'লে ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে।··· আমি কিছু বিয়ে-পাগলা হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে দৌড়ে যাই নি।'

দাম্পত্য বাদানুবাদটা হয়তো কলহেও পরিণত হ'তে পারত, কিন্তু মায়া সে সুযোগ দিলে না! সে শান্তকণ্ঠে মাকে বললে, 'আমি কিন্তু এখনও আমার কথার জবাব পাই নি মা।'

এবার অরুণ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'না না—ওসব কিছু করতে হবে না। বিয়ের চেষ্টাই দেখা হচ্ছে। আমি কি আর ভেতরে ভেতরে কোনো খোঁজ-খবর করছি না? এধারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে করব ভাবছিলুম ব'লেই না—তা সে দেখছি আমারই অপরাধ হয়েছিল। থাকার মধ্যে তো এই বাড়িটুকু!

ভাঙা পুরনো বাড়ি—কী-ই বা দাম। তবু মাথা গোঁজবার জায়গা ব'লেই এতকাল এদিকে তাকাই নি। তা তাই না হয় যাক্—বাবার বাড়ির বদলে তাঁর মেয়ে পার হোক্। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তা হবে। সত্যিই তে —আফ্টার অল, আমিই তো বিয়ে করেছিলুম, নিজের কোমরের জোর বুঝেই করা উচিত ছিল! ঘরের মেয়ে থাকতে পরের মেয়ে পার করতে যাওয় ঠিক হয় নি।'

অরুণ অনেকক্ষণ ধ'রে গজ্‌গজ্ করতেই থাকে। স্ত্রী পর্যন্ত যদি তাকে ভুল বোঝে তো সে যায় কোথায়?

'কিন্তু, সে-ও কয়েক বছরের কথা হয়ে গেল বৈকি!

ইতিমধ্যে খোঁজ-খবর হয়েছে, ঘটক লাগানো হয়েছে, কলকাতার দু'-দুটো বিবাহ-অফিসে নাম লেখানো হয়েছে—দু'-চার দল এসে দেখেও গেছেন কিন্তু, বিশেষ কোনো ফল হয় নি। মায়ার রঙ হয়তো এককালে ফরসাই ছিল, কিন্তু, আজ আর তা কল্পনা করাও কঠিন। দেহের কান্তি কমনীয়তা গঠন-পরিপাট্য—এসব কোন্ সুদূরের কথা তা ওর মারও মনে পড়ে না। রোগা হাড়-বার-করা দেহ, ফাটা পা, শির-ওঠা রুক্ষ হাত এবং কেশবিরল মাথায় টাসল্ দেওয়া কবরী—এসব সত্ত্বেও যদি বা কোনো পুরুষ অভিভাবকের পছন্দ হয়, বাড়ির 'ওনারা' দ্বিতীয়বার দেখতে এসে 'না' ক'রে দেন। ইদানীং তাই মায়া বেরোতে চায় না, কান্নাকাটি করে। বলে, 'কী হবে মিছিমিছি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গিয়ে মা? আমার আর এ অপমান সহ্য হয় না।'

মা বলেন, 'একেবারে যে কেউ পছন্দ করছে না তাও তো নয়। এমনি ক'রেই হবে ঠিক একদিন। কী করব মা বল্, সবই তোর অদৃষ্ট, নইলে সে মানুষটাই বা এত তাড়াতাড়ি যাবে কেন?'

সত্যিই যে একেবারে কেউ পছন্দ করে নি তা নয়। দু'-তিন দল এর ভেতর এসে পছন্দ ক'রেও গিয়েছিল। কিন্তু, তারপর আর কথা এগুতে পারে নি। হয় তাদের অত্যধিক খাঁই…নয় তো এদেরই ছেলে পছন্দ হয় না। দু'-দুটি পাত্রকে মেজভাই ভোলা নাকচ ক'রে দিয়েছে। দু'-জায়গাতেই আপত্তি উঠেছে তাদের অবস্থায়। ভোলা বলেছে, 'ঐ তো আয়! বিয়ে ক'রে নিজেরাই বা কী খাবে আর ছেলেমেয়েদেরই বা কী খেতে দেবে? না না—ওসব পাত্তর চলবে না।'

মা তবু একবার ক'রে মনে করিয়ে দেন হয়তো—'বাইরে যাই বলি না কেন—এধারে যে সাতাশ বছর বয়স হয়ে গেল সেটা হুঁশ আছে ?'

'তা ব'লে কি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে হবে নাকি ? এখন এক জ্বালা, সে যে তখন শতেক জ্বালায় জ্বলতে হবে। মাসে মাসে এসে ভায়ের বাড়িতেই হাত পাততে হবে হয়তো। মাথা গোঁজবার জায়গা নেই— ঈশ্বর না করুন যদি অসময়ে চোখ বোঁজে তো ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার এখানেই এসে উঠতে হবে, তার চেয়ে যেমন আছে তেমনিই থাক্। এতদিনই গেল যখন—'

সুতরাং, কিছুই হয় না।

একের পর এক—দিন মাস বৎসর কেটে যায় শুধু। আরও কর্কশ হয় মায়ার গায়ের চামড়া। আরও কিছু চুল উঠে যায় শুধু। আরও এক পোঁচ কালি পড়ে দেহে।

অবশ্য একেবারে যে কিছুই হয় না তা বলা শক্ত। ইতিমধ্যে কোথায় এক জায়গায় বরযাত্রী নিমন্ত্রণে গিয়ে ভোলা একটি বিয়ে ক'রে নিয়ে এল। মন্দ লোকে বললে সবটাই সাজানো, এত বড় আইবুড়ো বোন থাকতে বিয়ে করতে চক্ষু-লজ্জায় বাধছিল, তাই এ অভিনয়। কেউ বললে, জানাশুনো ভাবসাবের বিয়ে। মা কপাল চাপড়ালেন খানিকটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বউ বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হ'ল। বাড়ি তারও পৈতৃক। বিয়ে করার অধিকারও তার আছে। তাছাড়া পাল্‌টি ঘরেই বিয়ে করেছে—আপত্তি করারও কিছু নেই।

মায়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাসিমুখে আলাপ করতে হ'ল। হাসি-তামাশাও করতে হ'ল।

শুধু রাত্রে ওর বৌদি অরুণকে মনে করিয়ে দিলে, 'আরও নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও। যত দায় তো তোমারই। উনিও বিয়ে ক'রে এসে বসলেন, মাসে মাসে যে যাট টাকা দেন, তার বেশী কি আর একপয়সাও দেবেন মনে করছ ? খরচাই বাড়ল, আয় বাড়ল না। এতদিনে বোনের বিয়ে দিতে পারলে না—এর পর দেবে কী ক'রে ? বছর না ঘুরতে তো বাচ্চা আসবে একটি—খরচ তো বাড়তেই থাকবে দিনের পর দিন।'

অরুণ রাগ ক'রে বলে, 'টাকা যদি ভোলা না বাড়ায়, ওদের আলাদা ক'রে দেব—এই স্পষ্ট ব'লে দিলুম তোমায়।'

'খুব বুদ্ধির কাজ করবে! টাকাটাই কমে যাবে—তোমার খরচা কতটুকু কমবে? এখনও দুটো ভাই পড়ছে—সে সব খরচ কি মেজঠাকুরপো দেবে? তোমার ঘাড়ে চাপবে।'

'তাই তো! বড়খোকাটাকে বললুম দিই অফিসে ঢুকিয়ে, তুমিই তো তখন না করলে! কলেজে পড়ার খরচ কি কম?'

'সে তো বাপু নিজে টিউশানি ক'রেই চালাচ্ছে। অত ভালো ক'রে পাস করলে—দু'-দুটো ভাই তোমরা মাথার ওপর—না পড়ালে নিন্দেয় দেশ ছেয়ে যেত যে।'

কথাটা সেইখানেই চাপা প'ড়ে যায়। গত কয়েক বছর ধ'রেই এইভাবে চাপা পড়ছে। অতএব, ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে বৈকি!

ভোলার বিয়েটা খুব আকস্মিকভাবে হয়ে গিয়েছিল ব'লে ওর দিদি আসতে পারে নি। সে থাকে সেই শিলিগুড়িতে—আজকাল আসা-যাওয়ার হাঙ্গামাও ঢের। যাই হোক্—মাস-দুই পরে সে একদিন স-পুত্র-কন্যা এসে হাজির হ'ল।

প্রথম মিলনের কোলাহল থেমে যেতেই রান্নাঘরে নিভৃতে গিয়ে মাকে প্রশ্ন করলে মালতী, 'হ্যাঁ মা, মায়ার বিয়ের কী করছ? আর যে চাওয়া যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'বেশ বলেছ মা, বড়বোনের উপযুক্ত কথাই বলেছ। মাথার ওপর বড় বড় ভাই, উপযুক্ত ভগ্নীপতি থাকতে আমি বুড়ো মা পথে পথে ঘুরে জামাই খুঁজব—না?'

মালতী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে একটু গলা নামিয়ে বললে, 'পাত্তর একটি আছে মা। আমারই মামা-শ্বশুর হয়—খুব দূর সম্পর্কের। আমেদাবাদে চাকরি করে, যোলশ' টাকা মাইনে, ওখানে বিরাট বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। বৌ মরেছে বছর-তিনেক হ'ল। এক ছেলে, তা সে-ও কী কাজকর্ম শিখে দিল্লীতে চাকরি করছে, ভালো চাকরি। ভাবসাব ক'রে সে সেখানে বিয়েও করেছে একটা। পাঞ্জাবী মেয়ে, ছেলের চেয়ে নাকি বয়সে বড়। তাইতেই মামা খুব ঘা খেয়েছেন। এতদিন বিয়ে করব না ব'লে বসেছিলেন—এখন বলছেন যে, ডাগর-ডোগর মেয়ে পেলে করবেন। নইলে বুড়ো বয়সে দেখবে কে?'

তরঙ্গিণী গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা, অত বড় ছেলে বলছিস, তার বয়স কত?'

'বয়স একটু হয়েছে মা—তা আটচল্লিশ হবে, কিন্তু অত দেখায় না।'

'সে যে বুড়ো বর, বুড়ো বরে দেব ?'

'তোমার মেয়ের বয়সের হিসেবটা একবার কর না মা। আটাশ বছরের মেয়ে—চল্লিশের কম বরের বয়স হ'লে তো মানাবেই না।'

তরঙ্গিণী তবু সংশয়ের সঙ্গে বললেন, 'কী জানি মা, প্রথম হ'লেও না হয় হ'ত। একে বয়স হয়েছে, তায় অত বড় ছেলে—মেয়ে কি মনে করবে, এতকাল পরে এই বিয়ে দিলে ?···তবে ছাখ্—না হয় অরুণকে বল্। আমার মতামতের আর মূল্য কী ?'

মালতী তখনই অরুণের খোঁজে গেল। অরুণ আর ভোলা বড় ভগ্নীপতির সঙ্গেই ব'সে গল্প করছিল। কথাটা শুনে অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভগ্নীপতির মুখের দিকে তাকালে। তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'না, মেজমামার অবস্থা অবশ্য খুবই ভালো। মাইনে ছাড়াও প্রোডাক্‌শনের উপর জোড়া-পিছু একপয়সা ক'রে কমিশন পান। কম্‌সে কম পাক্কা ছু'টি লাখ টাকা জমিয়েছেন।···বয়স সত্যিই এমন কিছু দেখায় না—রোবাস্ট হেল্‌থ্—কিন্তু, সে কথাটা বলেছ ওদের ?' ব'লে একটা ইঙ্গিত করেন তিনি।

মালতী মাথাটা ঈষৎ নিচু ক'রে বলে, 'না, কথাটা তো এই উঠল। এমন কিছু নয়—একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, বাঁ হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তা কাজকর্ম তো সবই করছে। আর ধর, বিয়ের পরই যদি হ'ত তাহ'লে কী করতে ?'

এবার ভোলা ফেটে পড়ল।

'দিদি, তোমার নিজের ভালো বিয়ে হয়েছে ব'লেই বুঝি বোনের জন্যে এমন সম্বন্ধটা পাড়তে পারলে! তোমাকে সৎপাত্রে দিতে গিয়ে বাবা যদি সর্বস্বান্ত না হতেন তো মায়ার বিয়ে আমরা অনেকদিন আগেই দিতে পারতুম। ছোট-বোনের ওপর তোমার খুব টান—বোঝা গিয়েছে, ধন্যবাদ।···দোজবরে, বুড়ো—তার ওপর হাতকাটা গুলো—বলিহারি পাত্র! অমন বরে দেওয়ার চেয়ে বোনকে দড়ি-কলসী কিনে দেব, সেও ভালো।'

মালতীর চোখে জল এসে গেল। ভগ্নীপতি ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইলেন। তরঙ্গিণীরও লজ্জার সীমা রইল না। কিন্তু, কেউ কিছু বলবার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। মায়া যে কাছাকাছি থাকতে পারে—এদের কারুরই সে কথাটা মনে ছিল না। সে কাছেই ছিল। খুবই কাছে। একটু আগে রান্নাঘরের বাইরে থেকে সবই শুনেছে, এখনও এ ঘরের বাইরেই সে দাঁড়িয়েছিল। কে

জানে, মালতীর এই মামাশ্বশুরের কাহিনী শুনতে শুনতে তার মন বহু দূর অতীতের এক সন্ধ্যাবেলায় চ'লে গিয়েছিল কি না। সেখানে হয়তো আজও ডবল-উইকের টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে হীরের টায়রা, মুক্তোর কলার আর চুনিপান্নার নেকলেস পরা অপরূপ এক নারীমূর্তি—

অকস্মাৎ সে বাইরে থেকে মাকে ডেকে স্পষ্ট ক'রেই বললে, 'মা, দিদিকে বল ঐ সম্বন্ধ এখনই চিঠি লিখে পাকা ক'রে ফেলতে। অবিশ্যি তিনি যদি দয়া ক'রে নিতে রাজি হন। এখানে বিয়ে না হ'লে আমাকেই দড়ি-কলসী খুঁজে নিতে হবে মা। ভাইদের কত দরদ আর কত যে মুরোদ তা এই ক'-বছরে বেশ বুঝে নিয়েছি।'

## দেবাঃ ন জানন্তি

ওদিকের টেবিলে কানাকানি আর চাপা হাসি চলছে যূথিকাকে নিয়ে। বেশ বড় জটলা। আবার একটা স্ক্যাণ্ডাল! দাঁতে দাঁতে ঘষে সুমিত্রা। ওরা কি এই জন্যেই অফিসে আসে নাকি? একেই তো মেয়েদের দুর্নামের শেষ নেই! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরিশবাবু দু'বেলা শোনাচ্ছেন, 'অফিসে একটি ক'রে মেয়ে ঢুকছে আর আমাদের কাজ বাড়ছে। মেয়েদের দ্বারা যদি কাজ হ'ত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। ঈশ্বর কি তাহ'লে ওদের অবলা ক'রে সৃষ্টি করতেন! সে যা হোক্—ওরা না হয় ভূষণ হয়েই থাক্। অনেক ফানিচারই তো আছে এমন—কিন্তু, ওরা এসে ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে, এইতেই যে আপত্তি! এদের দিয়েও কোনো কাজ পাচ্ছি না।'

সুমিত্রা ওদিকে তাকাবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে খাতার ওপর ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু, কানে কথার টুকরোগুলো এসে যেন বেঁধে তীরের মত। নিবারণ বলছে, 'হিরণটার পেটে পেটে এত!' সুরেশ তার জবাবে বলছে, 'হিরণের দোষ দিই না ভাই—যূথিকা মেয়েটি সোজা নয়, নাছোড়বান্দা একেবারে! দিনকতক আমার পেছনে লেগেছিল কিনা—আমি জানি!' ফোঁস্ ক'রে উঠল চারু, 'তুই থাম্ সুরেশ। অমনি নিজে খানিকটা বাহাদুরি নেবার চেষ্টা। যূথিকার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—তোর পেছনে লাগবে!' রাগলে তোৎলা হয়ে যায়

সুরেশ, 'মা—মাইরি ব—বলছি। তু—তুই র—রবিকে জি—জিগ্যেসা কর।' রবি অম্লানবদনে মুখের ওপরই ব'লে দিলে, 'আমি তো জানতুম তুই-ই ওকে বিরক্ত করিস যেখানে সেখানে।'

ডেপুটি ডাইরেক্টার-জেনারেলের টি-এ বিল। সাবধানে দেখতে হবে। সুমিত্রা টাইম-টেব্‌ল্‌ খুলে মাইলের হিসাব দেখে। ওদিকে কান দিলে চলবে না। এ কাজটা হরিশবাবুর করার কথা—কিন্তু, তিনি ওকেই ভার দিয়েছেন, 'বুঝে-সুঝে নাও সব কাজ। কোনদিন কী করতে হয় বলা কি যায়?…তোমার মাথা তো ভালো—চাইকি এস্‌-এ-এস্‌টা যদি পাস করতে পার তো—। মেয়েদের অবিশ্যি হয় না। অঙ্কে যা মাথা!' নিজেই নিজের মন্তব্যের উত্তর দিয়ে শেষ করেছেন।

ওঁর এ আস্থার মর্যাদা রাখতেই হবে।

তবু রাগটা ও দমন করতে পারে না। প্রাণপণে চেপে থাকা সত্ত্বেও অনুভব করে যে, ঠোঁটের স্নায়ুটা দপ্‌ দপ্‌ করছে। কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। অপমান? তাই অন্তত ও বিশ্বাস করতে চায়। এই দু'-একটা মেয়ের জন্যে ওদের সকলের অপমান! কাজ তো কেউই করে না—সমস্ত অফিসটার মধ্যে সে আর বেলা, এই দু'জন যা কিছু কিছু করে—বাকি সবাই ব্যাগের মধ্যে ক'রে নভেল আনে আর দশ মিনিট অন্তর নাকের ডগায় পাউডার বুলোয়—ছোট্ট আয়না বার ক'রে। আর যা করে, তরুণ ছেলেদের সঙ্গে ইয়াকি—ফষ্টিনষ্টি।…সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় সুমিত্রার।

ছেলেগুলোও তেমনি।

কী আছে ঐ যূথিকার? সুমিত্রার চেয়ে ঢের বেশী কালো। হ্যাঁ—পাশে ব'সে মিলিয়ে দেখেছে সে। চোখ দুটো ওরই মধ্যে একটু ড্যাবা ড্যাবা—আর দাঁতগুলো বেশ সাজানো। তা হাসলে সুমিত্রাকেও ভালো দেখায়। বয়সটা কম এই যা—

কতই বা কম? কুড়ি-বাইশের তো কম নয়। আই-এ পাস ক'রে এসে ঢুকেছে, মেয়েরা কি আর ষোল বছরে ম্যাট্রিক পাস করে?…কিছুতে না। তার প্রমাণ তো সে নিজেই—।

নিজের বয়সের হিসাবটা মনে প'ড়ে যায়, উনত্রিশ বছর সাত মাস—গোনা-গাঁথা। অনেকেরই বয়সের হিসেব গুলিয়ে যায়। ওরও যদি যেত! সুমিত্রা বাঁচত তা হ'লে। কী কুক্ষণে যে ঠিক ঐ দিনটিতে ও জন্মেছিল। ওর দাদার

যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ—সেই দিনে ওর জন্ম। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে অষ্টপ্রহর ঐ কথাই শুনছে এবং—সেই সঙ্গে সেই বিশেষ তারিখ ও দিনটা। দাদার এই অর্থহীন রসিকতা সুমিত্রার পক্ষে কী বেদনাদায়ক হ'তে পারে তা বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান তাকে দেন নি। মেয়েদের বয়স স্মরণ করায় যে দায়িত্ব আছে অভিভাবকদের, সে কথাটাও দাদা কখনও ভেবে দেখে নি! মনে করিয়ে দিতে পারত খুবই—কিন্তু আত্মসম্মানে বেধেছে ব'লে প্রত্যেকবারই উদ্যত রসনাকে দমন করেছে সুমিত্রা।

দাদা নিজে বিবাহিত। সাত-আটটি সন্তান ওর। যা রোজগার করে তা'তে নিজের সংসার চলে না। বোনের বিয়ে দেবার কথা কল্পনা পর্যন্ত সে করে না। দু'-একজন দু'-একবার মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে বাবার ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে স'রে পড়েছে, 'বাবার মেয়ে, বাবা বুঝবেন! আমার নিজের তিনটে মেয়ে কেমন ক'রে পার করব তার ঠিক নেই, তা আবার বাবার মেয়ে!'

নিজের বোনকে বাবার মেয়ে ব'লে উল্লেখ করার রসিকতায় হেসে উঠত প্রতিবারেই—হো—হো—হা—হা—!

অপমানে সুমিত্রার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে যায় ওর ঐ হাসিতে, ইচ্ছা করে মাথাটা ধ'রে গুঁড়িয়ে দেয় ওর—

বাবা যখন রিটায়ার করেছেন তখন ইচ্ছা করলে বিয়ে দিতে পারতেন সুমিত্রার। ফাণ্ডের টাকাগুলো ছিল, সুমিত্রাও এমন শীর্ণ ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে নি। প্রথম কৈশোরের শ্যামল সরসতা একটি অপরূপ লাবণ্যে ঘিরেছিল ওর তনুলতাকে। কিন্তু তখন তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথাকে—'পনেরো বছরে বিয়ে। পাগল নাকি তুমি বড়বৌ!' আসলে সদ্য-পাওয়া অতগুলো টাকা তখন তিনি একটু অনুভব করতে চেয়েছিলেন। সামান্য কেরানীর সুদূর স্বপ্নের অতীত অতগুলো টাকা। অন্তত সুমিত্রার তাই বিশ্বাস।

তারপর সে টাকার অঙ্ক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এল। মধ্যে কী একটা ব্যবসা করতে গিয়েও হাজার চারেক টাকা নষ্ট করলেন বাবা। আর যা বাকি রইল তা সংসারের নিত্য-অনটনে দু'টাকা চার টাকা ক'রে খরচ হ'তে হ'তে একদিন আর কিছুই রইল না। দাদার যা মাইনে তাতে তার খরচই চলে না। শেষে প্রতিদিনের হাঁড়ি চড়াই হয়ে উঠল সমস্যা।

সুমিত্রা ক্লাস এইট্ পর্যন্ত প'ড়ে ইস্কুল ছেড়েছিল। মার শরীর খারাপ,

সংসারের কাজ দেখে কে? দুটো ছোট ভাই। দিদি নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। ছোড়দি যদিও বিধবা তবু তার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো ব'লে বাবা আনতে চান না এখানে—'এখানে এলে যদি চিরদিনের মত ঘাড়ে পড়ে? খেতে দেব কী?'...তারপর দাদার বিয়ে হ'তে জোর ক'রে আবার ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল সুমিত্রা। আবার ম্যাট্রিক পাস ক'রে পড়া বন্ধ হয়। বাবার আর্থিক অবস্থা এমন্ নয় যে, মেয়ের কলেজের খরচা যোগান। মাও বললেন, 'আর গুচ্ছের প'ড়ে কী হবে। এবার মেয়ের বিয়ের যোগাড় ছাখো—'

যোগাড় দেখলে অবশ্য দেখা যেত। তখনও কোনোমতে বিয়ে দেওয়া চলত। গরিবের মেয়ের কি বিয়ে হয় না? পাড়ার নেড়ুবাবু সাতাশ টাকা মাইনের বেয়ারা কোন্-যেন সদাগরী অফিসে। তবু তিনিও তো মেয়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু, তার বেলা সে-রকম উদ্যোগী হয়ে পরিশ্রম করবে এমন লোক ছিল না। বাবা তাস আর তামাক—সেই সঙ্গে পাড়ার অকর্মণ্য বৃদ্ধদের সঙ্গে আড্ডা—এই নিয়েই থাকতেন। স্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে বলতেন, 'বিয়ে বললেই বিয়ে? ঐ তো তোমার কালো ভূত মেয়ে—না রূপ না আমার রুপো, বর জোটাই কোথা থেকে? তাও তো সবাইকে ব'লে রাখছি, আর কী করব, রাস্তায় রাস্তায় পাত্তর চাই পাত্তর চাই ব'লে ঘুরে বেড়াব পাগলের মত?'

দাদা তো চিরদিনই উদাসীন। সে দেখে তার স্ত্রীকে সাহায্য করার লোক, মা দেখেন তাঁর সংসারের ভরসা। ব্যস্! সবাই নিশ্চিন্ত।

অবশেষে, সুমিত্রাই উদ্যোগী হয়ে পাড়াতে একটা টিউশানি জুটিয়ে নিলে, তারপর ভর্তি হয়ে গেল কলেজে। মাস কয়েক পরে চাকরিও জুটল একটা। ভোর ছ'টায় বাসী রুটি খেয়ে কলেজ যেত, সেখান থেকে সোজা অফিস—বাড়ি ফিরে সংসারের কাজ, রান্নাবাড়া। মা বুড়ো হয়েছেন, দুপুরটা চালান একরকম ক'রে—সন্ধ্যায় একেবারে অনড় হয়ে পড়েন। বৌদির কোলে চিরদিনই ছোট ছেলে। সুতরাং—

এখন তো আর তার বিয়ের কথা মুখে কেউ উচ্চারণই করে না। স্নেহ যে করে না তা নয়। বৌদি চিরদিনই ভালোবাসে। কিন্তু, সে তার ছেলেমেয়ে ধরার লোক ব'লে। দাদা-বাবা-মা সবাই ভালোবাসে; ওরই উপার্জনে তাঁদের উপবাস করা বন্ধ হয়েছে। ছোট ভাইদের পড়াশুনো চলছে। এককথায় সুমিত্রার এই সরকারী চাকরি হওয়াতে তাঁরা নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছেন। সংসারটা অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে চলেছে। দাদা তো এমনভাবেই কথা বলে যে, সুমিত্রার

আর বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়—এবং সে কথাটা নিশ্চয় সুমিত্রাও এতদিনে বুঝেছে—এটা স্বতঃসিদ্ধ।...

এর আগের ঔদাসীন্য বিঁধেছে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী বেঁধে এখনকার এই নির্মম স্বার্থপরতা। ওরা কী ভাবে সুমিত্রাকে? তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা সব কি বাইরের চেহারাটার মতই শুকিয়ে গেছে? তাও যে গেছে, সে তো ওদেরই অত্যাচারে। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই—উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম। আর তার ফলে ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য। শেষেরটাই তাকে আরও বেশী ক'রে শুকিয়ে দিয়েছে। নইলে বৌদিও তো তার বয়সী—হয়তো কিছু বড়ই হবে—তার ওপর আটটি সন্তানের মা। তবু এখনও কেমন ঢলঢলে আছে ওর মুখখানা। ওর বন্ধুরাও কেউ এমন হয়ে পাকিয়ে যায় নি।

নাঃ—এসব কি ছাইভস্ম ভাবছে সে? ছি ছি—এ বিলটা আজকে চেক ক'রে না দিতে পারলে হরিশবাবু কী ভাববেন! মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আসা যাক্।

সুমিত্রা উঠে পড়ে। ফিরে আসবার পথে চোখে পড়ে বারান্দায় অসিত দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে—অতসী যেতে যেতে মুচকি হেসে গেল। দু'জনেরই চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল নিমেষে। বহু পরিচিত এ চাহনি—

এমন কি অতসীও?

ওর চামড়াটা দু'-পোঁছ বেশী ফরসা এটা ঠিক। কিন্তু, বয়স তো সুমিত্রার চেয়েও বেশী...

বুকের মধ্যে যে দীর্ঘনিশ্বাসটা প্রাণপণে দমন ক'রে রেখেছিল সেটা এবার বেরিয়ে আসে। কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারে না। মনকেও এতক্ষণ ধ'রে যে প্রবঞ্চনা ক'রে চলেছে আর সেটা সম্ভব নয়। হ্যাঁ—সে ঈর্ষিত। কৈ, এতকালের মধ্যে তার দিকে তো কেউ ফিরেও তাকালে না? তার সঙ্গে রসিকতা করতে চায়, ইয়ার্কি দিতে চায় এমন কি কেউ নেই? একজন মাত্র তাকে নির্জনে পেলে কিছু অশ্লীল রসিকতা করেন—তবে সে আরও অপমান। তিনকড়িবাবুর রিটায়ার করারও বয়স পেরিয়ে গেছে, এখন এক্সটেনশানে আছেন।

আশ্চর্য! আজ না হয় সে এমন রোগা আর কাঠি-মত হয়ে গেছে; যখন তা ছিল না, তখনও তো কোনো ইতিহাস কোথাও রচিত হয় নি ওকে নিয়ে।

পাড়ার অনেক মেয়ের অনেক কাহিনী সে জানে। আজকাল তো কথাই নেই, ক্লাস এইট্ পেরোলেই এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি এবং ওপর থেকে নিচে চিঠি লেখালেখি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিঠিরও বেশী।—শুধু কি বিধাতা তারই চরিত্র নির্মল রাখবার জন্য বিশেষ একটি অদৃশ্য প্রহরায় ঘিরে রেখেছেন তাকে? রূপকথার রাজপুত্র না আসুক, পাড়ার কোনো বকা ছোকরাও তো কোনোদিন তার জানালা লক্ষ্য ক'রে ঢিল ছোঁড়ে নি, তাকে দেখে শিস দেয় নি। এমন কী কাঠিন্য তার মুখেচোখে মাখানো আছে? এমন কী গম্ভীর এবং ভয়াবহ সে?

ঠং ঠং ক'রে চারটে বেজে যায়। হরিশবাবু হেঁকে বলেন, 'কৈ গো সুমিত্রা-রানী, হ'ল তোমার? আমি ও ফাইলটা ক্লোজ করতে চাই যে। কোন দিন আবার শালা হুড়ো দেবে—'

সুমিত্রা অপরাধীর মত এসে দাঁড়ায়, 'বড্ড মাথা ধ'রে উঠেছে কাকাবাবু, কিছুতেই যেন কাজ এগোচ্ছে না। আমি ক'রে দিয়ে যাব যত দেরিই হোক্—'

হরিশবাবু মুখ তুলে তাকাতেই ওর মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা তাঁর চোখে পড়ে, 'ইস্ সত্যিই তো—মুখচোখ যে শুকিয়ে গেছে একেবারে। অ্যাস্পিরিন খাবে নাকি? আছে আমার কাছে।···ও বিল থাক্ গে আজ, এখন বরং বাড়ি চ'লে যাও। কাল ফার্স্ট আওয়ারে ক'রে দিও। ইস্—তোমরা যে মোটে শরীরটার দিকে নজর দাও না। যত বলি একটু ক'রে ত্রিফলার জল খেয়ো ভোরবেলা—'

বাকি কথাগুলো আর শোনে না সুমিত্রা। সত্যিই ওর মাথা ধ'রে উঠেছে ভীষণ। কেন এমন হ'ল কে জানে। বিশেষ ক'রে আজই ওর চিত্ত কেন এমন উদ্বেল হয়ে উঠল? এসব আঘাত তো নিত্য-নৈমিত্তিক!

বাড়ি আসতেই বাবা প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, এত সকাল সকাল?'

উত্তর দিলে না সুমিত্রা। হাতে সাজা হুঁকো এবং সামনে চায়ের পেয়ালা। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন। সে নিজেই নিরুপদ্রব ক'রে দিয়েছে ওঁর জীবন! ওপরে উঠতে মা বললেন, 'হ্যাঁরে তোর চোখমুখ এমন ব'সে গিয়েছে কেন? অসুখ করেছে নাকি? কৈ আয় তো দেখি—'

অন্যদিন হ'লে ওঁর এই উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার মনও আর্দ্র হয়ে উঠত, কিন্তু আজ যেন আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। সে সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিলে, 'আমার কি অসুখ করে মা? না করতে পারে? তাহ'লে তোমাদের চলবে কী ক'রে?'

…ওঁদের পাশ কাটিয়ে তেতলায় যাবার চেষ্টা করে সে। ওপরে দু'টি মাত্র ঘর, একটি দাদার আর একটি তাদের, অর্থাৎ বাবা মা দু'টি ভাই এবং সে, এই সব ক'জনের। অনেকদিন ধ'রেই অসহ্য হয়ে উঠেছে, সম্প্রতি নিজে কিছু টাকা খরচা ক'রে ওপরের চিলকুঠুরীটা চলনসই ক'রে নিয়ে তাতেই আশ্রয় নিয়েছে— একরকম জোর ক'রেই। মা আপত্তি করেছিলেন, 'আইবুড়ো মেয়ে একা ছাদের ঘরে থাকবি কি? ওমা—লোকে কী বলবে?'

সুমিত্রাও চোখা উত্তর দিয়েছিল, 'কী বলবে? ছাদ ডিঙিয়ে আমার ঘরে লোক উঠবে? নাকি ভূতে ধরবে? তোমার যা মেয়ে, ভূতেও ছোঁবে না মা!…সে যে যা বলে বলুক, সারাদিন খেটেখুটে একটু একা-একা থাকতে না পারলে পাগল হয়ে যাব!'

বাবা মা আর কিছু বলতে সাহস করেন নি। অর্থ উপার্জন করতে শুরু করলেই মেজাজ দেখাবার অধিকার জন্মায়—এ তো সবাই জানে!

বৌদির ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তার পুলকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওমা ঠাকুরঝি আজ এরই মধ্যে এসে গেছ। বাঁচলুম! তোমার ভাইঝিকে একটু সামলাও দিকি, কাপড় কাচতে পর্যন্ত যেতে পারছি না!'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সুমিত্রার। সে ওপরে উঠতে উঠতেই বললে, 'আমি এখন আর কিছুই পারব না বৌদি, বড্ড মাথা ধরেছে—'

'আবার মাথা ধরল! বেশ।…মাথাধরা ভাই আজকাল যেন তোমার হাতধরা হয়ে উঠেছে!'

'হ্যাঁ বৌদি, আমি ইচ্ছে ক'রে ধরাই।'

অপ্রসন্নকণ্ঠে বৌদি বললে, 'আমি কি তাই বলছি!'

কিন্তু শুয়ে থাকারই বা উপায় কী? একসময় তো উঠতেই হয়! দাদা আসবে, চা জলখাবারের পাট আছে। ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যে থেকেই খাব খাব করবে। একরাশ আটা মাখতে হবে। মা দয়া ক'রে কুট্‌নোটা কুটে রেখে দেন তবু রক্ষে। বৌদি রান্নাঘরে নামে আটটারও পর। কোলের মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, বেশভূষা ক'রে নেমে এসে শুধু রুটি ক'-খানা বেলে দেয়।

সুমিত্রা অফিসের কাপড়-জামা ছেড়ে নেমে এসে খুব কড়া ক'রে এক কাপ চা তৈরি ক'রে খায়—তারপর রান্নাঘরে ঢোকে প্রতিদিনকার মতই। আর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ মেলে না—চিন্তা কল্পনাও একান্ত অনবসরের কোন ছায়ায় মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

অবসর মেলে একেবারে সব রান্না সেরে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে—রাত ন'টারও পর। রান্নাঘর পর্যন্ত ধুয়ে সে নিজে যায় গা ধুতে। এটা ওর প্রতিদিনকার অভ্যাস। রান্নার তেল যেন সর্বাঙ্গে লেগে থাকে নইলে—তেল আর গন্ধ। আজও গা ধুয়ে এসে প্রসাধন করতে বসল। একটু যেন বিশেষ ক'রেই প্রসাধন করল, কেন, তা সে নিজেও জানে না। তারপর বাইরে বেরিয়ে তারাভরা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল। এইবার ঘণ্টাখানেক ওর ছুটি। নিরন্ধ্র অবসর। বাবা আড্ডা থেকে ফেরেন নি, দাদা ক্লাব থেকে আসবে দশটারও পরে। বৌদি এইসময় একটু ঘুমিয়ে নেয়, শেষরাত্রে ছেলেমেয়ের উপদ্রবে কোনোদিনই ভালো ঘুম হয় না।···অন্যদিন এ অবসরটা সে অফিস-লাইব্রেরি থেকে আনা বই প'ড়ে কাটায়। কিন্তু, আজ কিছুই ভালো লাগছে না। বইও না।

সমস্ত বাড়িটা নির্জন নিস্তব্ধ। শুধু ওদের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটি পরীক্ষার পড়া পড়ছে। নিচের দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে ওরা—সিঁড়ির নিচের খাঁজটুকু চটের পরদা টাঙিয়ে ছেলেটা পড়ার ঘর ক'রে নিয়েছে। পড়া! ···মনে হ'লেও হাসি পায় সুমিত্রার। দু'বার ফেল করেছে আই-এস্‌-সিতে, এইবার নিয়ে তিনবার হবে পরীক্ষা দেওয়া। বিশ্ববকাটে ছেলে বীরু, লম্বা একহারা গড়ন, সিগারেট বিড়ি তো মুহুর্মুহুঃ চাই—অন্য ব্যাপারেও পরিপক্ব। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই ও-পাড়ায় কী একটা এমন কেলেঙ্কারি করেছিল যাতে আর ওখানে থাকতেই পারেন নি ওর বাবা-মা। পুলিশ পর্যন্ত গড়াত, অনেক কষ্টে সেটা বেঁচেছে। এখানে এসেও নিশ্চেষ্ট নেই বলা বাহুল্য—সুমিত্রা অনেক চিঠি লেখালেখির ইতিহাস জানে। মোড়ের বাড়ির নন্দার দাদা রাত ন'টার সময় ধ'রে কী মারটাই দিলে সেদিন। ওর বাবা শাসন করতে পারেন না—অথচ আশা করেন যে, ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

বীরু!

কথা কইতেও ঘৃণাবোধ হয় সুমিত্রার—ওর সঙ্গে। আজ পর্যন্ত নিতান্ত বাধ্য হয়েই বোধ হয় গোটা-পাঁচ-ছয় শব্দ উচ্চারণ করেছে ওকে লক্ষ্য ক'রে।

একঝলক দক্ষিণা বাতাস হঠাৎ আশপাশের গাছপালাকে মর্মরিত ক'রে বয়ে যায়। অসময়ে উষ্ণ বাতাস। কেমন যেন শিউরে ওঠে সুমিত্রার গা-টা।

সহসা বীরুর সম্বন্ধেই আজ বা ওর কৌতূহল উগ্র হয়ে ওঠে কেন?···ওকে কখনও কাছ থেকে দেখে নি। কী আছে ওর ঐ চোয়াড়চোয়াড় চেহারায়?

নন্দা নাকি একরাশ চিঠি লিখেছিল ওকে।

এক-পা এক-পা ক'রে কখন একসময়ে সুমিত্রা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। একতলায় গিয়ে ভাড়াটেদের দিকের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেলে। ভেজানোই ছিল—খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে ঢুকে চটের পরদাটা সরিয়ে একসময় ও সত্যিই ঢুকে পড়ল বীরুর ঘরে—

সমস্ত ঘরটা বিড়ির ধোঁয়া ও গন্ধে পূর্ণ। ওকে দেখে বীরু যেন ভূত দেখার মতই চম্‌কে উঠে চট্ ক'রে অপূর্ব কৌশলে বিড়িটা নিভিয়ে ফেলে পাশের দেওয়ালে চেপে। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'একি সুমিত্রাদি? হঠাৎ এত রাত্রে? মাকে ডেকে দেব?'

'না না—মা নিশ্চয়ই একটু বিশ্রাম করছেন এখন, ডেকে কাজ নেই। এমনিই এলুম—কী পড়ছ দেখতে। বোস বোস, তোমার পড়ার ব্যাঘাত করতে চাই না,—'

সে জোর ক'রেই ওর কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দেয়, তারপরও কিন্তু হাতখানা থাকে বীরুর কাঁধেই—সরানো হয় না।

বীরু কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে। সে একটু বোকার মত হেসে বলে, 'বাঃ রে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি ব'সে থাকব।...এখানে কিছুই নেই ছাই। না হয় চলুন ওঘরেই—মা হয়তো ঘুমোন নি একেবারে—'

'না না থাক্। কেন, আমি থাকলে কি অসুবিধা হচ্ছে?' আল্‌গা ভাবে হাসে সুমিত্রা। কিন্তু মনে হয় ঠোঁট দুটো কান্নার ধরনে বেঁকে যাচ্ছে—নিজে নিজেই অনুভব করে সেটা। বীরুর কাঁধে রাখা হাতখানা কাঁপছে অল্প অল্প। অনভ্যস্ত ভূমিকার বিড়ম্বনায় স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে আসে।

টুক্‌রো টুক্‌রো আলাপ—কিছুতেই দানা বাঁধে না। বেশ বুঝতে পারে সুমিত্রা, বীরু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছে।

ও নিজেও ঘেমে ওঠে। আরও মিনিট পাঁচ-ছয় বৃথা চেষ্টা ক'রে সুমিত্রা উঠে পড়ে, 'আচ্ছা তুমি পড়। সময় নষ্ট করলুম খানিকটা!'

'না না, তা নয়। তবে আপনি আসাতে আমি ভেবেছিলুম কী না কি, বিপদ-আপদই হ'ল বুঝি। আপনি তো এমনি কারুর সঙ্গে কথাই কন না—বাব্‌বা, যা গম্ভীর!'

সৌজন্যের কথা। কিন্তু, চোখে যে হাসির আভাস ওর লেগেছিল, তাতে কি বিদ্রূপ নেই? কাল কি ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে এই কথাই বলবে না,

'ওপরের বাড়িওলাদের সেই কেল্‌টে ছুঁড়ীটা কাল রাত্তিরে জমাতে এসেছিল, মাইরি !'

আড়াল থেকে শুনে শুনে ওদের কথা বলার ধরন ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। কেন গেল ও, কেন এই অপমানটা হ'তে গেল স্বেচ্ছায় ?

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে চোখে জল এসে গেল সুমিত্রার। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সত্যিই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল সে।

খানিকটা পরেই ওদের চাকর রাখাল এসে পৌঁছল দেশ থেকে। রাখাল ওর দাদার অফিসে কাজ করে, ওদের বাড়িতে থাকে এবং খায়। তার বদলে দু'বেলা যতটা পারে কাজকর্ম ক'রে দেয়। সুমিত্রার চাকরি হওয়ার পর থেকেই এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

রাখাল মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। মুড়ির ছাতু, নতুন গুড় কত কী এনেছে। ততক্ষণে দাদা ও বাবাও এসে গিয়েছেন। খুব খানিকটা হৈ-হৈ হ'ল। রাখাল বললে, 'আমি যা ছাতু এনেছি তাই খাব এখন—দিদির তো রান্নাটান্না সারা।'

সুমিত্রা জোর দিয়ে বললে, 'না না, রুটি বেশী আছে। সত্যিই বেশী আছে। তাছাড়া আমার শরীরটা ভালো নেই, আমি তো কিছু খাবই না।'

সে জোর ক'রে নিজের ভাগের খাবারটা রাখালকে খাইয়ে দিলে। রাখাল বললে, 'আপনি মিছে ক'রে বললেন দিদি, পাছে আমি না খাই।'

মিষ্টি হেসে সুমিত্রা বললে, 'বললুমই বা রাখাল। সত্যিই যদি তোমার দিদি হ'ত—তুমি হঠাৎ গিয়ে পড়লে না খাইয়ে সে নিজে খেতে পারত ?'

উত্তর দিতে গিয়ে রাখালের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে, 'সে কথা আমি দেশে গিয়ে সবাইকে বলেছি দিদি যে, আমায় দিদিমণি যা যত্ন করেন, অমন আমার আপনার লোকেও কেউ করতে পারত না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যে-যার ঘরে চ'লে যায়, রাখাল রান্নাঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ক'রে এখানেই শোবে। চাকরদের শোবার মত ঘর আর নেই এখন। রান্নাঘরেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ঘর ধুতে ধুতে রাখাল পেছনে ছায়া দেখে চমকে ওঠে—সুমিত্রাই আবার কখন নিচে নেমে এসেছে—!

'কী চাই দিদিমণি ? জল ? বললেন না কেন ডেকে—দিয়ে আসতুম।'

'না না। এমনিই। ঘুম আসছে না তাই। তোমার কাছে তোমাদের দেশের খবর সব শুনতে এলুম।'

টুক্‌রো টুক্‌রো খবর দেয় রাখাল ঘর মুছতে মুছতে। একুশ-বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে—দেশে গিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি ক'রেই এসেছে। তবু সুমিত্রা যখন কাছে গিয়ে ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে, 'যাই বল রাখাল, তুমি একটু রোগা হয়েই এসেছ!' তখন একবার নিজের দিকে তাকিয়ে রাখালও তা স্বীকার করলে, 'বড্ড রোদে রোদে ঘুরেছি কিনা—তাছাড়া ঘরদোরগুলো নিজেই সারলুম। বাবা যে ছিষ্টির কাজ জমিয়ে রেখেছিলেন।'

অবশেষে রাখাল যখন বিছানা পাততে শুরু করলে, সুমিত্রাকে চ'লে আসতে হ'ল। আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অজুহাতই নেই। তাছাড়া, শোভনতা ও সঙ্গতির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ!

কিন্তু তবু, সে তখনই শুতে যেতে পারলে না। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ছাদে, একা এ[illegible]—নিশাচরী প্রেতিনীর মত।

অনেকক্ষণ পরে খুট ক'রে একটা শব্দ হ'ল নিচে। ওদেরই সদর দরজা খোলার মত। হেঁট হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখলে—হ্যাঁ, ওদের বাড়ি থেকেই কে একজন বেরিয়ে গেল খুব সন্তর্পণে। একবার মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকালেও—তবে অন্ধকারে বোধ হয় সুমিত্রাকে দেখতে পেলে না। কিন্তু, সুমিত্রা চিনতে পারলে—রাখাল।

ওধারে দাশগুপ্তদের বাড়িরও খিড়কির দোর খুলে গেল—প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি। মধ্যেকার খালি মাঠে ব'সে দু'জনে কী গল্প হ'তে লাগল। রাখাল একটা বিড়িও ধরাল। সেই আলোয় সুমিত্রা দেখল তার অনুমানই ঠিক—দ্বিতীয় প্রাণীটি গুপ্তদের ঝি চপলা।

মিনিট কতক গল্প করার পরই দু'জনে উঠে পড়ল। চপলা ফিরে গেল ওদের বাড়ি, রাখালও ফিরে এসে সাবধানে দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল। খুব সামান্য শব্দ হ'লেও সুমিত্রা ওর নিজের ঘরে এসে দোর দেওয়াটা পর্যন্ত শুনতে পেল।

সামান্য ব্যাপার। ওদের এ প্রণয়রহস্য অনেকদিনই অনুমান করেছে সুমিত্রা, আগে আগে কৌতুকই অনুভব করেছে বরং—কিন্তু আজ, কে জানে কেন অসহ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল। খানিকটা চুপ ক'রে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থেকে তর্‌তর্ ক'রে নেমে এল নিচে। বারান্দায় প'ড়ে মায়ের মাথার কাছের জানালা থেকে চাপা গলায় ডাকলে, 'মা মা শোন—ওঠ একবার!'

মা তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে উঠে দোর খুলে দিলেন, 'কি রে ব্যাপার কী? কী হয়েছে মা?'

'তোমাদের ঐ রাখাল মা, ওকে কিছুতেই রাখা চলবে না। ওকে সকালে উঠেই তাড়িয়ে দেবে—'

'কেন—কেন, কী হ'ল?'

'ওর স্বভাব-চরিত্র ভারী খারাপ। একেবারে যা-তা—ওদের বাড়ির ঐ চপলা—। ছি ছি!'

ঘৃণায় কথাটা শেষ করতে পারলে না।

মা কিন্তু অতি সহজেই কথাটা নিলেন, 'ও, এই! সর্ব রক্ষে! আমি বলি না জানি আর কি! ওসব তো বাছা আছেই। বলি ভদ্দরলোকদেরই স্বভাব-চরিত্র পাহারা দেওয়া যায় না—তা চাকরবাকর। নে, নে—যা তুই শুয়ে পড়গে যা দিকি। তিলকে তাল ক'রে মাথা গরম করিস নি।'

তিনি একরকম ঠেলেই মেয়েকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সুমিত্রা বিছানায় একরকম আছড়েই পড়ল। সারাজীবনের সমস্ত হতাশা, সমস্ত ব্যর্থতার বেদনা যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আজ অশ্রুর আকারে বেরিয়ে এল। কঠিন ঠাণ্ডা বিছানাতে আকুল হয়ে মাথা ঠুকতে লাগল সুমিত্রা। বেঁচে থাকার এ যন্ত্রণা সে আর সইতে পারছে না। হে ঈশ্বর, সে মরতে চায় শুধু এখন!

## শহীদ

সকাল থেকেই জিতেনবাবুর গজগজানির অন্ত নেই।—'আরে মলো যা, যাদের সত্যি-সত্যিই বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না—অল্প মাইনের কেরানীরা—তারা তো কৈ জলুস মিছিল বার করছে না! তোদের কী বাপু, বাপের হোটেলে খাচ্ছিস আর রাজনীতি ক'রে বেড়াচ্ছিস!…আর, ধ'রে আনছিস যত রাজ্যের দথ্‌নো বেপারী-গুলোকে—যারা দু'-আনার পটোলটা চোদ্দ আনা সেরে বেচে আমাদের কান মলে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে। তোদেরই বা কি—তাদেরই বা কি! মরতে মরছি আমরা! সারাটা দিন দোকান দিলে রাত্তির নাগাদ হয়তো তিনটে-চারটে টাকা উঠবে—

তাও যদি দু'-তিন দিন বন্ধ রাখতে হয় তো চলে কী ক'রে! তোরাই তো আমাদের হাঁড়ি সিকেয় তুলে দিচ্ছিস!'

তা রাগ তাঁর হতেই পারে। একটি কাটা কাপড়ের দোকান তাঁর ভরসা—নিতান্ত একরত্তি দোকান। তবু এই দোকান থেকেই এক কালে সচ্ছল সংসার চালিয়েছেন, মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু, এখন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ভাইদের কল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় কাটরা, রাস্তার ধারে ধারে ফুটপাথেই দোকান। সে-সব ফেলে কষ্ট ক'রে তাঁর কাছে আসবে কেন লোকে?

তা-ও ঐটুকু দোকানে মাইনে ক'রে একটা লোক রাখতে হয়েছে। একা এ-সব কাজ সম্ভব নয়—দিনরাত দেখেই বা কে? একটা কর্মচারী—তাছাড়া জল-তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ফাই-ফরমাশ খাটার জন্মে বাচ্ছা চাকর। এতে কি কম যায়? ঐ যে অত বড় ষাঁড়ের-নাদ ছেলে ব'সে আছেন, তা তার দ্বারা কি কোনো উপকার হবে? কথায় বলে—'আছে গোরু না বয় হাল তার দুঃখ সর্বকাল!' তাঁর হয়েছে তাই। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সাজোয়ান ছেলে—খাবার বেলা তো আর কেউ দেয় না—সে তো যোগাতে হয় বুড়ো বাপকেই—আবার মুখটিও বেশ, এটা খাব না, ওটা খাব না—রাগ-গোসা, কত কি! তাই দু'-পয়সা রোজগার করার চেষ্টা ত্থাখ, তা নয়। ওঁর দোকানে বেরোনো চলবে না—কী সমাচার, বাপের কাছে চাকরি করা যায় না। আচ্ছা বাপু যায় না তো যায় না—ধার-দেনা ক'রে তিনি বড় রাস্তার ওপর একটা ছোট বিস্কুট-লজেন্সের চলতি দোকান কিনে দিলেন। একটি বছরও গেল না—এধারে তো আদ্ধেকদিন দোকান খোলাই হ'ত না—কী ক'রে যে সব উড়ে গেল তা তিনি আজও বুঝতে পারেন না। একদিন গিয়ে দেখলেন দোকানে এক আনার জিনিসও নেই—উল্‌টে ঘরভাড়া বাকি পড়েছে ছ'-মাসের। শিশি-বোতল জার-শেল্‌ফ্‌ সব বেচেও তা শোধ হ'ল না, ঘর থেকে শোধ করতে হ'ল তাঁকে। ব্যস্‌, সেই থেকে নিশ্চিন্তি, বিধবা মেয়ের মত ব'সে খাচ্ছেন আর সারা দিন হল্ল হল্ল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সন্ধ্যে থেকে ত্থাখো গে হরকিষণ মাড়োয়ারীর বাইরের ঘরে পার্টির অফিসে ধন্না দিয়ে ব'সে আছে—ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুঁজোয় জল তোলা, পুরনো খবরের কাগজে কাঠের বাঁট কালিতে ডুবিয়ে পোস্টার লেখা, সারা রাত জেগে লোকের দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে আসা—সব তাঁর ঐ গুণধর পুত্তুরটির ওপর ভার।—'বোকা বোকা—কাঠ বোকা! কৈ, আর তো কেউ এগোয় না এই সব খাটুনির কাজে! ওরা যে ইচ্ছে ক'রে তোর ঘাড়ে চাপায় তাও বুঝিস না। সব তো বাক্যবীর! কর্মবীর তো কাউকে দেখি না।'

'অথচ বাড়ির কাজ দাও, বাবুর কী মেজাজ! 'না, আমি পারব না, আমার সময় নেই!' সময়টা তোমার কিসে যায় বাপু? ঐ পার্টির কাজ ক'রে? পার্টি তোমাকে চতুর্বর্গ ফল দেবে পেড়ে—নয়? কখনও তো একটা ফুটো পয়সা আনতে দেখা গেল না। 'পারব না।' পারবে না কেন বাপু? ওখানে তো জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করতে পার। কথায় বলে 'ঘর জ্বালানে পর ভালানে!' কাজের মধ্যে একটি কাজই পারেন, বক্তৃতাতে খুব দড়। যখনই শোন মুখে খই ফুটছে।' রাস্তার কোণে কোণে প্যাকিং কাঠের বাক্স পেতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা ক'রে গলা শুকিয়ে বাড়ি আসেন ছেলে—তাঁকে তখন তোয়াজ কর! দিনকতক বাড়িতেও শুরু করেছিলেন বক্তৃতা। বাড়ি ফিরবে তো রাত বারোটায়, তারপর তখন আবার যদি মা কি বোনকে ধ'রে তারস্বরে চিৎকার ক'রে ক'রে বক্তৃতা করতে শুরু করে তো তাঁর প্রাণ বাঁচে কী করে? সারাদিন খাটুনির পর এই তো এইটুকু তাঁর বিশ্রাম! তবু ক'দিন সহ্য করেছিলেন, শেষে একদিন খুব বাড়াবাড়ি করতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বলেছিলেন, 'গ্যাখো বাপু, বক্তৃতা করার যদি এত শখ থাকে—দোর খোলা আছে, রাস্তায় যাও। এ বাড়িতে যদি থাকতে হয় মুখটি বুজে থাকতে হবে। বক্তিমে! হাত্তোর ভালো হোক। তাও যদি বুঝতুম যাদের হয়ে এত চিৎকার, এত হাত-পা নাড়া তারা তোকে খেতে দিত! সে তো সেই 'মুনাফাখোর' বাপের পয়সা ছাড়া গতি নেই!'

সেই থেকে বাড়িটা অন্তত শান্ত হয়েছে। ছেলের গর্ভধারিণী অবিশ্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রে মুখ শুকিয়ে এসে বলেছিলেন, 'অত বড় ছেলেকে তুমি ভাতের খোঁটা দিলে, যদি কোথাও চ'লে-ট'লে যায়?'

উনি জবাব দিয়েছিলেন, 'তুমি রেখে বসো দিকি! চ'লে যাবে। চ'লে যাওয়া অত সহজ কিনা। যেখানেই যাবে পেটটাও যাবে সঙ্গে—আর তা গেলেই কিছু রেস্তও চাই। এই বাজারে একবেলাও ওর কোনো মুরুব্বী খেতে দেবে না!'

ওঁর কথাই সত্যি হয়েছিল—ছেলে পালাবার চেষ্টা তো করেই নি—আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গিয়েছিল বরং।

সে যাই হোক—তবু তো দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাচ্ছিলেন, এ আবার কি এক উড়ো আপদ এল! আজ ক'দিন তো রাজেনের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না—বাড়ি আসছে রাত দেড়টা-দুটো। মাকে ফরমাশ হয়েছে—'ভাত আমার ঢাকা দিয়ে রেখো—আমার মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব, সকাল ক'রে ফিরতে-টিরতে

পারব না।' তা-বাপু বিশ্বের দায়িত্বই যখন বইতে হচ্ছে, তখন এ পোড়া বাড়ির সঙ্গে ঐটুকু সম্পর্ক আর কেন রাখা?

মোদ্দা, বাবু যে কাজের মধ্যে কাজ, এই কম্ম ক'রে বেড়াচ্ছিলেন—তাঁরই ভাত ভিক্ষে নিয়ে টানাটানি—তা কে জানত! কাল নাকি তাঁরা পঁচিশ হাজার লোক নিয়ে সরকারের ঘাঁটিটাই দখল করতে গিয়েছিলেন—সে তো একদফা আতঙ্ক, হৈ-চৈ, সন্ধ্যের মুখে সকলে বললে, আর থাকা ঠিক নয়—অসময়ে দোকান বন্ধ করতে হ'ল। না ক'রেই বা হ'ত কি বল, খদ্দেরই ছিল না সন্ধ্যের আগে থেকে।

কাল তো যা হোক গেছে, আজ নাকি আবার বড়বাবু দয়া ক'রে তাঁর গর্ভধারিণীর কাছে ব'লে গেছেন, 'বাবাকে ব'লো আজ যেন দোকানে-টোকানে না বেরোয়—সব লুটপাট হয়ে যেতে পারে। আগুন জ্বলবে আজ, আমরাই আগুন জ্বালাব। খুব সাবধান!'

'তা জ্বালাবে বৈকি বাপু, জ্বালাবে বৈকি! কিন্তু, সে আগুন যে ঘুরে-ফিরে একসময় নিজের পেটে গিয়ে হাজির হবে, সে খেয়ালটি আছে? দিয়েছে বুঝি কাল খুব গোবেড়েন—তাই এত জ্বালা। মারতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছ!...তা সিয়ান ঠকলে বাপকে বলে না। মার খেয়েছিস্ চুপ ক'রে থাক—কিল খেয়ে কিল হজম কর—অত আবার তম্বি কেন রে বাবা? দু'কান-কাটা বেহায়া সব—লজ্জাও নেই।'

'খুব তো লম্বা-চওড়া ক'রে গেছ—বাবা যেন দোকান না খোলে। কাল তো ঐ একাদশী গেছে প্রায়, আজ যদি আবার মোটেই না খোলেন—বাড়িতে হাঁড়িটা চড়বে কি ক'রে? বাইরে আগুন জ্বালিয়ে যখন পেটের জ্বালায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসবি—তখন কী হবে? এমন মুরোদ তো নেই যে দু'-সের চাল কোথাও থেকে নিয়ে আসবি।'

অনেক জন্মের পাপ তাঁর, তাই এমন ছেলে জন্ম দিয়েছিলেন। চিরকাল জ্বালিয়ে খেলে। হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল তাঁর।

সারা সকালই বাড়িতে ব'সে ব'সে গজগজ করলেন জিতেনবাবু। অন্য দিন সাতটার মধ্যেই দোকানে বেরিয়ে যান। দশটা নাগাদ কর্মচারী আসে। আর একটু দেখে এগারোটা নাগাদ একবার বাড়ি ফেরেন ভাত খেতে। আবার ঠিক একটা না বাজতে বাজতে গিয়ে বসেন—একেবারে রাত ন'টা।

আজ আর সকালে বেরোন নি। কী করবেন সেই কথাটাই ভেবেছেন।

গোকুল মল্লিকের কাছ থেকে খবরের কাগজটা চেয়ে এনে পড়েছিলেন। হাবভাব ভালো লাগে নি একটুও, গোলমাল একটা বাধবে ব'লেই মনে হচ্ছে। আর বিশেষ ক'রে বড়বাবু যখন কথাটা ব'লে গেছে—কখনও তো বলে না এমন ক'রে।

কী করবেন—যাবেন—না, যাবেন না?

সেই কথাটাই ভেবেছেন গজগজানির ফাঁকে ফাঁকে।

কর্মচারী শেতল নন্দী তো আসবে না জানা কথাই। একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ! কামাই করতে পারলে আর কিছু চায় না। সেক্ষেত্রে তিনি একা গিয়ে দোকান খুলবেন? যদি সত্যিই কোনো গোলমাল বাধে?

থাক্ গে। কী আর হবে—না হয় একটা দিন বেফয়দাই যাবে। চার টাকা কি পাঁচ টাকা বড় জোর—এই তো? পুজোর বাজার এখনও পড়ে নি।

কিন্তু, ঘড়ির কাঁটা যত এগোয় জিতেনবাবুর অস্বস্তি বাড়ে। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে। দশটা সাড়ে-দশটা অবধি ঘরে ব'সে ব'সে যেন কণ্টক-শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করলেন তিনি, তারপর হঠাৎ একসময় ছিলেকাটা ধনুকের মত ছিট্‌কে লাফিয়ে উঠলেন।

'দেত্তেরি গোলমালের নিকুচি করেছে। করবে আর কী কাঁচকলা! একটু ইশারায় বুঝতে পারলেই আগড় টেনে দেব।'

এই ব'লে মাথার ব্রহ্মতালুতে একটুখানি সর্ষের তেল দিয়েই 'কৈগো ভাত বাড়' বলতে বলতে ছুটলেন কলতলার দিকে।

ওঁর 'দিগ্বিজয়ী ছেলে'র গর্ভধারিণী আপত্তি করেছিলেন বৈকি! অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি কি বেরোবে নাকি? রাজু অত ক'রে বারণ করল—'

'রাজু আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নাকি? নাকি তার কথা না শুনলে আমার কাঁচা মাথাটা উলিয়ে নেবে? ...বারণ তো ক'রে গেল, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা চলবে কী ক'রে ব'লে গেল কি?...নাও, নাও, তুমি ভাত বাড়! অত কথায় তোমার দরকার নেই।'

কোনোমতে নাকেমুখে দুটো ভাত গুঁজেই ছোটেন তিনি। মন স্থির করার পর আর কোনো দ্বিধা বা আশঙ্কাই যেন থাকে না, উৎসাহে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলেন। স্ত্রীকে ব'লে যান, 'পাড়ায় কোনো হ্যাঙ্গাম-হুজ্জত হ'লে একটু সাবধানে থেকো। দোর-টোর বন্ধ ক'রে থেকো।'

'তুমি সকাল সকাল আসবে তো?'

'যদি তেমন কিছু বুঝি তো আসব। নইলে সেই ধর রাত দশটা। আজ

হয়তো শেতলও আসবে না—একা থাকব। নড়বারই অবসর পাব না। দুর্গা দুর্গা—বামন বামন! চলি।'

গোলমালটার আভাস পাওয়া গিয়েছিল দেড়টা-দুটো থেকেই। তখনই উঠে পড়া উচিত ছিল জিতেনবাবুর—কিন্তু আর একটু না দেখে উঠতে পারলেন না—উঠি-উঠি ক'রেও। 'দেখিই না একটু—এধার পজ্জন্ত কি আর আসবে!' মনে মনে বার কতক বললেন।

ঐ দেখতে দেখতেই তিনটে-চারটে নাগাদ এমন গণ্ডগোল বেধে গেল যে বেরোবার পথই গেল আটকে। তিন-চারটে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি নাকি পুড়িয়েছে ছোঁড়ারা; ওদিকে হরিণঘাটার দুধের গাড়িও পুড়েছে। পুলিশের ওপর ইঁটপাটকেল ছোঁড়া হচ্ছে। তার ফলে গাড়ি গাড়ি পুলিশ এসে পড়েছে! এখনও গুলী-ফুলি ছোঁড়ে নি বটে, কিন্তু যা ছুঁড়ছে—কাঁদুনে গ্যাস—তাতেই যথেষ্ট। ছোঁড়াগুলো দল বেঁধে গিয়ে ইঁট ছুঁড়ছে, তার ফলে পুলিশ যখন তেড়ে আসছে তখন সব ফরসা—কাঁদুনে গ্যাস খেতে খাচ্ছেন তাঁরাই—যাঁরা বাড়িতে বা তাঁর মত দোকানে আটকে আছেন।

অবশ্য বেশী লোক তাঁর মত বোকামি করে নি। সকলেই প্রায় দোকান বন্ধ ক'রে স'রে পড়েছে তাঁর আশপাশের। শুধু তিনিই আটকা পড়েছেন। উঃ এমন গণ্ডগোল হবে কে জানত রে বাবা। চোখ যে গেল। শুধু চোখের জল বেরোলে তো যাহোক কথা ছিল, এ যে কলাবাস্‌নার ধোঁয়ার বেহদ্দ। কুঁজোর জল যা ছিল সব শেষ হয়ে গেল চোখে দিয়ে দিয়ে—রুমাল নেই পকেটে, একটা ন্যাকড়া ভরসা—সেটা ভিজিয়ে নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাই বা আর কতক্ষণ? তেষ্টা পেলেও খেতে পারবেন না। শেতল আসে নি, চাকরটাও সেই যে দেড়টার সময় দেখে আসি ব'লে স'রে পড়েছে, তারও পাত্তা নেই। হয় বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তি হয়েছে—নয় তো পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

দোকান বন্ধ ক'রেই ব'সে আছেন বটে, কিন্তু পুরানো বাড়ি—দরজাটা হয়েছে জানালামার্কা। ধোঁয়াটা পুরোপুরি ভেতরে এসে ঢুকছে, অথচ বেরোবার পথ নেই। বাড়ির ভেতরের দিকে একটা আওয়াজী ছিল, তিনিই ইঁদুরের ভয়ে তক্তা মেরে বুজিয়ে দিয়েছেন। এখন প্রাণের দায়ে টানাটনি ক'রে খোলবার চেষ্টা করলেন খানিকটা—কিন্তু চোখই চাইতে পারছেন না, তা করবেন কি?

এক-এক বার বাইরের কোলাহলটা একটু নিস্তব্ধ হয়ে আসছে—ভরসা ক'রে

দরজার কপাট একটু ফাঁক করে দেখছেনও, কিন্তু বেরোতে সাহস হচ্ছে না। দূরে আগুনের চিহ্ন। হৈ-চৈ হচ্ছে সেখানে। এখানে দু'দিকে দুই পুলিশের গাড়ি। তিন খাবার পর তেড়ে তেড়ে যখন আসছে তখন তো ছোঁড়ারা দিব্যি দুড়দাড় ছুটে পালাচ্ছে, তিনি কি আর পারবেন? তারপর সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেড়ে শালাকে ধরুক আর কি!

তিনি আবার দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন।

আর একটু জুড়ুক, তারপর দেখা যাবে। চোখটা জ্বালা করছে বটে—কিন্তু প্রাণটা তার চেয়েও বড়।

শুধু কুঁজোটায় যদি একটু জল থাকত!

সাতটা পর্যন্ত কোনোমতে ব'সে রইলেন আলো জ্বেলে। কিন্তু, আর পারা গেল না। আর কোনো দোকানে লোক নেই—শুধু তাঁর দোকানেই আছে। আলোতেই তার প্রমাণ। আলো নিভিয়ে তো ব'সে থাকা যায় না। অথচ সেইটেই হয়েছে পুলিশের সন্দেহের বড় কারণ, তার ফলে এদিকে ওদিকে যা-ই হোক না কেন, তাঁর দরজার সামনে একটা ক'রে কাঁদুনে বোমা ঠিক ফাটছে। ফুরোচ্ছেও না তো বেটাদের, এ কী অক্ষয়তূণ নাকি রে বাবা!

শেষ পর্যন্ত দুর্গাশ্রীহরি স্মরণ ক'রে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চোখ দুটো প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে গ্যাসে গ্যাসে—ঘরের অবস্থা তো অবর্ণনীয়, রাস্তাতেও যেন ঘন হয়ে আছে ধোঁয়া। কোনোমতে হাতড়ে হাতড়েই তালা লাগালেন, সেই অবস্থাতেই টেনে দেখলেন তালা তিনটে, তারপর আবার সেই অবস্থাতেই আন্দাজে আন্দাজে চলতে শুরু করলেন।

পুলিশের গাড়ি দুটো সাক্ষাৎ যমদূতের ঘাঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে—কে জানে ব্যাটারা হয়তো সঙ্গীন উঁচিয়ে ব'সে আছে,—বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করে পাশ দিয়ে আসতে। আর যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়—কথাতে আছে না, পড়বি তো পড় কানার মত সেই গাড়ির ওপরই গিয়ে পড়লেন হুমড়ি খেয়ে। ভাগ্যিস—ওরা কিছু বললে না!

অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় প'ড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন জিতেনবাবু, চোখের জ্বালাটাও খানিক কমল। চোখ চেয়ে দেখতেও পেলেন কিছুটা। ঝাপ্সা ঝাপ্সা হ'লেও—ব্যাপারগতিক বোঝার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

তবে যা বুঝলেন তাতে বিশেষ ভরসা পেলেন না। পাড়ার কর্মবীরেরা প্রথম

চোটেই রাস্তার আলো নিভিয়ে দিয়েছে, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দোকানপাটগুলো খোলা থাকলেও যা হয় হ'ত—এ কিছু দেখবার উপায় নেই। অন্ধকারে একটা খুব সুবিধে হয়েছে—যত বেকার বদমাইশ অকম্মা লোক ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে মজা দেখতে। সমস্ত চৌরাস্তাটা যেন জনসমুদ্র। পথটা ফাঁকা অবশ্য, সেখানে পুলিশ আর পুলিশের গাড়ি—ফুটপাথ গলির মোড়, গাড়িবারান্দার নিচে—ঠাসাঠাসি ভিড়।

মোড়টা পার হ'তে হবে—রাস্তা দিয়ে যাওয়াই সুবিধা—কিন্তু আর কাউকেই যেতে দেখছেন না যে! ভয়ে নামছে না কেউ, না পুলিশের বারণ? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন! নাকি ভিড় ঠেলেঠেলেই যাবেন গুঁতিয়ে। তাও তো খুব নিরাপদ মনে হচ্ছে না। কে জানে কখন হঠাৎ পুলিশ তাড়া করে, তখন ঐ ভিড়ের চাপেই হয়তো শেষ হয়ে যাবেন।

দূরে আগুন জ্বলছে। হৈ-হৈ শব্দ। টিয়ার গ্যাস ও গুলীর আওয়াজ না?

অনেকক্ষণ জল খান নি জিতেনবাবু, গলাটা শুকিয়েই আছে। এখন আর ঢোঁক গিলতেও পারছেন না। একটু যদি জল কোথাও পাওয়া যেত! পানের দোকানগুলোও বন্ধ যে!

হঠাৎ পুলিশের গাড়ি থেকে লাউড্‌স্পীকার চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনারা ভিড় করবেন না, দয়া ক'রে যার যেখানে দরকার চ'লে যান। ভিড় কমান। রাস্তার মোড়ে অকারণে ভিড় করবেন না!'

এবং সঙ্গে সঙ্গে—ভয় দেখাতেই হয়তো, তিন-চারটে বন্দুক ওপর দিকে মুখ ক'রে ফাঁকা আওয়াজ করল কয়েকটা।

যারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল তারা যে এতে খুব ভয় পেল তা নয়—বোধ হয় ফাঁকা আওয়াজের রহস্য তারাও জানে। তবে দু'-চার জন লোক নড়ল। পথে এক-আধ জন নামতেই জিতেনবাবুও নেমে পড়লেন এবং যথাসম্ভব দ্রুতপদে মোড়টা পেরিয়ে ওধারের কোণে গিয়ে পৌছলেন নিরাপদেই। যাক্—বাঁচা গেল। এবার এটুকু গলি-গলিতেই যাওয়া যাবে।

পিছন দিকে আর তাকালেন না জিতেনবাবু, ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখার এতটুকু ইচ্ছে নেই। বাড়ি পৌছে দু'ঘটি জল খেয়ে স্নান ক'রে ফেলতে পারলে বাঁচেন তিনি। আর এ কাজে নেই বাবা—গোলমাল হ্যাঙ্গাম থাকতে আর এ পথে আসছেন না। খুব শিক্ষা হয়েছে।

মোড়টা পেরিয়ে বড় রাস্তা ধ'রে খানিকটা চলবার পর তাঁর বাড়ির রাস্তা

পাবেন। ইতিমধ্যে গোটা চারেক গলির মোড় পেরোতে হয়। তার ভেতর দুটো বেশ নির্বিবাদে পার হয়ে গেলেন, মনে মনে ভরসা পেলেন একটু, বাড়ি পৌঁছবেন ব'লে আশা হ'ল এবার। আর দুটো মোড় কোনোমতে পেরোতে পারলে হয়—

এদিকে পুলিশ আছে, তবে অত নয়। ভিড়ও কম। শুধু গলির মোড়ে মোড়ে জটলাটা ঠিক আছে। কী যে মজা দেখছে বেটারা—

ওদিক থেকে একটা পুলিশের গাড়ি আসছে গর্জন ক'রে। গাড়িঘোড়াহীন নির্জন রাস্তায় একটা গাড়িরই কি শব্দ!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন জিতেনবাবু, চোখটা ছিল ঐ গাড়ির দিকেই —তাই কখন যে ডানহাতি গলির মোড়টা এসে পড়েছে অত টের পান নি। একেবারে সেটা পেলেন একটি ছোকরা সাঁ ক'রে সেই গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে, কারণ একটু ধাক্কাই লাগল তাঁর সঙ্গে—সে ছুটে এসে একটা কি জিনিস রাস্তার দিকে, সম্ভবত পুলিশের গাড়িটার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই তীর বেগে আবার ফিরে চ'লে গেল গলির ভেতর—সেই অন্ধকার কায়াহীন জনতায় মিশে গেল।

দ্যুম্ ক'রে প্রচণ্ড শব্দ উঠল একটা।

আর সেই সঙ্গেই প্রায় তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বার হল—'রেজো!'

কী ফাটল এটা—এই কি হাতবোমা নাকি? উঃ কী দুর্গন্ধ! এক ঝলক গরম হাওয়া আর সেই দুর্গন্ধটা যেন মুখে এসে আঘাত করল একটা।

তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন তাই—নইলে পালাবার তখনও সুযোগ ছিল। গাড়িটা থামাতে থামাতেও দু'মিনিট সময় লেগেছিল ওদের।

হতভম্ব হয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত বোমা ফাটার এই ঝাপটায়। এটা একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। এত কাল লোকের মুখে শুনে এসেছেন আর খবরের কাগজে প'ড়ে এসেছেন—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সে ঝাপটাতেও খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু, প্রধান কারণ এসব কিছু নয়। ছেলেকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন, সেই এক লহমাতেই। না, ভুল হয় নি তার। জ্যেষ্ঠ সন্তান—তিল তিল ক'রে বাপের চোখের সামনে বেড়ে ওঠে, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বাপ সে বেড়ে-ওঠাটা লক্ষ্য করে। তার ফলে সেই সন্তানের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুধু নয়, সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সামান্যতম ভঙ্গিটি পর্যন্ত তার পরিচিত হয়ে থাকে। ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সেটা কথা নয়। কথা হচ্ছে হারামজাদাটা কত দূর এগিয়েছে। তিনি কি এই

জন্যে বুকের-রক্ত-জল-করা পয়সায় ওকে খাওয়াচ্ছেন বসিয়ে বসিয়ে? ব'সে খাচ্ছে আর এই সব বজ্জাতি ক'রে বেড়াচ্ছে! দাঁড়াও, আজ তিনি বাড়ি পৌছন আগে, এ.. কটু দিব্যি দেবেন ওর গর্ভধারিণীকে, যাতে ভাত আর ওর সামনে বেড়ে দিতে না পারে সে মাগী!

কিন্তু, বাড়ি পৌছনোটাই হ'ল না আর।

গাড়ি থামতেই তিন-চার জন পুলিশ লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে এবং গলির মোড় লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়ল।

তারই একটি এসে লাগল জিতেনবাবুর ঠিক বুকের মাঝখানে।

খবর ঠিকই পৌছল। মৃতদেহও এসে পৌছল একসময় বাড়িতে। তার পর রাজেনের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা ক'রে থেকে পাড়ার লোকরাই অগ্রণী হলেন সংকারের জন্য।

খাট এল, দড়ি এল! বাঁধাও হ'ল। ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর বুকফাটা কান্নার মধ্যে শব উঠল শবযাত্রীদের কাঁধে।

এমন সময় কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এল রাজেন।

'হাঁ-হাঁ—নামাও নামাও। এখন যেতেই পারে না। এসব চন্দন-ফন্দন আবার কে লাগাল, এসব মুছতে হবে। পার্টির লোক আসছে, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার—ছবি নিতে হবে, যেমন মরেছে তেমনি। রক্তের দাগগুলো মোছে নি তো কেউ? দেখো। এ সব তো যে সে মৃত্যু নয়, শহীদের মৃত্যু যে। এর সম্মান আলাদা!'

শব নামল আবার শবযাত্রীদের কাঁধ থেকে।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হ'ল প্রেস-ফোটোগ্রাফারের জন্য। অবশ্য সে প্রতীক্ষা সার্থকই হ'ল বলতে হবে। কারণ, অনেকগুলোই ছবি নিলেন তাঁরা। সে ছবি পরের দিনই কোনো কোনো কাগজে বেরোল।

'খাদ্য-আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী এ বছরের প্রথম বীর শহীদ জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক' মরে বিখ্যাত হলেন। ছেলেকেও কিছুটা বিখ্যাত হবার সুযোগ দিয়ে গেলেন সেই সঙ্গে, কারণ উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, শোকার্ত রাজেনেরও কাছাগলায় দেওয়া অবস্থায় একটা ছবি কাগজে দেওয়া হল—'শহীদের পরিত্যক্ত বিপুল সংসারের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত শ্রীরাজেন মল্লিকের সামনে ভবিষ্যতের যে বিপুল ও বিকট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—আপনারা কি তার যথোচিত উত্তর দেবেন না?'

---